বাংলায় ভ্রমণ

—ঃ দ্বিতীয় খণ্ড ঃ—

পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথের

প্রচার বিভাগ হইতে

প্রকাশিত।

—১৯৪০—

মূল্য প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্রে ১।৷০ দেড় টাকা মাত্র।

সূচীপত্র

পূর্ব্ব ভারত রেলপথের
মানচিত্র।
মোগলসরাই
বক্সার
পাটনা জং
গয়া জং
মানপুর
কিউল জং
মুঙ্গের
জামালপুর
শিমুলতলা
ভাগলপুর
সাহেবগঞ্জ
হাজারিবাগ রোড
গোমো
ধানবাদ
বরাকর
রাণীগঞ্জ
অণ্ডাল জং
দুর্গাপুর
বর্দ্ধমান
মেমারি
দেবানন্দপুর

বাংলা নাগপুর রেলপথের মানচিত্র।

(৬) পার্ব্বতীপুর জংশন—কাটিহার জংশন।

দিনাজপুর জংশন—কলিকাতা হইতে ২৫২ মাইল ও পার্ব্বতীপুর জংশন হইতে ১৮ মাইল দূর। জেলার সদর শহর দিনাজপুর পুনর্ভবা নদীর তীরে অবস্থিত। দিনাজপুর অতি পুরাতন স্থান। অনেকে অনুমান করেন যে পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তি বা উত্তরবঙ্গের কোন বর্ষ, বিষয় বা পরগণার অধিকাংশ দিনাজপুরের নিকটে অবস্থিত ছিল। এখানে মহারাজা উপাধিধারী উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থজাতীয় একটি পুরাতন জমিদার বংশের বাস। কাহারও কাহারও মতে দিনাজ বা দিনরাজ নামক জনৈক ব্যক্তি এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা এবং তাঁহার নাম হইতেই এই স্থানের নাম দিনাজপুর হইয়াছে। আবার কেহ কেহ বলেন যে রাজা গণেশ দত্ত খান বা ইতিহাসবিশ্রুত রাজা গণেশই দিনাজপুর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে শ্রীমন্ত দত্ত চৌধুরী দিনাজপুরের রাজা বা জমিদার ছিলেন। কথিত আছে, কালিকার উপাসক এক ব্রহ্মচারী বিগ্রহসহ বহু সম্পত্তি শ্রীমন্ত দত্ত চৌধুরীকে দিয়া যান। এই ব্রহ্মচারীর সমাধি দিনাজপুর রাজবাড়ীর মন্দির দ্বারের নিকটে অবস্থিত। শ্রীমন্তের একমাত্র পুত্রের অকালমৃত্যু হওয়ায় তাঁহার দৌহিত্র শুকদেব ঘোষ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। শুকদেবের পুত্র রাজা প্রাণনাথ রায় অতি বিখ্যাত ছিলেন। কান্তনগরের সুবিখ্যাত কান্তজীর মন্দির ইঁহারই অমরকীর্ত্তি। দিনাজপুর হইতে ১২ মাইল দক্ষিণে মুর্শিদাবাদ রোড নামক রাজপথের পার্শ্বে ইঁহার দ্বারা খনিত "প্রাণসাগর" নামে একটি দীঘি দেখিতে পাওয়া যায়।

দিনাজপুর শহরটি রাজগঞ্জ, কাঞ্চনঘাট, পাহাড়পুর ও ফুলহাট এই কয় অংশে বিভক্ত। দিনাজপুরের থানার নিকটবর্ত্তী মশানকালীর মন্দির একটি প্রাচীন স্থান। দিনাজপুরের রাজবাড়ীটিও খুব পুরাতন। ইহার দুই দিকে পরিখার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ভীষণ ভূমিকম্পে পুরাতন প্রাসাদটির সমূহ ক্ষতি হইলে মহারাজা স্যার গিরিজানাথ রায় বহু অর্থ ব্যয়ে আধুনিক যুগের উপযোগী করিয়া উহার আমূল সংস্কার করান। বাণগড় হইতে আনীত বহু প্রাচীন কীর্ত্তি রাজবাড়ীতে রক্ষিত আছে। মহারাজার বৈঠকখানার সম্মুখে একাদশ খৃষ্টাব্দের একটি বৌদ্ধ চৈত্য, একটি শিব-মন্দির ও একটি কারুকার্য্যখচিত স্তম্ভ আছে। চৈত্যটি দেখিতে মন্দিরের মত; ইহার চারিদিকে বুদ্ধদেবের জীবনের চারিটি প্রধান ঘটনার অর্থাৎ জন্ম, গৃহত্যাগ, বুদ্ধত্বলাভ ও নির্ব্বাণের চিত্র আছে। স্তম্ভটি কষ্টিপাথর বা ব্রহ্মশিলা নির্ম্মিত, ইহার নিম্নভাগে যে লিপি আছে তাহা হইতে জানা যায় যে ৮৮৮ শকাব্দে (৯৬৬ খৃষ্টাব্দে) কাম্বোজবংশজাত গৌড়দেশের জনৈক রাজা একটি শিবমন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইহাই বাংলার কাম্বোজ অধিকারের একমাত্র নিদর্শন। দিনাজপুর রাজ-বংশের ঠাকুরবাড়ীতেও বাণগড় হইতে আনীত অনেকগুলি পুরাতন পাথরের খোদাই করা চৌকাঠ আছে। ইহাদের মধ্যে নাগ দরওয়াজা অতি সুন্দর। চৌকাঠের উচ্চতা দেখিলে মনে হয় যে ইহা যে মন্দিরের সহিত সংলগ্ন ছিল তাহা অন্ততঃ এক শত ফুট উচ্চ ছিল। নীচে হইতে দুইটি নাগ পরস্পরকে বেষ্টন করিতে করিতে মাথার উপরে আসিয়া মিলিয়াছে। এরূপ সুন্দর কারুকার্য্য অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। মহারাজার প্রাসাদের সম্মুখে একটি পুরাতন দীঘির পাড়ে অনেকগুলি পুরাতন কামান আছে, তাহার মধ্যে দুই একটি ফরাসীজাতি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত।

দিনাজপুর হইতে পরিষ্কার দিনে কাঞ্চনজঙ্ঘা ও হিমালয়ের অন্যান্য তুষারাবৃত শিখর মাঝে মাঝে দেখা যায়। কালীতলা মহাল্লায় মশানকালী নামে একটি পুরাতন কালী আছেন। ইহার নিকট দিনাজপুর রাজদিগের পুরাতন বিচারালয় ছিল এবং মশানকালীর সম্মুখে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিদিগকে

বলি দেওয়া হইত বলিয়া কথিত। দিনাজপুর স্টেশনের সম্মুখে বিস্তৃত ময়দানটি অতি সুন্দর। দিনাজপুর হইতে মুর্শিদাবাদ রাস্তা ধরিয়া চমৎকার আম্রবীথির মধ্য দিয়া সাড়ে তিন মাইল পথ যাইলে রামসাগর নামে একটি সুন্দর দীঘি দৃষ্ট হয়।

কান্তনগর—দিনাজপুর হইতে ঠাকুরগাঁও পর্য্যন্ত যে রাস্তা গিয়াছে, তাহার পার্শ্বে দিনাজপুর শহর হইতে ১২ মাইল উত্তরে অবস্থিত কান্তনগর একটি পুরাতন স্থান। এখানে একটি প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ আছে। প্রবাদ, ইহা মহাভারতোক্ত মৎস্যরাজ বিরাটের দর্গ। এই দুর্গটি প্রায় এক মাইল স্থান জুড়িয়া অবস্থিত। ইহার ভিতরে দুই তিনটি ঢিবি আছে; ইহার উচচ প্রাকারগুলি জঙ্গলের দ্বারা সমাচ্ছন্ন। এই স্থান হইতে লইয়া গিয়া বহু প্রাচীন কীর্ত্তির নিদর্শন দিনাজপুর রাজবাড়ীতে রক্ষিত হইয়াছে। কান্তনগরের কান্তজীর মন্দিরটি একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য বস্তু। ইহা একটি নবরত্ন মন্দির ছিল। ১৭০৪ খৃষ্টাব্দে দিনাজপুরের রাজা প্রাণনাথ রায় দিল্লী হইতে কান্তজীর বিগ্রহ আনাইয়া এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। বুখানান্ হ্যামিলটন্ ইহাকে বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মন্দির বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ভূমিকম্পে ইহার প্রভূত ক্ষতি হয়। পরে মহারাজা গিরিজানাথ ইহার সংস্কার করেন। এই মন্দিরটি যে কিরূপ সুন্দর ছিল তাহা ইহার পুরাতন চিত্র দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে। ইহার গাত্র সংলগ্ন ইষ্টকে রামায়ণ ও মহাভারতের এবং অন্যান্য নানা বিষয়ের চিত্রাবলী উৎকীর্ণ আছে। এগুলি কৃষ্ণনগরের কারিগরের কাজ। প্রতি বৎসর রাসযাত্রার মেলা উপলক্ষে এখানে বহু যাত্রীর সমাগম হয়। কান্তনগরের মাটির জিনিস উত্তরবঙ্গে সুপ্রসিদ্ধ। মেলার সময়ে লোকশিল্পের নিদশন স্বরূপ দ্রব্যাদি এখনও পাওয়া যায়।

বাণগড়—দিনাজপুর হইতে ১৮ মাইল দক্ষিণে দিনাজপর রোড নামক রাস্তার পার্শ্বে পুনর্ভবা নদীর তীরে অবস্থিত গঙ্গারামপুরও একটি পুরাতন স্থান। ইহার নিকটে ধলদীঘি ও কালদীঘি নামে দুইটি পুরাতন দীর্ঘিকা আছে। মুসলমান আমলে গঙ্গারামপুরে একটি সীমান্তরক্ষী সেনানিবাস বা ছাউনি ছিল এবং সেই সময়ে এই স্থানের নাম ছিল দমদমা। ইংরেজ আমলের গোড়ার দিকে এখানে একটি মুনসেফী আদালত ছিল। কাহারও কাহারও মতে এই দমদমাই কোটিবর্ষের অন্তগত প্রাচীন কোটিকপুর বা দেবকোটনগরী। বরেন্দ্রভূমির উত্তরভাগ বহুকাল ধরিয়া কোটিবর্ষ নামে পরিচিত ছিল। কোটিকপুরে জৈন মহামুনি জম্বুস্বামীর সমাধি ছিল। এখানকার রাজপুরোহিত সোমশর্ম্মার পুত্র ভদ্রবাহু জৈনদের ছয়জন শ্রুতকেবলীর শেষ শ্রুতকেবলী ও মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের গুরু ছিলেন। দাক্ষিণাত্যে চন্দ্রগিরি পর্ব্বতে তিনি দেহ রক্ষা করেন।

গঙ্গারামপুরের দেড় মাইল উত্তরে পুনর্ভবা নদীর পূর্ব্বতীরে বাণনগর বা বাণগড়ের বিস্তীর্ণ ধ্বংসাবশেষ অবস্থিত। সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে এই ধ্বংশাবশেষ গুলিতে খনন কার্য্য চলিতেছে। এই কার্য্য সম্পূণ হইলে মূল্যবান ঐতিহাসিকতথ্য পাওয়া যাইবে বলিয়া অনুমিত হয়। প্রবাদ এই স্থানে অসুররাজ বাণের একটি দুর্গ ছিল। বাণরাজার সহস্র বাহু ছিল এবং শিবের বরে তিনি যুদ্ধে অজেয় ছিলেন বলিয়া পুরাণে বর্ণিত আছে। তাঁহার কন্যা উষার সহিত শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধের বিবাহ উপলক্ষে শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার তুমুল যুদ্ধ হয় এবং সেই যুদ্ধে তাঁহার পরাজয় ঘটে ও ৯৯৮ খানি হাত কাটা যায়। বাণগড়ের বহু প্রাচীন কীর্ত্তি যে দিনাজপুর রাজবাটিতে রক্ষিত আছে তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই স্থান হইতে প্রস্তর ও ইষ্টক সংগ্রহ করিয়া নিকটবর্ত্তী

বহু লোকে গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়াছে। অরণ্য মধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ইষ্টক ও প্রস্তরখণ্ড এখনও এই স্থানের প্রাচীন সমৃদ্ধির স্মৃতি বহন করিতেছে। প্রবাদ, গঙ্গারামপুরের কালদীঘি বাণরাজার মহিষী কালারাণীর দ্বারা খনিত। ধলদীঘির আকৃতি দেখিয়া মনে হয় যে ইহা মুসলমান আমলে খনিত। গঙ্গারামপুর হইতে ৬ মাইল দক্ষিণে তালদীঘি নামে একটি প্রকাণ্ড জলাশয় আছে; ইহাকে একটি হ্রদ বলিলেও চলে। ইহা বাণরাজা কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বলিয়া কথিত। এই স্থানেও বাণরাজার স্মৃতি বিজড়িত ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়।

বাণগড়ে পালবংশীয় প্রথম মহীপালদেবের একখানি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে; ইহা হইতে জানা যায় যে বাহুবলে তিনি হৃত পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিয়া "অবনীপাল" হইয়াছিলেন। তাম্র-শাসন খানির দূতক তাঁহার মন্ত্রী বামনভট্ট।

মহীপাল দীঘি—দিনাজপর হইতে ১৮ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে মালদহ রোড নামক রাস্তার পার্শ্বে পালবংশের গৌরব মহারাজা প্রথম মহীপাল দেবের দ্বারা খনিত মহীপাল দীঘি নামক একটি প্রকাণ্ড সরোবর আছে। ইহা ৩,৮০০ ফুট লম্বা ও ১,১০০ ফুট চওড়া। ইহার তীরে পূর্ব্বে দেবালয় ও অট্টালিকাদি ছিল; এখনও তাহার ধ্বংসাবশেষ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। এই দীঘিতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মাগুর মাছ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার পাড়গুলি খুব উচচ ও দূর হইতেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দিনাজপুর জেলার মধ্যে ইহা একটি মনোরম স্থান। ইহার নিকটে মহীপুর নামক গ্রাম অবস্থিত। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে টমাস নামে এক পাদ্রী মহীপাল দীঘির ধারে একটি নীলকুঠি স্থাপন করেন।

মহীপাল দীঘি হইতে প্রায় ১০ মাইল দক্ষিণে বংশীহরি থানার অন্তর্গত টাঙ্গন নদীর তীরে মদনা-বাটি গ্রামে সুপ্রসিদ্ধ পাদ্রী কেরি সাহেবও একটি নীলকুঠি স্থাপন করেন। এই স্থানে তিনি একটি ছাপাখানা স্থাপন করিয়া একটি ধর্ম্ম বিষয়ক বা সাময়িক পত্রিকা বাহির করিতেন। কেহ কেহ বলেন ইহাই বাংলার সর্ব্ব প্রথম ছাপাখানা।

দিনাজপুর জংশন হইতে একটি শাখা লাইন দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত ৫০ মাইল দূরবর্ত্তী রুহিয়া নামক স্থান পর্য্যন্ত গিয়াছে।

সিতাবগঞ্জ—দিনাজপুর জংশন হইতে ১৮ মাইল দূরবর্ত্তী এই স্টেশনটি চিনির কল, চাউলের কল প্রভৃতির জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই স্থানে স্বামী দেবানন্দ নামক জনৈক সাধুর প্রতিষ্ঠিত বাসুদেব ও অন্নপূর্ণার মন্দির আছে।

শিবগঞ্জ—দিনাজপুর জংশন হইতে ৩৭ মাইল দূর। শিবগঞ্জের হাট এ অঞ্চলে বিশেষ প্রসিদ্ধ। স্টেশন হইতে ৮ মাইল পশ্চিমে নেকমরদ গ্রাম। নেকমর্দ্দন্ নামে একজন মুসলমান সাধুর সমাধি এই স্থানে অবস্থিত বলিয়া ইহার নাম নেকমরদ হইয়াছে। ইঁহার সম্মানে প্রতিবৎসর এখানে একটি বৃহৎ মেলা বসে। বাংলা দেশের মধ্যে ইহা অন্যতম বৃহৎ মেলা। গবাদি বহুজন্তু এই মেলায় বিক্রয় হয়; হাতী, উট, দুম্বাও আসিয়া থাকে। পূর্ব্বে ভুটিয়া ও তিব্বতীয়গণ এই মেলায় আসিত এবং এখানে বিখ্যাত টাঙ্গন বা ভুটিয়া ঘোড়া পাওয়া যাইত। এই মেলায় লোকশিল্পের নিদর্শন স্বরূপ দ্রব্যাদি পাওয়া যায়।

নেকমরদ গ্রাম হইতে পশ্চিমে পূর্ণিয়া জেলার কিষণগঞ্জ মহকুমার সূর্য্য পরগণার দক্ষিণ পর্য্যন্ত "মামু ভাগিনার আইল" নামে একটি সুদীর্ঘ বাঁধ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার সম্বন্ধে গল্প প্রচলিত আছে যে আঙ্গুরবাসা গ্রামের একটি বালিকাকে এক মামা ও তাহার ভাগিনা উভয়েই ভালো বাসিত ও বিবাহ করিতে চাহিয়াছিল ; কথিত আছে যে মামা ও ভাগিনা আঙ্গুরবাসা হইতে বিপরীত দিকে ৩০ মাইল দূরে বাস করিত এবং বালিকার প্রেম লাভার্থ নিজ নিজ স্থান হইতে আঙ্গুরবাসা পর্য্যন্ত একটি নূতন পথ নির্ম্মাণ করিতে থাকে ; উদ্দেশ্য ছিল এমন একটি পথে বালিকার নিকট উপস্থিত হওয়া যে পথে পূর্ব্বে কোন মানুষ চলে নাই। অলৌকিক ক্ষমতাবলে এক রাত্রির মধ্যে রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়া দুজনে নাকি একই সময়ে বালিকার নিকট উপস্থিত হয় এবং বালিকা মনস্থির করিতে না পারিয়া আত্মহত্যা করে। মতান্তরে পথ প্রস্তুত করিতে এত দেরী হইয়াছিল যে বালিকা অপেক্ষা না করিয়া অন্য একজনকে বিবাহ করে।

ঠাকুরগাঁও রোড—দিনাজপুর জংশন হইতে ৪০ মাইল দূর। স্টেশন হইতে দিনাজপুর জেলার অন্যতম মহকুমা ঠাকুরগাঁও পূর্ব্বে দিকে প্রায় ৪ মাইল দূর। স্টেশনে ঘোড়ার গাড়ী পাওয়া যায়। ঠাকুরগাঁও টাঙ্গন নদীর তীরে অবস্থিত ; নদীর অপর পারে দিনাজপুরের মহারাজা রমানাথের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ ও তৎপ্রতিষ্ঠিত একটি পুরাতন গোবিন্দ মন্দির দৃষ্ট হয়। রাজা রমানাথ যাতায়াতের সুবিধার জন্য এই স্থান হইতে পুনর্ভবা তীরে রাজা প্রণনাথের প্রিয় প্রাসাদ প্রাণনগর পর্য্যন্ত একটি খাল কাটাইয়াছিলেন। ইহা রামদাঁড়া নামে পরিচিত ও এখনও বর্ত্তমান। প্রাণনগরের কোন চিহ্ন এখন নাই। গোবিন্দ মন্দিরের অনতিদূরে দুই মাইল ব্যাপী একটি জঙ্গল বিদ্যমান ; মধ্যে মধ্যে ইহাতে ব্যাঘ্রাদি দৃষ্ট হয়।

রুহিয়া—দিনাজপুর জংশন হইতে ৫০ মাইল দূর। স্টেশন হইতে দুই মাইল উত্তর-পশ্চিমে আলোয়াখোওয়া গ্রাম অবস্থিত। ইহার পার্শ্ব দিয়া একটি প্রশস্ত রাজপথ বালিয়াডাঙ্গী, রাণীশঙ্কৈল, বিন্দোল প্রভৃতি হইয়া দক্ষিণে রায়গঞ্জ পর্য্যন্ত গিয়াছে। রাসপূর্ণিমার সময়ে এই স্থানে পক্ষকাল স্থায়ী একটি বিরাট মেলা হয়। এই মেলায় ঘোড়া, উট, গোরু, মহিষ, ছাগল, দুম্বা প্রভৃতি বিক্রয় হয়। বিহার, পাঞ্জাব, ভুটান প্রভৃতি অঞ্চল হইতে বিক্রয়ের জন্য জন্তুগুলি লইয়া আসা হয়। মেলার সময়ে রুহিয়া স্টেশন হইতে মোটর বাস ও গোরুর গাড়ী পাওয়া যায়। উট ও দুম্বা বেশীর ভাগ বকরূঈদে কুর্ব্বাণীর জন্য ক্রীত হয়। নেকমরদের মেলা হইতেও এই মেলা বড়।

রুহিয়া হইতে প্রায় এক মাইল পূর্ব্বদিকে করম খাঁর গড় নামক একটি পুরাতন দুর্গের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয় ; দুর্গটি দেখিলে ইহার সামরিক শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার উত্তরে ইহার চেয়ে বড় একটি হিন্দু রাজার দুর্গেরও ভগ্নাবশেষ আছে ; কথিত আছে দুই পক্ষে বহু দিন ধরিয়া যুদ্ধ হইয়াছিল।

বাঙ্গালবাড়ী—কলিকাতা হইতে ২৭৮ মাইল দূর। স্টেশনের পার্শ্বেই একটি চাউলের কল আছে। স্টেশনের ৩ মাইল উত্তরে হেমতাবাদে পীর বদর উদ্দীনের একটি পুরাতন সুন্দর সমাধি আছে ; ইহার নির্ম্মাণে হিন্দু বাটীর ভগ্নাবশেষ লওয়া হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। ইহার অনতিদূরে হুসেন শাহের তখত্ নামে একটি চতুষ্কোণ পিরামিড দৃষ্ট হয়, ইহার মধ্যেও দুইটি সমাধি আছে। নিকটে মহেশ রাজার প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষও দৃষ্ট হয়। অনুমিত হয়, সুলতান হুসেন শাহ এই মহেশ রাজাকে পরাজিত করিয়া জয়চিহ্ন স্বরূপ পিরামিডটি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। রায়গঞ্জ হইতেও হেমতাবাদে আসা যায়। উত্তর-পূর্ব্বে ৮ মাইল দূর ও রাস্তা আছে।

রায়গঞ্জ—কলিকাতা হইতে ২৮৪ মাইল দূর। ইহা দিনাজপুর জেলার একটি প্রসিদ্ধ কারবারের স্থান এবং ধান ও পাটের একটি বড় গঞ্জ। এখানে একটি মুনসেফী আদালত আছে।

রায়গঞ্জ হইতে ১৪ মাইল দক্ষিণে মহানন্দাকূলে চূড়ামন গ্রামে একঘর বর্দ্ধিষ্ণু ও প্রাচীন জমিদার বংশের বাস। নদীতীরে তাঁহাদের বাড়ীটি অতি সুন্দর।

বারসোই জংসন—কলিকাতা হইতে ২৯৭ মাইল দূর। রায়গঞ্জের ঠিক পরের ও ইহার আগের ষ্টেশন কাচনা হইতে পূর্ণিয়া জেলা তথা বিহার প্রদেশ আরম্ভ। মহানন্দার পূর্ব্ব তীরে বারসোই একটি বাণিজ্য কেন্দ্র। ষ্টেশন হইতে নদীর তীরের মালগুদাম পর্য্যন্ত একটি সাইডিং চলিয়া গিয়াছে। এখান হইতে একটি শাখা লাইন ৩৫ মাইল দূরবর্ত্তী কিষণগঞ্জ জংশন পর্য্যন্ত গিয়াছে।

ডালকোলহা—বারসোই জংশন হইতে ১৮ মাইল দূর। ষ্টেশনের প্রায় ৪ মাইল উত্তরে মহানন্দার পূর্ব্বকূলে অসুরগড় নামে একটি প্রাচীন উচচ দুর্গের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। কথিত আছে, রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে অসুর, বেণু, বারজান, নানহা ও কান্হা নামে পাঁচ ভাই নিজেদের বাসের জন্য রাতারাতি পাঁচটি দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। কিষণগঞ্জ মহকুমার উত্তর অংশে বেণু ও বারজানের নামে দুটি দুর্গের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। অসুর গড়ে এক জন মুসলমান পীরের সমাধিতে দিনাজপুরের নেকমরদের মেলার পর বহু লোক আসিয়া থাকে।

কিষণগঞ্জ জংশন—বারসোই জংশন হইতে ৩৫ মাইল দূর। ইহা পূর্ণিয়া জেলার একটি মহকুমা। সীমান্ত ভূমিতে যেরূপ হইয়া থাকে এই মহকুমার স্থানীয় মিশ্র ভাষা কিষণগঞ্জিয়া বা সিরিপুরিয়া প্রধানতঃ বাংলা হইলেও উহাতে মৈথিলীর কিছু কিছু মিশ্রণ আছে এবং সাধারণতঃ কায়েথী অক্ষরে ইহা লিখিত হয়। দার্জিজলিং রেলপথের একটি শাখা শিলিগুড়ি হইতে এখানে আসিয়া পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথের সহিত মিশিয়াছে।

কিষণগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত খাগড়া গ্রামে একটি পুরাতন নবাববংশের বাস আছে, ইঁহারা পূর্ণিয়া জেলার প্রসিদ্ধ জমিদার। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা সৈয়দ খাঁ দস্তুর শের শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধে হুমায়ুনকে সাহায্য করায় তাঁহার সনদ বলে ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দে সূর্য্যপুর পরগণার জমিদারী প্রাপ্ত হন। খাগড়ার নবাবদিগকে দেশ রক্ষার জন্য নেপালী প্রভৃতি আক্রমণকারীদের সহিত বহু বার যুদ্ধ করিতে হইয়াছে। খাগ্ড়ার প্রসিদ্ধি এখানকার বৃহৎ মেলার জন্য। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে নবাব আতাহুসেন খাঁ এই মেলার আরম্ভ করেন। তদবধি শীতকালে একমাস ব্যাপী এই মেলায় বহু লোক যোগ দিয়া আসিতেছেন। অসংখ্য গোরু, ঘোড়া, হাতী, উট এবং নানারূপ কৃষিজাত দ্রব্য এই মেলায় বিক্রয় হয়।

কাটিহার জংশন—কলিকাতা হইতে পার্ব্বতীপুর জংশন হইয়া ৩৪০ মাইল ও লালগোলা ঘাট হইয়া ২৬৪ মাইল দূর। ইহা পূর্ণিয়া জেলার অধীন একটি বিখ্যাত বাণিজ্য স্থান। এখানকার গঞ্জটি বেশ বড়। আটা, ময়দা, তৈল ও পাটের কয়েকটি কল এখানে আছে এবং এখান হইতে প্রচুর পরিমাণে চাউল, ময়দা ও তৈলবীজ (সরিষা, তিল প্রভৃতি) চালান যায়। এই স্থানের পুরাতন

নাম সৈফগঞ্জ। কথিত আছে প্রায় পৌনে দুইশত বৎসর পূর্ব্বে পূর্ণিয়ার নবাব সৈফ খাঁ কর্ত্তৃক এখানকার গঞ্জটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

কাটিহার একটি বড় জংশন স্টেশন। এখানে পূর্ব্ব-বঙ্গ রেলপথের সহিত বাংলা ও উত্তর-পশ্চিম (বেঙ্গল এণ্ড নথ ওয়েষ্টার্ণ) রেলপথের সংযোগ ঘটিয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথের এক শাখা এই স্থান দিয়া গঙ্গাতীরবর্ত্তী মণিহারিঘাট পর্য্যন্ত গিয়াছে এবং অপর একটি শাখা লাইন ৬৭ মাইল দূরবর্ত্তী নেপালরাজ্যের সীমান্তে অবস্থিত যোগবণী পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই শাখাপথে পূর্ণিয়া জংশন, জালালগড়, আরারিয়া কোর্ট, ফরবেশগঞ্জ ও যোগবণী উল্লেখযোগ্য স্টেশন। পূর্ণিয়া জংশন হইতে আর একটি শাখা লাইন ভাগলপুর জেলার অন্তর্গত মুরলীগঞ্জ ও বিহারীগঞ্জ পর্য্যন্ত গিয়াছে।

মণিহারি ঘাট—কাটিহার জংশন হইতে ১৭ মাইল দূর। এই স্থানটি গঙ্গাতীরে অবস্থিত। এখানে পূর্ব্ব-ভারত রেলপথের খেয়া জাহাজে গঙ্গা পার হইয়া পূর্ব্ব-ভারত রেলপথের সকরিগলিঘাট স্টেশনে যাওয়া যায়। গ্রহণ, বারুণী, কার্ত্তিকী-পূর্ণিমা, মাঘী-পর্ণিমা ও শিবরাত্রির সময় গঙ্গা স্নানের জন্য মণিহারি ঘাটে বহু যাত্রীর সমাগম হয়।

মণিহারির নিকটে ছোট পাহাড় নামে একটি পাহাড় আছে। ইহার উচ্চতা আড়াই শত ফুটের অধিক নহে। এই পাহাড়ে কতকগুলি কারুকার্য্য খচিত প্রস্তর স্তম্ভ দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ অনুমান করেন যে পূর্ব্বে এই পাহাড়ের উপর হয়ত কোন হিন্দু দেবমন্দির ছিল। এখন এই পাহাড়ের উপর একজন মুসলমান পীরের সমাধি আছে।

মনিহারির নিকটবর্ত্তী বলদিয়াবাড়ী নামক গ্রামের প্রান্তরে ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে বাংলার সিংহাসন লইয়া সিরাজউদ্দৌলা ও তাঁহার মাসতুতো ভাই পূর্ণিয়ার নবাব শওকত জঙ্গের মধ্যে এক যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে সিরাজউদ্দৌলার বাঙ্গালী সেনাপতি মোহনলাল ও শ্যামসুন্দর প্রভৃত পরাক্রম প্রদর্শন করেন। যুদ্ধে শওকত জঙ্গের মৃত্যু ঘটে।

পূর্ণিয়া জংশন—কাটিহার জংশন হইতে যোগবণী শাখা পথে ১৭ মাইল দূর। জেলার সদর শহর পূর্ণিয়া সরুয়া নদীর পূর্ব্বতীরে অবস্থিত। মুসলমান শাসনকালে পূর্ণিয়া প্রথমে একটি "সরকার" ও পরে মুঘলযুগে "ফৌজদারির" সদর শহর ছিল। সেই সময়ের কতকগুলি ভগ্ন অট্টালিকা ও ভগ্নপ্রায় মসজিদ পূর্ণিয়া শহরের মিয়াবাজার, খলিফা চক্, বেগম দেউড়ি ও লালবাগ প্রভৃতি স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাতন পূর্ণিয়া শহর নদীর অপর পারে ছিল। নদীর উপরকার একটি সেতুর দ্বারা এই দুই শহর পরস্পরের সহিত সংযুক্ত।

পূর্ণিয়া জংশন হইতে একটি শাখা লাইন বাহির হইয়া ২৩ মাইল দূরবর্ত্তী বনমনখি জংশনে গিয়া পুনরায় দুই শাখায় বিভক্ত হইয়া এক শাখা মুরলীগঞ্জ ও অপর শাখা বিহারীগঞ্জ পর্য্যন্ত গিয়াছে। কাটিহার জংশন হইতে মুরলীগঞ্জ ও বিহারীগঞ্জের দূরত্ব যথাক্রমে ৫২ মাইল ও ৫৭ মাইল।

বনমনখি স্টেশন হইতে ২ মাইল উত্তরে ধরারা গ্রামে একটি পুরাতন গড়ের ভগ্নাবশেষ ও তন্মধ্যে প্রায় ২০ ফুট উচ্চ একটি মসৃণ পাথরের থাম দৃষ্ট হয়। থামটি মাণিক থাম নামে পরিচিত। পল্লী কাহিনীতে গড়টি হিরণ্যকশিপুর প্রাসাদ ছিল বলিয়া কথিত এবং থামটিতে তাঁহার পুত্র প্রহ্লাদকে

বাঁধিয়া বধ করিবার উপক্রম করিলে স্বয়ং ভগবান্ নৃসিংহ রূপ ধরিয়া থামটির শীর্ষদেশ হইতে বাহির হইয়া ভক্তকে রক্ষা করেন। এই থামের উপর পূর্ব্বে একটি সিংহ মূর্ত্তি ছিল বলিয়া কথিত। গড়টির পাশ দিয়া যে ছোট নদীটি চলিয়া গিয়াছে তাহার নাম হিরণ্য নদী।

জালালগড়—কাটিহার জংশন হইতে ২৯ মাইল দূর। স্টেশনের অতি নিকটে একটি পুরাতন ভগ্ন দুর্গ আছে। দুর্গটি সমচতুষ্কোণ, ইহার উচচ প্রাচীরগুলি এখনও বিদ্যমান আছে। খাগড়ার নবাব বংশের রাজা সৈয়দ মহম্মদ জলাল উদ্দীন কর্ত্তৃক সপ্তদশ শতাব্দীতে ইহা নির্ম্মিত হয়। নেপালী গুর্খাগণের আক্রমণ হইতে দেশরক্ষা করিবার জন্যই প্রত্যন্ত প্রদেশে এই দুর্গটি নির্ম্মিত হইয়াছিল। জালালগড় স্থানটি বেশ স্বাস্থ্যকর। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে পূর্ণিয়া জেলার সদর এই স্থানে স্থানান্তরিত করিবার কথা উঠিয়াছিল, কিন্তু কার্য্যতঃ উহা আর ঘটিয়া উঠে নাই।

আরারিয়া কোর্ট—কাটিহার জংশন হইতে ৪১ মাইল দূর। ইহা পূর্ণিয়া জেলার একটি মহকুমা। এই স্থানের পূর্ব্ব নাম বসন্তপুর। এই শহরটি পনার নামক নদীর তীরে অবস্থিত।

ফরবেসগঞ্জ—কাটিহার জংশন হইতে ৫৯ মাইল। ইহা পূর্ণিয়া জেলার একটি বাণিজ্য প্রধান স্থান। পাটই এখানকার প্রধান রপ্তানি দ্রব্য। এ, জে, ফরবেস নামক জনৈক সাহেব জমিদারের নাম হইতে এই স্থানের নামকরণ হইয়াছে। স্থানটি বেশ স্বাস্থ্যকর। শীতকালের দিনে আকাশ পরিস্কার থাকিলে এখান হইতে হিমালয় পর্ব্বতের তুষার শুভ্র শৃঙ্গগুলি দেখিতে পাওয়া যায়।

যোগবণী—কাটিহার জংশন হইতে ৬৭ মাইল দূর। এই স্থানটি ব্রিটিশ অধিকারের শেষ সীমানায় অবস্থিত। স্টেশনের এলাকার বাহির হইতেই স্বাধীন নেপাল রাজ্যের সীমানা আরম্ভ হইয়াছে। এই স্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি সুন্দর। ইহার অদূরে তরাইএর গভীর অরণ্য ও হিমালয় পর্ব্বতের সানুদেশ। ইহা নেপাল রাজ্যে প্রবেশ করিবার অন্যতম সিংহদ্বার।

যোগবণী হইতে নেপাল রাজ্যের অন্তর্গত প্রসিদ্ধ তীর্থ বরাহছত্র ও ৫১ মহাপীঠের অন্যতম বলিয়া কথিত দন্তপীঠে যাওয়া যায়। এই দুইটি তীর্থ পরস্পরের অতি নিকটে অবস্থিত। যোগবণী হইতে এই স্থানের দূরত্ব প্রায় ৪০ মাইল। কোশী বা কৌশিকী নদীর তীর দিয়া পার্ব্বত্য পথে যাইতে হয়। দন্তপীঠে সতীর অধোদন্ত পড়িয়াছিল, এখানে দেবীর নাম বারাহী, ভৈরব মহারুদ্র। বরাহছত্রে বিষ্ণুর তৃতীয় অবতার বরাহের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। একটি পর্ব্বতশৃঙ্গের পাদদেশে এই তীর্থ অবস্থিত। প্রতিবৎসর কার্ত্তিকী পূর্ণিমার সময় এখানে মহামেলা হয় ও সেই সময়ে যোগবণী হইতে ইহার নিকটবর্ত্তী স্থান পর্য্যন্ত মোটরবাস যাতায়াত করে।
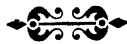
(চ) সান্তাহার জংশন—বগুড়া—কাউনিয়া জংশন ও পার্ব্বতীপুর জংশন—লালমণিরহাট জংশন—গোলকগঞ্জ জংশন।

আদমদীঘি—কলিকাতা হইতে ১৭৮ মাইল। এই স্থানে বাবা আদম নামে একজন অদ্ভুত শক্তি-সম্পন্ন ফকির বাস করিতেন। নাটোরের রাণী ভবানী তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন এবং এই স্থানে একটি দীঘি খনন করাইয়া ফকিরের নামে উৎসর্গ করেন; দীঘির পাড়ে বাবা আদমের দরগাহে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকেই পূজা দিয়া থাকেন। এই দীঘি ও বাবা আদমের নাম হইতে গ্রামটির নাম হইয়াছে আদমদীঘি। আদমদীঘির থানা হইতে ৩ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে দেওড়া গ্রামে একটি প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। গ্রামের মধ্যে ৮৮টি পুরাতন জলাশয় আছে। দেওপাল নামক রাজার প্রাসাদ এখানে ছিল বলিয়া কথিত। আদমদীঘির পূর্ব্ব পার্শ্বে তালশন গ্রাম সারস্বত ব্যাকরণের টীকাকার পণ্ডিত রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের জন্মস্থান। ইঁহার টীকার নাম "কৃতভাষ্য"। ইঁহার বংশীয় কৃষ্ণনাথ ভট্টাচার্য্যও সারস্বত ব্যকরণের "ঋজুদীপিকা ও প্রভাবতী" নামে এক খানি টীকা রচনা করেন। এই বংশে বহু পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

আদমদীঘি থানার অন্তর্গত ছাতিন বা ছাতিয়ান গ্রামে পুণ্যশ্লোকা রাণী ভবানীর জন্মস্থান। তিনি যে স্থানে জন্মগ্রহণ করেন সেই স্থানে তাঁহার মাতার নামে জয়দুর্গার মন্দির স্থাপিত আছে। ছাতিন গ্রামের সিদ্ধেশ্বরী পীঠ এ অঞ্চলে পবিত্র বলিয়া পূজিত হয়। কথিত আছে, সিদ্ধেশ্বরী পুকুরের পাড়ে তপস্যা করিয়া আত্মারাম চৌধুরী মহাশয় রাণী ভবানীর মত কন্যারত্ন লাভ করেন। এই গ্রাম হইতে নীল সরস্বতী, বাসুদেব ও সূর্য্যমূর্ত্তি রাজশাহীর বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির চিত্রশালায় স্থান পাইয়াছে।

নসরৎপুর—কলিকাতা হইতে ১৮০ মাইল। ষ্টেশনের দুই মাইল দক্ষিণে কড়ই বা কড়ইবদুল গ্রামে ময়মনসিংহ গৌরীপুরের জমিদার বংশের পূর্ব্ব বাস ছিল। আরও দুই মাইল দক্ষিণে ঝাঁকইর গ্রামে ময়মনসিংহ মুক্তাগাছার জমিদারগণের পূর্ব্ব বাস ছিল; তাঁহাদের প্রকাণ্ড প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ এখনও দৃষ্ট হয়। ঝাঁকইরের এক মাইল পূর্ব্বদিকে কাঞ্চনপুর গ্রামে একঘর কায়স্থ জমিদারের বাস আছে। ইহার পার্শ্বস্থ চাঁপাপুর গ্রামও বিশেষ প্রসিদ্ধ; তালোড়া ষ্টেশন হইতেও চাঁপাপুর যাওয়া যায়; তথা হইতে ৫ মাইল দূর। এ অঞ্চল এক কালে মজনু ফকির নামক দুর্দ্দান্ত দস্যুর অত্যাচারে বিশেষ উপদ্রুত হইয়াছিল। ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে একদল নাগা সন্ন্যাসী পশ্চিম অঞ্চল হইতে ময়মনসিংহ গোয়ালপাড়া অভিমুখে যাইবার সময়ে মজনু ফকিরের দলের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হন। চাঁপাপুরের নিকট ফকিরকাটা বিলের পাশে দুই দলে যুদ্ধ হয় এবং মজনু দলশুদ্ধ নিহত হয়। মজনু ফকিরের অত্যাচার বর্ণনা করিয়া "মজনুর কবিতা" নামে একটি গাথা এতদঞ্চলে প্রচলিত আছে; তাহা হইতে কিছু নিম্নে প্রদত্ত হইল;—

কালান্তক যম বেটা কে বলে ফকির।
যার ভয়ে রাজা কাঁপে প্রজা নহে স্থির।
সাহেব সুবার মত চলন সুঠাম।
আগে চলে ঝাণ্ডাবন ঝাউল নিশান॥

বগুড়ার ইতিহাস, প্রভাস চন্দ্র সেন, ১৩৯ পৃষ্ঠা।

তালোড়া—কলিকাতা হইতে কিঞ্চিদধিক ১৮৬ মাইল। ষ্টেশনের ৪ মাইল উত্তরে দুপচাঁচিয়া একটি পুরাতন ও বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম।

তালোড়া স্টেশন হইতে ২ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে কুন্দগ্রাম বা কুণ্ডগ্রামে "অদ্ভুত রামায়ণের" গ্রন্থকার অদ্ভুতাচার্য্য বা নিত্যানন্দ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। এই রামায়ণ কৃত্তিবাসী রামায়ণ অপেক্ষা অনেক বৃহৎ।

কাহালু—কলিকাতা হইতে ১৯২ মাইল। এখানকার আচার বংশীয় কায়স্থ জমিদারগণ প্রতিষ্ঠিত একটি পুরাতন শিবমন্দিরে এয়োদশটি গৌরীপাটের উপর শিব স্থাপিত। কাহালু হইতে অনতিদূরে এই থানার অন্তর্গত লক্ষ্মীচাপড়া গ্রামে বিশিষ্ট নৈয়ায়িক পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় গদাধর ভট্টাচার্য্য খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নব্যন্যায়ের ব্যাখ্যা 'গদাধরী" এখনও আদৃত হয়। তিনি বহু টীকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন, এগুলি "গদাধরী পাতড়া" নামে পরিচিত। ইঁহার বংশীয় মহামহোপাধ্যায় ভুবন মোহন বিদ্যারত্ন ও মধুসূদন স্মৃতিরত্নও প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন।

বগুড়া—কলিকাতা হইতে ১৯৯ মাইল দূর। জেলার সদর শহর বগুড়া করতোয়া নদীর পশ্চিমতটে অবস্থিত। বগুড়া আধুনিক শহর, ইহা ইংরেজগণ কর্তৃক ১৮২১ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এবং তখন হইতেই জেলার সদর শহর। বগুড়ার নবাববাটীই এখানকার প্রধান দ্রষ্টব্য। বগুড়ার ফৌজদারি কাছারির নিকট শহরের বিভিন্ন অংশ হইতে সাতটি রাস্তা আসিয়া একত্রে মিলিত হইয়াছে। এই স্থানকে "সাতশড়ক" বলে। বগুড়ার প্রায় সমুদায় সরকারী ও বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি সাতশড়কের নিকটে অবস্থিত। বগুড়া শহরে একটি ধর্ম্মশালা ও কয়েকটি হোটেল আছে। বালকবালিকাদের জন্য কয়েকটি উচচ ইংরেজী বিদ্যালয় ও সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ এখানে আছে।

বগুড়ার প্রান্তবাহিনী করতোয়া নদী এককালে প্রবলস্রোতা ছিল এবং প্রাচীন বরেন্দ্র ও কামরূপ রাজ্যের সীমা নির্দ্দেশ করিত। পূর্ব্বে এই নদীর খাত দিয়াই তিস্তার জলরাশি গিয়া পদ্মায় পড়িত। ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দের ভীষণ বন্যায় তিস্তা গতি পরিবর্ত্তন করিয়া পূর্ব্বদিকে গিয়া ব্রহ্মপুত্র নদে পতিত হয়। এই বিপর্য্যয়ের পর হইতে করতোয়ার পতন আরম্ভ হয়। অমরকোষে ইহার অপর নাম সদানীরা বলা হইয়াছে এবং গঙ্গা-যমুনার ন্যায় এই নদীও পুণ্যতোয়া। স্কন্দপুরাণ, কালিকাপুরাণ ও যোগিনীতন্ত্রে ইহার উল্লেখ আছে। স্কন্দপুরাণে "করতোয়া মাহাত্ম্য" নামে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় আছে। করতোয়ার অপর নাম সদানীরা নামে একটি নদীর উল্লেখ বেদের অনুগামী শতপথ ব্রাহ্মণেও দৃষ্ট হয়। স্কন্দপুরাণে করতোয়াকে "পৌণ্ড্রগণের প্লাবনকারিনী" বলা হইয়াছে। তাহাতে আরও বর্ণিত আছে যে হরগৌরীর বিবাহকালে গিরিরাজ হিমালয়ের করভ্রষ্ট মন্ত্রপূত জল হইতে এই নদীর উৎপত্তি বলিয়া ইহার নাম "করতোয়া"। স্কন্দপুরাণের মতে বর্ষাকালে অপর সকল নদ নদীই মলিনতা প্রাপ্ত হয় এবং তাহাদের পাবনী শক্তি আর থাকে না ; সেই সময়ে একমাত্র করতোয়াই বিশুদ্ধ সলিল বহন করে এবং তাহার পবিত্রতা অক্ষুন্ন থাকে। গঙ্গাস্নানের ন্যায় পঞ্জিকাগুলিতে করতোয়া-স্নানেরও বিভিন্ন যোগ উল্লিখিত থাকে। মহাভারতের বনপর্ব্বে লিখিত আছে যে করতোয়ায় স্নান করিয়া ত্রিরাত্রি উপবাস করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল পাওয়া যায়। স্কন্দপুরাণের পৌণ্ড্রখণ্ড অনুসারে পৌষনারায়ণীযোগে বারাণসীতে পূজা করিলে ত্রিকোটি কুল উদ্ধার লাভ করে, কিন্তু করতোয়া জলে পূজা করিলে তাহার দ্বিগুণ ফল পাওয়া যায়। করতোয়ার শীলাদ্বীপে স্নান করিলে আবার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পুণ্যসঞ্চয় হয়।

বগুড়ার নিকটবর্ত্তী বৃন্দাবন পাড়া নামক গ্রামে ক্ষৌণী-নায়ক ভীমের জাঙ্গালের কিয়দংশ বিদ্যমান আছে। বগুড়া হইতে মহাস্থানের পথে স্থানে স্থানে এই জাঙ্গাল বা প্রাচীরের চিহ্ন সুস্পষ্ট দেখিতে

পাওয়া যায়। ভীমের জাঙ্গাল বগুড়া শহরের উত্তর-পূর্ব্ব হইতে বৃন্দাবন পাড়া, মহাস্থানগড়, চাঁদমুয়া, কীচক, শালদহ প্রভৃতি হইয়া ঘোড়াঘাট পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছিল। লাল মাটির এই জাঙ্গালটি মধ্যে মধ্যে এখনও ২০ ফুট পর্য্যন্ত উচচ। এই জাঙ্গাল বেষ্টিত স্থান ক্ষৌণীনায়ক ভীম প্রতিষ্ঠিত মহাস্থানের উপপুর ছিল বলিয়া কথিত। হান্টার সাহেব ইহাকে ইতালীয় রিং ফোর্ট বা অঙ্গুরীয়ক দুর্গের সহিত তুলনা করিয়াছেন; বিপদের সময়ে নিকটস্থ জনপদের প্রজাগণ কিছুদিনের জন্য ইহার মধ্যে আশ্রয় লইতে পারিত।

বগুড়া হইতে ৫ মাইল দক্ষিণে মাঝিড়া গ্রামে উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে পণ্ডিত সা নামক একজন বিখ্যাত দস্যুর আড্ডা ছিল; তাহার অত্যাচারে জনসাধারণ ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিল। বগুড়ার উত্তরে কালীতলা হাট গ্রামেও তাহার একটি আড্ডা ছিল। এই দুই গ্রামের কালী মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা ও পূজা পণ্ডিত সা কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হয়।

বগুড়া হইতে ৬ মাইল উত্তরে করতোয়ার নিকট লাহিড়ীপাড়া গ্রামে "বিষহরি পদ্মপুরাণ" রচয়িতা কবি জীবনকৃষ্ণ মৈত্র মহাশয়ের বাস ছিল। তিনি রাণী ভবানীর সমসাময়িক ছিলেন। বগুড়া অঞ্চলে প্রচলিত "যোগীর কাছ" নামক লোকগীতি জীবনকৃষ্ণের রচনা বলিয়া কথিত।

বগুড়া হইতে ৭ মাইল উত্তর-পশ্চিমে যোগীরভবন নামক গ্রামে নাথপন্থী কাণফট্ যোগীদের একটি দেবপুরী আছে। দেবপুরী মধ্যে ধর্ম্মভুঙ্গি বা ধর্ম্মের মন্দির আছে এবং ইহার গদীঘরে একটি অগ্নিকুণ্ড সববদা জ্বালাইয়া রাখা হয়। দেবপুরীর প্রাচীরের বাহিরে ভৈরব, দুর্গা, সর্ব্বমঙ্গলা, গোরক্ষনাথ প্রভৃতির মন্দির আছে। গোরক্ষনাথের মন্দিরের পার্শ্বে নাথপন্থীদের গুরুর, তাঁহার শিষ্যের ও কুকুরের তিনটি সমাধি আছে। শিবরাত্রি ও জন্মাষ্টমীর সময় এখানে উৎসব হয়।

বগুড়া হইতে ৬ মাইল পূর্ব্বদিকে দুগাহাটা গ্রামে মুসলমান যুগের একটি পুরাতন গড়ের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান।

মহাস্থান গড়—বগুড়া হইতে ৭ মাইল উত্তরে করতোয়া নদীর পশ্চিমতীরে বাংলার প্রাচীন রাজধানী মহাস্থানগড়ের ধ্বংশাবশেষ অবস্থিত। বগুড়া হইতে মহাস্থান পর্য্যন্ত করতোয়া নদীর তীর দিয়া পাকা রাস্তা আছে। বগুড়া হইতে মোটর গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী বা এক্কাযোগে মহাস্থানে যাওয়া যায়।

ঐতিহাসিকগণ কর্ত্তৃক প্রমাণিত হইয়াছে যে মহাস্থান গড় প্রাচীন পুণ্ড্র বা পৌণ্ড্ররাজ্যের রাজধানী পুণ্ড্রবর্দ্ধন বা পুণ্ড্রনগর হইতে অভিন্ন। ঐতরেয় আরণ্যক, মহাভারত, হরিবংশ, ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ ও স্কন্দপুরাণ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে পুণ্ড্রদেশ ও পৌণ্ড্রজাতির উল্লেখ আছে। পুরাণে বর্ণিত আছে যে পুণ্ড্রদেশের রাজা পৌণ্ড্রক বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের একজন প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। তিনি নিজেকে বাসুদেব বা ভগবানের অবতার বলিয়া প্রচার করিতেন এবং বাসুদেবত্ব জ্ঞাপক শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মচিহ্ন ব্যবহার করিতেন। শ্রীকৃষ্ণের অপর নাম ছিল বাসুদেব এবং তিনিও এই সকল চিহ্ন ধারণ করিতেন। এই জন্য পুণ্ড্ররাজ বাসুদেব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে এই সকল চিহ্ন ব্যবহার করিতে নিষেধ করিয়া পাঠান। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার কথা উপেক্ষা করিলে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সসৈন্যে দ্বারকাপুরী আক্রমণ ও অবরোধ করেন। ভীষণ যুদ্ধের পর শ্রীকৃষ্ণ কৌশল অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে নিহত করেন। মহাভারতে বর্ণিত আছে যে পৌণ্ড্রদেশবাসিগণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে দুর্য্যোধনের পক্ষভুক্ত হইয়া পাণ্ডবগণের বিরুদ্ধে তুমুল সংগ্রাম করিয়াছিল।

প্রাচীন মানচিত্রে মহাস্থান গড়ের নাম "মুস্তানগড়" রূপে লিখিত আছে। এই স্থানের "মহাস্থান" নাম হওয়া সম্বন্ধে স্কন্দপুরাণে একটি সুন্দর আখ্যায়িকা আছে। বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার পরশুরাম তপস্যা করিবার জন্য একটি উপযুক্ত ও শাস্ত্রানুসারে চতুঃষষ্টি দোষ বিবর্জ্জিত স্থানের অনুসন্ধান করিতে করিতে পুণ্যতোয়া করতোয়ার তীরবর্ত্তী এই স্থানটিকে আবিস্কার করেন এবং এই স্থানে তপস্যার দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিয়া ইহার "মহাস্থান" নাম দেন। স্মরণাতীত কাল হইতে মহাস্থান তীর্থরূপে গণ্য হইয়া আসিতেছে। উত্তরকালে এই স্থানে পুণ্ড্ররাজ্যের রাজধানী স্থাপিত হইলে ইহা পুণ্ড্রনগর, পুণ্ড্রবর্দ্ধন, পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নামে পরিচিত হয়। পুণ্ড্রবর্দ্ধন অতি সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। বুদ্ধদেব পুণ্ড্রবর্দ্ধনে আগমন করিয়াছিলেন। সম্প্রতি মহাস্থানে আবিস্কৃত মৌর্য্যযুগের একটি শিলালেখ হইতে জানা যায় যে খৃষ্টপূর্ব্ব চতর্থ শতাব্দীতে পুণ্ড্রবর্দ্ধন মৌর্য্য সাম্রাজ্য ভুক্ত ছিল। ইহার শাসনকর্ত্তা মহামাত্য নামে অভিহিত হইতেন। ৬৪০ খৃষ্টাব্দে সুপ্রসিদ্ধ চৈনিক পর্য্যটক য়ুয়ান চোয়াং কামরূপ হইতে পৌণড্রবর্দ্ধনে আগমন করেন। তাঁহার লিখিত বিবরণ হইতে জানা যায় যে তৎকালে করতোয়া অতি বিস্তৃত নদী ছিল। তিনি ইহাকে ক-লো-তু বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। রাজধানী পুণ্ড্রবর্দ্ধনের পরিধি ছিল ৩০ লী বা ৫ মাইল। তাঁহার বর্ণনায় পুন্-না-ফা-তান-না বা পৌণ্ড্র-বর্দ্ধন গঙ্গার উপরিস্থ রাজমহল হইতে ৬০০ লী বা ১০০ মাইল পূর্ব্বদিকে। দুইটি স্থানের বর্ত্তমান অবস্থানের সহিত ইহা আশ্চর্য্যরূপে মিলিয়া যায়। ইহা হইতে প্রমাণ করা সহজ হইয়াছে যে মহাস্থান গড়ই প্রাচীন পৌণ্ড্রবদ্ধন। তিনি আরও লিখিয়াছেন যে পুণ্ড্রবর্দ্ধন হইতে ৯০০ লী বা ১৫০ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে যাইয়া কামরূপ রাজ্যে গমন করিয়াছিলেন। য়ুয়ান চোয়াং এই স্থানে ২০টি বৌদ্ধসংঘারাম, একশত হিন্দু-মন্দির ও ছয় হাজার বৌদ্ধশ্রমণকে দেখিয়াছিলেন। তিনি সন্ন্যাসীদের বেশীরভাগ দিগম্বর জৈন নিগন্থ সম্প্রদায়ভুক্ত দেখিয়াছিলেন। তিনি এই নগরীকে জনবহুল, বহু পুষ্করিণী ও পুষ্পোদ্যানসমন্বিত এবং অধিবাসিগণকে অর্থশালী ও বিদ্যানুরাগী বলিয়া বণনা করিয়াছেন। অধিবাসীরা শৈব, বৈষ্ণব, স্কন্দ বা কার্ত্তিকের উপাসক ও বৌদ্ধ, এই কয় সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিলেন। পুরুষেরা টুপী ব্যবহার করিতেন ও স্ত্রীলোকগণ স্কন্ধ পর্য্যন্ত বস্ত্রাবৃত করিয়া রাখিতেন। তৎকালে পুণ্ড্রদেশে বহু পরিমাণে দধি, দুগ্ধ, ঘৃত ও নবনী পাওয়া যাইত এবং অধিবাসিগণের স্বাস্থ্য খুব ভাল ছিল। মন্দির গুলির মধ্যে গোবিন্দ অথাৎ বিষ্ণু ও স্কন্দের মন্দিরই সর্ব্বপেক্ষা বড় ছিল। কথিত আছে, বুদ্ধদেব ছাড়া জৈন তীথঙ্কর পার্শ্বনাথ স্বামীও ধর্ম্মপ্রচারের জন্য পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগরে পদার্পণ করিয়াছিলেন।

সুপ্রসিদ্ধ রাজতরঙ্গিনী গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে অষ্টম শতাব্দীর শেষ ভাগে কাশ্মীররাজ জয়াপীড় পুণ্ড্রবর্দ্ধনের ঐশ্বর্য্যের খ্যাতি শুনিয়া তাহা স্বচক্ষে দেখিবার জন্য ছদ্মবেশে এই নগরীতে উপস্থিত হন। তৎকালে জয়ন্ত পুণ্ড্রবর্দ্ধনের রাজা ছিলেন। রাজধানীর ঐশ্বর্য্য দেখিয়া জয়াপীড় বিস্মিত হন। একদিন রাত্রে তিনি স্কন্দমন্দিরে নাচগান শুনিতেছেন, এমন সময়ে প্রধানা নর্ত্তকী কমলা দেখিতে পাইলেন যে তিনি অভ্যাসবশতঃ নিজের অজ্ঞাতসারে কাহারও নিকট হইতে যেন কিছু গ্রহণ করিবার অভিপ্রায়ে মধ্যে মধ্যে পশ্চাৎদিকে হস্ত প্রসারণ করিতেছেন। বুদ্ধিমতী কমলা বুঝিলেন যে ইনি নিশ্চয়ই কোন ছদ্মবেশধারী অভিজাত ব্যক্তি। জয়াপীড়কে কিছু না বলিয়া কমলা একখানি সুবণ পাত্রে করিয়া তাম্বুল লইয়া জয়াপীড়ের পশ্চাতে গিয়া দাঁড়াইলেন। এবার হস্ত প্রসারণ করিবামাত্রই জয়াপীড় তাম্বুল প্রাপ্ত হইলেন ও হঠাৎ পিছন ফিরিবামাত্র অপরূপ সুন্দরী কমলার সহিত তাঁহার দৃষ্টি বিনিময় হইল। কমলার সৌজন্যে মুগ্ধ হইয়া তিনি তাঁহার গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন। এই সময়ে রাজধানীর নিকটবর্ত্তী স্থানে একটি ভীষণ

সিংহের উপদ্রব সুরু হয়। সিংহ অনেককে হত্যা করিল, কিন্তু রাজ্যের বড় বড় সাহসী ব্যক্তিরাও সিংহকে হত্যা করিতে পারিলেন না। ইহাতে চারিদিকেই আতঙ্কের সৃষ্টি হইল। কমলার মুখে সিংহের অত্যাচারের কথা শুনিয়া জয়াপীড় তাঁহাকে কিছু না বলিয়া রাত্রিকালে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন এবং বহু ধ্বস্তাধ্বস্তির পর সিংহকে হত্যা করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। পরদিন মৃতসিংহের মুখ-বিবর হইতে কাশ্মীররাজ জয়াপীড়ের নামাঙ্কিত একখানি কেয়ূর বাহির হইলে রাজা জয়ন্ত অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন; তখনই চারিদিকে জয়াপীড়ের সন্ধানে লোক বহির্গত হইল। কমলার গৃহে জয়াপীড়ের সন্ধান পাইয়া পৌণ্ড্ররাজ জয়ন্ত তাঁহাকে বিশেষ আদরের সহিত নিজের প্রাসাদে আনয়ন করিলেন এবং তাঁহার সহিত স্বীয় সুন্দরী কন্যা কল্যাণদেবীর বিবাহ দিলেন। জয়াপীড় কমলাকেও বিবাহ করিয়া দুই পত্নীর সহিত কাশ্মীরে প্রত্যাগমন করিলেন।

ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত মহাস্থানে হিন্দু প্রভুত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মহাস্থান মুসলমানগণের দ্বারা বিজিত হয়। প্রবাদ, শাহ সুলতান হজরত আউলিয়া নামক বাল্খ প্রদেশ (প্রাচীন বাহলীক) বাসী জনৈক মুসলমান সাধু মহাস্থানের রাজা পরশুরামকে যুদ্ধে নিহত করিয়া এই স্থান অধিকার করেন। কথিত আছে, শাহ সুলতান একটি বিরাট মৎস্যের উপর আরোহণ করিয়া করতোয়া নদী দিয়া যাতায়াত করিতেন; তজ্জন্য লোকে তাঁহার উপাধি দিয়াছিল "মাহী-সওয়ার" বা মৎস্যারোহী। রাজা পরশুরামও তন্ত্রসিদ্ধ ও অদ্ভুত ক্ষমতাশালী ছিলেন। জীয়ৎকুণ্ড নামক কূপের মন্ত্রপূত জলের দ্বারা তিনি মৃত সৈন্যগণকে পুনর্জ্জীবন দান করিতেন। এই জন্য প্রথম দিকে পীর শাহ সুলতান যুদ্ধে বিজয় লাভ করিতে পারেন নাই। পরে অদ্ভুত ক্ষমতা বলে তিনি স্বয়ং একটি বাজপক্ষীর আকার ধারণ করিয়া শূন্যদেশ হইতে এক খণ্ড গোমাংস নিক্ষেপের দ্বারা জীয়ৎকুণ্ডের জল অপবিত্র করিয়া দিলে উহার মৃত সঞ্জীবনী শক্তি নষ্ট হইয়া যায় এবং পরবর্ত্তী যুদ্ধে রাজা পরশু-রামের সৈন্যক্ষয় হইতে থাকে ও অবশেষে তিনি স্বয়ং পরাস্ত ও নিহত হন। তাঁহার সুন্দরী ও যুবতী কন্যা শীলাদেবী কঙ্কণাঘাতে পীর শাহ সুলতানকে নিহত করিয়া করতোয়া নদীর জলে ডুবিয়া প্রাণত্যাগ করেন। প্রবাদ অনুসারে যে ঘাটে তিনি ডুবিয়া মরেন উহা আজিও শীলাদেবীর ঘাট নামে পরিচিত। শীলাদেবীর আত্মবিসর্জ্জনের করুণ কাহিনী অবলম্বন করিয়া এইচ্, এস্, টেলর নামক জনৈক য়ুরোপীয় পর্য্যটক "Lay of Mahasthangarh" নামে একটি সুন্দর কবিতা রচনা করিয়াছেন্। শীলাদেবীর কাহিনীটিকে অনেকে সম্পূর্ণ কাল্পনিক বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা বলেন, অতি প্রাচীনকাল হইতে মহাস্থানে শিলাদ্বীপ নামক যে তীর্থ আছে উহাই পরবর্ত্তী কালে শিলাদ্বীপের ঘাট বা শীলাদেবীর ঘাট নামে পরিচিত হইয়াছে। মহাস্থানের ভগ্নাবশেষ উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ৪৫০০ ফুট ও পূর্ব্ব-পশ্চিমে ৩০০০ ফুট; ভূমি হইতে ইহার উচ্চতা প্রায় ১৫ ফুট।

মহাস্থানের দ্রষ্টব্য বস্তুর মধ্যে প্রাচীন দুর্গ সর্ব্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য। ইহার পূর্ব্ব দিকের প্রাকার এখনও অনেকস্থলে অভগ্ন অবস্থায় আছে। ইহার দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে ইষ্টকের সোপান শ্রেণী পার হইয়া মহাস্থানগড় বিজয়ী পীর শাহ সুলতানের সমাধি বা দরগাহ দেখিতে পাওয়া যায়। এই দরগাহের নিম্নভাগ প্রস্তর নির্ম্মিত ও উর্দ্ধভাগ ইষ্টকের দ্বারা প্রস্তুত। অনেকে অনুমান করেন যে একটি বৌদ্ধ বা হিন্দুমন্দির ভাঙ্গিয়া ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার প্রস্তর নির্ম্মিত চৌকাঠে খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে প্রচলিত বঙ্গাক্ষরে "শ্রীনরসিংহদাসস্য" কথা কয়টি লেখা আছে। নরসিংহ দাস কে ছিলেন তাহা জানা যায় নাই। অনেকে অনুমান করেন যে শিল্পীর নামই নরসিংহ

দাস। দরগাহের নিকটে ইষ্টক নির্ম্মিত একটি ছোট মসজিদ ও একটি মক্তব আছে। মসজিদ্‌টি মুঘল বাদশাহ ফর্‌-রুখ-শিয়রের রাজত্বকালে ১৭১২ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত। দরগাহের অঙ্গনে অনেকগুলি কবর আছে, ইহার মধ্যে কতকগুলি কবর শাহ সুলতানের অনুচরগণের এবং অপর কতকগুলি দরগাহের খাদেমগণের সমাধি। দরগাহের প্রবেশ দ্বারের নিকট বৃহৎ গৌরীপাট এবং পুরোহিতের প্রস্তরাসন দৃষ্ট হয়। দরগাহের পশ্চাৎ দিকে অবস্থিত একটি বড় কূপকে স্থানীয় লোকে রাজা পরশুরামের জীয়ৎকুণ্ড বলিয়া নির্দ্দেশ করে। প্রাচীন দুর্গের প্রাকার ইষ্টক নির্ম্মিত ও মৃত্তিকা আচ্ছাদিত। ইহার পূর্ব্ব দিকে করতোয়া নদী ও অপর তিনদিকে বিস্তৃত পরিখার চিহ্ন দেখা যায়। দক্ষিণ দিকের পরিখা বারাণসী খাল, পশ্চিমের পরিখা গিলাতলা খাল ও উত্তর দিকের পরিখা কালীদহ সাগর নামে পরিচিত। কালীদহ সাগর মহাস্থানের উত্তরে অবস্থিত একটি বিল বিশেষ। বর্ত্তমানে দুর্গের পূর্ব্ব দিকে দোরাব সাহের দরজা ও শীলাদেবীর ঘাটের দরজা নামে দুইটি, উত্তর দিকে ঘাঘোর দুয়ার নামে একটি ও পশ্চিম দিকে তাম্র দরজা ও আর একটি ফটকের চিহ্ন আছে। উত্তর দিকের দরজা হইতে সনাতন সাহেবের গলি নামক একটি রাস্তা গড়ের ভিতর দিয়া গোবিন্দের দ্বীপ পর্য্যন্ত গিয়াছে। দুর্গের অভ্যন্তরে শাহ সুলতানের দরগাহের নিকটে "খোদার পাথর" ও "মানকালীর কুণ্ড" নামক দুইটি ধ্বংস স্তূপ আছে। এই স্থানে পূর্ব্বে দুইটি মন্দির ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। ইহার চতুর্দ্দিকে ইষ্টক ও প্রস্তরখণ্ড প্রভৃতি নিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। খোদার পাথর নামক প্রস্তর খণ্ডটির দৈর্ঘ্য ১১ ফুট ও বেড় প্রায় ৩ ফুট ; ইহা কোন দেব মন্দিরের চৌকাঠ ছিল বলিয়া মনে হয়। খোদার পাথরের চারিদিকে খনন করিয়া প্রচীন মন্দিরের পাথরের মেঝে ও কয়েকটি প্রস্তর খণ্ড পাওয়া গিয়াছে ; একটি প্রস্তরখণ্ডে চারিটি ধ্যানী বুদ্ধমূর্ত্তি ও একটি ভক্তের মূর্ত্তি খোদিত আছে। ইহা রাজশাহীতে বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির চিত্রশালায় রক্ষিত আছে। ইহা একটি বৌদ্ধ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ বলিয়া পণ্ডিতেরা অনুমান করেন। উত্তর দিকস্থ পথ সনাতন সাহেবের গলি দিয়া অগ্রসর হইলে বৈরাগীর ভিটা ও গোবিন্দের ভিটা প্রভৃতি ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্নতত্ব বিভাগ কর্ত্তৃক খননের ফলে এই সকল স্থানেও মৃত্তিকামধ্যে প্রাচীন মন্দিরের ভিত্তি ও কয়েকটি কক্ষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। কক্ষ সংলগ্ন ইষ্টকে পাহাড়পুর স্তূপের ন্যায় বহু দেবদেবী, জীবজন্তু ও পুষ্পলতাদির চিত্র উৎকীর্ণ আছে।

গোবিন্দের ভিটা নামক স্তূপটির প্রাচীন নাম গোবিন্দ দ্বীপ। ইহা করতোয়া নদীর ঠিক উপরেই অবস্থিত। পূর্ব্বে ইহার চারিদিকে করতোয়া বহিত। এখনও একটি প্রাচীন ঘাটের চিহ্ন রহিয়াছে। প্রত্নতাত্বিক গণের মতে এই স্থানেই প্রাচীন মহাস্থানের সুপ্রসিদ্ধ গোবিন্দ বা বিষ্ণুমন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইহার পার্শ্ব দিয়া একটি ক্ষুদ্র খাল করতোয়া নদীতে গিয়া পড়িয়াছে। এই খালটি কালীদহ সাগর হইতে উঠিয়া আসিয়াছে। গোবিন্দের ভিটার সংলগ্ন ঘাট বিশেষ পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হয়। আজিও প্রতিবৎসর বারুণী ও পৌষসংক্রান্তির দিনে উত্তরবঙ্গের বহু স্থান হইতে আগত যাত্রিগণ মহাস্থানের শীলাদেবীর ঘাট ও গোবিন্দদ্বীপের ঘাটে করতোয়ায় স্নান করিয়া থাকেন। পৌষ সংক্রান্তির সহিত "নারায়ণী যোগ" সংঘটিত হইলে ভারতের নানাস্থান হইতে আগত যাত্রীর সংখ্যা প্রায় লক্ষ পর্য্যন্ত হয়। সাধারণতঃ প্রতি ১২ বৎসর অন্তর একবার "পৌষ নারায়ণী যোগ" হইয়া থাকে।

মহাস্থান দুর্গের পশ্চিমভাগে তাম্রদরজা হইতে দুগের বাহিরে রাজা পরশুরামের প্রাসাদ ও সভাবাটী অবস্থিত। এই স্থানেও খননের দ্বারা গৃহভিত্তি, প্রাচীর ও কক্ষাদি আবিষ্কৃত

হইয়াছে। এই স্থান হইতে একটি রাস্তা পশ্চিমদিকে মথুরা ও ভাসুবিহার প্রভৃতি গ্রাম পর্য্যন্ত গিয়াছে। সুবিখ্যাত "রামচরিত" কাব্য-রচিয়তা কবি সন্ধ্যাকর নন্দী মহাস্থানের অধিবাসী ছিলেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পালরাজবংশের কর্ম্মচারী নন্দীদিগের একখানি প্রাচীন শিলালেখের ভগ্নাংশ মহাস্থানের নিকটে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ইহাতে দশম বা একাদশ খৃষ্টাব্দের লেখা দৃষ্ট হয়। মহাস্থানের নিকটবর্ত্তী ব্রাহ্মণপাড়া গ্রামে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে গুপ্তযুগের বলিয়া কথিত কতকগুলি মুদ্রা পাওয়া গিয়াছিল।

মহাস্থান হইতে ৪ মাইল পশ্চিমে বিহার নামে গ্রামে ও পার্শ্বেই ভাসোয়া বিহার বা ভাসুবিহার গ্রামে পুরাতন বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ অবস্থিত। সপ্তম শতাব্দীতে য়ুয়ান্ চোয়াং যখন পুণ্ড্রবর্দ্ধনে আগমন করেন, তখন এই স্থানে তিনি একটি গগনস্পর্শী চূড়াসমন্বিত বৌদ্ধবিহার দেখিয়াছিলেন। তিনি ইহাকে পো-শি-পো বলিয়া বণনা করিয়াছেন। এই সঙ্ঘারামে মহাযান সম্প্রদায়ের ৭০০ ভিক্ষু ও বহু বিখ্যাত শ্রমণ অবস্থান করিতেন। সঙ্ঘারামের নিকটে মহারাজ অশোক নির্ম্মিত একটি স্তূপ তিনি দেখিয়াছিলেন; স্তূপের স্থানটিতে পূর্ব্বকালে ভগবান তথাগত তিন মাস ধরিয়া ধর্ম্ম ব্যাখ্যান করিয়াছিলেন। ইহার অনতিদূরে অবলোকিতেশ্বরের মন্দিরে দূর-দূরান্তর হইতে যাত্রী আসিয়া প্রার্থনা করিত। কানিংহাম সাহেব ভাসুবিহার গ্রামের ৭০০ ফুট দীর্ঘে ও ৬০০ ফুট প্রস্থে ভগ্নাবশেষটি য়ুয়ান্ চোয়াং বর্ণিত সঙ্ঘারাম বলিয়া নির্ণয় করেন এবং ইষ্টক-নির্ম্মিত এখনও প্রায় ৩০ ফুট উচ্চ স্তূপটিকে অশোক নির্ম্মিত স্তূপ এবং ইহার উত্তরে মন্দিরের ভগ্নাবশেষকে অবলোকিতেশ্বরের মন্দির বলিয়া অনুমান করেন। তৎকালে ভাসুবিহার বৌদ্ধ সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ছিল এবং এই স্থানের খ্যাতি সমগ্র ভারতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। ভাসোয়া বিহার গ্রামে "সুসঙ্গ দীঘি" নামে একটি প্রাচীন দীর্ঘিকা আছে। প্রবাদ, ইহা সুসঙ্গ নামক রাজার দ্বারা খনিত। এই সুসঙ্গ রাজা কে ছিলেন তাহা জানা যায় নাই। মহারাজ বল্লাল সেনের গুরু অনিরুদ্ধ ভট্ট বিহার গ্রামবাসী ছিলেন। তাঁহার হারলতা নামক স্মৃতি সংগ্রহ এখনও প্রচলিত আছে

মহাস্থানের অতি নিকটে দক্ষিণ দিকে গোকুল নামক গ্রাম অবস্থিত। এখানেও একটি প্রকাণ্ড ধ্বংস স্তূপ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা "গোকুলের মেঢ়" নামে পরিচিত। এই স্তূপটি চতুর্বিবংশতি কোণ বিশিষ্ট ও মৃত্তিকা হইতে ইহার ভিত্তির উচ্চতা প্রায় এক ফুট। এই স্থান খনন করিয়া প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ প্রায় ১৭০টি কক্ষ আবিষ্কার করিয়াছেন। পরস্পরের গাত্র-সংলগ্ন এই কক্ষগুলিকে মৌমাছির চাকের খোপের মত দেখায়। স্তূপের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে ৪½ ফুট বিস্তৃত ও প্রায় ২৫ ফুট উচ্চ সোপান শ্রেণী বাহির হইয়াছে। এই স্তূপটিও একটি বৌদ্ধ দেবায়তন ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। ইহার প্রাচীর গাত্রে টালির উপর মানুষ, জীবজন্তু, লতাপাতা প্রভৃতির চিত্র উৎকীর্ণ আছে। ইহার শিল্প পদ্ধতি দেখিয়া প্রত্নতাত্ত্বিকগণ অনুমান করেন যে আনুমানিক ষষ্ঠ অথবা সপ্তম শতাব্দীতে গুপ্তযুগে এই মন্দিরটি নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই গ্রামে এখনও বহু সংখ্যক গোপের বাস আছে। নেতা ধোপানীর পাট নামে একটি স্তূপও এখানে দৃষ্ট হয়।

মহাস্থান হইতে প্রায় ৫ মাইল উত্তরে অবস্থিত চাঁদনীয়া বা চাঁদমুয়া একটি পুরাতন স্থান। প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বেও এই স্থান উত্তর-বঙ্গের একটি প্রসিদ্ধ বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল। অনেকে অনুমান করেন যে এই স্থানের প্রাচীন নাম চম্পানগর এবং মনসার ভাসান গানের নায়ক চাঁদ সদাগর

এখানেই বাস করিতেন। এই গ্রামের দুইদিকে গৌরী ও সোনারাই নামে দুইটি নদীর চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। সোনারাই নদীর মধ্যে একটি উচু ঢিবি ও কিনারা হইতে তথায় যাইবার জন্য একটি সেতুর ভগ্নাবশেষ আছে। অনেকে বলেন যে নদীর মধ্যে পদ্মা বা মনসা দেবীর একটি মন্দির ছিল। চাঁদনীয়া গ্রামের দক্ষিণে কালীদহ সাগর নামক বিল অবস্থিত।

চাঁদনীয়ার পার্শ্বেই করতোয়া কূলে শিবগঞ্জ মুসলমান যুগে একটি সামরিক ঘাঁটি ছিল। ইহা একটি বন্দর। শিবগঞ্জ থানার অন্তগত ইহার নিকটেই করতোয়া কূলে কীচক একটি প্রসিদ্ধ বন্দর। প্রবাদ মহাভারতের কীচক এই স্থানে বাস করিতেন। ইহার ৬ মাইল উত্তরে রংপুর জেলার গোবিন্দগঞ্জ থানার অন্তর্গত বিরাট নামক স্থানে বিরাট রাজার বাড়ী ছিল বলিয়া কথিত।

মহাস্থান হইতে প্রায় ২০ মাইল উত্তরে শালদহ নামক একটি প্রাচীন স্থান আছে। এই গ্রামেও বহু উচু ঢিবি, প্রাচীন ইষ্টক, দগ্ধ মৃত্তিকা আচ্ছাদিত প্রান্তর ও কয়েকটি লুপ্তপ্রায় প্রাচীন দীঘি দৃষ্ট হয়। অনেকে অনুমান করেন যে ক্ষৌণীনায়ক ভীম এই স্থানের অধিবাসী ছিলেন।

মহাস্থানের নিকটবর্ত্তী গ্রামগুলির গোকুল, বৃন্দাবন পাড়া ও মথুরা প্রভৃতি নাম ভ্রমণকারী মাত্রেরই বিস্ময় উৎপাদন করে। শ্রীকৃষ্ণের প্রতিদ্বন্দ্বী পুণ্ড্ররাজ বাসুদেবের সময় হইতেই যে এই স্থানগুলির এইরূপ নামকরণ হইয়াছে, এইরূপ অনুমান যদি কেহ করেন, তবে তাহা নিতান্ত অসঙ্গত নহে বলিয়াই মনে হয়।

মহাস্থানের নিকট করতোয়া তীরে আরোড়া গ্রামে "রসকদম্ব" রচয়িতা কবি বল্লভের জন্মস্থান। তাঁহার গ্রন্থ ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে সমাপ্ত হয়। ইহাতে আদি, সূত্র, বৈভব, হাস্য, প্রেম প্রভৃতি রসের অবলম্বনে ২২টি অধ্যায় আছে এবং বৈষ্ণবতত্ত্ব অবলম্বনে ইহা রচিত।

শেরপুর—বগুড়া হইতে শেরপুর দক্ষিণে ১০ মাইল দূর। বগুড়া ও শেরপুরের মধ্যে মোটরবাস যাতায়াত করে। শেরপুর বগুড়া জেলার দ্বিতীয় শহর এবং একটি প্রসিদ্ধ পুরাতন স্থান। মুঘল যুগে এই স্থানে একটি প্রত্যন্ত দুর্গ ছিল এবং এই স্থানের নাম ছিল শেরপুর মুরচা। প্রাচীন দুর্গের চিহ্ন এখনও কিছু কিছু দেখিতে পাওয়া যায়। আকবর-নামা ও আইন-ই-আকবরীতে ইহার উল্লেখ আছে। বাংলার ভূস্বামিগণের বিদ্রোহ দমন করিতে আসিয়া মুঘল সেনাপতি মহারাজা মানসিংহ কিছুকাল শেরপুরে বাস করিয়াছিলেন এবং এই স্থানে একটি প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। উহার ধ্বংসাবশেষ এখনও বর্ত্তমান আছে। শেরপুরে খানরা মসজিদ ও বন্দেগী সদর জাহান মসজিদ নামে দুইটি পুরাতন মসজিদ দেখিতে পাওয়া যায়। শেষোক্ত মসজিদ্‌টি ১৫৭১ খৃষ্টাব্দে সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে নবাব মির্জ্জা মুরাদ খাঁ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। শেরপুর শহরের বাহিরে জীর্ণ খেরুয়া মসজিদের শিলালেখটি সুন্দর। শেরপুর শহরে তুরকান্‌ শহিদের শিরে-মোকাম ও শহরের বাহিরে ধড় মোকাম নামে দুইটি দরগাহ বর্ত্তমান। প্রবাদ রাজা বল্লাল সেনের সহিত যুদ্ধে পীর তুরকান্‌ সাহেব নিহত হন। যে স্থানদ্বয়ে তাঁহার শির ও ধড় পড়িয়াছিল তথায় দুটি দরগাহ স্থাপিত হয়। গাজি মিঞা, হটিলা প্রভৃতি আরও কয়েকটি পীরের আস্তানা এখানে আছে। প্রতি বৎসর জৈষ্ঠ মাসের দ্বিতীয় রবিবারে গাজি মিঞার বিবাহোৎসব ধুম ধামের সহিত সম্পন্ন হয়।

শেরপুর নাটোর রাজবংশের সম্পত্তি। নাটোরের বারদুয়ারী কাছারি, নাটোর রাজবংশ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠীত হরগৌরী ও অনাদিলিঙ্গ শিবের মন্দির এখানকার প্রধান দ্রষ্টব্য। শেরপুর একটি বিখ্যাত বাণিজ্যের স্থান। এখানকার কপর্দ্দুল নামে বহুমূল্য রেশমী মশারি প্রসিদ্ধ ছিল।

শেরপুরের চার মাইল দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে রাজবাড়ী মুকুন্দ নামক স্থানে একটি রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। প্রবাদ, এই স্থানে বল্লাল সেনের একটি বাড়ী ছিল। কিংবদন্তী অনুসারে বল্লাল সেন বৃদ্ধকালে একটি তথাকথিত নীচ জাতীয়া যুবতীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করেন এবং তজ্জন্য তাঁহার পুত্র যুবরাজ লক্ষ্মণ সেনের সহিত তাঁহার মনোমালিন্য হইলে তিনি রাজ্য ছাড়িয়া এই স্থানে আসিয়া বাস করেন। এখানে চণ্ডীপুকুর, কাঞ্জী পুকুর প্রভৃতি নামে অভিহিত কয়েকটি প্রাচীন পুস্করিণী আছে। পরে এই স্থানে মুকুন্দ নামে কোনও রাজা ছিলেন বলিয়া কথিত। ভগ্নাবশেষ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে ইহা একটি নগরী বিশেষ ছিল।

শেরপুর হইতে প্রায় দক্ষিণে ১০ মাইল দূরে অবস্থিত ভবানীপুর একটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। শেরপর হইতে রাণীর জাঙ্গাল নামে একটি সুউচচ পথ ভবানীপুর পর্য্যন্ত গিয়াছে। সাঁতৈলের রাণী সত্যবতী ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়া খ্যাত। শেরপুর একপঞ্চাশৎ শক্তি মহাপীঠের অন্যতম বলিয়া খ্যাত। এই স্থানের পূর্ব্বনাম ছিল ভাবতা এবং ইহার পার্শ্ব দিয়া করতোয়া নদী প্রবাহিত ছিল। এখন করতোয়া এই স্থান হইতে প্রায় চার মাইল দুরে সরিয়া গিয়াছে। শাস্ত্র অনুসারে করতোয়া তীরে সতীর তল্প পড়িয়াছিল, দেবীর নাম অপর্ণা, ভৈরব বামন। কথিত আছে, পূর্ব্বে এই মহাপীঠ অরণ্যমধ্যে গুপ্ত অবস্থায় ছিল। মনোহর নামক একজন উদাসীন এই মহাপীঠের আবিষ্কার করেন। ইহার আবিষ্কার সম্বন্ধে ও শাঁখারীর নিকট হইতে বালিকা বেশে দেবীর শাখা লওয়া ও পুষ্করিণী হইতে শাখা পরিহিত হস্ত উত্তোলন করা এবং কপিলা গাভীর দুগ্ধ দানের কাহিনী প্রচলিত আছে। মনোহর করতোয়া তীরে এক পণ কুটিরের মধ্যে দেবী মর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কথিত আছে, জনৈক মুঘল রাজপুরুষ এই দেবীর নিকট মানত করিবার ফলে রাজরোষ হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া দেবীর জন্য একটি সুন্দর যুগ্ম মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। পরে সাঁতৈলের রাজা রামকৃষ্ণ একটি পশ্চিমদ্বারী সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তন্মধ্যে দেবী মূর্ত্তিকে স্থানান্তরিত করেন। কিন্তু দেবী স্বপ্নে আদেশ করেন যে মুঘল রাজপুরুষ নির্ম্মিত মন্দিরে থাকিতেই তাঁহার ইচছা। সুতরাং নূতন মন্দির হইতে দেবীপ্রতিমা পুনরায় আদি মন্দিরে স্থানান্তরিত হইলেন। শাস্ত্র অনুসারে এই দেবীর নাম অপর্ণা হইলেও সাধারণের নিকট ইনি ভবানী নামে সুপরিচিতা এবং দেবীর নাম হইতে প্রাচীন ভাবতার নব নাম ভবানীপুর হয়। ভবানীপুর নাটোর রাজবংশের সম্পত্তি। নাটোরের রাণী ভবানী দেবীমন্দিরের পার্শ্বে একটি বারদ্বারী মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে ভবানীশ্বর নামে এক শিবপ্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার দত্তক পুত্র মহারাজ রামকৃষ্ণ একজন উচচাঙ্গের সাধক ছিলেন। তিনি এখানে এক পঞ্চমুণ্ডী আসন নির্ম্মাণ করিয়া যোগ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। রাজা রামকৃষ্ণের পঞ্চমুণ্ডী আসন আজিও দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে পাঠাধোয়া নামে একটি প্রকাণ্ড দীঘি ও একটি জলটুঙ্গির ভগ্নাবশেষ আছে। ভবানী দেবীর মাহাত্ম্য সম্বন্ধে উত্তরবঙ্গে বহু অদ্ভুত কাহিনী প্রচলিত আছে। এখানে প্রত্যহ বহু মণ চাউলের অন্নভোগ হয় এবং সমাগত অতিথি অভ্যাগতগণকে অন্ন প্রসাদ প্রদান করা হয়। দেবীর আদেশ অনুসারে দেবীর ভোগে প্রত্যহ বোয়াল মাছ দেওয়া হয়। এখানে শ্যামা পূজা ও
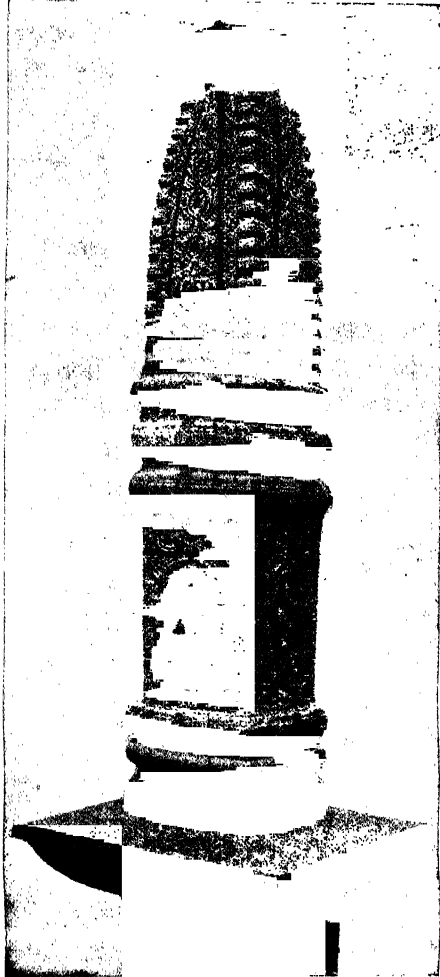
বাণগড় হইতে আনীত প্রস্তরস্তম্ভ, দিনাজপুর (পৃষ্ঠা ১)
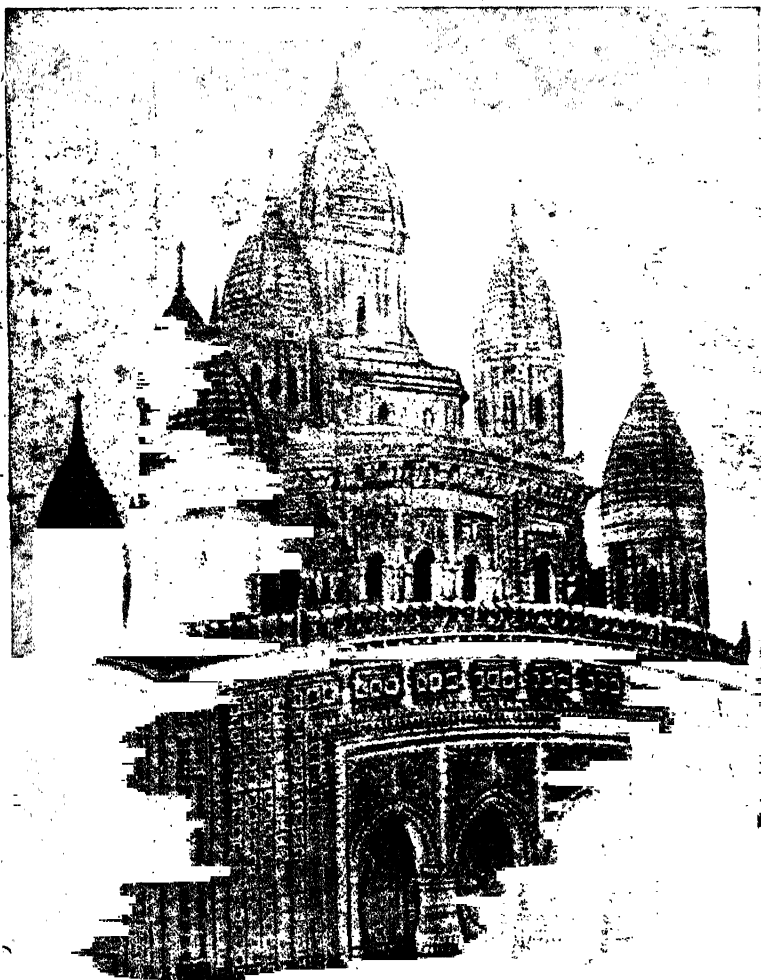
কান্তনগরের পুরাতন মন্দির (পৃষ্ঠা ২)
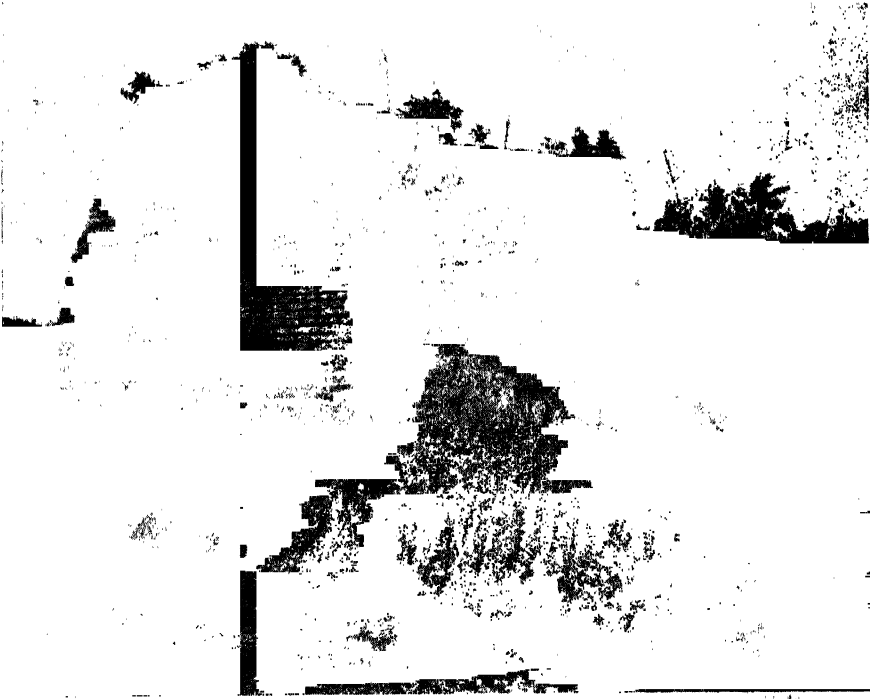
যোগীর ভবন, বগুড়া (পৃষ্ঠা ১০)

সাগরদীঘি, কোচবিহার (পৃষ্ঠা ২৬)

মহাস্থানগড়ে আবিষ্কৃত চণ্ডীমূর্ত্তি (পৃষ্ঠা ১০)

রাম নবমী উপলক্ষে বহু লোকের সমাগম হয়। তাহা ছাড়া বৈশাখ মাসের প্রতি শনি ও মঙ্গলবারে ছোটখাট মেলা হইয়া থাকে। শেরপুর হইতে এই স্থানে ঘোড়ার গাড়ীতে অথবা পদব্রজে যাইতে হয়।

শেরপুর হইতে ৪ মাইল পশ্চিমে কাশীপাড়া গ্রামে একটি অষ্টভুজা কঙ্কালসার চামুণ্ডা মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। শায়িত ভৈরবের উপর দেবী পদ্মাসনে উপবিষ্টা। শেরপুর হইতে ৬ মাইল পশ্চিমে ক্ষিদ্রলল্লী গ্রামে একটি চতুর্ভুজা মনসা, একটি সূর্য্যমূর্ত্তি ও বৌদ্ধ স্ত্রীমূর্ত্তি আছে। শেরপুরের নিকটস্থ জঙ্গলে চিতা বাঘ প্রভৃতি দৃষ্ট হয়।

সোনাতলা—কলিকাতা হইতে ২১৬ মাইল। ইহা একটি বড় গঞ্জ। স্টেশনের পূর্ব্বদিকে নিকটেই গড় ফতেপুর নামক একটি প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। ইহা কামতাপুর রাজ নীলাম্বরের দুর্গ ছিল বলিয়া কথিত। গৌড়েশ্বর হুসেন শাহ কর্ত্তৃক ইনি পরাজিত হইলে সম্ভবতঃ গড় ফতেপুর মুসলমান গণের অধিকারে আসে। দিনহাটা স্টেশন দ্রষ্টব্য।

মহিমাগঞ্জ—কলিকাতা হইতে কিঞ্চিদধিক ২২০ মাইল। স্টেশন ছাড়াইয়াই বাঙ্গালী নদীর উপর রেলের পুল আছে। স্টেশন হইতে নদী পর্য্যন্ত একটি ঘাট সাইডিং আছে। বাঙ্গালী নদীর উপরিভাগ আলাই ও তাহার উপর ঘাঘট নামে পরিচিত; ঘাঘট এককালে তিস্তার একটি প্রধান শাখা ছিল।

স্টেশন হইতে ৬ মাইল পশ্চিমে বর্দ্ধনকোট একটি পুরাতন স্থান; এখানে একঘর জমিদারের বাস আছে। গ্রামের নিকটে সর্ব্বমঙ্গলা ও শ্যামসুন্দর নামে দুইটি ভগ্নপ্রায় মন্দির ও কিছু কিছু ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। মন্দির দুটির শিলালেখ হইতে জানা যায় যে ১৬০১ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান জমিদার বংশের পূর্ব্বপুরুষ রাজা ভগবান্ কর্ত্তৃক এই মন্দির দুইটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বর্দ্ধনকোট হইতে আড়াই মাইল পশ্চিমে গোবিন্দগঞ্জ থানা এবং তথা হইতে ৮ মাইল পশ্চিমে বিরাট নামক গ্রামে প্রতি বৎসর একমাস ব্যাপী মেলা বসিয়া থাকে; বিহার হইতে আনীত গবাদি পশু মেলায় বিক্রীত হয়। বগুড়া প্রসঙ্গে বিরাটের কথা বলা হইয়াছে।

বোনারপাড়া জংশন—কলিকাতা হইতে ২২৫ মাইল দূর। এই স্থান হইতে একটি শাখা লাইন ১১ মাইল দূরবর্ত্তী তিস্তামুখ ঘাট পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই শাখা পথে বোনারপাড়া হইতে ৮ মাইল দূরবর্ত্তী তিস্তামুখ ঘাটের আগের স্টেশন ফুলছড়ি একটি উল্লেখযোগ্য স্টেশন। ইহা ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে অবস্থিত একটি বিখ্যাত বাণিজ্য কেন্দ্র। কলিকাতা হইতে যে সকল মাল বাহী স্টীমার আসামে যায় তাহার অধিকাংশই ফুলছড়িতে ধরে। ফুলছড়ি হইতে ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্ব্বতীরে অবস্থিত বাহাদুরাবাদ পর্য্যন্ত খেয়া জাহাজে করিয়া মালগাড়ী ও তিস্তামুখ ঘাট হইতে যাত্রী পারাপার করা হয়। ফুলছড়ি একটি স্বাস্থ্যকর স্থান।

গাইবান্ধা—কলিকাতা হইতে ২৩৭ মাইল দূর। ইহা রংপুর জেলার একটি মহকুমা ও পাটের ব্যবসায়ের বড় কেন্দ্র। শহরটি ঘাঘট নদীর তীরে অবস্থিত। ইহার প্রায় সকল দিকেই জলাভূমি দৃষ্ট হয়। গাইবান্ধা হইতে ৮ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্রের নিকটে মনাস নদীর উপর কামারজানি একটি বড় গঞ্জ ও বন্দর।

কাউনিয়া জংশন—সান্তাহার জংশন ও পার্ব্বতীপুর জংশন হইতে যথাক্রমে ৯৬ ও ৩৪ মাইল দূর। প্রধান লাইনের পার্ব্বতীপুর জংশন হইতে একটি মাঝারি মাপের শাখা লাইন আসিয়া এই স্থানে মিশিয়াছে। এই শাখাপথে বদরগঞ্জ, শ্যামপুর, রংপুর ও ভূতছাড়া উল্লেখযোগ্য স্টেশন। কাউনিয়ার উত্তরে তিস্তা নদী প্রবাহিত।

বদরগঞ্জ—পার্ব্বতীপুর জংশন হইতে ১০ মাইল দূর। এই স্থান হইতে ৮ মাইল দূরে ক্ষৌণী-নায়ক ভীমের স্মৃতি বিজড়িত "ভীমের গড়" নামক দুর্গ প্রাকারের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান। নিকটবর্ত্তী রস্তমাবাদ নামক গ্রামে সুপ্রসিদ্ধ "ভীমের জাঙ্গালের" কিয়দংশ দেখিতে পাওয়া যায়। বদরগঞ্জ একটি বাণিজ্যপ্রধান স্থান। প্রতি বৎসর শীতকালে প্রায় একমাস ব্যাপী মেলা এখানে বসিয়া থাকে।

শ্যামপুর—পার্ব্বতীপুর জংশন হইতে ১৬ মাইল দূর। ইহার নিকটবর্ত্তী সদ্যপুষ্করিণী একটি পুরাতন গ্রাম। এখানে বহু প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংশাবশেষ দৃষ্ট হয়। গ্রামটিতে কয়েক ঘর জমিদারের বাস। শ্যামপুর স্টেশনের নিকটবর্ত্তী বাগ্‌দুয়ার গ্রামে একটি বৌদ্ধমূত্তির ভগ্নাংশ বাগদেবী নামে পূজিতা হইয়া থাকে।

রংপুর—পার্ব্বতীপুর জংশন হইতে ২৪ ও কলিকাতা হইতে ২৫৭ মাইল দূর। জেলার সদর শহর রংপুর ঘাঘট নদীর পূর্ব্বতীরে অবস্থিত। প্রাচীন কালে এই স্থান কামরূপ রাজ্যের ও পরে কোচরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রবাদ, এই স্থানে কামরূপরাজ ভগদত্তের প্রমোদ স্থান ছিল বলিয়াই ইহার রঙ্গপুর নাম হয়। রংপুর শহরের নিকটে পায়রাবাঁধ নামে একটি পরগণা আছে, উহা রাজা ভগদত্তের কন্যা পায়রামতীর সম্পত্তি ছিল বলিয়া কিংবদন্তী আছে। আবার কেহ কেহ বলেন, যে আসাম প্রদেশের অন্তর্গত শিবসাগরের দক্ষিণে রঙ্গপুর নামে যে স্থান আছে উহাই কামরূপ-রাজ ভগদত্তের প্রমোদ-নগরী ছিল। মুসলমান আমলে রংপুর প্রত্যন্তপ্রদেশ বা মুসলমান অধিকৃত বাংলার সীমান্তে অবস্থিত ছিল। বর্ত্তমান দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত ঘোড়াঘাট শহর বাসের অযোগ্য হইয়া উঠিলে তথাকার ফৌজদার রংপুরে উঠিয়া আসেন। মুসলমান যুগে রংপুর ফৌজদারি ফকিরকুণ্ডি নামে খ্যাতি লাভ করে।

ইংরেজ অধিকারের প্রথম আমলে রংপুর জেলা বহুদিন ধরিয়া অশান্তি ও উপদ্রবের কেন্দ্র ছিল। শাসন কার্য্যের বিশৃঙখলার জন্য এবং ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ইজারাদার দেবীসিংহের অত্যাচারের ফলে ("নশীপুর রোড" দ্রষ্টব্য) অষ্টাদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে উত্তর-বঙ্গের প্রজাসাধারণ বিদ্রোহী হইয়া উঠে এবং ভবানী পাঠক ও মজনু শা নামক দুইজন দলপতির নেতৃত্বে তাহারা নানাস্থানে লুটপাট চালাইতে থাকে। এই দলে প্রায় ৫০,০০০ লোক ছিল। প্রথমতঃ রংপুরের কলেক্টরের প্রেরিত বরকন্দাজ সৈন্য তাহাদিগকে দমন করিতে সমথ হয় না। পরে ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে লেপ্টেন্যান্ট ব্রেনানের নেতৃত্বে ইহাদের বিরুদ্ধে একটি সেনাবাহিনী প্রেরিত হয়। লেঃ ব্রেনান জনৈক দেশীয় ব্যক্তির সাহায্যে ভবানী পাঠকের বজরা আক্রমণ করিয়া যুদ্ধে তাহাকে নিহত করেন। লেঃ ব্রেনানেব রিপোর্ট হইতে "দেবী চৌধুরাণী" নাম্নী জনৈকা দস্যু নেত্রীর কাহিনীও অবগত হওয়া যায়। ইনি নৌকায় বাস করিতেন; ইহার অধীনে বহু সৈন্য সামন্ত ছিল এবং ভবানী পাঠকও তাঁহার দলভুক্ত ছিলেন। এই কাহিনীকে অবলম্বন করিয়া সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র "দেবী চৌধুরাণী" নামক যে অমর উপন্যাস রচনা করিয়াছেন তাহা শিক্ষিত বাঙালী মাত্রেরই পরিচিত। "জলপাইগুড়ি"

দ্রষ্টব্য। ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে প্রায় ৭০০ সন্ন্যাসী ও ফকির একটি দলগঠন করিয়া এই জেলার নানা স্থানে অত্যাচার করিতে অরম্ভ করে। ইহাদের বহু ঘোড়া, হাতী, উট ও নানাপ্রকার অস্ত্র শস্ত্র ছিল। ১৮০ জন সিপাহীকে লইয়া লেঃ ম্যাক্‌ডোনালড নামক জনৈক সেনা-নায়ক এই দলটিকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেন। কিন্তু তিন বৎসর পরে এই দলের নেতৃগণ প্রায় দেড় হাজার লোক ও গাদা বন্দুক প্রভৃতি লইয়া পুনরায় দৌরাত্ম্য সুরু করে। ইহাদিগকে দমন করিতে বাংলা সরকারকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্য্যন্ত রংপুর জেলায় এইরূপ উপদ্রব প্রবল ছিল।

রংপুর শহরটি মাহিগঞ্জ, নবাবগঞ্জ, ধাপ ও লালবাগ এই চারি অংশে বিভক্ত। মাহিগঞ্জেই নবাবী আমলে ফৌজদারি কাছারি ছিল। এই স্থানে শাহ জালাল বোখারি ও সৈয়দ গোরা নামক দুইজন পীরের দুইটি পুরাতন মসজিদ আছে। প্রবাদ, শাহ জালাল বোখারি একটি মৎস্যের পৃষ্ঠে চড়িয়া এই স্থানে আসিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম হয় মাহিগঞ্জ। এখানে প্রায় ১২৫ বৎসরের পুরাতন একটি জগন্নাথ-মন্দির আছে। দেওয়ান রঙ্গলাল নামক রংপর কলেক্‌টরির জনৈক দেওয়ান ইহার প্রতিষ্ঠাতা। রংপুর শহরের নবাবগঞ্জ পল্লীর মুন্সীপাড়া নামক স্থানে মৌলানা কেরামত আলি নামক জনৈক সাধু ব্যক্তির কবর আছে। ইনি প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। বহু দূর হইতে লোকে ইহার সমাধি দেখিতে আসে। রংপুরের লালবাগ পল্লী রেল স্টেশনের নিকটে অবস্থিত। স্টেশনের নিকটে উত্তরবঙ্গের অন্যতম বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান "কারমাইকেল কলেজ" নামক প্রথম শ্রেণীর কলেজের প্রাসাদোপম ভবন অবস্থিত। রংপুর জেলায় বহু জমিদারের বাস; সেই জন্য রংপুর শহরে তাজহাট, ডিমলা, কাকিনা, মন্থনা, পীরগঞ্জ, বর্দ্ধনকোট প্রভৃতি স্থানের প্রসিদ্ধ জমিদারগণের সুন্দর সুন্দর বাড়ী আছে। এখানকার জেলাবোর্ডের বাড়ীটিও অতি সুন্দর। প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন জৈন মন্দির, শিখদিগের দুইটি পুরাতন "সঙ্গত" বা ভজনাগার ও উত্তর-বঙ্গ সাহিত্য পরিষৎ ভবনও রংপুরের দ্রষ্টব্য বস্তু। উত্তর-বঙ্গ সাহিত্য পরিষদে উত্তর-বঙ্গের অনেক পুরাতত্ত্ব সম্পর্কিত দ্রব্যাদি সযত্নে রক্ষিত আছে। তাজহাট জমিদারীর প্রতিষ্ঠাতা মান্নালাল রায় শিখ ধর্ম্মাবলম্বী পাঞ্জাবী ক্ষত্রিয় ছিলেন। তিনি খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রংপুর শহরের মাহিগঞ্জে আসিয়া বাস স্থাপন করেন। ক্রমে তিনি বৃহৎ জমিদারীর মালিক হন। তাঁহার তাজ বা শিরস্ত্রাণ হইতে তাঁহার বাসস্থান তাজহাট নামে পরিচিত হয়। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রবর্ত্তক রাজা রামমোহন রায় রংপুর কলেক্‌টরিতে কিছুকাল কার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহার বাসাবাটির একটি ইন্দারা এখনও এখানে বর্ত্তমান আছে। দুর্গা পূজার সময়ে এখানে রামের রথ বাহির হয় এবং একটি মেলা বসিয়া থাকে। রামের রথ বাংলার আর কোথাও দৃষ্ট হয় না।

শীতকালের দিনে আকাশ পরিষ্কার থাকিলে রংপুর শহর হইতে হিমালয়ের তুষারমণ্ডিত শিখর দেখিতে পাওয়া যায়।

রংপুর জেলা তামাকের চাষের জন্য বিখ্যাত। ভারতের বাহিরেও এই স্থানের তামাকের চাহিদা আছে।

রংপুরের ১০ মাইল উত্তরে অবস্থিত মহীপুর একটি পুরাতন মুসলমান জমিদার বংশের বাসস্থান। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে কোচবিহার রাজ্যের সেনাপতি আরিফ মহম্মদ চৌধুরী এই জমিদারীর সৃষ্টি করেন। তাঁহার অন্তঃকরণ অতি উচ্চ ছিল। স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তির মাত্র ।১০ অংশ নিজের

জন্য রাখিয়া তিনি অবশিষ্ট সম্পত্তি বন্ধুবান্ধব দিগকে দান করেন। তাঁহার প্রদত্ত সম্পত্তির এক অংশ হইতে তুষভাণ্ডার জমিদারীর সৃষ্টি হয়। "তুষভাণ্ডার" দ্রষ্টব্য।

রংপুর হইতে দক্ষিণমুখে একটি রাস্তা বাহির হইয়া এই জেলার মিঠাপুকুর, পীরগঞ্জ, পলাশবাড়ী এবং গোবিন্দগঞ্জ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ স্থান হইয়া বগুড়া পর্য্যন্ত গিয়াছে। ইহার অধিকাংশ কামতাপুর রাজগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত কামতাপুর হইতে ঘোড়াঘাট পর্য্যন্ত রাজপথের অংশ। রংপুর হইতে ১৮ মাইল দক্ষিণে এই রাস্তার বড় দরগা নামক স্থানে নবাবী আমলের একটি প্রাচীন মসজিদ্ আছে। এখানে প্রসিদ্ধ সাধু ইসমাইল গাজীর ব্যবহৃত একটি গদা রক্ষিত আছে। রংপুর হইতে প্রায় ২৪ মাইল দক্ষিণে পীরগঞ্জ থানা। থানার ৭ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত কাঁটাদুয়ার গ্রামে গাজী ইসমাইলের মস্তক সমাহিত আছে। ইহাও মুসলমান দিগের একটি পবিত্র স্থান। ইসমাইল গাজীর সম্বন্ধে জানা যায় যে আরব দেশ তাঁহার জন্মভূমি। ভারতবর্ষে ভাগ্যান্বেষণ করিতে আসিয়া তিনি সম্রাট বারবাক শাহের সময়ে গৌড় রাজ্যের সেনা বিভাগে প্রবিষ্ট হন। গৌড় বিজয়ী প্রসিদ্ধ মহম্মদ--বিন-বখতিয়ার খিলজি আসাম বিজয়ে বিফল হওয়ার পর সম্রাটের আদেশে ইসমাইল গাজী কামরূপ রাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন এবং যুদ্ধে তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া সম্রাটের করদ রাজা রূপে পরিণত করেন। কথিত আছে, ঘোড়াঘাটের হিন্দুরাজা তাঁহার প্রতিপত্তি দেখিয়া ঈর্ষান্বিত হইয়া সম্রাট্-দরবারে তাঁহার নামে সম্রাটের বিরুদ্ধে কামরূপ রাজের সহিত ষড়যন্ত্র করিবার অভিযোগ আনয়ন করেন। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া সম্রাট ইসমাইলের শিরশ্ছেদের আজ্ঞা দেন। প্রবাদ, যে ইসমাইলের ছিন্ন মস্তক কাঁটাদুয়ারে এবং মুণ্ডহীন দেহ হুগলী জেলার অন্তগত জাহানাবাদে (বর্ত্তমান আরামবাগ) গিয়া পড়ে। এই অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া লোকে ইসমাইলকে পীর জ্ঞানে তাঁহার দেহ ও মস্তকের সমাধিস্থলকে পবিত্র বলিয়া বিবেচনা করে। কাঁটাদুয়ারের মসজিদের সংলগ্ন বহু পীরোত্তর জমি আছে।

পীরগঞ্জ থানা হইতে ৬ মাইল দক্ষিণে চাত্রা গ্রামে কামতাপুর রাজ নীলাম্বরের একটি বিস্তৃত দুগের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। পীরগঞ্জ ও চাত্রার মধ্যে বড়বিল নামে ৩ বর্গ মাইল ব্যাপী একটি বিল দৃষ্ট হয়; ইহার দক্ষিণেও রাজা নীলাম্বরের গড়ের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়।

রংপুর হইতে ১৭ মাইল দক্ষিণে উপরিউক্ত পুরাতন রাজপথের কিছু পশ্চিমে, বড় দরগাহের প্রায় ৩ মাইল উত্তর-পশ্চিমে উদয়পুরে রাজা গোপীচন্দ্রের পুত্র ভবচন্দ্র বা উদয়চন্দ্রের রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। কুড়িগ্রাম স্টেশন দ্রষ্টব্য। ভবচন্দ্র বা হবচন্দ্র রাজা ও তাঁহার গবচন্দ্র মন্ত্রীর অদ্ভুত বুদ্ধি ও বিচার পদ্ধতির বহু কাহিনী আজিও জনসমাজে প্রচলিত আছে। রবীন্দ্র নাথ তাঁহার হিংটিং ছট্ কবিতা এইরূপে আরম্ভ করিয়াছেন;—

স্বপ্ন দেখেছেন রাত্রে হবুচন্দ্র ভূপ
অর্থ তার ভাবি ভাবি গবুচন্দ্র চুপ।

ভূতছাড়া—পার্ব্বতীপুর জংশন হইতে ৩০ মাইল দূর। রংপুর জেলায় তামাকের ব্যবসায়ের ইহা একটি প্রধান কেন্দ্র; সুদূর বর্ম্মা হইতে মগ ব্যবসায়ীরা প্রতি বৎসর তামাক কিনিবার জন্য এখানে আসিয়া থাকেন।

তিস্তা জংশন—পার্ব্বতীপুর জংশন হইতে ৩৮ মাইল দূর। কাউনিয়া জংশন ও এই স্টেশনের মধ্যে তিস্তা নদীর উপর একটি রেলওয়ে সেতু আছে।

তিস্তার সংস্কৃত নাম ত্রিস্রোতা। কালিকা পুরাণে লিখিত আছে যে একবার পার্ব্বতী এক দানবের সহিত ভীষণ যুদ্ধ করিবার সময়ে শিবভক্ত এই দানব শিবের নিকট তৃষ্ণা নিবারণের জন্য জল প্রার্থনা করেন। শিবের বরে পার্ব্বতীর বক্ষ হইতে তিনটি ধারায় এই নদী বাহির হইয়া আসে। বেশী দিনের কথা নয় তিস্তা দক্ষিণে বহিয়া আত্রাই ও করতোয়ার খাতে পদ্মায় গিয়া পড়িত। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দের ভীষণ বন্যার সময়ে তিস্তা পুরাতন খাত ছাড়িয়া দক্ষিণ-পূর্ব্বে বর্ত্তমান খাত কাটিয়া ব্রহ্মপুত্রে যাইয়া মিলিত হয়। তিস্তা জংশন হইতে একটি শাখা লাইন ১৫ মাইল দূরবর্ত্তী কুড়িগ্রাম পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই শাখাপথে তিস্তা জংশন হইতে ৪ মাইল দূরে সিংহেরদাবড়ি-হাট স্টেশনের নিকটে বহুকাল হইতে প্রতি বৎসর মাঘ ফাল্গুন মাসে "সিন্দূরমতীর মেলা" নামে প্রায় এক সপ্তাহব্যাপী একটি মেলা হইয়া থাকে। রংপুর জেলার সুপ্রসিদ্ধ মাণিক চন্দ্র ও গোপীচন্দ্রের গানের ময়নামতী ও সিন্দূরমতীর কথা ইহা স্মরণ করাইয়া দেয়; সম্ভবতঃ এই সিন্দূরমতী গ্রাম্য গীতিতে স্থান পাইয়াছেন এবং তাঁহার নামেই মেলাটি চলিয়া আসিতেছে।

কুড়িগ্রাম—পার্ব্বতীপুর জংশন হইতে ৫৩ মাইল। ইহা রংপুর জেলার একটি মহকুমা। শহরটি ধরলা নদীর তীরে অবস্থিত ও পাটের কারবারের জন্য বিখ্যাত। এই স্থান হইতে ১০ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে গিয়া ধরলা ব্রহ্মপুত্রে পড়িয়াছে। কথিত আছে, প্রাচীন কোচরাজ্য মুসলমানগণ কর্ত্তৃক বিজিত হইলে উক্ত রাজ্যের কুচওয়ারা অঞ্চলের কুড়িটি মেচ পরিবার এই স্থানে আসিয়া বসবাস করেন বলিয়া ইহার নাম হয় কুড়িগ্রাম। এই মেচগণ এখন সম্পূর্ণরূপে বাংলার হিন্দু সমাজের কুরী নামক জাতির সহিত মিশিয়া গিয়াছেন। কুড়িগ্রাম একটি স্বাস্থ্যকর স্থান। ধরলা নদীর ভাঙনের জন্য শহরটির মধ্যে মধ্যে বিশেষ ক্ষতি হয়।

কুড়িগ্রাম হইতে ১১ মাইল দক্ষিণে উত্তর-বঙ্গের সুবিখ্যাত বাহিরবন্দ পরগণার প্রধান স্থান উলিপুর যাইতে হয়। বাহিরবন্দ পরগণার জমিদারী পূর্ব্বে কোচরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৬০৩ খৃষ্টাব্দে রাজা পরীক্ষিতের সময়ে ইহা মুঘলগণ কর্ত্তৃক বিজিত হয়। এখন ইহা কাশীম-বাজারের মহারাজার সম্পত্তি হইয়াছে।

উলিপুরের ৫ মাইল পশ্চিমে ওয়াড়ি নামক স্থানে কতকগুলি ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। ইহা গোপীচন্দ্র রাজার একটি বাটির ধ্বংসাবশেষ বলিয়া কথিত। প্রধান লাইনের ডোমার স্টেশন দ্রষ্টব্য। রংপুর জেলার "গোপীচন্দ্রের গান" নামক লৌকিক গাথা-সাহিত্যের নায়ক রাজা গোপী চন্দ্র বা গোপীচাঁদ কাহারও কাহারও মতে ১০০৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১০৩০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন; আবার কেহ কেহ তাঁহাকে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর লোক বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। গোপীচাঁদ ঢাকা জেলার অন্তর্গত সাভারের রাজা হরিশচন্দ্রের অদুনা ও পদুনা নামক দুই কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহার জননী রাণী ময়নামতী হাড়িসিদ্ধা নামক এক সিদ্ধপুরুষের শিষ্যা ও যাদুবিদ্যায় পারদর্শিনী ছিলেন বলিয়া তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে নানারূপ দুর্নাম রটে। পত্নীদ্বয়ের পরামর্শে গোপীচাঁদ স্বীয় জননীকে উত্তপ্ত তৈলকটাহে নিক্ষেপ করিয়া হত্যা করেন। পরে নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া তিনি বিশেষ অনুতপ্ত হন ও স্বয়ং হাড়িসিদ্ধার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করেন। বাংলার বাউলগণ গোপীযন্ত্র নামক যে বাদ্য যন্ত্রের সহিত গান করেন, উহা রাজা গোপীচাঁদের সময়ে প্রথম প্রবর্ত্তিত হয় বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। গোপীচন্দ্রের গান রংপুর জেলার সর্ব্বত্র গীত হয় এবং ভারতবর্ষের নানাস্থানে ইহা অল্পবিস্তর পরিবর্ত্তিত হইয়া বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে।

উলিপুর হইতে ১০ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্র কূলে চিলমারী একটি পুরাতন গ্রাম ও বাণিজ্য কেন্দ্র। চিলমারীর অপর পারে ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্ব কূলে গারো পাহাড়ের পাদদেশে কুড়িগ্রাম মহকুমার কিয়দংশ অবস্থিত; তথায় রৌমারী একটি প্রসিদ্ধ বন্দর।

লালমণিরহাট জংশন—পার্ব্বতীপুর জংশন হইতে ৪৪ মাইল দূর। ইহা রংপুর জেলার অন্তর্গত একটি নগণ্য গণ্ডগ্রাম ছিল, কিন্তু রেলের কল্যাণে এখন প্রায় শহরে পরিণত হইয়াছে। এখানে একটি বড় রেলওয়ে উপনিবেশ আছে।

ইহা বাংলা-দুয়ার (বেঙ্গল-ডুয়ার্স) রেলপথের সহিত একটি জংশন স্টেশন। এখান হইতে আরম্ভ হইয়া বাংলা-দুয়ার রেলপথ ১৩৩ মাইল দূরবর্ত্তী জলপাইগুড়ি জেলার অন্তর্গত তোর্‌সা নদীর ধারে মাদারীহাট পর্য্যন্ত গিয়াছে। তোর্‌সা তিব্বতে উঠিয়া ভুটানের মধ্য দিয়া আসিয়া জলপাইগুড়ি জেলায় প্রবেশ করে। মাদারীহাট হইতে ১২ মাইল দক্ষিণে ফালাকাটা পাট, তামাক ও সরিষার বড় গঞ্জ। শ্রীপঞ্চমীর সময়ে এখানে একমাসব্যাপী একটি মেলা বসে। এই স্থানে আগে আলিপুর দুয়ার মহকুমার সদর ছিল। বাংলা-দুয়ার রেলপথের উভয় পার্শ্বে বহু চা-বাগান আছে। এই রেলপথে লালমণিরহাট হইতে যথাক্রমে ১৪ ও ১৭ মাইল দূরবর্ত্তী কাকিনা ও তুষভাণ্ডার দুইটি পুরাতন জমিদার বংশের বাসস্থান। কাকিনা প্রাচীন কোচরাজ্যের ছয়টি বিভাগের অন্যতম বিভাগ ছিল। এখানকার রাজবংশ দান ও বিদ্যানুরাগের জন্য প্রসিদ্ধ। কাকিনার রাজবাড়ীটি দেখিতে অতি সুন্দর। তুষভাণ্ডার জমিদার বংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম সীতারাম রায় চৌধুরী। তিনি স্বীয় সুহৃৎ আরিফ মহম্মদ চৌধুরীর নিকট হইতে তাঁহার সম্পত্তির পাচ আনা অংশ প্রাপ্ত হইয়া এই জমিদারীর পত্তন করেন (রংপুর দ্রষ্টব্য)। তুষভাণ্ডার এ অঞ্চলের একটি প্রসিদ্ধ গঞ্জ। লালমণিরহাট হইতে ৪৬ মাইল দূরবর্ত্তী পাটগ্রাম স্টেশনও একটি বাণিজ্য প্রধান স্থান। পাটগ্রাম হইতে ৮ মাইল পশ্চিমে তিস্তার পূর্ব্ব কূলে মেখলিগঞ্জ কোচবিহার রাজ্যের একটি উপবিভাগ ও গঞ্জ। পূর্ব্বে এখানে পাটের একপ্রকার সুন্দর রঙ্গীন গালিচা প্রস্তুত হইত; ইহাকে মেখলি বলিত।

বাংলা-দুয়ার রেলপথের সদর দপ্তর লালমণিরহাট হইতে ৬৯ মাইল দূরবর্ত্তী দোমোহানি নামক স্থানে অবস্থিত। এই স্থান হইতে একটি ছোট শাখা লাইন ৬ মাইল দূরবর্ত্তী জলপাইগুড়ি শহরের বিপরীত দিকে তিস্তা নদীর পূর্ব্ব তীরস্থ বার্ণেসঘাট পর্য্যন্ত গিয়াছে। দোমোহানি হইতে ৪ মাইল পূর্ব্বদিকে ময়নাগুড়ি দুয়ার অঞ্চলের একটি প্রসিদ্ধ স্থান। ময়নাগুড়ি রোডে একটি স্টেশনও আছে। ময়নাগুড়ি হইতে জলপেশ মন্দির ৪ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে; (জলপাইগুড়ি দ্রষ্টব্য)। দোমোহানির পরবর্ত্তী স্টেশন লাটাগুড়ি জংশন হইতে অপর একটি শাখা ৬ মাইল দূরে রামশাই হাট পর্য্যন্ত গিয়াছে। রামশাইহাট জলঢাকা নদীর তীরে অরণ্যের মধ্যে অবস্থিত। ব্যাঘ্রাদি শিকারের জন্য অনেকে এখানে আসিয়া থাকেন। জলঢাকা ভুটান হইতে উঠিয়া দার্জিলিং জেলার সীমান্ত দিয়া জলপাইগুড়ি জেলায় ঢুকিয়াছে; তথা হইতে কোচবিহার রাজ্যের মধ্য দিয়া গিয়া রংপুর জেলায় তোরসা নদীর একটি শাখার সহিত মিলিত হইয়া ধরলা নামে পরিচিত হইয়াছে। লালমণিরহাট হইতে ৯০ মাইল দূরবর্ত্তী **মাল জংশন** এই রেলপথের একটি উল্লেখযোগ্য স্টেশন। ইহা একটি বিখ্যাত বাণিজ্য কেন্দ্র। এখান হইতে একটি শাখা লাইন বাহির হইয়া ১১ মাইল

পশ্চিমে দার্জিলিং জেলার সীমান্তের নিকট বাগরাকোট পর্য্যন্ত গিয়াছে। মাল জংশনের পরবর্ত্তী স্টেশন চালসা আর একটি জংশন। এখান হইতে ৬ মাইল উত্তরে দার্জিলিং জেলার সীমান্তের নিকট মেটেলি পর্য্যন্ত একটি শাখা লাইন আছে।

ডুয়ার্স বা দুয়ার কথাটি ভুটিয়া ভাষার শব্দ, ইহার অর্থ পর্ব্বতের পাদদেশস্থ সমতল ভূমি। বেঙ্গল-ডুয়ার্স রেলপথের ভোটমারি, ভোটপট্টি, লাটাগুড়ি, বিন্নাগুড়ি প্রভৃতি স্টেশন ভোট জাতির স্মৃতি বহন করিতেছে। পূর্ব্বে এই অঞ্চল ভুটিয়াগণের অধিকারভুক্ত ছিল। আসাম বিজয়ের পর এই অঞ্চল ব্রিটিশ সম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ভুটিয়ারা যাহাতে কোনরূপ দৌরাত্ম্য না করে তজ্জন্য ইংরেজ সরকার হইতে ভুটানের রাজাকে বার্ষিক কিছু অর্থ দেওয়া হইত। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভুটিয়ারা দুয়ার অঞ্চল দিয়া বাংলার মধ্যে প্রবেশ করিয়া যথেচ্ছ অত্যাচার করিতে সুরু করায় বাংলা সরকার ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে য়্যাশলি ঈডেন সাহেবকে দূতরূপে ভুটান রাজসভায় প্রেরণ করেন। তিনি সেখানে ভুটিয়াগণ কর্ত্তৃক অপমানিত হইলে ভুটিয়াগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়। এই যুদ্ধে প্রথমতঃ ইংরেজগণ তত সুবিধা করিতে পারেন নাই; পরে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে ভুটিয়াগণের বিরুদ্ধে বিপুল বাহিনী প্রেরণ করিয়া তাহাদিগকে পরাস্ত ও বশীভূত করা হয়। দুয়ার অঞ্চল পূর্ব্বে সাধারণ বিধি বহির্ভূত একটি স্বতন্ত্র অঞ্চল রূপে একজন ডেপুটি কমিশনারের দ্বারা শাসিত হইত; পরে ইহাকে জলপাইগুড়ি জেলার সহিত সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। এই অঞ্চল পূর্ব্বে জঙ্গলময় ও অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর ছিল। ভোটযুদ্ধে প্রেরিত বহু ইংরেজ সৈনিক ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হইয়া প্রাণ হারাইয়াছিল। এখন এই অঞ্চল চা-উৎপাদনের একটি প্রধান কেন্দ্ররূপে পরিণত হওয়ায়, ইহার জঙ্গল একরূপ লোপ পাইয়াছে বলিলেই হয় এবং স্বাস্থ্যেরও বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

মোগলহাট—পার্ব্বতীপুর জংশন হইতে ৫০ মাইল দূর। ধরলা নদীর পশ্চিম কূলে ইহা একটি বিখ্যাত পাটের কারবারের স্থান। মুঘল বা মোগলগণ যখন আসাম অভিযানে গমন করেন, তখন এই স্থানে তাঁহারা একটি বাজার বসাইয়াছিলেন বলিয়া ইহা মোগলহাট নামে পরিচিত। সন্ন্যাসী বিদ্রোহের সময় এই স্থানে ইংরেজ সৈন্যগণের সহিত বিদ্রোহীদিগের কয়েকটি খণ্ডযুদ্ধ হইয়াছিল।

গিতলদহ জংশন—পার্ব্বতীপুর জংশন হইতে ৫২ মাইল দূর। ইহা ধরলা নদীর পূর্ব্ব তীরে কোচবিহার রাজ্যের অন্তর্গত। এখান হইতে একটি শাখা লাইন কোচবিহার রাজ্যের ভিতর দিয়া জলপাইগুড়ি জেলার অন্তর্গত দুয়ার অঞ্চলের দলসিংপাড়া ও জয়ন্তী পর্য্যন্ত গিয়াছে।

দিনহাটা—পার্ব্বতীপুর জংশন হইতে ৬০ মাইল দূর। ইহা কোচবিহার রাজ্যের অন্তগত একটি বড় স্টেশন ও বাণিজ্য কেন্দ্র। এই স্থান হইতে ১০ মাইল পশ্চিমে ধরলা নদীর তীরে গোসানীমারি গ্রামে প্রাচীন কামতা রাজ্যের রাজধানী কামতাপুরের ধ্বংসাবশেষ অবস্থিত। প্রাসাদ ও গড়ের মৃণ্ময় প্রাকারের কিছু কিছু অংশ ও দুইটি ভগ্ন মন্দির এখনও বর্ত্তমান। ধ্বংসাবশেষটি এখনও রাজপাট নামে পরিচিত। কামতারাজ্য মহাভারতোক্ত প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর বা কামরূপেরই অংশ বিশেষ ছিল। পৌরাণিক ও তান্ত্রিক গ্রন্থে যথা, কালিকাপুরাণ ও যোগিনীতন্ত্রে কামরূপের চতুঃসীমা এইভাবে নির্দ্দিষ্ট আছে: উত্তরে কাঞ্চনাদ্রি বা কাঞ্চনজঙ্ঘা, পশ্চিমে করতোয়া নদী, পূর্ব্বে দিক্করবাসিনী বা দিক্ষু নদী এবং দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্র ও লাক্ষা নদীর সঙ্গম। এই চতুঃসীমার মধ্যবর্ত্তী ভূখণ্ডের আকার একটি ত্রিভুজের ন্যায় এবং ইহা রত্নপীঠ, কামপীঠ, স্বর্ণ পীঠ ও সৌমার পীঠ এই চারি অংশে

বিভক্ত। ইহার পশ্চিমাংশ বা শৌমার পীঠ ঐতিহাসিকযুগে কামতা নামে বিখ্যাত হইয়াছিল। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ অনেক স্থলে কামরূপ ও কামতা শব্দ তুল্যার্থজ্ঞাপক হিসাবে ব্যবহার করিয়াছেন। আনুমানিক পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে খ্যেনবংশীয় নীলধ্বজ কামতা রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। কামদা বা কামতাদেবী তাঁহার উপাস্য দেবতা ছিলেন। দেবীর নামানুসারে তিনি রাজ্যের নাম কামতারাজ্য এবং রাজধানীর নাম কামতাপুর রাখেন। সাধারণ লোকে এই দেবীকে গোস্বামিনী সর্ব্বাধিশ্বরী বা গোসানী নামে অভিহিত করিত। এই জন্য পরবর্ত্তীকালে কামতাপুর গোসানীমারি নামে পরিচিত হয়। নীলধ্বজের পর যথাক্রমে চক্রধ্বজ ও নীলাম্বর কামতারাজ্যের অধীশ্বর হন। নীলাম্বর অতি শক্তিশালী নৃপতি ছিলেন। তিনি বাহুবলে কামরূপ রাজ্যের অধিকাংশ স্থান ও আধুনিক রংপুর জেলার প্রায় সমগ্র অঞ্চল স্বীয় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। তাঁহার রাজ্যের দক্ষিণ সীমা ঘোড়াঘাট পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে রাজ্যরক্ষার জন্য নীলাম্বর রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কামতাপুর হইতে ঘোড়াঘাট পর্য্যন্ত যে প্রাচীন রাজপথ আছে উহার পার্শ্বে ঘোড়াঘাটের অদূরে নীলাম্বরের দুর্গের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। নীলাম্বরের রাজ্যকালেই কামতা রাজ্যের পতন ঘটে। কথিত আছে, মন্ত্রী শচীপাত্রের পুত্র কোনও বিশেষ গর্হিত কর্ম্মের জন্য রাজা নীলাম্বর কর্ত্তৃক নিহত হন এবং তাঁহার মৃত দেহ রন্ধন করিয়া তাঁহার পিতা শচীপাত্রকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়ান হয়। ইহা জানিতে পারিয়া মর্ম্মাহত শচীপাত্র নীলাম্বরের উপর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য গৌড়েশ্বর হুসেন শাহকে কামতাপুর আক্রমণের জন্য প্ররোচিত করেন। বহু বৎসর ধরিয়া কামতাপুর অবোরোধ করিয়া হুসেন শাহ ইহার দুর্ভেদ্য দুর্গ জয় করিতে পারেন নাই। অতঃপর তিনি এক কৌশল অবলম্বন করিলেন। তিনি রাজা নীলাম্বরের নিকট দূত দ্বারা প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন যে তাঁহার বেগমগণ কামতাপুরের মহারাণীর সহিত দেখা করিতে চাহেন, সুতরাং বেগমগণের শিবিকাগুলি যেন দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিবার ছাড়পত্র পায়। নীলাম্বর অসন্দিগ্ধচিত্তে ইহাতে সম্মতি দিলে হুসেন শাহ অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত বহু সৈনিককে শিবিকায় আবৃত করিয়া দুর্গমধ্যে প্রেরণ করেন। তাহারা অকস্মাৎ শিবিকা হইতে বাহির হইয়া অন্তঃপুর রক্ষিগণকে আক্রমণ করে ও নিরস্ত্র নীলাম্বরকে বন্দী করিয়া হুসেন শাহের নিকট আনয়ন করে। কথিত আছে, যে হুসেন শাহ নীলাম্বরকে একখানি লৌহপিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া গৌড় অভিমুখে প্রেরণ করেন, কিন্তু পথিমধ্যে নীলাম্বর কোনরূপে পলায়ন করিবার সুযোগ পান এবং অরণ্য মধ্যে আত্মগোপন করেন, ইহার পর আর তাঁহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। রাজধানী কামতাপুর বহু প্রাচীরের দ্বারা সুরক্ষিত ও দুর্ভেদ্য ছিল। ধরলা নদীর ভাঙ্গনে ইহার অনেকস্থান বর্ত্তমানে লুপ্ত হইয়া গেলেও যাহা বিদ্যমান আছে তাহা হইতেই নগরীটির বিশালতার কতকটা ধারণা করিতে পারা যায়। বুখানান হ্যামিলটন ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে ইহার পরিধি ১৯ মাইল দেখিয়াছিলেন। পূর্ব্বে এই স্থান অত্যন্ত জঙ্গলময় ছিল, কিন্তু এখন ইহার চারিদিকে চাষ আবাদ হওয়ায় এখানে যাইবার আর কোন অসুবিধা নাই। মহারাজা নীলধ্বজের প্রতিষ্ঠিত কামদা বা গোসানী দেবী প্রাচীন দুর্গমধ্যে এখনও নিত্যপূজা প্রাপ্ত হইতেছেন। বর্ষাকাল ভিন্ন অন্য সময়ে দিনহাটা স্টেশন হইতে গোসানীমারি পর্য্যন্ত গোযান পাওয়া যায়।

কোচবিহার—পার্ব্বতীপুর জংশন হইতে ৭৪ মাইল দূর। ইহা কোচবিহার নামক করদ-রাজ্যের রাজধানী। বাংলাদেশে দুইটি মাত্র করদ রাজ্য আছে, একটি কোচ বিহার, অপরটি ত্রিপুরা। কোচ বিহার রাজ্যের পরিমাণ ফল ১,৩১৮ বগ মাইল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে কোচ বিহারের মহারাজা

১৩ টি তোপের সম্মানের অধিকারী। কোচবিহারের সহিত বাংলা সরকারের কোন রাজনৈতিক সম্বন্ধ নাই, ইহা ভারত সাম্রাজ্যের প্রাচ্য রাজ্যব্যূহের অন্তর্গত। শাসনকার্য্যের সুবিধার জন্য সমগ্র রাজ্য কোচবিহার সদর, মাথাভাঙ্গা, মেখলিগঞ্জ ও তুফান গঞ্জ এই চারি উপবিভাগে বিভক্ত। ইংরেজ শাসিত প্রদেশের ন্যায় এই রাজ্যেও হাইকোর্ট, নিমন আদালত, জেলখানা এবং স্বতন্ত্র পুলিস, জজ, ম্যাজিস্ট্রেট প্রভৃতি আছে। তন্ত্রগ্রন্থে কোচবিহারের নাম "কোচবধূপুর" রূপে উল্লিখিত আছে। কথিত আছে, এই অঞ্চল শিবের অতি প্রিয় বিহারক্ষেত্র বলিয়া ইহার নাম "কোচ-বিহার" হইয়াছে।

১৭৭২ খৃষ্টাব্দে কোচবিহার রাজ্য ঈস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির সহিত সন্ধি সুত্রে আবদ্ধ হয়, তৎপূর্ব্বে ইহা সম্পূর্ণ স্বাধীন রাজ্য ছিল। পূর্ব্বকালে কোচবিহার প্রাচীন কামরূপ-খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কামতারাজ্যের শেষ রাজা নীলাম্বরের পতনের পর ("দিনহাটা" দ্রষ্টব্য) কোচনেতা বিশু বা বিশ্বসিংহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য জাতিগুলিকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া একটি সেনাবাহিনী গঠন করেন এবং গৌড়েশ্বর হুসেন শাহের বিজিত অঞ্চলের কতকাংশ অধিকার করিয়া আনুমানিক ১৫১৫ খৃষ্টাব্দে কোচবিহার নামে একটি স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। কোচজাতি প্রাচীন ক্ষত্রিয় জাতির একটি শাখা বলিয়া প্রসিদ্ধ। বিশ্বসিংহের সময়ে কোচরাজ্য পূর্ব্বে কামরূপ জেলার বড়নদী ও পশ্চিমে করতোয়া নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কথিত আছে, বিশ্বসিংহ কামাখ্যার সুপ্রসিদ্ধ কামপীঠের আবিষ্কার করেন। "পাণ্ডু" স্টেশন দ্রষ্টব্য। ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে বিশ্বসিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র মল্লদেব বা নরনারায়ণ রাজা হন। মল্লদেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শুক্লধ্বজ বা চিলারায় কোচ বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন। তাঁহার ন্যায় বীর তৎকালে অতি অল্পই ছিল। তিনি বাহুবলে আহোম, কাছাড়, মণিপুর, জয়ন্তীয়া, ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট প্রভৃতি জয় করিয়া কোচ সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত করেন। এই সময়ে তাঁহার অপর ভ্রাতা কমলা ব্রহ্মপুত্রের ধার দিয়া যে সামরিক রাজপথ নির্ম্মাণ করেন তাহা এখনও স্থানে স্থানে দৃষ্ট হয় ও গোহাঁই কমলা আলি নামে পরিচিত। কামাখ্যা দেবীর বর্ত্তমান মন্দিরটি শুক্লধ্বজের চেষ্টায় নির্ম্মিত হয়। ১৫৬০ খৃষ্টাব্দে গৌড়ের সুলতানের সহিত কোচ সাম্রাজ্যের সংঘর্ষ ঘটে এবং সেই যুদ্ধে মহাবীর চিলারায় পরাজিত ও বন্দী হন। নরনারায়ণ তখন সম্রাট আকবরের সহিত যোগ দিয়া গৌড় রাজ্য আক্রমণ করিয়া বহু দূর পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিতে সমর্থ হন। ১৫৮৪ খৃষ্টাব্দে নরনারায়ণের মৃত্যুর পর কোচরাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। সঙ্কোশ নদীর পশ্চিম দিকের অংশ অর্থাৎ বর্ত্তমান কোচবিহার এবং জলপাইগুড়ি, রংপুর ও দিনাজপুর জেলার কিয়দংশ নরনারায়ণের পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণের ভাগে পড়ে, এবং সঙ্কোশ নদীর পূর্ব্বতীর ও ব্রহ্মপুত্র নদের উভয় তীরস্থ ভূভাগ চিলারায়ের পুত্র রঘুদেবের অধিকার ভুক্ত হয়। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ এই দুই রাজ্যকে যথাক্রমে "কোচবিহার" ও "কোচহাজো" নামে অভিহিত করিয়াছেন। কোচবিহার রাজ্যের অধিকারী লক্ষ্মীনারায়ণ মুঘলদিগের সহিত যোগ দেন এবং দিল্লীর সম্রাটের করদ রাজা রূপে পরিণত হন। কোচহাজো রাজ্যের রাজধানী বড়পেটার অনতিদূরবর্ত্তী বড়নগর নামক স্থানে অবস্থিত ছিল। আহোমগণ কোচহাজো রাজ্যের কিছু কিছু জয় করিয়াছিলেন। রঘুদেবের পুত্র পরীক্ষিতের সময়ে কোচবিহার ও কোচহাজো রাজ্যদ্বয়ের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে সেই সুযোগে ১৬১২ খৃষ্টাব্দে মুঘলগণ কোচহাজো রাজ্য অধিকার করিয়া নিজেদের খাস্ শাসনাধীনে আনেন। পরে পরীক্ষিতের বংশধরগণ কয়েকটি জমিদারী লাভ করিয়া বর্ত্তমান বিজনি গ্রামে বসবাস করেন। "বিজনি" দ্রষ্টব্য।

১৭৭২ খৃষ্টাব্দে ভুটিয়ারা কোচবিহার রাজ্য আক্রমণ করিলে কোচবিহাররাজ ওয়ারেন-হেষ্টিংসের সাহায্য গ্রহণ করেন; ভুটিয়ারা বিতাড়িত হন এবং লাসার লামার মধ্যস্থতায় শান্তি স্থাপিত হয়। অতঃপর ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দের ৫ই এপ্রিল তারিখে কোচবিহার রাজ্য ও ঈস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির মধ্যে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়।

কোচবিহার শহর তোরসা নদীর তীরে অবস্থিত। পূর্ব্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্ম্মিত বলিয়া কোচবিহার শহরটি দেখিতে অতি সুন্দর। তরুবীথিযুক্ত সরল ও প্রশস্ত রাজপথ, রাজপথের পার্শ্বস্থ শ্যামল তৃণাচ্ছাদিত ভূখণ্ড, প্রমোদ-উদ্যান, স্বচ্ছ সলিল পূর্ণ দীঘি-সরোবর ও আম, কাঁঠাল, গুবাক প্রভৃতি বৃক্ষের শ্রেণী শহরটিকে একটি সুন্দর কুঞ্জবনে পরিণত করিয়াছে। বাংলা দেশে এরূপ সুন্দর শহর নাই বলিলেও চলে। এখানকার বহু দ্রষ্টব্য বস্তুর মধ্যে মহারাজার প্রাসাদ, গ্রন্থাগার, রাণীর বাগান নামক উদ্যান, ভিক্টোরিয়া কলেজ নামক প্রথম শ্রেণীর কলেজ-ভবন, মেয়েদের উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়, সাগর দীঘি ও মদনমোহনের মন্দির উল্লেখ যোগ্য। মদনমোহনের রাসযাত্রা উপলক্ষে মহা সমারোহ ও নানা স্থান হইতে বহু যাত্রীর সমাগম হয়। এ সময়ে এখানকার প্রসিদ্ধ রাসের পুতুল দেখিতে পাওয়া যায়। রাসযাত্রা মেলায় লোকশিল্পের নিদর্শন স্বরূপ কিছু কিছু দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। কোচবিহার শহরে রাজ-অতিথিশালা, হোটেল ও ডাকবাংলা প্রভৃতি থাকায় ভ্রমণকারীর পক্ষে এখানে থাকিবার কোনই অসুবিধা নাই।

কোচবিহার হইতে ১১ মাইল পূর্ব্বদিকে রায়ঢাক নদীর কূলে অবস্থিত এই রাজ্যের উপবিভাগ তুফানগঞ্জ অবস্থিত। জলঢাকা নদীর তীরে মাথাভাঙ্গা উপবিভাগটি কোচবিহার হইতে ১৬ মাইল পশ্চিমে এবং বাংলা-দুয়ার রেলপথের পাটগ্রাম স্টেশন হইতে ১২ মাইল পূর্ব্বদিকে।

বাণেশ্বর—পার্ব্বতীপুর জংশন হইতে ৮০ মাইল দূর। এই স্থানটি কোচবিহার রাজধানীর উপকণ্ঠে অবস্থিত। এখানে বাণেশ্বর নামক এক অতি প্রাচীন শিবের মন্দির আছে। কেহ কেহ বলেন, যে এই স্থান তন্ত্রোক্ত অন্যতম শৈবপীঠ। স্টেশনের অতি নিকটে একটি দীঘির পাড়ে তরু-কুঞ্জের মধ্যে মন্দিরটি অবস্থিত। ইহা প্রায় ৫০ ফুট উচ্চ এবং আনুমানিক আড়াইশত বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত। ইহা কোচবিহারের মহারাজার সম্পত্তি। শিবরাত্রির সময়ে এখানে খুব বড় মেলা হয়।

আলিপুর দুয়ার—পার্ব্বতীপুর জংশন হইতে ৮৬ মাইল দূর। ইহা জলপাইগুড়ি জেলার একটি মহকুমা। শহরটি কালজানি নদীর উত্তর তীরে অবস্থিত এবং একটি প্রসিদ্ধ বাণিজ্য কেন্দ্র। কর্ণেল হেদায়েৎ আলি খাঁ নামক একজন বীরপুরুষ ভুটান যুদ্ধে ইংরেজপক্ষে বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করেন। তাঁহার নামানুসারে এই স্থানের আলিপুর নাম হইয়াছে। ভুটানগণের নিকট হইতে এই স্থান বিজিত হইবার পর কর্ণেল হেদায়েৎ আলি ইহার প্রথম শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

আলিপুর দুয়ার হইতে ১০ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে মহাকালগুড়ির চারিদিকে রায়ঢাক ও গদাধর নদীর মধ্যে প্রায় ৭০ বর্গ মাইল ব্যাপিয়া চার্চ্চ মিশনারি সোসায়েটির তত্ত্বাবধানে প্রতিষ্ঠিত খৃষ্টান সাঁওতালগণের একটি বসতি আছে; ইহার ১০টি গ্রাম হইতে নির্ব্বাচিত ১০ জন প্রধান ও ধর্ম্মযাজকের সভাপতিত্বে একটি মন্ত্রণা-সভা আছে। মহাকালগুড়িতে ডাক বাংলা গির্জা প্রভৃতি আছে এবং তথায় যাইবার জন্য স্টেশন হইতে মোটর বাস চলে। মহাকালগুড়ির পশ্চিম পার্শ্বে একটি পুরাতন গড়ের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়।

রাজাভাতখাওয়া জংশন—পার্ব্বতীপুর জংশন হইতে ৯৬ মাইল দূর। ইহা দুয়ার অঞ্চলের বকসা নামক সংরক্ষিত বন বিভাগের অন্তর্গত অরণ্যজাত শাল, শিশু, খয়ের প্রভৃতি কাষ্ঠ চালানের প্রধান কেন্দ্র। এখানে বক্‌সা বন বিভাগের দপ্তর অবস্থিত। রাজাভাতখাওয়া এই অদ্ভুত নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে কথিত হয় যে, পূর্ব্বে কোচ রাজ ও ভুটিয়া রাজের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধের পর যখন শান্তি স্থাপিত হয় তখন এই স্থানে সন্ধি ও শান্তি স্থাপন কালে কোচরাজের নিমন্ত্রণে ভুটিয়ারাজ আহারাদি করিয়াছিলেন।

এই স্থান হইতে একটি শাখা লাইন গভীর জঙ্গল ভেদ করিয়া ৯ মাইল উত্তরে জয়ন্তী পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই শাখাপথে বক্‌সা রোড ও জয়ন্তী এই দুইটি স্টেশন আছে। অপর একটি শাখা লাইন উত্তর-পশ্চিমে ১৭ মাইল দূরবর্ত্তী দলসিংপাড়া পর্য্যন্ত গিয়াছে। শেষোক্ত শাখায় গারোপাড়া, কালচিনি, হ্যামিলটনগঞ্জ, হাসিমারা ও দলসিংপাড়া এই কয়টি স্টেশন ও উহাদের আশে পাশে বহু চা-বাগান আছে। কালচিনির চায়ের বাজারে নাম আছে। হাসিমারায় সুমিষ্ট আনারস পাওয়া যায়; হাসিমারা স্টেশন হইতে ৮ মাইল পশ্চিমে তোর্‌সা নদী পার হইয়া বাংলা-দুয়ার রেলপথের মাদারীহাট স্টেশন অবস্থিত। হ্যামিলট্‌ন্‌গঞ্জের কাঠের কারবার প্রসিদ্ধ। দলসিংপাড়ার সুমিষ্ট কমলা লেবুর খ্যাতি আছে।

বকসা রোড—পার্ব্বতীপুর জংসন হইতে বক্‌সা রোডের দূরত্ব ১০২ মাইল। অরণ্য মধ্যস্থ এই স্টেশন হইতে ভুটান সীমান্তের নিকট অবস্থিত বক্‌সা ছাউনী বা সেনা নিবাসে যাইতে হয়। স্টেশন হইতে বকসা প্রায় ৫ মাইল উত্তরে। প্রথম তিন মাইল পথ জঙ্গলের মধ্য দিয়া গিয়াছে। ইহার পর সাঁতরাবাড়ী নামক স্থান হইতে পাহাড়ী পথ সুরু হইয়াছে। রেল স্টেশন হইতে বক্‌সা পর্য্যন্ত বেশ ভাল রাস্তা আছে। মোটর কার বা এক্কা যোগে যাওয়া যায়। বক্‌সার সেনা নিবাস ভুটান পাহাড়ের সানুদেশে প্রায় ১৮০০ ফুট উচ্চে অবস্থিত। ইহার নিকটবর্ত্তী উচ্চতম পর্ব্বতশৃঙ্গ ছোট সিঞ্চুলা প্রায় ২৪৫৭ ফুট উচ্চ। বক্‌সার পার্ব্বত্যপথ দিয়া ভুটান তিব্বত ও মধ্য-এসিয়ায় যাওয়া যায়। ভুটিয়ারা যাহাতে বাংলার সমতল ভূমিতে আসিয়া অত্যাচার করিতে না পারে সেই জন্য উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে এখানে একটি সেনা নিবাস ও দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে এই দুর্গটি বন্দীনিবাস রূপে ব্যবহৃত হইতেছে। এখানে ভুটিয়ারা গজদন্ত, মোম, মধু, কমলা লেবু, ভোট-কম্বল, মৃগনাভি, গণ্ডারের শৃঙ্গ ও এণ্ডি কাপড় প্রভৃতি বিক্রয় করিতে আসে। বক্‌সার পথ দিয়া মধ্য-এশিয়া, তিব্বত ও ভুটান প্রভৃতি স্থান হইতে ভারতবর্ষে বহু পরিমাণে পশম আমদানি হয়। ভুটিয়ারা চাউল, তামাক, সুপারি ও বস্ত্রাদি কিনিয়া লইয়া যায়। সমুদ্রের উপর হইতে বক্‌সা সেনানিবাস ১,৮০০ ফুট উচ্চ; ইহা একটি স্বাস্থ্যকর স্থান। সেনানিবাসের ৭ মাইল উত্তরে অবস্থিত ৫,৬০৫ ফুট্ উচ্চ ছোট সিঞ্চুলা গিরিশৃঙ্গ জলপাইগুড়ি জেলার মধ্যে সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বতশিখর; ইহার পর হইতেই ভুটান রাজ্যের আরম্ভ।

জয়ন্তী—পার্ব্বতীপুর জংশন হইতে জয়ন্তী ১০৫ মাইল দূর। ইহার নিকটেই অরণ্য বেষ্টিত পর্ব্বতমালা অবস্থিত। রাজাভাতখাওয়া হইতে গভীর জঙ্গল মধ্য দিয়া ট্রেন আসিবার সময়ে প্রায়ই বন-মুরগী প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। এই জঙ্গলের দৃশ্য সত্যই অতি মহান ও গম্ভীর। বন্য হস্তী ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র প্রাণী এই জঙ্গলে দেখিতে পাওয়া যায় এবং শিকারের জন্য বহু লোক এ অঞ্চলে আসিয়া থাকেন। জয়ন্তীতে একটি চূণের কারখানা আছে। এই স্থান হইতে অনতিদূরে

প্রসিদ্ধ "মহাকাল" শিবের স্থানে যাওয়া যায়। মহাকাল শিব অরণ্য মধ্যে পর্ব্বতোপরি অবস্থিত। শিবের কোন মন্দির নাই। শিবস্থানের নিকট একটি বিরাট আম্রবৃক্ষ ও একটি পুষ্করিণী অবস্থিত। শিবরাত্রির সময় এখানে পাহাড় অঞ্চল হইতে বহু যাত্রীর সমাগম হয়।

ভুরুঙ্গমারী—পাব.তীপুর জংশন হইতে ৬৬ মাইল। স্টেশন হইতে গ্রাম প্রায় ৩ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে রায়ঢাক বা দুধকুমার নদীর কূলে অবস্থিত। ইহা রংপুর জেলার একটি প্রসিদ্ধ গঞ্জ। দুধকুমার-তোর্‌সা কালজা।ি ও রায়ঢাকের মিলিত জলধারা বহন করে।

গোলকগঞ্জ জংশন--পাব্বর্বতীপুর জংশন হইতে ৭৬ মাইল দূর। ইহাই গোয়ালপাড়া জেলা ও আসাম প্রদেশের প্রথম স্টেশন। স্থানটি গঙ্গাধর নদের তীরে অবস্থিত এবং গোয়ালপাড়া জেলার একটি বিখ্যাত বাণিজ্য কেন্দ্র। গঙ্গাধরের উপর একটি রেল সেতু আছে। এই স্থান হইতে একটি শাখা লাইন ১৩ মাইল দূরবর্ত্তী ধুবড়ী পর্য্যন্ত গিয়াছে। গোলকগঞ্জ হইতে গঙ্গাধর নদের উপর নৌকাপথে যথাক্রমে ৮ ও ১৬ মাইল উত্তরে আগমনী ও তামারহাট গোয়ালপাড়া জেলার প্রসিদ্ধ গঞ্জ।

গৌরীপুর---ধুবড়ী শাখা পথে পাব্বর্বতীপুর জংশন হইতে ৮৫ মাইল দূর। ইহা গঙ্গাধর নদের একটি শাখা গদাধর নদের তীরে অবস্থিত এবং একটি বর্দ্ধিষ্ণু বাণিজ্য কেন্দ্র। এখানে বিস্তৃত কাঠের ও পাটের কারবার আছে। সমগ্র আসামের মধ্যে গৌরীপুরের রাজা সব চেয়ে বড় জমিদার। একটি টিলার উপর অবস্থিত তাঁহার "মতিয়া বাগ" নামক প্রাসাদ এখানকার একটি প্রধান দ্রষ্টব্য। এই প্রাসাদে সম্রাট শের শাহের একটি তোপ আছে; উহা কনস্তানতিনোপল হইতে আনীত বিখ্যাত কারিগর সৈয়দ আহমদ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। গৌরীপুর হইতে ছয় মাইল উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত রাঙ্গামাটীতে সপ্তদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত বলিয়া কথিত একটি পুরাতন মসজিদ্ আছে। মুঘল আমলে এই স্থানে একটি ফৌজদারীর সদর ছিল।

ধুবড়ী—পাব্বর্বতীপুর জংশন হইতে ৮৯ মাইল দূর। ইহা গোয়ালপাড়া জেলার সদর শহর এবং ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে অবস্থিত একটি বাণিজ্য প্রধান স্থান। শহরের পূর্ব্ব প্রান্তে গদাধর আসিয়া ব্রহ্মপুত্রে মিশিয়াছে। অনেকে অনুমান করেন যে "ধোপা বুড়ী" কথা হইতে ধুবড়ী নাম হইয়াছে। তাঁহাদের মতে এই অঞ্চলেই বেহুলা-লখীন্দরের ঘটনা ঘটিয়াছিল এবং মনসার ভাসান গানে উল্লিখিত নিত্যা বা নেতা ধোপানীর পাট ধুবড়ীতে অবস্থিত ছিল। কোচবংশীয় রাজা পরীক্ষিৎ ধুবড়ীতে একটি দুগ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। মুঘল সেনাপতি মোকরম্ খাঁ ঐ দুর্গ অধিকার করিয়া ধুবড়ী জয় করেন। "কোচ বিহার" স্টেশন দ্রষ্টব্য। ধুবড়ী শিখ ধর্ম্মাবলম্বীদিগের একটি প্রসিদ্ধ তীর্থ স্থান। এই স্থানে একটি টিলার উপর তাঁহাদের দমদম গুরুদ্বার অবস্থিত। ইহা গুরু তেগ বাহাদুরের আদেশে ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় বলিয়া কথিত।

ধুবড়ী শহরটি ব্রহ্মপুত্র তীরস্থ একটি উচচ টিলার উপর নির্ম্মিত। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি সুন্দর। গোয়ালপাড়া জেলা আসাম প্রদেশের অন্তর্গত হইলেও এই জেলায় বহু বাঙালীর বাস আছে এবং ধুবড়ী প্রভৃতি অঞ্চলে বাঙালীদেরই প্রাধান্য।

অশোকাষ্টমী উপলক্ষে ধুবড়ীতে ব্রহ্মপুত্র স্নানের জন্য সহস্র সহস্র লোক সমাগম হয় ও মেলা বসে। এই মেলায় লোকশিল্পের নিদর্শন স্বরূপ কিছু কিছু জিনিষ পাওয়া যায়।

গোয়ালপাড়া—ধুবড়ী হইতে প্রায় ৪০ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্রের অপর বা দক্ষিণ তীরে গারোপাহাড়ের পাদদেশে গোয়ালপাড়া অবস্থিত। আসাম-সুন্দরবন ডেস্প্যাচ স্টীমার পথে ৯ ঘন্টার পথ। পূর্ব্বে এই স্থানেই জেলার সদর ছিল। যাতায়াতের সুবিধার জন্য পরে ধুবড়ীতে জেলার সদর স্থানান্তরিত করা হয়। বর্ত্তমানে গোয়ালপাড়া একটি অপ্রধান স্থানে পরিণত হইয়াছে। ব্রহ্মপুত্র কূলে প্রায় ৪০০ ফুট উচ্চ পাহাড়ের উপর অবস্থিত এই শহরটির দৃশ্য অতি চমৎকার। গোয়ালপাড়া জেলার এলাকাভুক্ত স্থান এক সময়ে রংপুর জেলার অধীন ছিল। গোয়ালপাড়া শহরের বিপরীত দিকে ব্রহ্মপুত্র নদের উত্তর তীরে অবস্থিত যোগীঘোপা একটি দ্রষ্টব্য স্থান। এখানে ব্রহ্মপুত্র তীরে পাহাড়ের গাত্রে কতকগুলি গুহা আছে। প্রবাদ, অতি প্রাচীন কালে এই স্থানে কয়জন যোগী তপস্যা করিতেন। এখানে দুধনাথ শিবের মন্দির নামে একটি প্রাচীন শিবমন্দিরও আছে। মুঘলেরা যখন আসাম আক্রমণ করেন, তখন আহোমগণ যোগীঘোপার গুহাগুলিকে দুর্গরূপে ব্যবহার করিয়া তাঁহাদের আক্রমণ প্রতিহত করিয়াছিলেন। যোগীঘোপায় ইংরেজদের একটি কুঠি ছিল। এখনও চারটি নামহীন পুরাতন সমাধি দৃষ্ট হয়। যোগীঘোপা ধুবড়ী হইতে স্টীমার পথে গোয়ালপাড়ার ঠিক্ আগের স্টেশন। বঙ্গাইগাঁও স্টেশন হইতে যোগীঘোপা ২০ মাইল দক্ষিণে; বরাবর ভালো রাস্তা আছে।

(ছ) গোলকগঞ্জ জংশন—রঙ্গিয়া জংশন—পাণ্ডু।

গোলকগঞ্জ জংশন ছাড়াইয়া পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথের মাঝারি মাপের প্রধান লাইন গোয়ালপাড়া জেলার গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়া পূর্ব্ব মুখে চলিয়া গিয়াছে। জঙ্গল মধ্যে বা জঙ্গলের নিকটে অবস্থিত বাঁশবাড়ী, টিপকাই, সাপট গ্রাম, ফকিরাগ্রাম, কোকরাঝাড় ও বাসুগাঁও স্টেশন হইতে অরণ্য জাত কাষ্ঠাদি চালান যায়। রেলপথ সাপটগ্রামের নিকট সঙ্কোশ, কোকরাঝাড়ের নিকট সরলভাঙ্গা বা গৌরাং ও বাসুগাঁর নিকট চম্পামতী নদী পার হইয়াছে। নদীগুলি ব্রহ্মপুত্রে গিয়া পড়িয়াছে।

ফকিরাগ্রাম—পার্ব্বতীপুর জংশন হইতে ১০৬ মাইল। স্টেশনের ১২ মাইল দক্ষিণে সঙ্কোশ ও গৌরাং নদী যে স্থানে ব্রহ্মপুত্রে মিলিত হইয়াছে তাহার নিকট অবস্থিত বিলাসীপাড়া একটি প্রসিদ্ধ বন্দর। ধুবড়ী হইতে গোয়ালপাড়া প্রভৃতি যাইতে স্টীমার পথে বিলাসীপাড়া একটি স্টীমার স্টেশন। ময়মনসিংহ জেলা হইতে আগত এখানকার জমিদার বংশের প্রসিদ্ধি আছে। বিলাসীপাড়া হইতে ৫ মাইল পশ্চিমে বগড়ীবাড়ীও একটি বাণিজ্য প্রধান স্থান; পর্ব্বতজোয়ার জমিদার বংশের এক শাখার বাস এই স্থানে।

বঙ্গাইগাঁও—পার্ব্বতীপুর জংশন হইতে ১৩০ মাইল। এখানে কমলা লেবুর বাগান আছে এবং নানা স্থানে ইহা চালান যায়। স্টেশন হইতে ১০ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে উত্তর শালমরা একটি বড় গ্রাম ও থানা; এখানকার এণ্ডি রেশমের খ্যাতি আছে। উত্তর শালমারা হইতে ৩ মাইল পূর্ব্ব দিকে অভয়াপুরী গ্রামে সুপ্রসিদ্ধ বিজনি রাজবংশের বাসস্থান। ইহারা কোচরাজবংশের এক শাখা। কোচবিহার স্টেশন দ্রষ্টব্য। এখানকার রাজ প্রাসাদে সাম্রাট্ শের শাহের কনস্তান্তি-নোপলের সৈয়দ অহ্মদ নির্ম্মিত একটি তোপ আছে। উত্তর শালমারা হইতে ১০ মাইল দক্ষিণে যোগীঘোপা; ইহার কথা ধুবড়ী প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে।

বিজনি—পাৰ্ব্বতীপুর জংশন হইতে ১৪০ মাইল। ইহা গোয়ালপাড়া জেলার একটি প্রসিদ্ধ স্থান। সরকারী কাগজপত্রে ইহা বিজনী দুয়ার নামে উল্লিখিত আছে। ভুটানের নীচে গোয়ালপাড়া জেলার উত্তরভাগও দুয়ার নামে অভিহিত হয়। বিজনির সংরক্ষিত বন ১৯৬ বর্গ মাইল ব্যাপিয়া অবস্থিত। এই বনে বাঘ, ভালুক, গণ্ডার প্রভৃতি জন্তু দৃষ্ট হয় এবং শাল, শিশু ও খয়ের গাছ বহু পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। বিজনির আগের স্টেশন চাপরাকাটা ও বিজনির মধ্যে রেল লাইন আই নদী পার হইয়াছে। বিজনি স্টেশনের কিছুদূরে রেল লাইন মনাস নদী পার হইয়াছে। এই নদীর পূর্ব্বপার হইতে কামরূপ জেলার তথা প্রকৃত আসামের আরম্ভ। কামরূপ দরং প্রভৃতি জেলায় বাঙালীদের সংখ্যা নগণ্য হইলেও বাঙ্গালী ভ্রমণকারীদের সুবিধার জন্য এ অঞ্চলের কয়েকটি প্রধান প্রধান স্থানের কথা নিম্নে বলা হইল।

সরভোগ—পাৰ্ব্বতীপুর জংশন হইতে ১৫১ মাইল। ইহা কামরূপ জেলার অন্তগত একটি বাণিজ্য কেন্দ্র ; এই স্থান হইতে বহু পরিমাণে পাট চালান যায়। এই স্টেশনে ডাকগাড়ী প্রভৃতি সকল গাড়ীই থামে। স্টেশনের পরেই রেল লাইন মরামনাস বা বেকী নদী পার হইয়াছে।

বড়পেটা রোড—পাৰ্ব্বতীপুর জংশন হইতে ১৩৮ মাইল দূর। স্টেশন হইতে ১৩ মাইল দক্ষিণে বড়পেটা শহর পর্য্যন্ত রেলের সহিত সংশ্লিষ্ট একটি মোটর বাস সর্ভিস আছে। বড়পেটা কামরূপ জেলার একটি মহকুমা। ইহা আসাম দেশীয় মহাপুরুষিয়া নামক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের একটি প্রধান কেন্দ্র। শঙ্করদেব ও তৎশিষ্য মাধবদেব এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। ইঁহারা শ্রীচৈতন্য দেবের প্রায় সমসাময়িক। ১৪৪৯ খৃষ্টাব্দে এক অসমীয়া কায়স্থবংশে শঙ্করদেব জন্মগ্রহণ করেন। তৎকালীন কামরূপে তান্ত্রিক অভিচারের বীভৎসতা নিবারণের জন্য তিনি বৈষ্ণবমতের প্রচার করেন। শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থোক্ত বিশুদ্ধ ভক্তি সাধন ও নাম সংকীর্ত্তনই এই ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ। ইঁহাদের দেবালয়গুলিতে সাধারণতঃ কোন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত থাকে না। এই স্থানে সকলে সমবেত হইয়া ভগবানের নাম গান করেন। এই দেবায়তনগুলি নামঘর কীর্ত্তনঘর বা সত্র নামে পরিচিত। শঙ্করদেব কায়স্থ ছিলেন বলিয়া প্রথমতঃ ব্রাহ্মণগণ তাঁহার প্রবর্ত্তিত নবধর্ম্মমত গ্রহণ করিতে চাহেন নাই। কিন্তু তাঁহার অপূর্ব্ব ভগবদ্ভক্তি ও অলৌকিক শক্তির পরিচয় পাইয়া পরে অনেকে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। অন্যান্য মহাপুরুষগণের ন্যায় শঙ্করদেবের জীবন চরিতেও বহু অলৌকিক ঘটনার বিবৃতি আছে। অসমীয়াগণ তাঁহাকে অবতার স্বরূপ জ্ঞান করেন। মহাপুরুষ শঙ্করদেব কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত বলিয়া এই সম্প্রদায় মহাপুরুষিয়া নামে পরিচিত। অসমীয়া ভাষাও শঙ্করদেবের নিকট বিশেষ ভাবে ঋণী। বঙ্গদেশীয় বৈষ্ণব ভক্তগণের আবির্ভাব ও তিরোভাব তিথির ন্যায় কামরূপ দেশীয় বৈষ্ণবগণও স্ব স্ব সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের আবির্ভাব ও তিরোভাব উপলক্ষে সত্র সমূহে কীর্ত্তন মহোৎসবের আয়োজন করিয়া থাকেন। এই কীর্ত্তন গানগুলি অনেকটা বাংলা দেশের কীর্ত্তনের মত। বড়পেটা ধামের সত্রে প্রতি মাসেই কোন না কোন মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বড়পেটার প্রধান সত্রে একটি কীর্ত্তন ঘর ও তাহার পার্শ্বে ভোজঘরে কোলিয়া ঠাকুর ও দোল-গোবিন্দ নামে দুইটি মূর্ত্তি ও শঙ্করদেব ও মাধবদেবের পুঁথি, চুল ও পদচিহ্ন সযত্নে রক্ষিত আছে। শঙ্করদেব ও মাধব দেবের বাৎসরিক শ্রাদ্ধ উৎসব আসামের সর্ব্ব প্রধান উৎসব গুলির অন্যতম। ইহা ছাড়া আসামের নিজস্ব " বিহু " উৎসবের কথা সকলেই শুনিয়াছেন। বড়পেটার সোনার তারের অলঙ্কার গুলির শিল্প কৌশল সত্যই অতি সুন্দর।

বড়পেটার প্রায় আট মাইল উত্তরে বড়নগরে কোচরাজ বলিনারায়ণ ও পরীক্ষিতের রাজধানী ছিল। উহার ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমানে জঙ্গলাবৃত হইয়া রহিয়াছে।

নলবাড়ী—পাৰ্ব্বতীপুর জংশন হইতে ১৮৬ মাইল দূর। কামরূপ জেলার ইহা একটি ক্ষুদ্র শহর ও বাণিজ্য কেন্দ্র। স্টেশনের কিছু পরে রেল লাইন পাগলাদিয়া নদী পার হইয়াছে।

রঙ্গিয়া জংশন—পাৰ্ব্বতীপুর জংশন হইতে ১৯৭ মাইল দূর। ইহা কামরূপ জেলার একটি প্রসিদ্ধ বাণিজ্য কেন্দ্র। রঙ্গিয়ার কিছু পূর্ব্বদিকে বড়নদী কামরূপ ও দরং জেলার সীমা রক্ষা করিয়া দক্ষিণে যাইয়া ব্রহ্মপুত্রে পড়িয়াছে। রঙ্গিয়া হইতে দুই মাইল উত্তরে চেতনা গ্রামের নিকট রাজা অরিমত্তের রাজধানী বলিয়া কথিত বৈদারগড় নামে একটি সুবৃহৎ গড়ের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। গড়ের প্রতিদিকে প্রায় ৪ মাইল লম্বা করিয়া বাঁধ দিয়া ঘেরা। রঙ্গিয়া হইতে ১৭ মাইল উত্তরে ভুটান সীমান্তের নিকট দরঙ্গা এবং তথা হইতে ৮ মাইল পশ্চিমে সুবলখাতা নামক স্থানদ্বয়ে প্রতি বৎসর শীতকালে প্রায় একমাস ব্যাপী একটি মেলা বসিয়া থাকে। ভুটিয়ারা মোম, গালা, লঙ্কা, কম্বল, টাট্টু ঘোড়া, ছাগল, ভুটিয়া কুকুর প্রভৃতি বিক্রয় করে ও সুতী ও রেশমীর কাপড়, কাঁসার বাসন প্রভৃতি কিনিয়া লইয়া যায়। দরঙ্গার ৬ মাইল উত্তরে একেবারে ভুটান সীমান্তে, কামরূপ জেলার অন্তর্গত দেওয়ানগিরি নামক একটি ভুটিয়া অধ্যুষিত গ্রাম আছে।

রঙ্গিয়া জংশন হইতে একটি শাখা লাইন পূর্ব্বদিকে দরং জেলার মধ্য দিয়া ৭৭ মাইল দূরবর্ত্তী উত্তর রঙ্গপাড়া জংশন পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই শাখায় টাংলা, হরিশিঙ্গা, উদলগুড়ি, মাজবাট, ঢেকিয়াজুলি রোড, বেলসিরি উল্লেখযোগ্য স্টেশন এবং ইহাদের নিকটে বহু চা বাগান আছে। টাংলা হইতে প্রায় ১৭ মাইল দক্ষিণে মঙ্গলদাই দরং জেলার একটি মহকুমা। মঙ্গলদাইয়ের নিকটে ব্রহ্মপুত্রের উপর খরুপেটিয়া ঘাট একটি বড় বন্দর। ঢেকিয়াজুলি রোড হইতে প্রায় ১১ মাইল দক্ষিণে ঢেকিয়াজুলি একটি ক্ষুদ্র নগরী। উত্তর রঙ্গপাড়া তেজপুর-বালিপাড়া নামক রেলপথের সহিত একটি জংশন স্টেশন। দরং জেলার প্রধান শহর তেজপুর উত্তর রঙ্গপাড়া হইতে ১৭ মাইল দূর। ব্রহ্মপত্র নদের উপর অবস্থিত তেজপুর শহরটির স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য অতি মনোরম। তেজপুরের প্রাচীন নাম শোণিতপুর। পুরাণ অনুসারে এই স্থানে অসুররাজ বাণের রাজধানী ছিল। অসমীয় ভাষায় তেজ শব্দের অর্থ শোণিত; সুতরাং তেজপুরই যে প্রাচীন শোণিতপুর তাহা একরূপ নিঃসংশয়ে বলা যায়। শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধ ও বাণরাজের কন্যা ঊষা পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইলে ইহা লইয়া তেজপুরের পশ্চিম প্রান্তরে বাণ রাজা ও শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে যুদ্ধ হয় বলিয়া কথিত। ইহার পর তাঁহাদের বিবাহ হয়। দিনাজপুর স্টেশন দ্রষ্টব্য। তেজপুরের অনতিদূরে ঊষা পাহাড় বাণরাজ দুহিতা ঊষার স্মৃতি বহন করিতেছে। তেজপুরের পূর্ব্ব প্রান্তে বামুনী পাহাড়ে কতক গুলি সুন্দর ও প্রাচীন পাথরের মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ মনে করেন এই স্থানে পূর্ব্বে কোন রাজার রাজধানী ছিল।

আমিনগাঁও—পাৰ্ব্বতীপুর জংশন হইতে ২১৯ মাইল। চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যে ব্রহ্মপুত্র নদের উত্তর কূলে অবস্থিত এই স্থানটির প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি সুন্দর। আমিনগাঁওএর অপর পারে পাণ্ডু স্টেশন পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম-বাংলা রেলপথের জংশন রূপে গণ্য হয়। পূর্ব্ব-বঙ্গ রেলপথের খেয়া জাহাজে আমিনগাঁও ও পাণ্ডুর মধ্যে যাত্রী ও মালগাড়ী পারাপার করিয়া থাকে। এই স্থানে একটি রেলওয়ে সেতু নির্ম্মাণের পরিকল্পনা আছে।

অশ্বক্লান্তা—আমিনগাঁও হইতে ৩ মাইল উত্তরে উত্তর গৌহাটি একটি বড় গ্রাম। ইহার দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্রের অপর পারে সুপ্রসিদ্ধ গৌহাটি শহর অবস্থিত। উত্তর গোহাটির অশ্বক্রান্তা বা অশ্বক্রান্ত তীর্থের বিশেষ প্রসিদ্ধি আছে। উত্তর গৌহাটি সুপ্রসিদ্ধ চিলারায়ের পৌত্র কোচহাজোর রাজা

পরীক্ষিৎ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বলিয়া কথিত; তাঁহার নগর রক্ষার গড় প্রভৃতি এখনও বহুদূর পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

এখানে একটি উচচ পাহাড়ের উপর বহু সোপান পার হইয়া অনন্ত শয্যাশায়ী বিষ্ণুর মূর্ত্তি ও কূর্ম্মরূপী জনার্দ্দনের মন্দির আছে। পাহাড়ের পাদদেশে অশ্বক্রান্ত নামে একটি কুণ্ড আছে। ইহার অপর নাম অশ্বক্রান্ত গয়া। যাত্রীদের মধ্যে অনেকে এখানে স্নান, তর্পণ ও পরলোকগত পিতৃপুরুষগণের উদ্দেশে শ্রাদ্ধাদি করিয়া থাকেন। যোগিনীতন্ত্রে ও কালিকাপুরাণে কামাখ্যার কামপীঠের ন্যায় অশ্বক্রান্ত তীর্থের মাহাত্ম্য অতি বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত আছে। যোগিনীতন্ত্রের মতে, অন্যান্য তীর্থে সহস্র বর্ষ মন্ত্র জপ করিয়া যে ফল পাওয়া যায় অশ্বক্রান্ত তীর্থে মুহূর্ত্তমাত্র মন্ত্র জপে তাহার সমান ফল হয়। এই স্থান মন্ত্রসিদ্ধির একটি বিশিষ্ট সাধন ক্ষেত্র বলিয়া বিবেচিত হয়।

অশ্বক্লান্তা নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে জনশ্রুতি যে নরকাসুরের, মতান্তরে শোণিতপুররাজ বাণাসুরের সহিত যুদ্ধার্থী শ্রীকৃষ্ণের অশ্ব এই স্থানে বিশ্রাম করিয়া ক্লান্তি দূর করিয়াছিল বলিয়া ইহার নাম অশ্বক্লান্তা হইয়াছে। অন্যমতে রুক্মিণীকে হরণ করিয়া পলায়ন করিবার সময়ে শ্রীকৃষ্ণের ক্লান্ত অশ্ব এই স্থানে বিশ্রাম করিয়াছিল। এখানে পর্ব্বত গাত্রে একটি অশ্বের খুর অঙ্কিত আছে। লোকের বিশ্বাস যে উহা শ্রীকৃষ্ণের অশ্বের পদচিহ্ন।

হাজো—যোগিনীতন্ত্রে কামরূপমণ্ডলের বহু তীর্থের মধ্যে কামাখ্যা, উমানন্দ ও মাধব বা হয়গ্রীব মাধব এই তিনটি তীথের কথাই বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। মাধব বা হয়গ্রীব মাধবের মন্দির হাজো গ্রামে অবস্থিত। আমিনগাঁও হইতে বর্ষাকাল ভিন্ন অন্য সময়ে এই স্থান পয্যন্ত মোটরবাস পাওয়া যায়। আমিনগাঁও হইতে হাজোর দূরত্ব পশ্চিমে প্রায় ১২ মাইল। হাজো একটি প্রাচীন ও বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। এই গ্রামে নির্ম্মিত কাঁসা ও পিতলের দ্রব্যাদি ও এণ্ডির কাপড় সমগ্র আসামে বিখ্যাত।

একটি উচচ টিলার উপর মাধবের মন্দির অবস্থিত। প্রায় একশত বিস্তৃত সোপান অতিক্রম করিয়া মন্দিরের দ্বারদেশে পৌঁছিতে হয়। হাজোর মন্দিরটি আহোম স্থাপত্যের অতি সুন্দর নিদর্শন। ভূমি হইতে মন্দিরের চূড়া প্রায় ১৫০ ফুট উচচ। মন্দিরের গাত্রে বিষ্ণুর দশাবতার ও ইন্দ্র, যম, লক্ষ্মী প্রভৃতি বহু দেবদেবীর মূর্ত্তি উৎকীণ আছে। মন্দিরের পিছনে ভোগমণ্ডপ, সম্মুখে নাটমন্দির ও নাটমন্দিরের পার্শ্বে দোলমঞ্চ অবস্থিত। নাটমন্দির ও গর্ভমন্দিরের মধ্যস্থলে একটি প্রকাণ্ড হোমকুণ্ড আছে। মন্দিরের দ্বারদেশে একটি শিলালিপি আছে। উহা হইতে জানা যায় যে আহোমরাজ রুদ্রসিংহ এই মন্দিরের সংস্কার করিয়াছিলেন। মাধবের মূর্ত্তিটি দেখিতে ঠিক্ বুদ্ধমূর্ত্তির মত। অনেকে অনুমান করেন যে আসলে ইহা একটি বুদ্ধমূর্ত্তি। এখনও প্রতিবৎসর শীতকালে ভুটান হইতে বহু বৌদ্ধ এই মন্দিরে পূজা দিতে আসেন। দোলমঞ্চের পার্শ্বে বা নিম্নে একটি প্রাচীন নদীর খাত দেখা যায়। ইহা ব্রহ্মপুত্রনদের পরিত্যক্ত খাত বলিয়া অনেকের অভিমত। মন্দিরে উঠিবার সোপান শ্রেণীর সম্মুখে একটি বড় পুষ্করিণী আছে, ইহার জল বিশেষ পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হয়।

পুরাণে বর্ণিত আছে যে বেদ অপহরণকারী হয়শিরা বা হয়গ্রীব নামক দৈত্যকে বিনাশ করিবার জন্য বিষ্ণু হয়গ্রীব অবতার হইয়াছিলেন। এখানে কিন্তু মাধব অশ্ববদন নহেন, প্রস্তর নির্ম্মিত মূর্ত্তিটির মুখ অতি প্রশান্ত ও সুন্দর, ঠিক ধ্যানী বুদ্ধমূর্ত্তির মত।
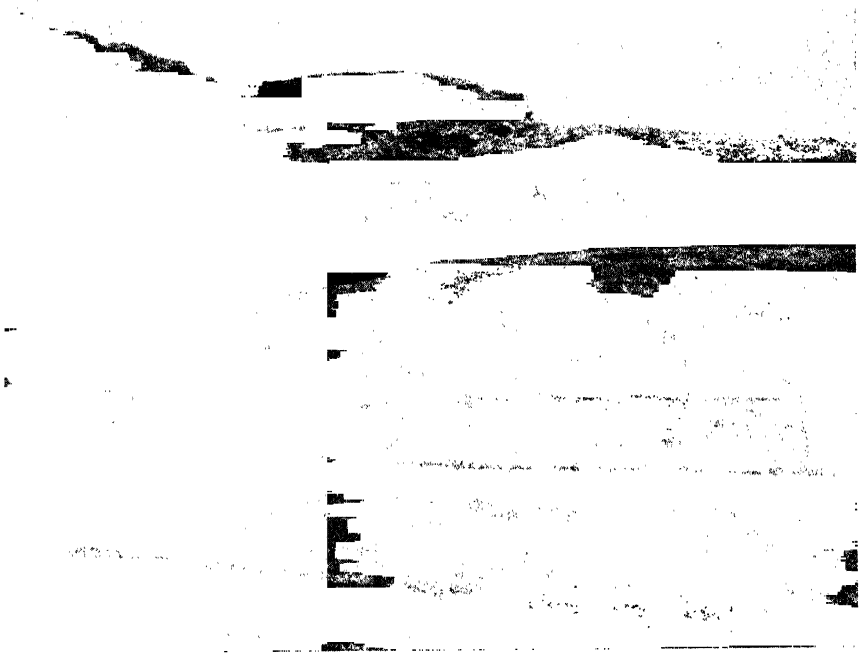
গোবিন্দ ভিটার কারুকার্য্য, মহাস্থানগড় (পৃষ্ঠা ১৩)
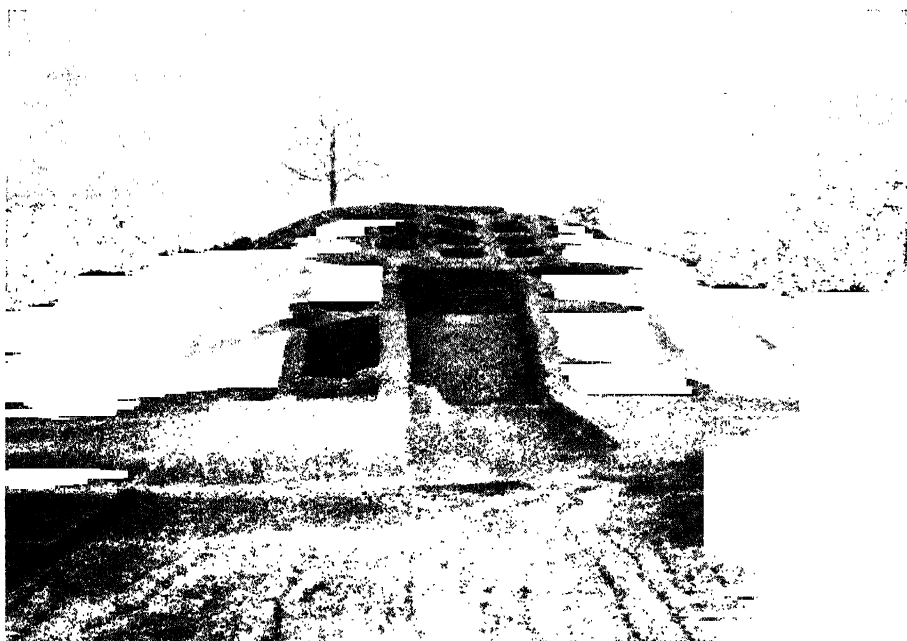
গোকুলের মেড়, বগুড়া (পৃষ্ঠা ১৪)

ভবানী পাঠক কর্ত্তৃক পূজিত কালীমূর্ত্তি, দেবীপুর, রংপুর (পৃষ্ঠা ১৮)
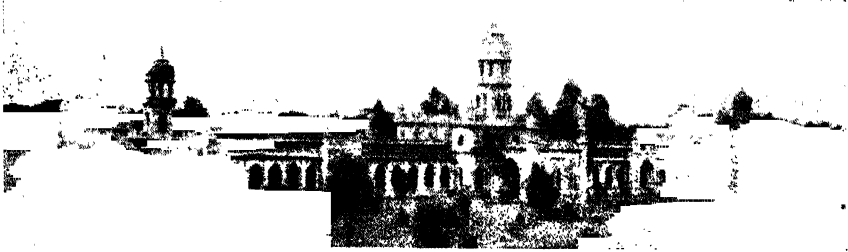
রংপুর কারমাইকেল কলেজ (পৃষ্ঠা ১৯)
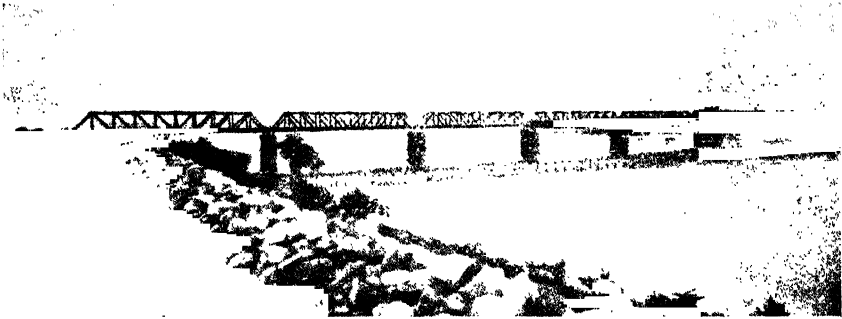
তিস্তার সেতু (পৃষ্ঠা ২০)

হরিশ্চন্দ্র রাজার পাট, রংপুর (পৃষ্ঠা ২১)
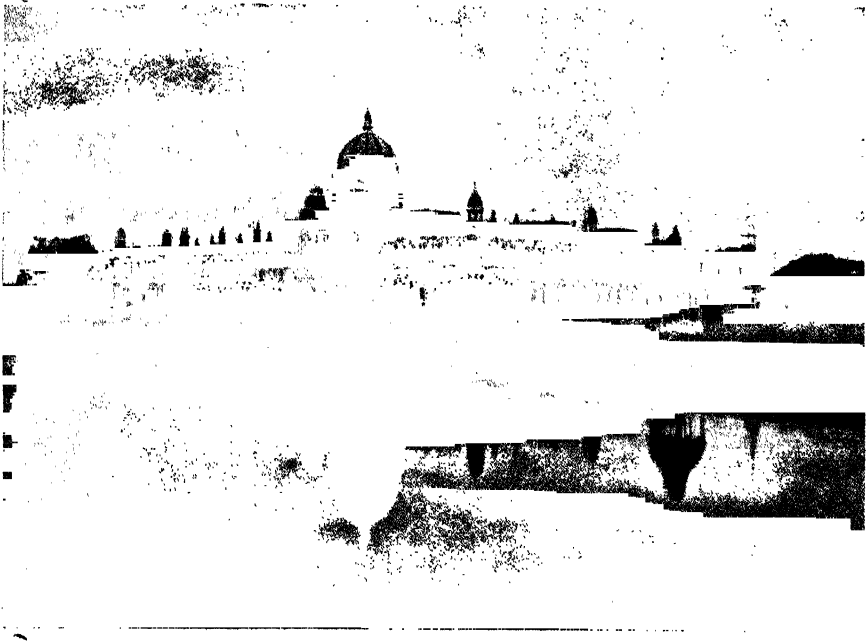
কোচবিহার রাজপ্রাসাদ (পৃষ্ঠা ২৬)
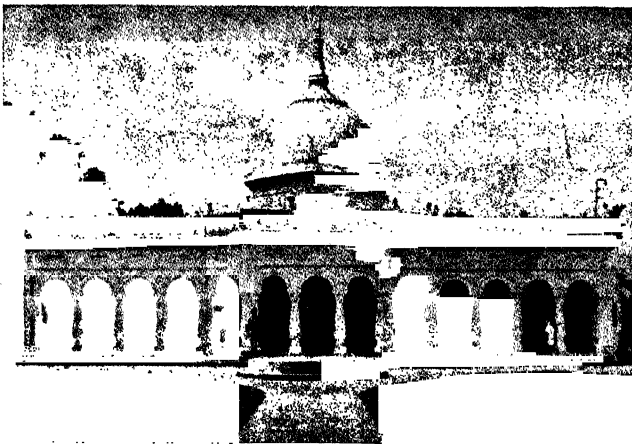
মদন মোহন মন্দির, কোচবিহার (পৃষ্ঠা ২৬)

মাধব মন্দিরের নিকটে একটি ছোট পাহাড়ে কেদার বা কামেশ্বর মহাদেবের মন্দির অবস্থিত। অদূরবর্ত্তী দুইটি পাহাড়ের নাম বেহুলা-লখীন্দর ও আর দুইটি পাহাড় ধুনি-মুনি নামে পরিচিত। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস, যে বেহুলার ঘটনা এতদঞ্চলেই ঘটিয়াছিল। ধুবড়ীর নেতা ধোপানীর পাটের কথা এ প্রসঙ্গে স্মর্ত্তব্য।

হাজোর ডাক্‌বাংলার পিছনে মুকামারা নামে একটি ছোট পাহাড়ের উপর মুসলমানদের "পোয়া-মক্কা" নামে একটি প্রাচীন মসজিদের ধ্বংসাবশেষ অবস্থিত। প্রবাদ, এখানে আসিলে নাকি হজের সিকি ফল পাওয়া যায়। এই স্থানে বহু মুসলমান যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে।

হাজো নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ যে "কোচ-হাজো" নামে একটি স্বতন্ত্র রাজ্যের উল্লেখ করিয়াছেন, সে কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। "কোচবিহার" দ্রষ্টব্য। হাজো নামক জাতি হইতেই গ্রামের নাম হাজো হইয়াছে, ইহাই অনেকের অভিমত। আবার কেহ কেহ বলেন যে এখানে পোয়া-মক্কায় অনেকে হজ করিতে আসেন বলিয়াই ইহার নাম হজো বা হাজো হইয়াছে। এরূপ একটি কাহিনীও প্রচলিত আছে, যে অতি পূর্ব্বকালে এই স্থানে একজন যোগীপুরুষ অতি কঠোর তপস্যা করিতেছিলেন। কামাখ্যার ডাকিনীগণের ছলনায় তাঁহার যোগভঙ্গ হইলে তিনি নাকি "হা যোগ! হা যোগ!" এই বলিতে বলিতে এই স্থান ত্যাগ করেন। সেই হইতে গ্রামের নাম হাযোগ বা সংক্ষেপে হাজো হইয়াছে।

জনশ্রুতি, যে এক সময়ে কামাখ্যার ডাকিনীগণ কামাখ্যাধামে অত্যন্ত উৎপাত আরম্ভ করিলে ভৈরব উমানন্দ তাহাদিগকে সেই স্থান হইতে দূর করিয়া দেন এবং সেই বিতাড়িতা ডাকিনীগণ এখানে আসিয়াই বসবাস করে।

হাজো হইতে ৬ মাইল দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্র কূলে হাতিমুড়া নামে একটি পাহাড় স্টীমারে বহুদূর হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। পাহাড়টিকে দেখিলে মনে হয় যেন বিরাটকায় হাতী হাটু গাড়িয়া বসিয়া আছে, এইজন্য ইহার নাম হইয়াছে হাতিমুড়া।

পাণ্ডু—আমিনগাওএর ঠিক বিপরীত দিকে ব্রহ্মপুত্র নদের দক্ষিণ তীরে পাণ্ডু স্টেশন অবস্থিত। অনেকে বলেন যে এই স্থনের প্রাচীন নাম পাণ্ডুনগর; বনবাসকালে পাণ্ডুপুত্রগণ নাকি এই স্থানে কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। পাণ্ডবেশ্বর বা পাণ্ডুনাথ নামে এখানে এক শিবের মন্দির আছে। মন্দিরটি একটি পাহাড়ের সানুদেশে অবস্থিত। কাহারও কাহারও মতে এই স্থানেই বিষ্ণুর সহিত মধুকৈটভের বাহুযুদ্ধ হইয়াছিল। প্রবাদ, এক সময়ে যুদ্ধে ক্লান্ত হইয়া বিষ্ণু শিলার আকার ধারণ করিয়াছিলেন। পাণ্ডবেশ্বর শিবের মন্দিরের নিকটবর্ত্তী এক খণ্ড প্রস্তর বিষ্ণুশিলা রূপে পূজিত হয়। কয়েক বৎসর হইল মুক্তানন্দ পরমহংস নামক একজন সাধুপুরুষের কয়েকজন শিষ্য এই স্থানে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ইহাও এখানকার একটি দ্রষ্টব্য বস্তু।

পাণ্ডু স্টেশন হইতে আসাম-বাংলা রেলপথ গোহাটি, চাপারমুখ জংশন, লামডিং জংশন, প্রভৃতি হইয়া তিনসুকিয়া জংশন পর্য্যন্ত গিয়াছে। চাপারমুখ জংশন হইতে একটি শাখা দিয়া নওগাঁ যাওয়া যায়। লামডিং জংশন হইতে একটি লাইন দক্ষিণে বদরপুর জংশন হইয়া চট্টগ্রাম চলিয়া গিয়াছে। তিনসুকিয়া জংশন হইতে দিব্রু-সদিয়া রেলপথে একদিকে দিব্রুগড় ও অপর দিকে আসামের তৈল

ও কয়লার খনির অঞ্চলে ডিগ্‌বয়, মারঘারিটা, লিডো প্রভৃতি স্থানে যাইতে হয়। অম্বুবাচী মেলার সময়ে কামাখ্যা দর্শনেচ্ছু যাত্রীদের সুবিধার জন্য আসাম-বাংলা রেলপথ পাণ্ডু স্টেশন হইতে দুই মাইল দূরে সাময়িক ভাবে কামাখ্যা নামে রেল স্টেশন খুলিয়া থাকেন।

কামাখ্যা—কামরূপ মণ্ডলের প্রধান তীর্থ কামাখ্যা আমিনগাঁও বা পাণ্ডু হইতে মাত্র দুই মাইল দূরে অবস্থিত। ইহা ভারত বিখ্যাত একটি পীঠ স্থান। পাণ্ডু হইতে পদব্রজে বা মোটরবাসে এই পথটুকু যাওয়া যায়। কামাখ্যা-তীর্থ নীলাচল নামক একটি উচচ পাহাড়ের উপর অবস্থিত। পাহাড়ে উঠিবার তিনটি পথের মধ্যে কামাখ্যা রেল স্টেশনের দিক হইতে যে পথটি গিয়াছে উহাই শ্রেষ্ঠ। আমিনগাঁও হইতে যাঁহারা নৌকা বা স্টীমলঞ্চ যোগে কামাখ্যায় যাইতে চাহেন, তাঁহাদের পক্ষে ব্রহ্মপুত্র তীর হইতে যে পথটি উঠিয়াছে উহাই সুবিধা। ইহা দ্বারবঙ্গের পরলোকগত মহারাজা পবনেশ্বর প্রসাদ সিংহ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। সচরাচর যাত্রিগণ কামাখ্যা-স্টেশনের দিকের পথটিই ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই পথ দিয়া উপরের দিকে কিছুদূর অগ্রসর হইলে পথের দুই দিকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কতকগুলি প্রস্তরখণ্ড দৃষ্ট হয়। এই প্রস্তরখণ্ডগুলি কামাখ্যা দেবীর আদি মন্দিরের ভগ্নাবশেষ বলিয়া কথিত। পর্ব্বত শৃঙ্গস্থ দেবীমন্দিরে পৌঁছিবার পূর্ব্বে পথের পার্শ্বে একস্থানে পর্ব্বতগাত্রে খোদিত দুইটি বিশাল মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এই মূর্ত্তিদ্বয় কামাখ্যার দ্বারপাল তাল ও বেতাল নামে পরিচিত।

কিংবদন্তী যে কামাখ্যার আদি মন্দির কামদেব কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। হরকোপানলে ভস্মীভূত কামদেব এই স্থানে পূর্ব্বরূপ বা শরীর পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া এই প্রদেশ কামরূপ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। আবার কাহারও মতে প্রাগজ্যোতিষপুর বা কামরূপের রাজা নরকাসুর কামাখ্যার মূল মন্দিরের নির্ম্মাতা। পুরাণে বর্ণিত আছে যে নরকাসুর বরাহরূপী বিষ্ণুর পুত্র। তিনি অত্যন্ত শক্তিশালী ও অত্যাচারী ছিলেন। শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, যে নরকাসুর ষোল হাজার কুমারী কন্যাকে স্বীয় অন্তঃপুরে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। পরে শ্রীকৃষ্ণ নরকাসুরকে যুদ্ধে নিহত করিয়া এই কুমারী গণের উদ্ধার সাধন ও স্বয়ং তাঁহাদিগকে বিবাহ করেন। জনশ্রুতি, যে নরকাসুর নীলাচলের উপরিস্থিত কামপীঠের রক্ষক ছিলেন এবং কামাখ্যা দেবীর সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তিনি তাঁহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হন। কামাখ্যা দেবী তাঁহাকে বলেন যে নরকাসুর যদি একরাত্রির মধ্যে তাঁহার জন্য একটি মন্দির ও পুকুর এবং পর্ব্বত শৃঙ্গ পর্য্যন্ত একটি রাস্তা নির্ম্মাণ করিতে পারেন, তবেই তিনি তাঁহাকে বিবাহ করিবেন। নরকাসুর একরাত্রির মধ্যেই মন্দির নির্ম্মাণ ও পুষ্করিণী খনন করেন, কিন্তু রাস্তাটি প্রায় শেষ হয় হয়, এমন সময়ে কামাখ্যা দেবীর মায়ায় একটি মোরগ ডাকিয়া উঠে। ইহাতে কামাখ্যা দেবী বলেন যে কুক্কুট ডাকিলেই রাত্রি প্রভাত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। সুতরাং নরক তাঁহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে না পারায় কামাখ্যা দেবীকে বিবাহ করিবার দাবী আর করিতে পারেন না। ইহাতে নরক সেই কুক্কুটটির উপর ক্রুদ্ধ হইয়া উহাকে কাটিয়া ফেলেন। যে স্থানে এই ঘটনাটি ঘটে উহা কুকড়াকাটা নামে পরিচিত। এই গ্রামটি গৌহাটির নয় মাইল উত্তরে অবস্থিত। কামাখ্যার রেল স্টেশনের নিকট হইতে মন্দির পর্য্যন্ত রাস্তাটি নরকাসুরের দ্বারা নির্ম্মিত বলিয়া কথিত হয়।

পৌরাণিক যুগের পর কামাখ্যার মহাপীঠ বহুদিন লুপ্ত অবস্থায় ছিল। কোচরাজ বিশ্বসিংহ এই মহাপীঠের অবিষ্কার ও পুনঃ প্রকাশ করেন। কথিত আছে, রাজা বিশ্বসিংহ প্রতিপক্ষীয় পার্ব্বত্য জাতিকে দমন করিবার জন্য সসৈন্যে গৌহাটিতে গিয়া উপস্থিত হন। একদা রাজা বিশ্ব-

সিংহ স্বীয় ভ্রাতা শিবসিংহের সহিত নীলাচলের উপরিভাগে গমন করেন। সেখানে কাহারও সাক্ষাৎ না পাইয়া দুই ভ্রাতা ফিরিয়া আসিতেছেন, এমন সময়ে একটি বটবৃক্ষতলে একটি মাটির ঢিবির পার্শ্বে একজন বৃদ্ধাকে দেখিতে পাইলেন। ভ্রাতৃদ্বয় অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত্ত হইয়াছিলেন। সেই মৃত্তিকার ঢিবির মধ্য হইতে জলধারা নির্গত হইতেছিল। বৃদ্ধা সেই জল দ্বারা তাঁহাদের পিপাসার নিবৃত্তি করাইলেন। বৃদ্ধার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া রাজা বুঝিতে পারিলেন যে ইহা নিশ্চয়ই কোন শক্তিপীঠ। তিনি সেখানে মানত করিয়া আসিলেন যে যদি দেবীর দয়ায় তাঁহার রাজ্য নিষ্কণ্টক হয় তবে তিনি সোণার মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিবেন। ইহার অত্যল্পকাল পরে বিশ্বসিংহ রাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠ হন। তাঁহার পণ্ডিতগণ শাস্ত্রালোচনার দ্বারা এই মহাপীঠকে কামপীঠ বলিয়া নির্ণয় করেন। মৃত্তিকা খনন করিয়া বিশ্বসিংহ মহামুদ্রা পীঠ ও প্রাচীন মন্দিরের অধোভাগ আবিষ্কার করেন এবং মন্দিরের পুনঃ নির্ম্মাণ করিয়া সোণার পরিবর্ত্তে প্রতি ইষ্টকখণ্ডে এক রতি করিয়া সোণা দিয়াছিলেন। প্রবাদ যে কামাখ্যা দেবীর পীঠের সম্মুখে একজন ঢাকী ঢাক বাজাইত এবং তাহা শুনিয়া দেবী কামাখ্যা ভাবাবেশে বিবস্ত্রা হইয়া ঢাকের বাদ্যের তালে তালে নৃত্য করিতেন। ঢাকীর মুখে এই কথা শুনিয়া রাজা বিশ্বসিংহ একদিন এই নৃত্য দেখিয়া ফেলেন; ইহাতে অত্যন্ত লজ্জিতা হইয়া দেবি ক্রোধভরে হাতের দ্বারা ঢাকীর মাথা কাটিয়া ফেলেন এবং বিশ্বসিংহকে অভিসম্পাত করেন যে তাঁহার বংশধর কেহ কামপীঠ দর্শন করিলে বংশ বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। এই কারণে কোচবিহারের রাজবংশীয়গণ নাকি কামাখ্যা দর্শন করেন না। কথিত আছে, বহু দেবমন্দির ভগ্নকারী কালাপাহাড় কামাখ্যা দেবীর প্রাচীন মন্দির ভগ্ন করেন। ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে কোচবিহারের রাজভ্রাতা ও সেনাপতি শুক্লধ্বজ বা চিলা রায় বহু অর্থ ব্যয়ে বার বৎসর কাল ধরিয়া কামাখ্যা দেবীর মন্দির পুনরায় নির্ম্মাণ করেন। চিলা রায়ের কামরূপ জয়ের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। (কোচবিহার স্টেশন দ্রষ্টব্য)।

বর্ত্তমান নাটমন্দিরে যে শিলালিপি আছে তাহাতে লেখা আছে নৃপতি মল্লদেব (নরনারায়ণ) যিনি দয়াগুণে অতুলনীয়, ধনুর্ব্বিদ্যায় যিনি অর্জ্জুনের তুল্য, দানে যিনি কর্ণের সমান ও দধীচির ন্যায় মহৎ, যিনি সকল গুণের সাগর, সকল শাস্ত্রে পারগ, যাঁহার চরিত্র অসাধারণ, রূপে যিনি কামদেবের তুল্য,—সেই মল্লদেব কামাখ্যা দেবীর একজন সেবক। তদীয় ভ্রাতা শুক্লদেব (শুক্লধ্বজ) ১৪৮৭ শকাব্দে নীলাচলে দুর্গা দেবীর মন্দির নির্ম্মাণ করেন।

আসামের অনেক মন্দিরের মত কামাখ্যা মন্দিরের উপরিভাগ উল্টানো ধামার মত। সম্মুখস্থ নাটমন্দিরের ছাদে এইরূপ পাঁচটি চূড়া আছে। তাহার পরেই ভোগ মণ্ডপের ছাদ দেখিতে ঠিক চালাঘরের মত। মন্দিরের গাত্রে অষ্টাদশ ভৈরব ও চৌষট্টি যোগিনীর মূর্ত্তি উৎকীর্ণ আছে। মন্দিরের বহির্ভাগে কোচরাজ নরনারায়ণ ও তাঁহার ভ্রাতা শুক্লধ্বজের প্রস্তরখোদিত প্রতিমূর্ত্তি অবস্থিত। প্রাচীন মন্দিরের প্রস্তরময় ভিত্তির উপর মন্দিরটি নির্ম্মিত। কয়েকটি সিঁড়ি বাহিয়া নীচে গর্ভমন্দিরের মধ্যে কামপীঠ বা মহামুদ্রা দর্শন করিতে হয়। এখানে দেবীর কোন প্রতিমূর্ত্তি নাই, একখণ্ড দ্বিধাবিভক্ত শিলাপট্টই কামপীঠের প্রতীক। যাত্রিগণ প্রদীপের ক্ষীণ আলোকের সাহায্যে দেবীর দর্শন, স্পর্শন ও অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। কামপীঠের নিকটে অনেকগুলি অষ্টধাতু নির্ম্মিত দেবদেবীর মূর্ত্তি আছে। মন্দিরের পার্শ্বেই সৌভাগ্যকুণ্ড নামক একটি পুষ্করিণী আছে। ইহা ইন্দ্রাদিদেবগণের দ্বারা খনিত ও সর্ব্ব তীর্থের জলের দ্বারা পূর্ণ বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। লোকের বিশ্বাস যে ইহার জলে স্নান করিলে হতভাগ্যেরও ভাগ্য ফিরিয়া যায়। যাত্রীরা এখানে জলস্পর্শ স্নান, তর্পণ ও পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধাদি করিয়া থাকেন। নাটমন্দিরের সম্মুখে অথচ এক পার্শ্বে পশু বলির স্থান। পূর্ব্বে এখানে বন্য বরাহও বলি হইত। এখন ছাগ ও মেষ বলি হয়।

যোগিনী তন্ত্রে ও কালিকাপুরাণে কামরূপের মাহাত্ম্য অতি বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে এবং কামরূপ মণ্ডলে যে বহু মহাতীর্থ বিরাজিত তাহারও উল্লেখ আছে। এই সকল তীর্থের মধ্যে নীলাচলের উপর অবস্থিত কামপীঠের মাহাত্ম্যই আবার সবচেয়ে বেশী। কালিকা পুরাণে আছে,

"তীর্থান্তরে গবাং কোটিং বিধিবদ্ যঃ প্রযচ্ছতি।
একাহঞ্চ বসেদত্র তয়োস্তুল্যং ফলং লভেৎ॥"

অথাৎ, অন্যতীর্থে কোটি গো-দান করিলে যে ফল হয়, এখানে একদিন মাত্র বাস করিলে তাহার সমান ফল হয়।

কামাখ্যা মন্দিরের নিকটে ছিন্নমস্তা দেবীর মন্দির, নবগ্রহের মন্দির প্রভৃতি আরও অনেকগুলি ছোট ছোট মন্দির আছে। কামাখ্যা দেবীর মন্দির হইতে প্রায় এক মাইল দূরে নীলাচলের সর্ব্বোচচ শিখরে ভুবনেশ্বরী দেবীর মন্দির অবস্থিত। মন্দিরের নিকটে দ্বারবঙ্গের মহারাজার একটি সুন্দর বাটী আছে। এই স্থান হইতে চারিদিকের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি সুন্দর দেখায়। নীচে পাহাড়ের পাদমূলে ব্রহ্মপুত্রের রজত ধারা, অদূরে ব্রহ্মপুত্র নদ মধ্যে বৃক্ষলতা সমাচ্ছন্ন উমানন্দ দ্বীপ, উত্তরে সুদূর ভুটানের সুনীল পর্ব্বতমালা ও তুষারাচ্ছন্ন গিরিহস্ত, পূর্ব্বে গৌহাটি শহর ও সমতল ভূমি ও দক্ষিণে খাসি পর্ব্বতমালার দৃশ্য সত্যই অতি মনোরম। বর্ষার পর তরুরাজির শ্যামলিমা অনির্ব্বচনীয় হইয়া উঠে।

কামাখ্যা গ্রামে কোন ধর্ম্মশালা নাই। এখানে পাণ্ডাদিগের গৃহেই যাত্রীদের আহার ও বাসস্থান উভয়ই মিলে। এখানকার পাণ্ডাদের সৌজন্যের কথা ভারত বিখ্যাত। বর্ত্তমানে কামাখ্যায় প্রায় তিনশত ঘর পাণ্ডার বাস। আসামের আহোমরাজারা প্রথমে খাঁটি হিন্দু ছিলেন না ; এমন কি ইহাদের মধ্যে অনেকেই হিন্দুধর্ম্মাবলম্বিগণকে উৎপীড়নও করিয়াছেন। রাজা প্রতাপসিংহ ১৬১১-৪৯ খৃষ্টাব্দে বৈষ্ণবদিগের উপর বহু অত্যাচার করিয়াছিলেন। ১৬৯২ খৃষ্টাব্দে রাজা গদাধর সিংহও বৈষ্ণবদিগকে উৎপীড়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু তৎপুত্র রাজা রুদ্র সিংহ স্বয়ং বৈষ্ণবধর্ম্ম অবলম্বন করেন এবং সুপ্রসিদ্ধ শান্তিপুরের কৃষ্ণরাম ভট্টাচার্য্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে কামাখ্যা মন্দিরের পুরোহিত নিযুক্ত করেন। কৃষ্ণরামের বংশধরগণ আসামে পার্ব্বতীয়া গোসাই নামে পরিচিত।

স্মরণাতীত কাল হইতেই কামরূপ-কামাখ্যা তান্ত্রিক সাধনার সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ কেন্দ্ররূপে সম্মানিত। এখানকার তান্ত্রিকগণের অসাধারণ কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক কাহিনী ভারতের সর্ব্বত্র প্রচলিত আছে। কামরূপ-কামাখ্যার গুণজ্ঞান বা তুক্‌তাকের দোহাই আজিও বহু লোককে দিতে দেখা যায়। পূর্ব্বে লোকের ধারণা ছিল যে কামাখ্যায় গেলে কামরূপ-সুন্দরীরা লোককে ভেড়া করিয়া রাখিয়া দেয়। তান্ত্রিক অভিচারের কেন্দ্ররূপে কামাখ্যাকে লোকে পূর্ব্বে ভীতি মিশ্রিত সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে দেখিত। কথিত আছে, যে স্বনামধন্য শঙ্করাচার্য্য কামাখ্যার তান্ত্রিকগণের মন্ত্রাভিচারের ফলে রোগগ্রস্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। বাংলার লোকসাহিত্যে কাঙুর বা কামাখ্যার গুণজ্ঞানের সম্বন্ধে বহু উল্লেখ আছে। মহাকবি ঘনরাম চক্রবর্ত্তীর "ধর্ম্মমঙ্গল" কাব্যে উল্লিখিত আছে যে মহাবীর লাউসেন কামরূপ জয় করিতে গেলে মায়ানদ ব্রহ্মপুত্রের জলোচ্ছ্বাসে তাঁহার সমস্ত সেনাবাহিনী ভাসিয়া যায়। পরে স্বীয় উপাস্য দেবতা ধর্ম্মের প্রভাবে তিনি কাঙর (কামরূপ) রাজকে যুদ্ধে পরাস্ত করিতে সমর্থ হন।

অম্বুবাচীই কামাখ্যার সর্ব্বপ্রধান উৎসব। অম্বুবাচী নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরের দ্বার খোলা হয়। এই সময়ে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে আগত সহস্র সহস্র নরনারীর আগমনে কামাখ্যাধাম

কামাখ্যার মন্দির (পৃষ্ঠা ৩৪

জলদুর্গের তোরণ, নারায়ণগঞ্জ (পৃষ্ঠা ৪৪)
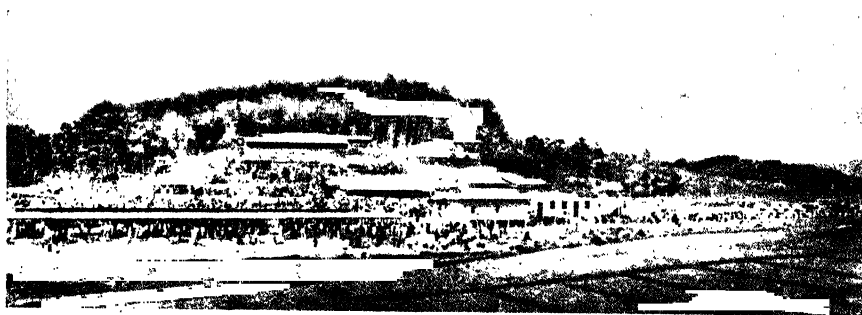
ঘোড়দৌড়ের মাঠ শিলং, (পৃষ্ঠা ৩৯)

পাইন তরুর অন্তরালে শিলং (পৃষ্ঠা ৩৯)

মুখরিত হইয়া উঠে। দুর্গাপূজার মহাষ্টমী ও চৈত্রমাসে অশোকাষ্টমী তিথিতেও এখানে বহু নরনারীর সমাগম হয়। তাহা ছাড়া বৎসরের সর্ব্ব সময়েই এখানে ধর্ম্মপ্রাণ তীর্থযাত্রিগণ আগমন করিয়া থাকেন।

উমানন্দ—কামাখ্যা দেবীর ভৈরব বা রক্ষক উমানন্দ মহাদেবের মন্দির ব্রহ্মপুত্র নদের মধ্যে একটি পাহাড়ের উপর অবস্থিত। কামাখ্যা হইতে এই স্থানের দূরত্ব প্রায় দুই মাইল। গৌহাটি শহরের খেয়াঘাট হইতে স্টীমলঞ্চ অথবা নৌকাযোগে এই দ্বীপে যাইতে হয়। বর্ষাকালে নৌকায় যাওয়া নিরাপদ নহে, কারণ এই সময়ে ব্রহ্মপুত্রে অত্যন্ত প্রবল স্রোত বহিতে থাকে। হরিদ্বর্ণ বৃক্ষাদি শোভিত উমানন্দ দ্বীপের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বড়ই মনোরম। উমানন্দ পাহাড়টির উচ্চতা তত বেশী নহে, তবে ইহার সিঁড়িগুলি কতকটা খাড়াভাবে অবস্থিত। ভৈরবের মন্দিরে যাইতে পথের দুইদিকে পলাশ, গোলক চাঁপা, কাঠাল, আম, নারিকেল, শিমুল, তেঁতুল প্রভৃতি গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। এই ক্ষুদ্র দ্বীপটিতে কতকগুলি অদ্ভুত জাতীয় উল্লুক আছে। ইহাদের লাঙ্গুল দীর্ঘ, গায়ের রং কৃষ্ণবর্ণ ও মুখ হনুমানের মত। নিকটবর্ত্তী আর কোথাও এই শ্রেণীর উল্লুক দেখিতে পাওয়া যায় না। যাত্রীরা ইহাদিগকে কলা প্রভৃতি খাইতে দিয়া থাকেন। উমানন্দের মন্দিরটি একচূড়া বিশিষ্ট; ইহার স্থাপত্য প্রণালীও কামাখ্যা মন্দিরের ন্যায়। কামাখ্যার ন্যায় এখানেও গুহামধ্যে নামিয়া দীপালোকের সাহায্যে দেবদর্শন করিতে হয়। উমানন্দ শিবলিঙ্গটি পিতল নির্ম্মিত পঞ্চমুখী ডেকচির দ্বারা আবৃত। ভৈরবের নিকটেই দ্বাদশটি শালগ্রাম ও অষ্টধাতু নির্ম্মিত দশভুজ ও পঞ্চ মস্তক বিশিষ্টা চণ্ডীর বিগ্রহ অবস্থিত। মন্দির-গহ্বরে একটি ক্ষুদ্র কুণ্ড আছে। ইহা ভোগবতী গঙ্গা নামে পরিচিত। উমানন্দ দ্বীপে ভৈরবের সেবায়েত ভিন্ন অপর কাহারও বাসস্থান নাই। উমানন্দের মন্দিরের উত্তর দিকে আর একটি ভগ্নপ্রায় প্রাচীন মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়; ইহার নিকটে বৈদ্যনাথ নামক অপর একটি শিব বিরাজমান।

কথিত আছে, যে পূর্ব্বে উমানন্দ শৈল নীল পর্ব্বত বা কামাখ্যার সহিত অবিচ্ছিন্ন ছিল। কালক্রমে ব্রহ্মপুত্রের স্রোতের বেগে ইহা মূলপর্ব্বত শ্রেণী হইতে পৃথক হইয়া একটি দ্বীপে পরিণত হইয়াছে। শিবরাত্রির সময় উমানন্দ শৈলে বহু যাত্রীর সমাগম হয়। যাঁহারা কামাখ্যা দশন করিতে যান তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই উমানন্দ দর্শন করিয়া থাকেন।

উমানন্দ শৈলের উত্তর দিকে ব্রহ্মপুত্র গর্ভে উর্ব্বশী নামে আর একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে। এখানে উর্ব্বশী কুণ্ড নামে একটি তীর্থ ছিল, বর্ত্তমানে উহা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এই ক্ষুদ্র দ্বীপটি বর্ষাকালে জলমগ্ন হইয়া যায় বলিয়া জলযানের গতি নিয়ন্ত্রণের জন্য উহার উপর একটি শুভ্রবর্ণ স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত আছে।

গৌহাটি—কামরূপ জেলার সদর ও আসামের সর্ব্বপ্রধান শহর গৌহাটি কামাখ্যা হইতে মাত্র দুই মাইল দূর। পাণ্ডু হইতে ট্রেণে, মোটরবাসে অথবা ঘোড়ার গাড়ীতে গৌহাটি যাওয়া যায়। অসমীয়াগণ গৌহাটিকে "গুয়াহাটি" বলেন। ইহার পূর্ব্ব নাম গুবাক হাটি। ব্রহ্মপুত্র নদের দক্ষিণ তীরে অবস্থিত গৌহাটি একটি সুন্দর ও পরিপাটী শহর। উত্তর তীরে উত্তর গৌহাটি নামে একটি গ্রাম আছে।

অতি প্রাচীনকালে মহীরাং দানব নামে একজন রাজা রাজত্ব করিতেন। ইহাকে অসুর বংশীয় রাজাদের আদিপুরুষ বলা যাইতে পারে। এই বংশে নরকাসুর কিরাত-বংশীয় কামরূপের রাজা ঘটককে পরাজিত করিয়া কামরূপের সিংহাসন লাভ করেন। নরকাসুরের নাম পুরাণ ও তন্ত্রে উল্লিখিত আছে। নরকাসুর কামরূপের রাজধানী বর্ত্তমান গৌহাটিতে স্থাপন করিয়াছিলেন। সে সময়ে গৌহাটির নাম ছিল প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর। নগরের চারিদিকে পরিখা ও প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া তিনি নগরকে সুরক্ষিত করিয়াছিলেন। গৌহাটির কাছে একটি ছোট পাহাড় এখনও নরকাসুরের পাহাড় নামে পরিচিত।

ঐতিহাসিকযুগে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে বঙ্গরাজ শশাঙ্ক কামরূপ জয় করিয়া বঙ্গরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। প্রসিদ্ধ চৈনিক পর্য্যটক য়ুয়ান চোয়াং সেই সময়ে ভারত ভ্রমণে আসেন এবং কামরূপ দর্শন করেন। একাদশ শতাব্দীতে কামরূপ পালরাজগণ কর্ত্তৃক বিজিত হয় এবং ষোড়শ শতাব্দীতে কোচরাজ-সেনাপতি চিলারায়ও কামরূপ জয় করেন।

বাংলার স্বাধীন মুসলমান রাজারা এককালে গৌহাটি পর্য্যন্ত জয় করিয়াছিলেন। সুলতান শমস্‌উদ্দীন ইলিয়াস শাহের পুত্র সিকন্দর শাহ্ ১৩৬৭ খৃষ্টাব্দে কামরূপে আসিয়া একটি টাকশাল প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তখন মুসলমানেরা আসামের নাম দিয়াছিলেন চাউলের দেশ। সিকন্দরের পুত্র গিয়াস্‌-উদ্‌-দীন আজম্ শাহ্ গৌহাটিতে একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। গৌহাটিতে আবিষ্কৃত একখানি আরবী শিলালিপি হইতে এই কথা জানিতে পারা গিয়াছে। শিলালিপিখানি এখন গৌহাটিতে কামরূপ অনুসন্ধান সমিতির চিত্রশালায় আছে। গৌহাটিতে মুঘলদিগের সহিত আসামের আহোমবংশীয় রাজাদের অনেকবার যুদ্ধ হইয়াছিল। আহোম রাজগণের বীরত্ব কাহিনী আজও আসামের ঘরে ঘরে পরিকীর্ত্তিত। বাংলার শাসনকর্ত্তা ইতিহাস প্রসিদ্ধ নবাব মীরজুমলা আসাম আক্রমণ করিতে যাইয়া ঘরগাঁও পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন, কিন্তু বন্যা ও বৃষ্টির জন্য এবং খাদ্যদ্রব্যাদির অভাবে তাঁহাকে ব্যর্থ মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল। ১২০৫ খৃষ্টাব্দে মুহম্মদ খিলজিরও (বক্তিয়ার খিলজির পুত্র) এইরূপভাবে আসাম অভিযান ব্যর্থ হইয়াছিল। জয়ধ্বজ সিংহ, চক্রধর সিংহ এবং গদাধর সিংহ মুঘলদের নিকট হইতে কুড়িটি কামান কাড়িয়া লইয়াছিলেন। এই সকল কামানে পুরাতন অসমীয়া অক্ষরে রাজার নাম ও তারিখ এবং কামানটি যে মুসলমানদের নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়া হইয়াছিল এই সকল কথা সংস্কৃত ভাষায় লেখা আছে। খৃষ্টাব্দের অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে আহমরাজা গৌরীনাথ সিংহ বৈষ্ণব প্রজাদের বিদ্রোহের জন্য পুরাতন রাজধানী গড়গাও ছাড়িয়া গৌহাটিতে পলাইয়া আসিয়াছিলেন। অবশেষে ইংরাজদের সাহায্যে ১৬৯২ খৃষ্টাব্দে নবেম্বর মাসে গৌরীনাথ গৌহাটি ফিরাইয়া পান। বদনচন্দ্র বড়ফুকন্ নামক একজন রাজকর্ম্মচারীর সহায়তায় ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মদেশ হইতে আগত সৈন্য আসাম অধিকার করে। ইংরাজদের সহিত ব্রহ্ম দেশের রাজার যুদ্ধ বাধিলে ইংরাজ সৈন্য ১৮২৪ খৃষ্টাব্দের ২৮এ মার্চ্চ তারিখে গৌহাটি দখল করে এবং সেই সময় হইতে ইহা ইংরাজদের অধিকারে আছে।

গৌহাটির তিনদিকে অনেকগুলি ছোট ছোট পাহাড় আছে এবং ইহার উপরে আহোম্-রাজাদের নির্ম্মিত অনেকগুলি পুরাতন দেবমন্দির এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।

গৌহাটির খেয়া ঘাটের নিকটে শুক্রেশ্বরের মন্দির অবস্থিত। মন্দিরের নিম্নে পাষাণ গাত্রে খোদিত বিষ্ণু, দুর্গা, গণেশ, সূর্য্য প্রভৃতির সুন্দর মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। গৌহাটি শহরের পূর্ব্ব প্রান্তে একটি অনুচ্চ পাহাড়ের উপর নবগ্রহ মন্দিরে সূর্য্য চন্দ্র প্রভৃতি নয়টি গ্রহের পূজার ব্যবস্থা আছে।

গৌহাটিতে বহু দ্রষ্টব্য বস্তু আছে। উহাদের মধ্যে কটনকলেজ নামক প্রথম শ্রেণীর কলেজ, কামরূপ অনুসন্ধান সমিতির চিত্রশালা, গ্রাম্যশিল্পের সরকারী সংগ্রহ ও বিক্রয় কেন্দ্র, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গৌহাটি-শাখা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

গৌহাটি শহর হইতে ৯ মাইল দূরে বনমধ্যে অবস্থিত বশিষ্ঠাশ্রম এখানকার একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থান। কথিত আছে, নিমিরাজার শাপে দেহহীন বশিষ্ঠমুনি এখানকার অমৃতকুণ্ডে স্নান করিয়া পূর্ব্বদেহ প্রাপ্ত হন। এখানে ঘন সন্নিবিষ্ট বৃক্ষের শ্রেণী স্থানটিকে এক অপূর্ব্ব ও গম্ভীর সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করিয়াছে। একটি ঝরণা এখানকার প্রাচীন মন্দিরের পার্শ্ব দিয়া কুলু কুলু রবে প্রবাহিতা। বশিষ্টের পত্নী অরুন্ধতীর স্মৃতি বিজড়িত অরুন্ধতীশিলা আয়ুষ্মতীগণের পরম প্রিয়। স্বামী-সৌভাগ্য লাভের আশায় তাঁহারা এই শিলাপট্টকে সিন্দুরের দ্বারা রঞ্জিত করিয়া থাকেন। গৌহাটি হইতে ঘোড়ার গাড়ী অথবা মোটর গাড়ীতে করিয়া বশিষ্ঠাশ্রমে যাওয়া যায়।

শিলং—পাণ্ডু হইতে আসামের রাজধানী শিলং ৬৭ মাইল দূর। পাণ্ডুঘাট হইতে সকাল বেলায় মোটর গাড়ী ও বাস ছাড়িয়া বেলা ১১টার মধ্যে শিলংএ পেঁছায়। ফিরিবার সময় শিলং হইতে সমস্ত মোটর দুইটার পরেই ছাড়ে এবং রাত্রি আটটার পূর্ব্বেই গৌহাটি হইয়া পাণ্ডু আসিয়া পেঁছায়। গৌহাটি হইতে নয় মাইল সমতল ক্ষেত্র দিয়া চলিবার পর জোড়াবাটের নিকট হইতে মোটর গাড়ী পাহাড়ের রাস্তা ধরে এবং আকাবাঁকাভাবে সর্পিল গতিতে পাহাড়ের গা বাহিয়া ওঠা-নামা করিতে থাকে। এই পথের দৃশ্য বড় সুন্দর। রাস্তার একদিকে খাড়া পাহাড় ও অপর পার্শ্বে গভীর খাদ; অরণ্য সমাবৃত পর্ব্বত-শিখরগুলি ঢেউএর মত একটির পর একটি চলিয়া গিয়াছে। এই পথে গৌহাটি হইতে ৩০ মাইল দূরে এবং সমুদ্র হইতে ১৭৮৬ ফুট উচ্চে অবস্থিত নংপো একটি উল্লেখযোগ্য স্থান। এখানে উজান ও ভাটি দুই দিককার গাড়ী একত্র হয়। এখানে রাস্তার পার্শ্বে খাসিয়া রমণীগণ পান, সুপারি, কলা, চা প্রভৃতি বিক্রয় করে। এখানে কয়েকখানি দোকানও আছে। নংপোর নিকটে একটি রন্ধ্রপথ বা এক পর্ব্বত হইতে অন্য পর্ব্বতে যাইবার রাস্তা আছে। এই পথ দিয়া বন্যহস্তিগণ দলে দলে এক বন হইতে অন্য বনে যায়। নংপোর পর হইতে রাস্তার দুইদিকে শালের জঙ্গল দৃষ্ট হয়। এই রাস্তার পার্শ্ব দিয়া একটি পার্ব্বত্য নদী প্রবাহিত আছে। এই পথে ৫২ মাইল অতিক্রম করিবার পর দুইটি উচ্চ পর্ব্বত শৃঙ্গের মধ্যে অবস্থিত শিলং শহরের দৃশ্য চোখে পড়ে। শিলং সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে প্রায় ৫০০০ ফুট্ উচ্চ।

শিমলা, মুসৌরি বা দার্জিলিং যেমন পর্ব্বতের স্কন্ধে অবস্থিত, শিলং সেরূপ নহে। এই শহরটি পর্ব্বতের অধিত্যকা বা মালভূমির উপর অবস্থিত। ভারতবর্ষে যতগুলি শৈলনিবাস আছে, তাহাদের মধ্যে মাদ্রাজের উটাকামণ্ড, রাজপুতানার আবু এবং কাশ্মীরের সোনামাগের মত শিলংও অধিত্যকার উপর নির্ম্মিত। এখানে সারা বৎসর স্বচ্ছন্দে বাস করা যায়, এখানে বৃষ্টিপাত কিছু অধিক বলিয়া গ্রীষ্মকালেও বিশেষ গরম হয় না। মেঘ ও কুয়াসা না থাকিলে শিলং হইতে ৪৫ মাইল দূরবর্ত্তী ব্রহ্মপুত্র নদ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। পাইনতরু বেষ্টিত শিলং নগরীর দৃশ্য অতি মনোরম। এখানকার রাস্তাগুলিও অতি সুন্দর। শিলং শহরের বহু দ্রষ্টব্য বস্তুর মধ্যে লাট সাহেবের বাড়ী ও তাহার নিকটবর্ত্তী অশ্বখুরাকৃতি ওয়ার্ড লেক নামক কৃত্রিম হ্রদ, কাউন্সিল ভবন, সেন্ট্ এডমাণ্ড কলেজ, রামকৃষ্ণ মিশন, পাস্তুর ইনস্টিটুট ও বড় বাজারের নাম উল্লেখ যোগ্য। শিলংএ বহু হোটেল ও বোর্ডিং হাউস আছে। শিলংএর গল্‌ফ্ খেলার মাঠ ও ঘোড় দৌড়ের মাঠও খুব

বিখ্যাত। গল্‌ফ্‌ খেলার মাঠটি সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় স্থানীয়। শিলং শহরের অতি নিকটে অবস্থিত বিশপ্‌ ফল্‌ ও বিডন ফল্‌ নামক দুইটি জল প্রপাত ভ্রমণকারী মাত্রেরই দ্রষ্টব্য।

শিলং অতি স্বাস্থ্যকর স্থান। এখানকার কুহেলিকা (mist) ও পাইন তরুর হাওয়া শরীরের পক্ষে বিশেষ উপকারী বলিয়া চিকিৎসকগণের অভিমত। ইহা বাঙালীদের অতি প্রিয় পার্ব্বত্য স্বাস্থ্যনিবাস।

শিলংএ অতি উৎকৃষ্ট মাখন ও নানাপ্রকার সুস্বাদু ফলমূল সুলভে কিনিতে পাওয়া যায়।

চেরাপুঞ্জি—শিলং হইতে চেরাপুঞ্জির দূরত্ব প্রায় ৩৭ মাইল। এই দুই স্থানের মধ্যে প্রত্যহ মোটরবাস যাতায়াত করে। এই পথের দৃশ্যও অতি মনোরম। এই পথে ছয় মাইল দূরে আপার শিলং অবস্থিত। এখানে একটি সরকারী কৃষিক্ষেত্র আছে। আপার শিলংএ এলিফ্যান্ট বা হস্তী প্রপাত ও গেইট্‌ ফল্‌ নামক দুইটি জলপ্রপাত আছে। হস্তী প্রপাতটি রাস্তার অতি নিকটে অবস্থিত। এই প্রপাতটি তিনটি বিভিন্নস্তরে পাহাড়ের গা বাহিয়া নামিয়া আসিয়াছে; দেখিতে হস্তিশুণ্ডের ন্যায় বলিয়া ইহার "হস্তী প্রপাত" নাম হইয়াছে। ১৪ মাইলের পর রাস্তাটি দ্বিধা বিভক্ত হইয়া একটি পথ শ্রীহট্টের দিকে চলিয়া গিয়াছে। ইহার পর হইতে পথের দুই পার্শ্বে গভীর অরণ্য দৃষ্ট হয়। এই পথে বহু বাঁক আছে। এক এক স্থানের বাঁক ইংরেজী U, V প্রভৃতি অক্ষরের আকৃতির ন্যায়। গাড়ীতে বসিয়াই পথের পার্শ্বে মধ্যে মধ্যে ঘুটিং হইতে চূণ প্রস্তুত করিবার চুল্লী দেখিতে পাওয়া যায়। এই পথ দিয়া চলিতে চলিতে বহু খাসিয়া নরনারীর সহিত দেখা হয়। কেহ এক্কা লইয়া চলিয়াছে, কাহারও পৃষ্ঠে বোঝা, আবার কেহ কেহ বা পথের পার্শ্বস্থ অরণ্য হইতে কাষ্ঠাদি সংগ্রহ করিতেছে।

চেরাপুঞ্জি শহরটিও শিলংএর ন্যায় অধিত্যকার উপর নির্ম্মিত। পূর্ব্বে ইহা খাসিয়া-জয়ন্তীয়া পাহাড় নামক জেলার সদর শহর ছিল। কিন্তু অত্যন্ত বৃষ্টিপাতের জন্য স্থানটি অস্বাস্থ্যকর বলিয়া ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ হইতে এই স্থান হইতে জেলার দপ্তর শিলংএ স্থানান্তরিত করা হয়। পৃথিবীর মধ্যে চেরাপুঞ্জিতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বৃষ্টিপাত হয়। এখানকার বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ গড়ে ৪২৬ ইঞ্চি। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে এখানে ৯০৩ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হইয়াছিল। যে পাহাড়ের মালভূমিতে চেরাপুঞ্জি শহর অবস্থিত তাহার নাম চেরা পাহাড়। ইহার উচ্চতা সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে ৪,০০০ হাজার ফুট। ইহার একটি বৈশিষ্ট্য এই যে অন্যান্য পর্ব্বতের মত ইহা ক্রমশঃ নিম্ন না হইয়া একেবারে শহরের প্রান্তে খাড়া ভাবে গিয়া শেষ হইয়াছে। এই স্থানে মুশমাই নামে একটি বৃহৎ জলপ্রপাত আছে। বর্ষাকালে ইহার বিস্তৃতি প্রায় ১৩০০ ফুট হয়। ইহার জলরাশি প্রায় ১৮০০ ফুট নিম্নে গিয়া পড়িতেছে। উচ্চতার দিক দিয়া এই জলপ্রপাত পৃথিবীর মধ্যে চতুর্থ স্থান অধিকার করে। চেরা পাহাড় যেখানে শেষ হইয়াছে তাহার পর শত মাইলেরও অধিক বিস্তৃত শ্রীহট্টের সমতল ক্ষেত্র দেখা যায়। মুশমাই প্রপাতের নিকট হইতে এই সমতল ক্ষেত্রের দৃশ্য অতি অপূর্ব্ব। চেরাপুঞ্জির নিকটে একটি পর্ব্বত-গুহা আছে। ইহার প্রস্তরময় ছাদ ও প্রাচীরে সব সময়েই বিন্দু বিন্দু জল সঞ্চিত থাকে। তাহার উপর আলোক পড়িলে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রের শোভার ন্যায় সুন্দর দৃশ্যের সৃষ্টি হয়। চেরাপুঞ্জি হইতে ছাতক পর্য্যন্ত একটি রোপ্‌-ওয়ে আছে। ইহাও চেরাপুঞ্জির অপর একটি দ্রষ্টব্য।

শিলং হইতে আহারাদি করিয়া বেলা ১১টার সময় রওনা হইলে সন্ধ্যার পূর্ব্বেই চেরাপুঞ্জি দেখিয়া ফিরিয়া আসা যায়।

(জ) নারায়ণগঞ্জ—ঢাকা—বাহাদুরাবাদ।

কলিকাতা হইতে গোয়ালন্দ হইয়া নারায়ণগঞ্জের দূরত্ব ২৫৯ মাইল। গোয়ালন্দ ও নারায়ণ-গঞ্জের মধ্যে প্রত্যহ ডাকবাহী স্টীমার যাতায়াত করে। এই জলপথের দূরত্ব ১০৪ মাইল। গোয়ালন্দ ও নারায়ণগঞ্জের মধ্যবর্ত্তী স্টীমার স্টেশনগুলির মধ্যে টেপাখোলা, কুতুবপুর-পদ্মা, ভাগ্যকুল, তারপাশা, বহর, মুন্সীগঞ্জ ঘাট ও মিরকাদিম ব্যবসায় প্রধান ও উল্লেখ যোগ্য স্টেশন।

ভাগ্যকুলের রায় উপাধিধারী বিখ্যাত ব্যবসায়ী ও জমিদারবংশ বাংলার অন্যতম ধনী পরিবার বলিয়া প্রসিদ্ধ। ভাগ্যকুল হইতে প্রায় দুই মাইল দূরবর্ত্তী রাঢ়ীখাল গ্রাম বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পরলোকগত আচার্য্য সার জগদীশ চন্দ্র বসু মহাশয়ের জন্মস্থান। ভাগ্যকুল হইতে ছয় মাইল দূরবর্ত্তী ঘোলঘর গ্রাম কলিকাতা হাইকোর্টের প্রথম বাঙালী প্রধান বিচারপতি স্বর্গীয় স্যর চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয়ের জন্মস্থান।

তারপাশা একটি বিখ্যাত স্টীমার স্টেশন। এই স্থান হইতে স্টীমারযোগে মাদারিপুর ও খুলনা প্রভৃতি স্থানে যাওয়া যায়। তারপাশা স্টেশনের অতি নিকটে ঢাকা জেলার অন্যতম বন্দর লৌহজঙ্গ অবস্থিত। লৌহজঙ্গের পাল চৌধুরী বংশও বিখ্যাত ব্যবসায়ী ও ধনী। পূর্ব্বে লৌহজঙ্গে এই বংশের প্রতিষ্ঠিত নবরত্ন ও একুশরত্ন মঠ বিশেষ দ্রষ্টব্য বস্তু ছিল। কিন্তু কীর্ত্তিনাশা পদ্মার ভাঙ্গনে উহা নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। লৌহজঙ্গের নিকটবর্ত্তী ব্রাহ্মণগাঁ নামক পল্লী শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর পিতা স্বর্গীয় ডক্টর অঘোর নাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জন্মস্থান। পদ্মার ভাঙ্গনে এই পল্লীটিও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়াছে।

বহর স্টেশনটি সাধারণের নিকট রাজাবাড়ী নামে পরিচিত। রাজাবাড়ীতে বিক্রমপুরের সুবিখ্যাত ভৌমিক ইতিহাস প্রসিদ্ধ কেদার রায়ের মাতার শ্মশানের উপর নির্ম্মিত একটি অতি সুন্দর ও সু-উচচ মঠ ছিল। পদ্মানদীর বহু দূর হইতে এই মঠের চূড়া দেখিতে পাওয়া যাইত। এরূপ সুন্দর মঠ বাংলা দেশে অতি অল্পই ছিল। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই মঠটি গর্ভসাৎ করিয়া পদ্মা তাহার কীর্ত্তিনাশা নাম সম্পূর্ণরূপেই সার্থক করিয়াছে। বহরের নিকটবর্ত্তী দীঘির পাড় ঢাকা জেলার অন্যতম বিখ্যাত বাণিজ্য কেন্দ্র। বহর বা রাজাবাড়ীর বিপরীত দিকে পদ্মার অপর পারে বর্ত্তমান ফরিদপুর জেলার এলাকায় ইংরেজ ঈস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির ঢাকাস্থ নায়েব দেওয়ান মহারাজা রাজবল্লভের বাসস্থান রাজনগর অবস্থিত ছিল। রাজবল্লভের প্রতিষ্ঠিত একুশ চূড়া বিশিষ্ট মঠ ও অন্যান্য কীর্ত্তিও পদ্মার কুক্ষিগত হইয়াছে। বহর হইতে প্রায় তিন মাইল দূরে বাঘিয়া গ্রামে লস্কর দীঘি নামক একটি পুরাতন দীঘি ও তত্তীরে অতি সুন্দর কারুকার্য্য খচিত একটি শিবমন্দির আছে। রূপরাম লস্কর নামক জনৈক ব্যক্তি এই দীঘি ও শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

বহরের অদূরবর্ত্তী তেলিরবাগ গ্রাম দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের পৈতৃক বাসস্থান।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে চাঁদরায় ও তাঁহার পুত্র বা ভ্রাতা কেদার রায় বিক্রমপুরে পদ্মার কূলে শ্রীপুর নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করিয়া সবিক্রমে রাজত্ব করিতে থাকেন। তাঁহারা যথেষ্ট নৌবল সঞ্চয় করিয়া সন্দীপ প্রভৃতি অঞ্চল অধিকার করেন। শ্রীপুর তখন একটি প্রসিদ্ধ পোতাশ্রয় ছিল এবং পর্ত্তুগীজগণও জাহাজ মেরামতের জন্য এই স্থানে আসিতেন। সন্দীপ

পরে চাঁদরায়ের হস্তচ্যুত হয় এবং কিছু কাল পর্ত্তুগীজগণের অধীনে আসিয়া আরাকান রাজের হস্তগত হয়; তখন পর্ত্তুগীজ নেতা কার্ভালো প্রভৃতি পলাইয়া আসিয়া শ্রীপুরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সময়ে চাঁদ রায়ের মৃত্যুর পর মহারাজ মানসিংহ মন্দা রায় নামক একজন সেনাপতিকে শ্রীপুর অধিকার করিবার জন্য প্রেরণ করিলে নৌযুদ্ধে কেদার রায় ও কার্ভালো তাঁহাকে পরাস্ত ও নিহত করেন। তখন মহারাজ মানসিংহ স্বয়ং কেদার রায়কে দমন করিতে আসেন। কেদার পরাজিত হইয়া সপরিবারে সমুদ্রাভিমুখে পলায়ন করেন। অতঃপর তাঁহাদের মধ্যে সন্ধি হয়, কিন্তু কেদার সন্ধিমত কর না দেওয়ায় মহারাজ মানসিংহের আদেশে সেনাপতি কিলমক্ বিপুল বাহিনী লইয়া শ্রীপুর আক্রমণ করেন; কিন্তু তিনি যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন। কেদার সহজ শত্রু নহেন বুঝিতে পারিয়া মানসিংহ স্বয়ং চতুরঙ্গবাহিনী সজ্জিত করিয়া শ্রীপুরের নিকটে আসিয়া হানা দিলেন। কথিত আছে, যে মানসিংহ একজন দূতের নিকট একখানি তরবারী ও একটি শৃঙ্খল সহ নিম্নলিখিত মিশ্রভাষায় রচিত শ্লোকটি লিখিয়া পাঠান,

"ত্রিপুর মঘ বাঙ্গালী কাককুলী চাকালী
সকল পুরুষ মেতৎ ভাগি যাও পলায়ী
হয়-গজ নর-নৌকা কম্পিতা বঙ্গভূমি
বিষম সমর সিংহো মানসিংহ প্রযাতি।।"

মহাবীর কেদার এই সিংহের হুঙ্কারে ভীত না হইয়া দূতের নিকট হইতে তরবারি গ্রহণ করিলেন এবং তাহার হাত দিয়া মানসিংহকে নিম্নলিখিত সংস্কৃত শ্লোকটি লিখিয়া পাঠাইলেন,

"ভিনত্তি নিত্যং করিরাজকুম্ভং
বিভর্ত্তি বেগং পবনাদতীব
করোতি বাসং গিরি গহ্বরেষু
তথাপি সিংহঃ পশুরেব নান্যঃ।"

অতঃপর উভয় পক্ষের প্রবল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। নয় দিন বীর বিক্রমে যুদ্ধ করিবার পর মহাবীর কেদার রায় দশম দিবসে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন।

মানসিংহ কেদার রায়ের গৃহদেবতা শিলাময়ী দেবী ও পুরোহিত কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্যকে জয়পুরে লইয়া যান। বিগ্রহটি এখনও সল্লা দেবী নামে তথায় পূজিত হইতেছেন। পুরোহিত কমলাকান্তের বংশ জয়পুরে বিদ্যমান। এই বংশের বিদ্যাধর নানা বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন এবং অম্বর রাজ জয় সিংহের প্রধান মন্ত্রী পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন; সুপ্রসিদ্ধ জয়পুর শহর তাঁহারই পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্ম্মিত। শ্রীপুর ও চাঁদরায় কেদার রায়ের কীর্ত্তি সমূহ আজ পদ্মাগর্ভে বিলীন হইলেও এককালে যে উহা একটি প্রসিদ্ধ স্থান ছিল তাহা পর্য্যটক র‍্যাল্‌ফ ফিচের ভ্রমণ বৃত্তান্ত হইতে জানা যায়। ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে তিনি বাক্‌লা হইতে শ্রীপুরে আসিয়া ১৮ মাইল দূরবর্ত্তী সোনার গাঁও গমন করেন এবং পুনরায় শ্রীপুরে ফিরিয়া তথা হইতে জাহাজ যোগে পেগু গমন করেন। ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে বাংলার প্রথম পাদরী ফ্রান্‌সিস্ ফার্নানদেজ শ্রীপুরে আগমন করেন এবং তথায় খৃষ্টান ধর্ম্ম প্রচার করিবার অনুমতি পান।

ঢাকা জেলায় রাজাবাড়ী, টঙ্গীবাড়ী, লৌহজঙ্গ, মুন্সীগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ প্রভৃতি থানা পল্লী অঞ্চলে ঘন লোক বসতি হিসাবে, বাংলা দেশের অন্য কয়েকটি থানার সহিত পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করে।

নারায়ণগঞ্জ—কলিকাতা হইতে গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত রেলপথে এবং তথা হইতে স্টীমারে সব শুদ্ধ প্রায় ২৫৯ মাইল দূর। লাক্ষ্যা, শীতলাক্ষ্যা বা শীতল লক্ষ্মী নদীর উপর অবস্থিত এই প্রসিদ্ধ বন্দর হইতে পূর্ব্ব-বঙ্গ রেলপথের মাঝারি মাপের একটি লাইন ঢাকা, টঙ্গী জংশন, ময়মনসিংহ জংশন, সিংহজানি জংশন প্রভৃতি হইয়া ১৪২ মাইল দূরবর্ত্তী বাহাদুরাবাদ পর্য্যন্ত গিয়াছে। পূর্ব্ব-বঙ্গ রেল-পথের ইহা একটি বিচ্ছিন্ন অংশ। নারায়ণগঞ্জ হইতে স্টীমার পথে একদিকে মুন্সীগঞ্জ, তারপাশা, ভাগ্যকূল, টেপাখোলা প্রভৃতি হইয়া গোয়ালন্দ ও অপর দিকে চাঁদপুর ও মেঘনা পথে ভৈরব, সুনামগঞ্জ, ছাতক প্রভৃতি হইয়া শ্রীহট্ট পর্য্যন্ত পাওয়া যায়।

শীতলক্ষ্যা নারায়ণগঞ্জের ৩ মাইল দক্ষিণে ধলেশ্বরী নদীর সহিত মিশিয়াছে এবং পূর্ব্বদিকে অল্প কিছুদূর গিয়া পুরাতন ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনার সহিত মিলিত হইয়াছে। এই মোহানা কলাগাছিয়া নামে খ্যাত। কয়েক মাইল দক্ষিণে গিয়া এই মিলিত জলধারা পদ্মায় গিয়া পড়িয়াছে। ইহার পর হইতে পদ্মা মেঘনা নামেই পরিচিত। শীতলক্ষ্যা সাতখামাইর স্টেশনের ১০ মাইল পূর্ব্বদিকে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র হইতে নির্গত হইয়াছে; উপরের দিকে ইহা বানার নামে পরিচিত; এককালে শীতলক্ষ্যা পুরাতন ব্রহ্মপুত্রের প্রধান খাত ছিল। ধলেশ্বরী ময়মনসিংহ জেলার সেলিমাবাদের উত্তরে নূতন ব্রহ্মপুত্র বা যমুনা হইতে উঠিয়া এলাশিন, কেদারপুর, সাভারের পাশ দিয়া বহিয়া আসিয়াছে; ধলেশ্বরী যমুনা হইতে অনেক পুরাতন নদী এবং ইহার খাত দিয়া এক কালে ব্রহ্মপুত্র প্রবাহিত হইত। মেঘনা মণিপুর রাজ্যের উত্তর সীমাস্থ পর্ব্বতশ্রেণী হইতে বাহির হইয়া প্রথমে সুরমা ও পরে মেঘনা নামে পরিচিত হইয়াছে; নীচের দিকে ইহা ঢাকা ও ত্রিপুরা জেলার সীমা রক্ষা করিয়াছে। নারায়ণগঞ্জের ৪ মাইল পশ্চিমে বুড়ীগঙ্গা ধলেশ্বরীর পূর্ব্বকূলে আসিয়া মিশিয়াছে; বুড়ীগঙ্গা সাভার থানার ৪ মাইল দক্ষিণে ধলেশ্বরী হইতে বাহির হইয়া ঢাকা নগরীর পশ্চিমপ্রান্ত বাহিয়া আসিয়াছে; কালিকাপুরাণে বৃদ্ধগঙ্গা বা বুড়ীগঙ্গার উল্লেখ আছে; এককালে ইহা গঙ্গার কোনও খাত ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। বুড়ীগঙ্গা-ধলেশ্বরী সঙ্গমের ২ মাইল দক্ষিণে বিক্রমপুরের ইছামতী নদী ধলেশ্বরীর পশ্চিম কূলে আসিয়া মিশিয়াছে; পাবনা, যশোহর, চব্বিশ পরগণা প্রভৃতি স্থানেও ইছামতী নামে নদী দৃষ্ট হয়। (প্রধান লাইনের ঈশ্বরদি স্টেশন দ্রষ্টব্য)। কেহ কেহ অনুমান করেন যে এক কালে ইছামতী পুণ্য সলিলা করতোয়ার শাখা ছিল; কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় যেমন এখনও করতোয়ায় লোকে তীর্থ স্নান করেন, সেইরূপ বিক্রমপুরে ইছামতীর পঞ্চতীর্থ ঘাটে আজও লোকে উক্ত তিথিতে স্নান করিয়া পুণ্যসঞ্চয় করেন। এতগুলি নদীর সঙ্গম স্থলের নিকট অবস্থিত বলিয়া নারায়ণগঞ্জ একটি স্বাভাবিক বন্দর।

আন্দাজ ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান নারায়ণগঞ্জটি স্থাপিত হয়। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দেও এখানে একটি বড় লবণের গোলা ছিল এবং তথা হইতে প্রতি বৎসর পাঁচলক্ষ মণ লবণ আমদানি হইত। তৎকালে চীনা ও মগ বণিকেরা কারবারের জন্য এখানে আসিত। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে নারায়ণগঞ্জ স্বাধীন বন্দর বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে নারায়ণগঞ্জ মহকুমা স্থাপিত হয়। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ১২ই মে হইতে নারায়ণগঞ্জ চট্টগ্রাম বন্দরের অধীন বন্দর বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। মুসলমান

যুগেও নারায়ণগঞ্জ একটি বন্দর ছিল; তখন ইহার কি নাম ছিল ঠিক্ জানা নাই। কথিত আছে, ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্ম্মচারী ভিখনলাল ঠাকুর কোনও সন্ন্যাসীর নিকট হইতে পাঁচটি নারায়ণ চক্র পাইয়া একটি এই স্থানে, একটি পুরাতন ব্রহ্মপুত্র কূলে পঞ্চমী ঘাটে, একটি ইদ্রাকপুরে ও একটি ঢাকার লক্ষ্মী বাজারে ও আর একটি নরসিংহজীর আখড়ায় স্থাপিত করেন। এই বন্দরের আয় হইতে এই পাচটি নারায়ণ বিগ্রহের সেবার ব্যবস্থা করেন বলিয়া স্থানটির নাম নারায়ণগঞ্জ হইয়াছে।

নারায়ণগঞ্জ নগর এখন শীতলক্ষ্যার উভয় তীরে অনেক দূর পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এখানে বহু পাটের কল, ঢাকেশ্বরী ও লক্ষ্মীনারায়ণ প্রভৃতি কাপড়ের কল, কাচের কল ইত্যাদি স্থাপিত আছে। প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ টাকার পাট এখান হইতে রপ্তানি হয়। শীতলক্ষ্যার পশ্চিমকূলে রেল স্টেশন, হাজীগঞ্জ, ভগবান গঞ্জ, তান বাজার প্রভৃতি মহাল্লা এবং পূর্ব্বকূলে নবীগঞ্জ, সোনাকান্দা, মদনগঞ্জ প্রভৃতি শহরের অংশ অবস্থিত।

প্রসিদ্ধ বাগ্মী বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে নারায়ণগঞ্জ কিরূপ ছিল, সে সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"আমি প্রথমে যে নারায়ণগঞ্জ দেখিয়াছিলাম, সে নারায়ণগঞ্জ আজ আর নাই। সে নারায়ণগঞ্জ ছিল একটা গ্রাম ও বাজার। আজিকার নারায়ণগঞ্জ হইয়াছে একটা বড় বন্দর ও সহর। ঢাকা—নারায়ণগঞ্জে তখনও রেল হয় নাই। পাটের গুদাম দুই একটা হইয়াছে। বোধ হয় রালী ব্রাদার্সের আফিস বসিয়াছে। আর ছাতকের ইংলিস কোম্পানীর বড় একটা আফিস ছিল। নারায়ণগঞ্জে তখন হোটেল ছিল না। কতকগুলি আখড়া ছিল। এই সকল আখড়াতেই যাত্রীরা আশ্রয় ও আহার পাইত। এজন্য যথাসম্ভব প্রণামী দিতে হইত। এই প্রণামীর উপরে প্রসাদের গুণাগুণ নির্ভর করিত। সামান্য প্রণামী দিলে সাধারণ ডাল ভাত মিলিত; বেশী প্রণামী দিলে উৎকৃষ্ট আতপান্ন, গব্য ঘৃত, দৈ, সর, দুধ এবং মিষ্টান্ন মিলিত। আখড়ার নাট-মন্দিরে শুইবার স্থান মিলিত। গত পঞ্চাশ বৎসরে ইহার শ্রী ফিরিয়া গিয়াছে।"

শহরের নবীগঞ্জ মহাল্লায় কদম রসুল বা হজরৎ মহম্মদের পদচিহ্নযুক্ত একখণ্ড প্রস্তর একটি সৌধ মধ্যে রক্ষিত আছে। বার ভুঁইয়ার অন্যতম প্রধান ভুঁইয়া সুপ্রসিদ্ধ ঈশা খাঁর প্রপৌত্র মানোয়ার খাঁ খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইহা নির্ম্মাণ করেন এবং ১৬৪২ খৃষ্টাব্দে গোলাম নবী নামক একজন মুঘল কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক ইহা পুননির্ম্মিত হয়।

শহরের হাজীগঞ্জ ও সোনাকান্দা মহাল্লায় দুইটি পুরাতন গোলাকার জলদুর্গের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়; মুনসীগঞ্জের নিকটস্থ প্রসিদ্ধ কলাগাছিয়া সঙ্গমের উপর ইদ্রাকপুরে ঠিক্ অনুরূপ একটি জলদুর্গের ভগ্নাবশেষ আছে। ইহাদের মধ্যে সোনাকান্দার দুর্গটি দেখিলে পূর্ব্বাবস্থা বুঝিতে পারা যায়, বর্ষাকালে এখনও দুর্গটির চারিদিকে নৌকাযোগে ঘোরা যায়; গোল দেওয়ালে একহাত দুইহাত অন্তর কামান বসাইবার ছিদ্র এবং একটি মুর্চ্চার উপর বড় কামান বসাইবার স্থান। সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে বাংলার সুবাদার মীর জুম্‌লা কর্ত্তৃক পর্ত্তুগীজ ও মগ দস্যুদের আক্রমণ হইতে রাজধানী ঢাকা নগরী দৃঢ়ভাবে রক্ষা করিবার জন্য এই তিনটি দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই জাতীয় জলদুর্গ বোম্বাই প্রদেশের থানা জেলা ভিন্ন ভারতবর্ষের আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। হাজীগঞ্জের দুর্গটি পরিধিতে প্রায় দেড় মাইল এবং উহা এখন ঢাকার নবাবদের হাফেজ মঞ্জিল নামক বাগানের মধ্যে পড়িয়াছে। সম্ভবতঃ মীর জুম্‌লার পূর্ব্বেও এখানে একটি দুগ ছিল। প্রবাদ বার ভুঁইয়ার অন্যতম সুপ্রসিদ্ধ চাঁদরায়ের কন্যা ও ঈশা খার পত্নী সোনা বিবি এই দুর্গে থাকিয়া মগ দিগের সহিত সবিক্রমে যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং নিশ্চিত পরাজয় বুঝিয়া অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ বিসজর্জন দিয়াছিলেন।

চেরাপুঞ্জির পথে (পৃষ্ঠা ৪০)

চেরাপুঞ্জি বাজার (পৃষ্ঠা ৪০)

হাজীবাবার দরগাহ, নারায়ণগঞ্জ (পৃষ্ঠা ৪৪)

লালবাগ কেল্লা, ঢাকা (পৃষ্ঠা ৫৬)

নারায়ণগঞ্জের এক মাইল উত্তরে হাজীগঞ্জ মহাল্লার পার্শ্বেই খিজিরপুর গ্রাম। বার-ভুঁইয়ার অন্যতম প্রধান ভুঁইয়া ঈশা খাঁ মশ্নদ-ই-আলির রাজধানী এই স্থানে ছিল। কথিত আছে, ঈশা খা রাজপুত বংশীয় হিন্দু ছিলেন এবং মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সুলতান সুলেমান কররাণীর পুত্র বায়াজিদের সৈন্য বিভাগে প্রবেশ করেন এবং শীঘ্রই প্রতিভাবলে আড়াই-হাজারী সেনানায়ক হন। সুলতান দায়ুদের সময়ে তিনি রাজমহলের যুদ্ধে বিশেষ সাহসিকতার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। দায়ুদের মৃত্যুর পর তাঁহার বহু সৈনিক ঈশা খাঁর আশ্রয় গ্রহণ করে। অতঃপর তিনি পূর্ব্ববঙ্গের সুবর্ণগ্রাম বা সোনারগাঁওয়ের অন্তর্গত খিজিরপুরে আসিয়া রাজত্ব স্থাপন করেন। শ্রীপুরের সুপ্রসিদ্ধ ভুঁইয়া চাঁদরায় ও কেদার রায়ের সহিত প্রথমে তাঁহার বন্ধুত্ব ছিল। কিন্তু চাঁদ রায়ের বিধবা কন্যা সোনামণিকে বিবাহ করায় সেই আঘাতে চাঁদ রায় শীঘ্রই মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং কেদার রায় প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য আজীবন বিদ্বেষবহ্নি জ্বালাইয়া রাখিয়াছিলেন। ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে ঈশা খাঁ সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করায় দিল্লীশ্বর কর্ত্তৃক শাহবাজ খাঁ তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরিত হন। শাহবাজ খাঁ বিশেষ কিছু করিতে পারেন নাই। অতঃপর মহারাজ মানসিংহ তাঁহাকে দমন করিতে আগমন করেন। ঈশা খাঁ খিজিরপুর হইতে হটিয়া সাতখামাইরের ১০ মাইল পূর্ব্বদিকে অবস্থিত এগার-সিন্ধু দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কথিত আছে ঈশা খাঁ মানসিংহকে সম্মুখ যুদ্ধে আহ্বান করেন এবং তাঁহার বীরত্বে ও সাহসিকতায় প্রীত হইয়া মানসিংহ তাঁহার সহিত সন্ধি করেন ও বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ হন। ঈশা খাঁ তখন মানসিংহের সহিত আগ্রায় গিয়া বাদশাহের নিকট হইতে ২২ পরগণার জমিদারী ও মস্নদ-ই-আলি উপাধি প্রাপ্ত হন। খিজিরপুরে একটি উদ্যান মধ্যে শ্বেত মর্ম্মর প্রস্তরের একটি সমাধি সম্রাট জাহাঙ্গীরের এক কন্যার বলিয়া প্রবাদ। ইহা কাহার সমাধি তাহা ঠিক জানা নাই। খিজিরপুর হইতে ৬ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে দেওয়ানবাগ নামক স্থানেও ঈশা খাঁর একটি দুর্গ ছিল; তাঁহার প্রপৌত্র মানোয়ার খাঁর এই স্থানে বাস ছিল। দেওয়ানবাগে একটি মৃত্তিকা স্তূপ হইতে খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর সাতটি কামান আবিস্কৃত হইয়াছে। এ গুলি ঢাকার চিত্রশালায় রক্ষিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে একটি কামান সম্রাট শের শাহের; তৎকর্ত্তৃক আনীত কনস্তানতিনোপ্ল্ নিবাসী সৈয়দ আহমদ নামক বিখ্যাত কারিগর কর্ত্তৃক ইহা নির্ম্মিত।

পানাম—নারায়ণগঞ্জ হইতে প্রায় ৮ মাইল পূর্ব্বদিকে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনার মধ্যস্থলে পানাম গ্রামটি আজ জঙ্গলাকীর্ণ হইলেও পূর্ব্বকালে প্রসিদ্ধ সুবর্ণগ্রাম বা সোনারগাঁও নগরী এই স্থানে অবস্থিত ছিল; গড় ও প্রাকারের ভগ্নাবশেষ এখনও এই স্থানে দৃষ্ট হয়। প্রবাদ মহারাজ জয়ধ্বজের সময়ে এই অঞ্চলে সুবর্ণ বৃষ্টি হইয়াছিল বলিয়া এই স্থান সুবর্ণগ্রাম নামে পরিচিত হয়। ইহা একটি বিস্তৃত ভূখণ্ড ছিল; ইহার উত্তরে ছিল পুরাতন ব্রহ্মপুত্র, পূর্ব্বে আড়িয়লখা (বাখরগঞ্জ জেলায় এই নামে বড় নদী আছে) ও মেঘনা এবং দক্ষিণে ও পশ্চিমে শীতলক্ষ্যা। মহম্মদ বিন্ বখ্তিয়ার খিল্জী কর্ত্তৃক গৌড় বা লক্ষ্মণাবতী অধিকৃত হইলে সেনবংশীয় রাজগণ প্রায় ১২০ বৎসর পর্য্যন্ত বিক্রমপুরের রামপাল ও সুবর্ণগ্রামে স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন। পশ্চিম হইতে নবাগত মুসলমানগণের ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব হইতে আরাকানের মগগণের বার বার আক্রমণে সেনরাজগণ ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া পড়েন এবং খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে পূর্ব্ব-বঙ্গ মুসলমান অধিকারে আসে। মধুসেন ও দনুজ মাধব বা দনুজরায় ব্যতীত সুবর্ণগ্রাম তথা পূর্ব্ব-বঙ্গের অপর স্বাধীন হিন্দু রাজার ঐতিহাসিক প্রমাণ বিশেষ নাই। মুসলমান যুগে রামপালের অবনতি ও সোনারগাওএর বিশেষ উন্নতি হয়। ১২৯৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬০৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইহা পূর্ব্ব-বঙ্গের মুসলমান শাসকবর্গের রাজধানী ছিল এবং এই স্থানে টাকশাল প্রতিষ্ঠিত ছিল। ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে আহোম, মগ ও পর্ত্তুগীজদের উৎপাত নিবারণার্থ

বাংলার রাজধানী রাজমহল হইতে ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়। তখন হইতে পূর্ব্ব-বঙ্গের শাসন কেন্দ্রও ঢাকায় অবস্থিত হয়। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে সুপ্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী ইবন বতুতা সোনারগাঁও আগমন করেন এবং তথা হইতে যবদ্বীপগামী একটি বাণিজ্য-পোত দেখিয়াছিলেন। ফক্রুদ্দীন এই সময়ে সোনারগাঁওএর সুলতান ছিলেন। ইবন বতুতা রাজপ্রাসাদ বিশেষ সুদৃঢ়ভাবে রক্ষিত দেখিয়াছিলেন; আজিও পরিখার উপরের একটি পুরাতন পুলের সম্মুখে তোরণদ্বারের ভগ্নচিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে ভ্রমণকারী র‍্যালফ ফিচ্ এই স্থানে আগমন করেন। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন সোনারগাঁওএর কাপাস-বস্ত্র ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাঁহার সময়ে সোনার গাঁওএর রাজা ছিলেন ঈশা খাঁ। পাঠান যুগে সোনারগাঁও হজরৎ-ই-জলাল নামে অভিহিত হইত। চীন্‌সম্রাট্ লুইতি রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া পলাতক হইলে তাঁহার শত্রুপক্ষ তাঁহার পশ্চাতে পশ্চিম মহাসাগরে যাত্রা করিয়া সোনা-উরকং ও পান-কো-লো নামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হন বলিয়া লিখিত আছে। সোনা-উরকং ও পান-কো-লো সোনারগাঁও ও বাংলা বলিয়া অনুমিত হয়।

পানামের নিকটেই সোনারগাঁওয়ের অন্তগত **মগরাপাড়া** গ্রামে মগ দীঘি নামক একটি জলাশয়ের তীরে গৌড়রাজ গিয়াস-উদ্দীন আজমশাহের সুন্দর কারুকার্য্য খচিত কষ্টিপাথরের সমাধি বিদ্যমান। সম্ভবতঃ পূর্ব্ব-বঙ্গের রাজধানী সোনারগাঁওএ অবস্থানকালে তাঁহার মৃত্যু হয়। সমাধির সিকি মাইল পশ্চিমে বাঘালপুর গ্রামের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে পাঁচপীরের দরগাহ নামে পাঁচটি দরগাহের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। এগুলি গয়েস্‌দি, সমসদ্দি, সিকন্দর, গাজী ও কালু নামক পাঁচজন যোদ্ধ ফকিরের নমাজের স্থান ও সমাধি বলিয়া কথিত। এ অঞ্চলে মাঝি মাল্লারা নদী পারাপারের সময়ে পীর বদরের সহিত পাঁচ পীরের নাম লইয়া থাকে। মগরাপাড়ায় পীর শাহ্ আব্‌দুল আলা বা পোকাই দেওয়ানের সমাধি বিশেষ পবিত্র গণ্য হয়; প্রবাদ ইনি ১২ বছর জঙ্গলমধ্যে গভীর তপস্যায় মগ্ন ছিলেন, আহারাদি করিতেন না এবং তাঁহার চারিদিকে প্রকাণ্ড উইঢিবি গড়িয়া উঠিয়াছিল। মগরাপাড়ার নিকটে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র কূলে পোড়ারাজা বা দ্বিতীয় বল্লাল সেন কর্ত্তৃক নির্ম্মিত একটি পাথরের রথের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। ইহার গাত্রে নানারূপ কারুকার্য্য খোদিত আছে। প্রবাদ রথ-দ্বিতীয়ার দিন একশত ব্রাহ্মণ রথটিকে টানিয়া লইয়া যাইতেন; কিন্তু অন্য কোনও দিন বহুশত লোকে মিলিয়াও ইহাকে নড়াইতে পারিত না।

পানামের নিকটে গোয়ালদী গ্রামে গৌড়েশ্বর হুসেন শাহের রাজত্বকালে ১৫১৯ খৃষ্টাব্দে মোল্লা আকবর খাঁ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি মসজিদ আছে। ইহা সোনারগাঁওএর প্রাচীনতম মসজিদ। ঘোর লাল রঙের ইট দিয়া মসজিদটি নির্ম্মিত এবং তিনটি গম্বুজের মধ্যকারটি নীল মর্ম্মর প্রস্তরের।

পানামের নিকটে আমিনপুর গ্রামে ক্রোড়ী বাড়ী বলিয়া একটি ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান। ইহা মহারাজ বল্লাল সেনের সেনাপতি বংশীয় বলরাম দাস নামক মুসলমান রাজাদের জনৈক কোষাধ্যক্ষের বাটী বলিয়া পরিচিত।

পানামের নিকটস্থ ঝিনারদি গ্রাম পূর্ব্বে দীনার দ্বীপ নামে অভিহিত হইত বলিয়া কথিত। দীনার দ্বীপের ষষ্ঠীবর সেন ও তৎপুত্র গঙ্গাদাস সেন কৃত রামায়ণ, মহাভারত ও পদ্মপুরাণের প্রাচীন পুঁথি পূর্ব্ব-বঙ্গের নানা স্থানে পাওয়া যায়। ষষ্ঠীবরের গুণরাজ খাঁ উপাধি ছিল। ডক্টর দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় লিখিয়াছেন—"ষষ্ঠীবরের রচনা সংক্ষিপ্ত সরল ও পরিপক্ক, কিন্তু তৎপুত্র গঙ্গাদাসের রচিত পদ্য চঞ্চল ও সুন্দর, তাহা বেশ চিত্তাকর্ষক; তত সংক্ষিপ্ত নহে কিন্তু বিস্তৃত হইয়াও মনোরম্য।"

সোনারগাঁয়ের অনেক স্থানে কোচ দিগের প্রতিষ্ঠিত দীঘি দেখিতে পাওয়া যায়।

সোনারগাঁয়ের "হরিদাস খানি" দই ও সরভাজা প্রসিদ্ধ।

লাঙ্গলবন্ধ—নারায়ণগঞ্জ হইতে ৪ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে পুরাতন ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম কূলে অবস্থিত। চৈত্রমাসে অশোকাষ্টমীর সময়ে দূরদূরান্তর হইতে বহুলোক এই স্থানে ব্রহ্মপুত্রে স্নান করিতে আসেন। এই সময়ে দুই তিন দিন স্থায়ী চৈত্রবারুণী নামে একটি মেলা বসিয়া থাকে; মেলায় লোকশিল্পের নিদশন স্বরূপ কিছু কিছু দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। অশোকাষ্টমী তিথিতে জগতের সকল তীর্থ, নদী ও সাগর ব্রহ্মপুত্র নদে উপনীত হয় বলিয়া কথিত। অনেকে এই সময়ে এক মাস ধরিয়া লাঙ্গলবন্ধে তীর্থাবাস করেন; ইহা প্রয়াগে কল্প বাসের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

কথিত আছে পরশুরাম মাতৃহত্যা করিলে তাঁহার কুঠারটি হস্ত হইতে আর বিচ্ছিন্ন হয় না; তখন পিতার আদেশে ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিয়া মাতৃহত্যা জনিত পাপ হইতে মুক্ত হন ও কুঠারটি হস্ত হইতে স্খলিত হয়। তখন তিনি মানবের কল্যাণের জন্য কুঠারটিকে লাঙ্গলরূপে ব্যবহার করিয়া ব্রহ্মকুণ্ডের জলরাশি সমতল ক্ষেত্রে লইয়া আসেন; কিন্তু এই স্থানে পৌঁছিয়া তাঁহার কুঠার বা লাঙ্গল আটকাইয়া যায়। ব্রহ্মপুত্রকে শীতলক্ষ্যার সহিত মিলিতে নিষেধ করিয়া তীর্থরাজে পরিণত করিবার মানসে পরশুরাম তীর্থযাত্রা করেন। ইতিমধ্যে ব্রহ্মপুত্র পরশুরামের অজ্ঞাতে শীতলক্ষ্যার দর্শনে গমন করেন। খবর পাইয়া শীতলক্ষ্যা বৃদ্ধার বেশে পথিমধ্যে বসিয়া থাকেন। ব্রহ্মপুত্র তাঁহাকেই আসিয়া জিজ্ঞাসা করেন শীতলক্ষ্যা আর কতদূরে। বৃদ্ধা তখন বলিলেন যে তিনিই শীতলক্ষ্যা, ব্রহ্মপুত্রের তাণ্ডবরবে ভীত হইয়া ছদ্মবেশ গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা শুনিয়া ব্রহ্মপুত্র লজ্জা পাইয়া লাঙ্গলবন্ধে ফিরিয়া গেলেন। তীর্থ হইতে ফিরিয়া পরশুরাম সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া ব্রহ্মপুত্রের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। অবশেষে ব্রহ্মপুত্রের অনুনয় বিনয়ে শান্ত হইয়া তিনি বলেন যে বৎসরে মাত্র একদিন অশোকাষ্টমী তিথিতে ব্রহ্মপুত্র নদ তীর্থরাজ হইবে ও ইহার পশ্চিম কূলে স্নান করিলে সকল তীর্থ স্নানের ফললাভ হইবে। ব্রহ্মপুত্রের পূর্ববতীরের স্থান পাণ্ডব-বর্জ্জিত বলিয়া কথিত।

লাঙ্গলবন্ধে জাগ্রত প্রাচীন জয়কালী দেবী ব্যতীত বহু দেবদেবী প্রতিষ্ঠিত আছেন। স্নান ঘাটের নিকট একটি বটতলা প্রেমতলা নামে খ্যাত; অশোকাষ্টমীর সময়ে বৈষ্ণবগণ এই স্থানে সমবেত হইয়া অহোরাত্র নামকীর্ত্তন করেন বলিয়া ইহার নাম প্রেমতলা। কথিত আছে পাণ্ডবগণ বনবাস কালে এই স্থানে আগমন করিয়াছিলেন। লাঙ্গলবন্ধ হইতে ৪ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিমকূলে পঞ্চমীঘাট নামক স্থানে তাঁহারা স্নান ও তর্পণ করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত; তথায় এখনও যাত্রীরা স্নান ও তর্পণ করিয়া থাকেন। অশোকাষ্টমীতে এই স্থানেও লোকে স্নান করিয়া থাকেন।

বারদী—মেঘনাকূলে নারায়ণগঞ্জ মহকুমার একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। নারায়ণগঞ্জ হইতে মেঘনা পথে ভৈরব হইয়া শ্রীহট্ট পর্য্যন্ত যে স্টীমার যায় ঐপথে বারদী স্টীমার ঘাট মাত্র ৪ ঘণ্টার পথ। এইগ্রামে সুপ্রসিদ্ধ সাধক লোকনাথ ব্রহ্মচারীর আশ্রম ছিল। তাঁহার সম্বন্ধে নানারূপ অলৌকিক ঘটনার কথা শোনা যায়। ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে পশ্চিম-বঙ্গের কোনও গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। কথিত আছে তাঁহার পিতা বংশের উদ্ধার-সাধন মানসে বালক লোকনাথকে উপবীত দিয়া আচার্য্য গুরু ভগবান গঙ্গোপাধ্যায়ের হাতে সন্ন্যাস জীবনের জন্য সঁপিয়া দিয়া চিরতরে বিদায় দেন। তিনি বহুকাল হিমালয়ে তপস্যা করিয়াছিলেন এবং আরবদেশ, ইউরোপ খণ্ড প্রভৃতি নানা স্থানে ভ্রমণ

করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত। তাঁহার দৃষ্টি এত প্রখর ছিল যে লোকে তাহা সহ্য করিতে পারিত না। তিনি জাতিস্মর ছিলেন ও সাময়িকভাবে দেহ ছাড়িয়া অন্যত্র গমন করিয়া পুনরায় দেহে ফিরিয়া আসিতেন বলিয়া কথিত।

চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষে বারদীতে ৭ দিন ধরিয়া মেলা হয়।

মুন্সীগঞ্জ—কলাগাছিয়া মোহানার দক্ষিণে নারায়ণগঞ্জ হইতে ৬ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে অবস্থিত। নারায়ণগঞ্জ হইতে গোয়ালন্দ ও ভৈরব-শ্রীহট্টগামী স্টীমার এখানে ধরে। ঢাকা জেলার ইহা অন্যতম মহকুমা। শহরের নিকটেই মীর জুমলার ইদ্রাক্‌পুর জলদুর্গের মধ্যে সদর-আলার বাসভবন অবস্থিত। মুন্সীগঞ্জের প্রায় অর্দ্ধ মাইল উত্তরে ধলেশ্বরী কলাগাছিয়া মোহানার দক্ষিণ কূলে সুপ্রসিদ্ধ ও সুবৃহৎ কার্ত্তিক বারুণীর মেলা বসিয়া থাকে। এ অঞ্চলে এত বড় মেলা আর কোথাও নাই। পূর্ব্বে এই মেলা কার্ত্তিক পূর্ণিমায় আরম্ভ হইত, এখন কিছু পরে আরম্ভ হইয়া ৩।৪ মাস স্থায়ী হয়; বহু দূরদেশ হইতে ব্যবসায়ীরা এখানে আসিয়া থাকে। মুন্সীগঞ্জে সম্প্রতি একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

সুবিখ্যাত বিক্রমপুর পরগণা মুন্সীগঞ্জ মহকুমার অন্তগত। বহুবার এই পরগণার সীমানা পরিবর্ত্তন হওয়ার জন্য ইহার কিয়দংশ বর্ত্তমানে ফরিদপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। উত্তরে ধলেশ্বরী নদী, দক্ষিণে ইদিলপুর পরগণা, পূর্ব্বে মেঘনা ও পশ্চিমে পদ্মা—সাধারণতঃ এই চতুঃসীমার অন্তর্গত ভূভাগ বিক্রমপুর নামে পরিচিত। বিক্রমপুরের বহু প্রাচীন কীর্ত্তি লোপ করায় এই অঞ্চলে পদ্মার নাম যে কীর্ত্তিনাশা হইয়াছে সে কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। বিক্রমপুর নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রবাদ যে প্রাচীন কালে এই স্থানে বিক্রম নামক জনৈক রাজার রাজ্য ছিল।

মুন্সীগঞ্জ হইতে তিন মাইল পশ্চিমে বিক্রমপুরের প্রাচীন রাজধানী **রামপাল** অবস্থিত। প্রবাদ অনুসারে পালবংশীয় নৃপতি রামপালদেবের নাম হইতেই এই স্থানের "রামপাল" নাম হইয়াছে। বিক্রমপুর অঞ্চলে যে এক সময়ে পাল রাজগণের আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছিল, বিক্রমপুরের বিভিন্ন প্রাচীন স্থান হইতে প্রাপ্ত পালযুগের বহু শিল্পদ্রব্য, প্রস্তরমূর্ত্তি ও মৃন্তাস্কর্য্য হইতে তাহার নিদর্শন আবিস্কৃত হইয়াছে। সেনবংশীয় নৃপতি বল্লাল সেনের সীতাহাটি তাম্রফলকে "স খলু শ্রীবিক্রমপুর সমাবাসিত শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারাৎ" এইরূপ লিখিত আছে। ঐতিহাসিকগণের মধ্যে অনেকে অনুমান করেন যে এই শ্রীবিক্রমপুর ও বর্ত্তমান রামপাল অভিন্ন।

মুন্সীগঞ্জের দেড় মাইল উত্তর-পশ্চিমে ধলেশ্বরীর দক্ষিণ-কূলে সুপ্রসিদ্ধ গঞ্জ **মীর কাদিম** অবস্থিত। মীর কাদিম হইতে আরও দেড় মাইল পশ্চিমে ফিরিঙ্গী বাজার গ্রাম। নবাব শায়েস্তা খাঁ চট্টগ্রাম অধিকার করিয়া ফিরিঙ্গী বন্দীদিগকে আনিয়া এই স্থানে বসতি স্থাপন করেন। এখানে একটি পুরাতন রোমান ক্যাথলিক গির্জ্জাঘর আছে।

বিক্রমপুরের বহু গ্রামে বৌদ্ধ ও হিন্দু দেবদেবী মূর্ত্তি অনেক আবিস্কৃত হইয়াছে। বহুকাল ধরিয়া সংস্কৃত চর্চা ও জ্যোতিষ শাস্ত্র আলোচনার জন্য বিক্রমপুরের প্রসিদ্ধি ছিল। বিক্রমপুরের পর নবদ্বীপে পঞ্জিকা প্রস্তুত আরম্ভ হয়। বিক্রমপুরের স্থানীয় সময় উজ্জয়িনী হইতে ইহার দেশান্তর দুই দণ্ড চৌত্রিশ পল ঠিক ভাবে গণনা করিয়া পঞ্জিকায় দেওয়া হইত। নবদ্বীপ ও কলিকাতায় পঞ্জিকা প্রস্তুত আরম্ভ হইলে তাহাতে বিক্রমপুরের স্থানীয় সময়ই

দেওয়া হয়। আধুনিক কালের দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, বিচারপতি স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ, বিজ্ঞানাচার্য্য স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু প্রভৃতি বাংলার বহু খ্যাতিমান পুরুষ বিক্রমপুরের লোক। বিপ্রকল্পলতিকা নামক গ্রন্থ অনুসারে সেনবংশীয় বিক্রম সেন বিক্রমপুরের প্রতিষ্ঠাতা। এ অঞ্চলের পাতক্ষীর, দই, সন্দেশ ও নারিকেলের জিরা-চিড়ার খ্যাতি আছে। বাংলার শেষ হিন্দু রাজবংশ রামপাল নগরে বহুকাল রাজত্ব করেন। এই স্থানে বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী চন্দ্রবংশীয় রাজা শ্রীচন্দ্রদেবের একখানি তাম্র-শাসন আবিস্কৃত হইয়াছিল। খড়গ বংশের পতনের পর চন্দ্রবংশীয় রাজগণ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। শ্রীচন্দ্রদেবের রাজধানী বিক্রমপুরে ছিল। তাঁহার মাতার নাম ছিল কাঞ্চনা। এই তাম্রশাসন দ্বারা শ্রীচন্দ্রদেব পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির নেহকাষ্ঠীগ্রামে পীতবাস গুপ্তশর্ম্মাকে ভগবান বুদ্ধের উদ্দেশে কিছু জমি দান করেন। "লঘুভারত" গ্রন্থ অনুসারে মহারাজ লক্ষ্মণসেন রামপালে জন্মগ্রহণ করেন। মহারাজ বল্লালসেন নির্ম্মিত বলিয়া কথিত একটি বৃহৎ প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ এখানে দেখিতে পাওয়া যায়; ইহা বল্লালবাড়ী নামে পরিচিত। রামপাল দীঘি, বল্লাল দীঘি প্রভৃতি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দীঘি এখানে বর্ত্তমান। গত শতাব্দীতে এই স্থানে একজন কৃষক মাটি খুঁড়িতে গিয়া ৭০ হাজার টাকা মূল্যের একখণ্ড হীরক পাইয়াছিল। রামপালের নিকট ধামদ গ্রামে একখানি সোনার পুঁথি পাওয়া গিয়াছিল, ইহার ২৪টি পাতার প্রত্যেকটি ৩০ ভরি ওজনের। রামপাল একটি বিস্তীর্ণ নগরী ছিল; ইহার নিকটস্থ পঞ্চসার, দেওভোগ, বজ্রযোগিনী, সুখবাসপুর জোড়াদেউল প্রভৃতি বহু স্থানে প্রাচীর গৃহাদির ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। কাহারও কাহারও মতে নালান্দা মহাবিহারের সুপ্রসিদ্ধ অধ্যক্ষ শীলভদ্র রামপালে জন্মগ্রহণ করেন। রামপালের সেনবংশের পতন সম্বন্ধে কথিত আছে সেনবংশীয় রাজা দ্বিতীয় বল্লালসেন যখন রাজা তখন একজন মুসলমান প্রজা ফকিরের আশীর্ব্বাদে পুত্র সন্তান লাভ করিয়া প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য রাজনিষেধ সত্ত্বেও একটি গোহত্যা করেন। এক টুকরা মাংস চিলে রাজপ্রসাদে নিক্ষেপ করিলে রাজা অনুসন্ধান করিয়া ঘটনার কথা জানিতে পারিয়া মুসলমান প্রজার শিশু পুত্রটিকে বধ করিতে আদেশ দেন। রাজাদেশে শিশুপুত্র নিহত হইলে শোকসন্তপ্ত পিতা মক্কাশরীফে গমন করেন; তথায় হজরৎ আদম তাঁহার করুণ কাহিনী শুনিয়া বহু অনুচর লইয়া রামপালের নিকট আসিয়া কয়েকটি গোবধ করেন। সুতরাং রাজা দ্বিতীয় বল্লালের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। কথিত আছে চৌদ্দ দিন যুদ্ধের পর হজরৎ আদম যখন সন্ধ্যায় নমাজ পড়িতেছিলেন সেই সময়ে দ্বিতীয় বল্লাল সহসা আসিয়া তরবারীর আঘাতে তাঁহাকে হত্যা করেন। যুদ্ধে আসিবার সময়ে দ্বিতীয় বল্লাল সঙ্গে করিয়া একটি শিক্ষিত পারাবত আনিয়াছিলেন এবং পরিবারবর্গকে বলিয়া আসিয়াছিলেন যে যুদ্ধে হারিয়া যাইলে তিনি পারাবতটি ছাড়িয়া দিবেন এবং প্রাসাদে উহা পৌঁছাইলে পরিবারবর্গ তাঁহার পরাজয়ের কথা জানিতে পারিবেন। হজরৎ আদমকে নিহত করিয়া দ্বিতীয় বল্লাল যখন দীঘিতে স্নান করিতেছিলেন সেই সময়ে পারাবতটি হঠাৎ ছাড়া পাইয়া রাজপুরীতে চলিয়া যায়। রাজ পরিজনের সকলে তখন একটি বৃহৎ অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। রাজা তাড়াতাড়ি গৃহে ফিরিয়া মনের দুঃখে নিজেও অগ্নিকুণ্ডে আত্মাহুতি দেন; এই জন্য তিনি পোড়া রাজা নামে পরিচিত। রামপালের রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষের মধ্যে অগ্নিকুণ্ড নামে একটি জলাশয় এখনও বিদ্যমান; উহা খনন করিলে বহু পরিমাণে অঙ্গার পাওয়া যায়। প্রবাদ এই অগ্নিকুণ্ডেই রাজা দ্বিতীয় বল্লালসেন সপরিবারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হন। রামপালের ঠিক উত্তরে কাজী-কস্‌বা গ্রামের দুর্গাবাড়ী নামক স্থানে আদম শহীদ বা বাবা আদমের মসজিদ ভগ্নাবস্থায় দণ্ডায়মান আছে। ইহার শিলালেখ হইতে জানা যায় যে ১৪৮৩ খৃষ্টাব্দে ইহা সুলতান জলালউদ্দীন ফতে শাহের রাজত্বকালে মালিক কাফুর কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। ইহা ঢাকা জেলার প্রাচীনতম

মসজিদ; মসজিদের প্রবেশ দ্বারের নিকটে দুইটি প্রস্তর স্তম্ভ হিন্দু মুসলমান রমণীগণ কর্ত্তৃক সিন্দুর লিপ্ত হইয়া থাকে। বামপার্শ্বের পশ্চিমে আবদুল্লাপুর ও পাইকপাড়া গ্রামের মধ্যে কানাইচঙ্গের মাঠ নামে একটি ক্ষুদ্র প্রান্তর দৃষ্ট হয়। কথিত আছে এই স্থানে রাজা দ্বিতীয় বল্লালসেনের সহিত মুসলমানদিগের যুদ্ধে কানাইচঙ্গ নামক একজন সৈনিক দ্বিতীয় বল্লালের পক্ষে বিশেষ সাহস ও দক্ষতা প্রদর্শন করেন এবং তাঁহার নাম হইতে যুদ্ধক্ষেত্র কানাইচঙ্গের মাঠ নামে পরিচিত হয়। ইহা আবদুল্লাপুরের যুদ্ধ নামে অভিহিত। কাহারও কাহারও মতে এই যুদ্ধেই দ্বিতীয় বল্লালসেন নিহত হন এবং তাহার পর হইতে পূর্ব্ব-বঙ্গে হিন্দু রাজত্বের অবসান হয়। আবদুল্লাপুর গ্রামে মহারাজ বল্লাল সেন নির্ম্মিত মীর কাদিম খালের উপর একটি পুরাতন সাঁকো আজিও বিদ্যমান।

বিক্রমপুরের রাজধানী রামপাল নগরীর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে সুপ্রসিদ্ধ **বজ্রযোগিনী** গ্রাম অবস্থিত। এই গ্রামটিকে একটি ছোটখাট পরগণা বলা যাইতে পারে; ইহা সাতাইশটি পাড়ায় বিভক্ত। ইহার এক একটি পাড়া এক একখানি গ্রামের সমান। এই গ্রামের বিভিন্ন পাড়ায় তিনটি ডাকঘর আছে; ইহা হইতেই গ্রামখানির বিশালতা অনুমান করা যাইতে পারে। অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে এই গ্রাম সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধাচার্য্য দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশের জন্মস্থান। এই গ্রামে ৯৮০ খৃষ্টাব্দে বিশিষ্ট বৌদ্ধ জ্ঞানী ও পণ্ডিত দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ এক রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া কথিত। তাঁহার পিতার নাম কল্যাণশ্রী ও মাতার নাম প্রভাবতী। বার বছর ধরিয়া দীপঙ্কর সুপ্রসিদ্ধ বজ্রাসন বিহারে অধ্যয়ন করেন। পরে তৎকালের প্রাচ্য বৌদ্ধদের সর্ব্বপ্রধান স্থান সুবর্ণদ্বীপের (ব্রহ্মের পেগু জেলার সুধর্ম্ম নগর—বর্ত্তমান নাম থেটন) মহাসংঘিকাচার্য্যের নিকট আরও বার বছর অধ্যয়ন করিয়া দেশে ফিরিয়া আসেন। তৎকালে তাঁহার ন্যায় বৌদ্ধপণ্ডিত দ্বিতীয় ছিল না। মহারাজ নয়পাল তাঁহাকে বিক্রমশিলা মহাবিহারের সর্ব্বাধ্যক্ষ পদে বরণ করেন। তথা হইতে তিব্বতীয়গণ কর্ত্তৃক সনির্ব্বন্ধ অনুরুদ্ধ হইয়া তিনি তিব্বতে গমন করিয়া তথায় বৌদ্ধধর্ম্ম পুনরুজ্জীবিত করেন। তিববতে তাঁহার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। তিববতে দীপঙ্কর প্রতিষ্ঠিত বজ্রযোগিনী মূর্ত্তির নামকরণ স্পষ্টতঃই তাঁহার জন্মস্থানের নাম হইতেই হইয়াছে। দীপঙ্কর শতাধিক পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র দান-শ্রীও অসাধারণ পণ্ডিত বলিয়া খ্যাত ছিলেন। বজ্রযোগিনী গ্রামে দীপঙ্করের গৃহ এখনও নাস্তিক পণ্ডিতের বাড়ী বলিয়া পরিচিত।

রামপালের দেড় মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে রঘুরামপুর গ্রামে বিক্রমপুরের চাঁদরায় কেদার রায়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে রঘুরাম রায় নামে একজন স্থানীয় রাজা ছিলেন। তাঁহার বীর সেনাপতি রাম মালিক পল্লী কবিতায় স্থান পাইয়াছেন,—

রাম মালিকের লাঠি।
রঘু রামের মাটি।।
উঠ্‌লে লাঠির ডাক।
দৌড়ে পলায় বাঘ।।
গুলি ফিরে ঝাঁকে।
রামের লাঠির পাকে।।
মালিক ধরে লাঠি।
যম যেন সে খাটি।।

(ঢাকার ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, ৪৯৮ পৃষ্ঠা, যতীন্দ্র মোহন রায়)

রঘুরামপুরের পশ্চিমে সুখবাসপুর গ্রামের দীঘির ধারে রাজা রঘুরায়ের একটি প্রমোদ ভবন ছিল বলিয়া গ্রামটির নাম সুখবাসপুর হয় বলিয়া কথিত। এই গ্রামে একটি সুন্দর তারা মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছিল।

মুন্সীগঞ্জ হইতে ৬ মাইল দক্ষিণে সেরাজাবাদ গ্রামে বিক্রমপুরের বাউল সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক সুধারাম বাউলের আখড়া অবস্থিত। তাঁহার রচিত বহু বাউল সঙ্গীত এ অঞ্চলে চলিত আছে। সেরাজাবাদ হইতে প্রায় ৩ মাইল আরও দক্ষিণে কামারখাড়া গ্রামের উচচ মঠটি এ অঞ্চলে প্রসিদ্ধ; এই গ্রামে একটি দীঘির সংস্কারকালে লব্ধ অতি সুন্দর রজত-নিৰ্ম্মিত শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম ধারী একটি চতুর্ভুজ ত্রিবিক্রম মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন। পদ্মের উপর দণ্ডায়মান মূর্ত্তিটি সর্ব্বশুদ্ধ ১৪ ইঞ্চি। দুই পার্শ্বে রজত নিৰ্ম্মিত লক্ষ্মী ও সরস্বতী মূর্ত্তি; পাদদেশে অষ্টধাতুর গরুড় ও উপরে অষ্টধাতুর চাল বিদ্যমান। বিগ্রহটি সম্বন্ধে নানারূপ অলৌকিক ঘটনার কাহিনী প্রচলিত আছে।

ঢাকা—নারায়ণগঞ্জ হইতে ১০ মাইল দূর। বুড়ী-গঙ্গা নদীর উত্তরকূলে অবস্থিত ঢাকা একটি প্রাচীন নগরী। গোয়ালন্দ-নারায়ণগঞ্জ ষ্টীমার পথ ব্যতীত কলিকাতা হইতে সিরাজগঞ্জ ঘাট ট্রেণে, তথা হইতে জগন্নাথগঞ্জ ষ্টীমারে ও জগন্নাথগঞ্জ হইতে ট্রেণে কিংবা তিস্তামুখ ঘাট পর্য্যন্ত ট্রেণে, তথা হইতে বাহাদুরাবাদ ষ্টীমারে এবং বাহাদুরাবাদ হইতে ঢাকা পর্য্যন্ত ট্রেণে আসা যায়। খৃষ্টীয় ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় পর্য্যটকগণ বেঙ্গালা নামে একটি বৰ্দ্ধিষ্ণু নগরীর উল্লেখ করিয়াছেন, কাহারও কাহারও মতে ঢাকা ও বেঙ্গালা একই শহর। সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে সুবাদার ইসলাম খাঁ কর্ত্তৃক ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে বাংলার রাজধানী রাজমহল হইতে ঢাকায় স্থানান্তরিত করিবার পূর্ব্ব হইতেই যে ঢাকা নগরীর প্রাধান্য ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার পূর্ব্বে মহারাজ মানসিংহ এখানে কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। ইসলাম খাঁ আসিবার বহু পূর্ব্বে এই স্থানে দুইটি প্রাচীন মস্জিদ প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং ঢাকার সুপ্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী বসাকগণ বাণিজ্য উপলক্ষে এইস্থানে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। রাজধানী স্থানান্তরের কারণ ছিল রাজমহলের নিকট গঙ্গার গতি পরিবর্ত্তনে ব্যবসায়ের অসুবিধা ও পর্ত্তুগীজ, মগ ও আহোমদের আক্রমণ হইতে বাংলার পূর্ব্বপ্রান্ত রক্ষার সুব্যবস্থা করা। সম্রাটের নাম অনুসারে রাজধানী ঢাকা জাহাঙ্গীরনগর নামে পরিচিত হয়। ইসলাম খাঁর নাম হইতে ঢাকা শহরের নবাবপুর ও ইসলামপুর মহাল্লার নাম হইয়াছে। ১৬১৩ খৃষ্টাব্দে ঢাকায় তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার মৃতদেহ তাঁহার জন্মস্থান ফতেপুর-শিক্রীতে লইয়া গিয়া সমাহিত করা হয়। তাঁহার পর তাঁহার ভ্রাতা কাশিম খাঁ কয়েক বৎসর সুবাদার ছিলেন এবং ১৬১৮ খৃষ্টাব্দে সম্রাজ্ঞী নূর জাহানের ভ্রাতা ইব্রাহিম খাঁ ফতেজঙ্গ কাশিমের পরিবর্ত্তে সুবাদার নিযুক্ত হন। পাঁচ বৎসর শান্তিতে শাসন করিবার পর বিদ্রোহী রাজকুমার শাহ্জাহানের সহিত যুদ্ধে তিনি নিহত হন; শাহ্জাহান অল্পকালের জন্য ঢাকায় বাস করিয়াছিলেন। শাহ্জাহান বাংলা ত্যাগ করিলে পর পর কয়েকজন সুবাদারের পর ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে ইসলাম খাঁ মশদী সুবাদার নিযুক্ত হন। ইনি চট্টগ্রাম অধিকার করিয়া উহার নাম ইসলামাবাদ রাখেন। পর বৎসর ১৬৩৯ খৃষ্টাব্দে সম্রাট শাহ্জাহান ইসলাম খাঁকে দিল্লীতে উজির পদে নিযুক্ত করেন এবং পুত্র শাহ্ শুজাকে বাংলার সুবাদার করিয়া প্রেরণ করেন। শাহ্ শুজা ঐ বৎসরই রাজধানী পুনরায় রাজমহলে লইয়া যান। কুড়ি বৎসর দক্ষতার সহিত শাসন করিবার পর পিতার কঠিন পীড়া হইলে সিংহাসন লইয়া ভ্রাতৃবিরোধ উপস্থিত হয় ও ভ্রাতা আওরঙ্গজেবের সেনাপতি মীর জুমলা কর্ত্তৃক শাহ্ শুজা পরাজিত হইয়া

সপরিবারে আরাকান রাজের আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং আরাকানেই তাঁহার মৃত্যু হয়। মীর জুমলা বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হইয়া রাজধানী ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে আবার ঢাকায় আনয়ন করেন।

মীর জুমলার মৃত্যুর পর ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে সম্রাজ্ঞী মমতাজমহলের ভ্রাতা ও নূরজাহানের ভ্রাতুষ্পুত্র শায়েস্তা খাঁ বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হন। তাঁহার সময়ে ঢাকা উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করে। সুদীর্ঘকাল শাসন করিয়া ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে তিনি অবসর গ্রহণ করেন এবং অল্পকাল পরেই আগ্রায় পরলোক গমন করেন। অতঃপর বাহাদুর খাঁ, ইব্রাহিম খাঁ ও আওরঙ্গজেবের পৌত্র আজিম উশ্‌সান ঢাকায় সুবাদার নিযুক্ত হন। ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে আজিম উশসানের সহিত দেওয়ান মুর্শিদ কুলী জাফর খাঁর মনোমালিন্য হেতু মুর্শিদকুলী খাঁ রাজধানী মুর্শিদাবাদে লইয়া যান এবং আজিম উশসান্ বিহারের সুবাদার নিযুক্ত হন। তখন হইতে ঢাকার শাসনভার নায়েব নাজিমদের উপর অর্পিত হয়। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি দেওয়ানী পদ পাইলে তৎকালীন ঢাকার নায়েব নাজিম নবাব জসারৎ খাঁর শাসন ক্ষমতা লুপ্ত হয় এবং তিনি মাসোহারা প্রাপ্ত হন। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে গাজী উদ্দীন হায়দার বা পাগলা নবাবের মৃত্যুর পর তাঁহার সন্তানাদি না থাকায় নবাব নাজিমের পদ উঠিয়া যায়। দেনার দায়ে তাঁহার সম্পত্তি বিক্রীত হইয়া যায়; তাঁহার একটি হাওদা নবাবপুরের বসাকগণ ক্রয় করেন এবং জন্মাষ্টমীর মিছিলের সময়ে উহা এখনও বাহির করা হয়। তারিখ-ই-ঢাকা অনুসারে ঢাকা নগরীর চরম উন্নতির সময়ে পশ্চিমে জাফরাবাদ হইতে পোস্তগোলা পর্য্যন্ত ১০ মাইল ও উত্তরে টঙ্গ নদী পর্য্যন্ত ১৫ মাইল বিস্তৃত ছিল এবং ইহার লোকসংখ্যা ছিল ৯,০০,০০০। ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে টাভার্ণিয়ার ঢাকায় আগমন করেন। ১৯০৫ হইতে ১৯১২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ঢাকা পূর্ব্ব-বঙ্গ ও আসাম নামক নবগঠিত ও অল্পকালস্থায়ী প্রদেশের রাজধানী ছিল।

ঢাকার বর্ত্তমান সুপ্রসিদ্ধ নবাব বংশের সহিত পুরাতন ঢাকার নায়েব-নাজিম প্রভৃতিদের কোনই সম্পর্ক নাই। দিল্লীর সম্রাট্ মহম্মদ শাহের সময়ে খাজা আব্দুল হাকিম নামে এক ব্যক্তি কাশ্মীরের সুবাদার ছিলেন। ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে নাদের শাহ্ যৎকালে দিল্লী নগরী ধ্বংস করেন সে সময়ে খাজা আব্দুল হাকিম তথায় উপস্থিত ছিলেন এবং তথা হইতে পলাইয়া শ্রীহট্টে গিয়া বাসস্থাপন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা মৌলবী আবদুল্লা ঢাকায় আসিয়া ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করেন এবং প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করেন। এইরূপে ঢাকার নবাব বংশের আরম্ভ হয় বহু দিন পর্য্যন্ত ইহারা চামড়া ও সোনার কারবার করিয়া পরে ভূসম্পত্তি অর্জ্জন করেন এবং ক্রমে বাংলার অন্যতম প্রধান ভূম্যধিকারী হন। এই বংশের নবাব স্যার আব্দুল গনি, স্যার আহ্‌সান উল্লা ঢাকা শহরের উন্নতিকল্পে বহু অথ দান করিয়াছিলেন। ঢাকায় ইঁহাদের নাম স্মরণীয় হইয়া আছে। এখনও ইঁহারা বৎসরে কম করিয়া ৬৫,০০০ হাজার টাকা ধর্ম্ম ও সেবা কার্য্যে ব্যয় করিয়া থাকেন।

মুঘলদের সময়ে মগেরা ঢাকা ২১৩ বার লুণ্ঠন করে। পলাশী যুদ্ধের পর সন্ন্যাসী বিদ্রোহের সময় ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে ঢাকা নগরী লুণ্ঠিত হয়।

ঢাকা নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানারূপ মত আছে। ঢাকার অধিষ্ঠাত্রীদেবী ঢাকেশ্বরী হইতে ঢাকা নাম হইয়াছে বলিয়া অনেকে মনে করেন; কিন্তু ঢাকেশ্বরী হইতে ঢাকা বা ঢাকা হইতে ঢাকেশ্বরী নাম হইয়াছে তাহা বলা শক্ত। কিংবদন্তী যে সতী দেহ বিষ্ণুচক্রে বিচ্ছিন্ন হইলে তাঁহার

কিরীটের "ডাক" এই স্থানে পতিত হয়। "ডাক" স্থানীয় শব্দ; কারুকার্য্য প্রতিফলিত করিবার জন্য জড়োয়া গহনার নীচে "ডাক" বসানো হইয়া থাকে। "ডাক" পতিত হওয়ায় স্থানটি একটি উপপীঠ বলিয়া গণ্য হয় এবং ঢাকা নাম প্রাপ্ত হয় এবং দেবী ঢাকেশ্বরী নামে পরিচিত হন। অন্যমতে ঢাকেশ্বরী দেবী "ঢাকা" বা গুপ্ত ছিলেন; মহারাজ বল্লাল সেন তাঁহাকে আবিষ্কার করিয়া প্রতিষ্ঠিত করেন এবং পূর্ব্বে 'ঢাকা' ছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম ঢাকেশ্বরী হয়। কেহ কেহ বলেন ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে সুবাদার ইসলাম খাঁ যখন রাজমহল হইতে এই স্থানে রাজধানী লইয়া আসেন তখন তাঁহার শিবির হইতে ঢাক বাজাইয়া যত দূর পর্য্যন্ত তাহা শোনা গিয়াছিল তত দূর রাজধানীর সীমা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল এবং এই জন্য শহরের নাম হয় ঢাকা। কেহ বা বলেন ঢাক নামক গাছ্ হইতে ঢাকা নাম হইয়াছে; আজকাল কিন্তু ঢাক গাছ্ ঢাকা শহরে বিশেষ দৃষ্ট হয় না।

বর্ত্তমান ঢাকা নগরী দৈর্ঘ্যে ৪ মাইল ও প্রস্থে ১ হইতে ২ মাইল। ইহা বাংলার দ্বিতীয় শহর। ঢাকার দ্রষ্টব্য স্থান গুলির মধ্যে প্রথমেই বুড়ীগঙ্গা তীরে বাক্ল্যাণ্ড বাঁধের উল্লেখ করিতে হয়। ইহার দৃশ্য সত্যই সুন্দর বিশেষতঃ বর্ষাকালে যখন নদী কানায় কানায় ভরিয়া উঠে। ইহার জন্যই ঢাকাকে কেহ কেহ প্রাচ্যের ভিনিস্ বলিয়া থাকেন। বাঁধের পশ্চিম প্রান্তে ঢাকার নবাবদের বৃহৎ ও সুদৃশ্য আধুনিক প্রাসাদ **আহসান মঞ্জিল** অবস্থিত। বাঁধের পূর্ব্ব প্রান্তেও সুন্দর অট্টালিকা দেখিতে পাওয়া যায়। এই বাঁধের উপরই ঢাকার সুপ্রসিদ্ধ নর্থব্রুক হল অবস্থিত; নিকটেই বাঁধের উপর একটি পুরাতন বড় কামান রক্ষিত আছে। বাঁধের ধারে ধারে সুন্দর সুন্দর বাসভবন প্রভৃতি অবস্থিত; ইহাদের মধ্যে সুদৃশ্য প্রাচীন ইমারত বড় কাট্রা ও ছোট কাট্রা উল্লেখযোগ্য। সুপ্রসিদ্ধ শাহ্ শুজা বড় কাট্রা নামক সরাইখানাটি নির্ম্মাণ করেন। বড় কাট্রার নিকটেই শায়েস্তা খাঁ নির্ম্মিত সরাইখানা ছোট কাট্রার মধ্যে বিবি চম্পার সমাধি দৃষ্ট হয়; তিনি কে ছিলেন জানা যায় নাই; তাঁহার নাম হইতে স্থানটি চাঁপাতলি নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। বড় কাট্রার ঠিক্ সম্মুখে বুড়ীগঙ্গার অপর পারে জিঞ্জিরায় বাংলার সুবাদার ইব্রাহিম খাঁ কর্ত্তৃক ১৬২০ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। এই **জিঞ্জিরার প্রাসাদেই** পলাশীর যুদ্ধের পর আলিবর্দ্দী দুহিতা ঘেসেটি ও আমিনা বেগম ও সিরাজউদ্দৌলার বেগম ও শিশুকন্যা বন্দিনী ছিলেন। মীরজাফরের পুত্র মীরণ মুর্শিদাবাদে লইয়া যাইবার ছল করিয়া ধলেশ্বরী নদীতে নৌকা ডুবাইয়া ইঁহাদের হত্যা করেন বলিয়া কথিত; মৃত্যুকালে ঘেসেটি ও আমিনা বেগম মীরণকে বজ্রাঘাতে মৃত্যুর অভিশাপ দেন। মীরণ বজ্রাঘাতেই প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত। বুড়ীগঙ্গার তীর হইতে প্রত্যহ গহনার নৌকা মাণিকগঞ্জ, ধামরাই, বহর, তালতলা, লৌহজঙ্গ, শ্রীনগর, কলাকোপা প্রভৃতি স্থানে যাতায়াত করে।

বাকল্যাণ্ড বাঁধ ছাড়িয়া একটি রাস্তা নদীর সমান্তরালে পশ্চিমে পটুয়াটুলি, ইসলামপুর, বাবুবাজার, মুঘলটুলি, চক বাজার হইয়া শহরের প্রান্তে লালবাগ পর্য্যন্ত গিয়াছে। আর একটি প্রধান রাস্তা বাকল্যাণ্ড বাঁধ হইতে উত্তরে কাছারি প্রভৃতি হইয়া রেলওয়ে স্টেশনের দিকে গিয়াছে। ইহা নবাবপুর রাস্তা নামে পরিচিত। নবাবপুর, উয়ারি, তাঁতিবাজার, বাংলা বাজার, সূত্রপুর, লক্ষ্মী বাজার, শাঁখারি বাজার, আরমানিটোলা, কায়েতটুলি, রমনা প্রভৃতি মহাল্লার নাম ঢাকার বাহিরেও পরিচিত। নবাবপুর রাস্তার নিকটে মানোয়ার খাঁর বাজার সুপ্রসিদ্ধ ঈশা খাঁ মসনদ-ই-আলির প্রপৌত্রের নাম বহন করিতেছে। চক বাজারের বড় চক-মসজিদটি ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দে শায়েস্তা খাঁ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়; এই মস্জিদে চওড়া ও বড় কিন্তু অনুচ্চ খিলানগুলি আওরঙ্গাবাদ ও আহমদ নগরের

রীতি অনুসারে শায়েস্তা খাঁ এদেশে প্রচলন করেন ; এজন্য ইহা শায়েস্তাখানী ধরণ নামে পরিচিত। মুর্শিদাবাদের সুপ্রসিদ্ধ কাট্‌রা মসজিদ এই ধরণে নির্ম্মিত। বুড়ীগঙ্গার তীরের মত চকবাজারেও মুঘল যুগের একটি তোপ পড়িয়া আছে। বাবু বাজারে শায়েস্তা খাঁ নির্ম্মিত আর একটি মসজিদ আছে। চক বাজারের নিকট যে স্থানে এখন জেল-হাসপাতাল অবস্থিত ঐ স্থানে মুঘল আমলে ইসলাম খাঁর দুর্গে টাকশাল ছিল। এই টাকশালে ঈস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির টাকাও মুদ্রিত হইয়াছিল। শহরের নারিন্দা মহাল্লায় ১৪৫৬ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত বিনট বিবির মসজিদ ঢাকার সর্ব্বপেক্ষা পুরাতন মসজিদ। মুর্শিদকুলী খাঁ নির্ম্মিত বেগম বাজারের মসজিদ ঢাকার সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ মস্‌জিদ ; ইহা দেখিতেও অতি সুন্দর। আরমানি টোলায় ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত আরমানি গির্জ্জাটি সুবৃহৎ। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বহু আর্ম্মেনীয় বাণিজ্যসূত্রে ঢাকায় আগমন করেন। রেল স্টেশনের সম্মুখেই খাজা আম্বরের মসজিদ ও কূপ দেখিতে পাওয়া যায় ; খাজা আম্বর শায়েস্তা খাঁর প্রধান খোজা ছিলেন।

স্টেশনের পরই বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকা ও রমনা মহাল্লার আরম্ভ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভূত-পূর্ব্ব ঢাকা কলেজ ও জগন্নাথ কলেজ ভাঙ্গিয়া গড়া হইয়াছে। পুরাতন ঢাকা কলেজের বাড়ীতে এখন ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল অবস্থিত। জগন্নাথ ইণ্টারমিডিয়েট্ কলেজ উহার কাছে একটি বৃহৎ ও সুন্দর অট্টালিকায় বিদ্যমান। বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকাটি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ও অতি সুন্দর। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস ও কলেজ ভবনগুলি দেখিবার মত। নিকটেই ঢাকার চিত্রশালা ; ইহা নায়েব-নাজিম নবাব জসারৎ খাঁর প্রাসাদের বার-দুয়ারী বা বৈঠকখানায় অবস্থিত ; চিত্রশালার ছাদে এখনও নবাবী আমলের পুরাতন চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। এই চিত্রশালায় বিক্রমপুর প্রভৃতি অন্যান্য স্থানের প্রাচীন মূর্ত্তি প্রভৃতি রক্ষিত আছে এবং ঢাকা ভ্রমণকারীর ইহা অবশ্যই দ্রষ্টব্য।

শহরের উত্তর-পশ্চিম কোণে ঢাকার অধিষ্ঠাত্রী দেবী ঢাকেশ্বরীর মন্দির অবস্থিত ; ইহার কথা কিছু আগে বলা হইয়াছে। ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ডে ঢাকেশ্বরীর উল্লেখ আছে। ঢাকেশ্বরী মন্দির মহারাজ বল্লাল সেন কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বলিয়া প্রবাদ। কথিত আছে, তাঁহার জননী নির্ব্বাসিতা হইয়া ঢাকার ১২ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে স্থিত রাণী-ঝি গ্রামে বাস করিতেন ; তাঁহাকে লোকে রাণী-ঝি বলিয়া ডাকিত এবং সেই জন্য গ্রামটির নামও রাণীঝি হয় ; বনমধ্যে এই গ্রামে বল্লাল সেন জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম বন-লাল বা বল্লাল হয়। ইহার নিকট লক্ষ্মণ-খোলা গ্রামে মহারাজ লক্ষ্মণ সেন একটি হাট বসাইয়াছিলেন বলিয়া কথিত। এই অঞ্চলের সহিত মহারাজ বল্লালের সম্বন্ধ জনপ্রবাদ দ্বারা সূচিত হয়। ঢাকেশ্বরীর মন্দির বহুবার সংস্কৃত হইলেও উহার পশ্চাদ্ভাগ প্রায় আদি ও অবিকৃত অবস্থায় আছে। ঢাকেশ্বরী সম্বন্ধে অপর কাহিনী প্রচলিত আছে যে মহারাজ মানসিংহ শ্রীপুরের কেদার রায়কে পরাস্ত ও নিহত করিয়া তাঁহার গৃহদেবী শিলাময়ীকে লইয়া প্রথমে ঢাকায় আসেন এবং তথায় ঠিক্ অনুরূপ আর একটি মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করান। আসল ও নকল মূর্ত্তিতে ভেদ ধরিবার উপায় ছিল না। মানসিংহ কেদার রায়ের শিলাময়ীকে জয়পুরে লইয়া যান এবং অপরটি ঢাকেশ্বরী নামে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত করেন।

শহরের উত্তরে মালীবাগ নামক স্থানে বারভুঁইয়ার অন্যতম চাঁদরায় প্রতিষ্ঠিত বলিয়া কথিত সিদ্ধেশ্বরী মন্দির অবস্থিত। মন্দিরের সম্মুখে একটি রক্ত চন্দন গাছ আছে। সিদ্ধেশ্বরীর পূজারী সৌমার বন গোস্বামী স্বয়ং সিদ্ধপুরুষ ছিলেন বলিয়া কথিত। একবার আজিমপুরার সাধকপ্রবর শাহ্

আলি সাহেব ব্যাঘ্র পৃষ্ঠে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে তিনি নাকি একটি প্রাচীরে চড়িয়া প্রাচীর শুদ্ধই শাহ্ আলি সাহেবের নিকট আগাইয়া গিয়াছিলেন। সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরের পার্শ্বে ঘন বৃক্ষাচ্ছাদিত একটি জলাশয় ও কয়েকটি পুরাতন মন্দির আছে; উহা মালীবাগের আখ্ড়া নামে খ্যাত।

শহরের উত্তরে রমনার ময়দানে বুড়া শিব ও রমনার কালী প্রতিষ্ঠিত আছেন। বুড়া শিব ঢাকার সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন দেবতা; কেহ কেহ বলেন ইনি শঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। ইহা ঠিক হইলে বুড়া শিবের বয়স দেড় হাজার বছর হইবে। রমনার কালী শঙ্করাচার্য্য সম্প্রদায়ের দশনামী উদাসীন সন্ন্যাসীদের মঠের মধ্যে অবস্থিত; ইঁহার পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম্ম। মন্দিরটি যে রীতিতে গঠিত পূর্ব্ব-বঙ্গেও সেরূপ মন্দির বেশী দেখিতে পাওয়া যায় না। বহরের নিকট অধুনালুপ্ত রাজাবাড়ী মঠ ও রাজনগরে রাজ বল্লভের একুশরত্ন মন্দিরে চূড়া এই ধরণের ছিল। কালী মন্দিরের প্রাঙ্গনে একটি বৃহৎ প্রস্তর-খণ্ড সাধক ব্রহ্মানন্দ গিরির সিদ্ধাসন বলিয়া পূজা পাইয়া থাকে। প্রবাদ তাঁহার প্রস্তরাসন খানি লইয়া উমা ও তারা দেবী মিলিয়া ভক্তের সাথে সাথে চলিতেন আর লোকে দেখিত যে ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে প্রস্তরখানি শূন্য দিয়া ভাসিয়া চলিয়াছে।

রমনার কালীবাড়ীর পশ্চিমে ফুলার রোডের দক্ষিণে একটি পুরাতন শিখ সঙ্গত আছে। প্রাচীর-বেষ্টিত সঙ্গতটির প্রাঙ্গনে বহু শিখ মোহান্তের সমাধি বর্ত্তমান। একটি কক্ষে "গ্রন্থ সাহেব" ও কালো পাথরে অঙ্কিত গুরু নানকের পদচিহ্ন রক্ষিত আছে। প্রাঙ্গনে গুরু নানকের ইন্দারা নামে পরিচিত একটি অষ্টকোণ কূপ আছে; প্রবাদ গুরু নানক একবার ঢাকায় আসিয়াছিলেন এবং এই কূপ হইতে জল পান করিয়াছিলেন এবং এই কারণে ইহার জলের রোগ-শান্তির ক্ষমতা আছে বলিয়া লোকের বিশ্বাস। গুরুমুখীতে লিখিত কূপের একটি প্রস্তর ফলক হইতে জানা যায় যে মোহান্ত প্রেমদাস কর্ত্তৃক ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে ইন্দারাটির একবার সংস্কার হয়। কেহ কেহ বলেন সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে নবম গুরু তেগ বাহাদুর ঢাকায় আসিয়া এই সঙ্গতটি প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তাঁহার অনেক শিষ্য হইয়াছিল। কেহ বা বলেন ষষ্ঠগুরু হর গোবিন্দের সময়ে নথা সাহেব ধর্ম্ম-প্রচারের জন্য ঢাকায় আগমন করেন এবং তিনিই এই সঙ্গত প্রতিষ্ঠা করেন; সঙ্গতটি নথা সাহেবের সঙ্গত নামেও পরিচিত।

রমনা ময়দানের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত হাজী খাজে সাহাবাজের মস্জিদটি ১৬৭৮ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়; ইহার তিনটি গুম্বজ ও আটটি চূড়া আছে। মসজিদের পার্শ্বে সাহাবাজের সমাধি অবস্থিত। সাহাবাজ কাশ্মীর হইতে আগত বণিক ছিলেন।

রমনার ময়দানের নিকট ১৮২১ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত গ্রীকদের গির্জ্জা অবস্থিত।

শহরের উত্তর দিকে হুসেনী দালান মুসলমান যুগের সুপ্রসিদ্ধ কীর্ত্তি চিহ্ন। শিয়া সম্প্রদায়ের এই ইমামবাড়ীটি শাহ্ শুজার শাসন কালে ঢাকার "মীর-ই-বহর" বা নৌবহর পরিদর্শক সৈয়দ মীর মুরাদ কর্ত্তৃক ১৬৪২ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়। শিয়া সম্প্রদায়ের মহরম পর্ব্ব এই স্থানে আজও মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। হুসেনী দালানের স্থাপত্যরীতি সুন্দর। ঢাকার নায়েব নাজিমগণ হুসেনী দালানের মত ওয়াল্লী থাকিতেন; এক্ষণে ঢাকার নবাবগণ স্থন্নী মতাবলম্বী হইলেও ইহার মতওয়াল্লী পদ গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং ইহার জন্য বহু অর্থ ব্যয় করেন।

শহরের পশ্চিম প্রান্তে ইদ্‌গা নামক মুসলমান-ধর্ম্ম স্থানটি শাহ্‌ শুজার সময়ে দেওয়ান মীর আবদুল কাশিম কর্ত্তৃক ১৬৪০ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়।

শহরের পশ্চিম প্রান্তে বুড়ী গঙ্গার নিকটে লালবাগ কেল্লা অবস্থিত। ধ্বংসপ্রাপ্ত এই দুর্গের তোরণ দ্বার, প্রাকার ও স্তম্ভ প্রভৃতি যে অংশ দাঁড়াইয়া আছে তাহাও দেখিবার মত। সম্রাট্‌ আওরঙ্গজেবের পুত্র মহম্মদ আজম যখন সুবাদার রূপে অল্পকাল ঢাকায় অবস্থান করেন সেই সময়ে তিনি এই কেল্লা ও প্রাসাদ নির্ম্মাণ আরম্ভ করেন। শায়েস্তা খাঁর সময়ে নির্ম্মাণকার্য্য আরও অগ্রসর হয়। দুর্গ মধ্যে একটি জলাশয়ের পশ্চিমে পরী বিবির মকবরা নামে একটি মনোরম সমাধি সৌধ আছে। পরী বিবি নবাব শায়েস্তা খাঁর কন্যা ছিলেন। মক্‌বরাটি নির্ম্মাণের জন্য চুণার, গয়া ও জয়পুর হইতে প্রস্তরাদি আনীত হইয়ছিল। সমাধি সৌধে নয়টি কক্ষ আছে এবং এগুলিতে নানা রঙের মর্ম্মর প্রস্তরের সুন্দর কাজ আছে। সৌধের ছাদটির নির্ম্মাণরীতিতে বিশেষত্ব আছে; কানিংহাম সাহেবের মতে ইহা হিন্দু স্থাপত্যের পরিচায়ক; মক্‌বরার চন্দন কাষ্ঠের দ্বারগুলিও হিন্দু রীতির সাক্ষ্য দিতেছে। কেল্লার ঠিক্‌ দক্ষিণ পার্শ্বেই একটি পুরাতন ফটকের বাহিরে সুবৃহৎ লালবাগ মসজিদ অবস্থিত। সম্রাট্‌ আওরঙ্গজেবের পৌত্র আজিম-উশ-সানের পুত্র সম্রাট্‌ ফরুখ্‌ শিয়র যখন পিতার প্রতিনিধিরূপে ঢাকায় অবস্থান করিতেছিলেন সেই সময়ে এই মস্‌জিদটি নির্ম্মাণ করেন। লালবাগ কেল্লার নিকটেই বুড়ীগঙ্গা তীরে আজিম-উশ-সান নির্ম্মিত সুপ্রসিদ্ধ পোস্তাপ্রাসাদ অবস্থিত ছিল; এখন ইহা বুড়ীগঙ্গ গর্ভে গিয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ বিশপ হিবার পোস্তাপ্রাসাদ দেখিয়া লিখিয়াছিলেন যে ইহার স্থাপত্য রীতি মস্কো নগরীর সুবিখ্যাত ক্রেমলিন প্রাসাদের অনুরূপ এবং ঢাকা শহর তাঁহাকে পদে পদে মস্কোর কথা মনে করাইয়া দিয়াছিল। সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে লালবাগে বিদ্রোহীদের সহিত ইংরেজ নাবিকদলের একটি ক্ষুদ্র সংঘর্ষ হইয়াছিল; বিদ্রোহীরা পরাজিত হইয়া জামালপুর ময়মনসিংহ অভিমুখে পলায়ন করে।

ঢাকার পশ্চিম প্রান্তে মিউনিসিপাল এলাকার দুই মাইল পশ্চিমে জাফরাবাজার ও বাঁশবাড়ী নামক স্থানে শায়েস্তা খাঁ নির্ম্মিত মনোরম সাতগুম্বজ মসজিদ অবস্থিত। সৌন্দর্য্যে পরী বিবির মক্‌বরার পরেই ইহার স্থান। পার্শ্বেই শায়েস্তা খাঁর কন্যা বেগম বিবি ও গুলজার বিবির সমাধিসৌধ।

শহরের নবাবপুর মহাল্লায় বসাকগণের আদিপুরুষ কৃষ্ণদাস মুচ্ছদ্দি ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে সুবিখ্যাত নবাবপুরের লক্ষ্মীনারায়ণ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। কথিত আছে বিগ্রহটি পূর্ব্বে বার-ভুঁইয়ার অন্যতম চাঁদরায় কেদার রায়ের ছিল। ঢাকার সুপ্রসিদ্ধ জন্মাষ্টমীর মিছিল লক্ষ্মীনারায়ণের উদ্দেশে কৃষ্ণদাস কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হয়। এই মিছিলে বাঁশ ও কাগজ প্রভৃতি দিয়া নির্ম্মিত দুই তিন তল বাটির চেয়ে উচচ "চৌকী" গুলি হইতে নানারূপ কৌশলে পৌরাণিক, সামাজিক ও সাময়িক ঘটনাবলীর অভিনয় করা হয়। জন্মাষ্টমীর বড় চৌকীটির শিল্প-কৌশল বিশেষ প্রসিদ্ধ। বহু লোক এই মিছিল দেখিতে ঢাকায় আগমন করেন। জন্মাষ্টমীর মেলায় লোকশিল্পের নিদশন স্বরূপ কিছু কিছু দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া ঢাকার ঝুলনযাত্রা, রাস ও রথযাত্রারও প্রসিদ্ধি আছে।

ঢাকার লক্ষ্মীবাজারের লক্ষ্মীনারায়ণ, ঠাঠারি বাজারের জয়কালী মন্দির ও পঞ্চরত্ন মঠ ও এক্রামপুরের বীরভদ্রাশ্রমও উল্লেখযোগ্য। বৈষ্ণব-প্রধান নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র গোস্বামী ধর্ম্মপ্রচারাথ ঢাকায় আগমন করিয়াছিলেন এবং তাঁহারই নামে বীরভদ্রাশ্রম স্থাপিত হয়।

মুর্শিদাবাদের ন্যায় ঢাকায়ও বহুদিন হইতে খাজা খিজিরের উদ্দেশে ভাদ্রমাসের শেষ বৃহস্পতি বারে ব্যারা বা বেরা উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। মুর্শিদাবাদ স্টেশন দ্রষ্টব্য।

মুর্শিদাবাদের ন্যায় ঢাকাও বাংলাদেশের বাণিজ্যের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল এবং এখানেও ইংরেজ, ফরাসী, ওলন্দাজ ও পর্ত্তুগীজ বণিকগণের কুঠি ছিল। পর্ত্তুগীজেরা সর্ব্বপ্রথমে ঢাকায় আসেন এবং সঙ্গতটোলায় তাঁহাদের কুঠি ছিল শুনিতে পাওয়া যায়। ওলন্দাজেরা প্রথমে দেশীয় গোমস্তা পাঠাইয়া মাল খরিদ করিতেন, কিন্তু ১৭৪২ হইতে ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে একজন ওলন্দাজ ঢাকার কুঠির কর্ত্তা হইয়া আসেন। এখন যেখানে ঢাকায় মিট্‌ফোর্ড্ হাঁসপাতাল তৈয়ারী হইয়াছে পূর্ব্বে সেইস্থানে ওলন্দাজদিগের কুঠি ছিল। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কুঠি বাদশাহ আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে ১৬৮২ খৃষ্টাব্দের পরে নির্ম্মিত হইয়াছে। পুরাতন কুঠি তেজগ্রামে ছিল কিন্তু পরে বুড়ীগঙ্গার নিকটে ১৭২৪ খৃষ্টাব্দের পর ভিক্টোরিয়া পার্কের পশ্চিমে বর্ত্তমান ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল যে স্থানে অবস্থিত সেই স্থানে নূতন কুঠি তৈয়ারী হয়। ঢাকায় ঈস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্য ১৮১৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চলিয়াছিল।

ওলন্দাজেরা ইহা ইংরেজদের ছাড়িয়াদিয়াছিলেন; ঢাকা নগরে যে স্থানে ফরাসীদের কুঠি ছিল সেই স্থান এখনও ফরাসডাঙ্গা নামে পরিচিত। ফরাসীদিগের কুঠিটি ঢাকার নবাব বাহাদুরের 'আহ্‌সন মঞ্জিল' নামক বিখ্যাত প্রাসাদ মধ্যে পড়িয়া গিয়াছে।

আধুনিক কালে বসাকগণ ঢাকার ব্যবসায়ক্ষেত্রে সর্ব্বপ্রধান। তাঁহাদের পুরাতন ব্যবসায় হইতে বাহিরের লোক তাঁহাদের হটাইতে পারেন নাই। ঢাকায় পাট ও কাঁচা চামড়ার কারবার বেশ বড়। বহুকাল হইতে এখানে কমদামী সাবান প্রস্তুত হইতেছে। একটি কাঁচের কারখানাও এখানে আছে।

ঢাকার বস্ত্রশিল্প অতি পুরাতন। প্লিনির লেখা হইতে জানা যায় প্রাচীন রোমের মেয়েরা ঢাকার সূক্ষ্ম মসলিনের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। এরিয়ানের "পেরিপ্লাস অব দি ঈরিট্রিয়ন সী" নামক গ্রন্থেও মসলিনের উল্লেখ আছে। ঢাকা, সোনারগাঁও, ডেমরা, তিতর্দ্দি প্রভৃতি স্থানে সূক্ষ্মতম মসলিন প্রস্তুত হইত। বর্ষাকালই মসলিন বুনিবার প্রশস্ত সময় ছিল। মসলিন নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে কথিত হয় যে মাদ্রাজ প্রদেশের মসলিপত্তন বন্দর হইতে ইউরোপীয় বণিকগণ এই বস্ত্র কিনিয়া লইয়া যাইতেন এবং মসলিপত্তন হইতে মসলিন নামের উৎপত্তি। অপর মতে তুরস্ক প্রভৃতি দেশে প্রাচীন কাল হইতে এই বস্ত্র রপ্তানী হইত। কিন্তু পরে পর্ত্তুগীজ জল দস্যুগণের অত্যাচারে বা এরূপ কোনও কারণে এই ব্যবসায় প্রায় বন্ধ হইয়া যায়। তখন তুরস্কের মোস্‌ল নগরীতে এই বস্ত্র প্রস্তুতের চেষ্টা হয় এবং তথাকার সূক্ষ্ম বস্ত্র মস্‌লিন নামে পরিচিত হয়।

ঢাকার বস্ত্রশিল্প এক সময়ে জগদ্বিখ্যাত ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ঢাকার সূক্ষ্ম মস্‌লিন বস্ত্র ইউরোপের সর্ব্বত্র রপ্তানী হইত। ভ্রমণকারী ট্রাভার্ণিয়ার লিখিয়াছেন—ইরাণের দূত মহম্মদ আলি বেগ ভারতবর্ষ হইতে প্রতিগমনকালে শাহকে উপহার দিবার জন্য ৬০ হাত দীর্ঘ একখানা মস্‌লিন একটি অতি ক্ষুদ্র নারিকেল খোলের ভিতর করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। এক গজ প্রস্থ ২০ হাত লম্বা একখানা মস্‌লিন জড়াইয়া একটি অঙ্গুরীয়কের ছিদ্র দ্বারা এদিকে ওদিকে নেওয়া যাইত। এইরূপ ৩০ হাত দীর্ঘ ২ হাত প্রস্থ একখণ্ড মস্‌লিন ওজনে ৪।৫ তোলা হইত এবং তাহা ৪০০৲। ৫০০৲ টাকা বিক্রয় হইত। কথিত আছে সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের এক কন্যা সাত ফের দিয়া আবরোয়ান মস্‌লিন পরিধান করিয়া পিতৃ সমক্ষে উপস্থিত হইলে নির্লজ্জা বলিয়া ভৎর্সিতা হন। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দেও মস্‌লিন প্রস্তুতের এক পাউণ্ড ওজনের এক ফেটি সূতা মাপিয়া লম্বায় ২৫০ মাইল হইয়াছিল। সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের প্রিয়তমা পত্নী নূরজাহান বেগম ঢাকাই মসলিনের প্রভূত আদর

করিতেন। সম্রাট্‌ শাহজাহান এবং আওরঙ্গজেব ঢাকাই মস্‌লিন দিল্লীর অন্তঃপুরে ব্যবহার করিবার ব্যবস্থা করেন এবং যাহাতে মস্‌লিন ভারতবর্ষ হইতে বাহিরে যাইতে না পারে, সে জন্য রাজকীয় আদেশও প্রদান করিয়াছিলেন। ঢাকার মস্‌লিনের নানা নাম ছিল, যথা ঝুনা (হিন্দি শব্দ, অর্থ—সূক্ষ্ম—ইহা মাকড়সশার জালের মত ছিল), সব্‌নম্‌ (ইরানীয় শব্দ, অথ সান্ধ্য শিশির—সিক্ত করিয়া ঘাসের উপর বিছাইয়া দিলে ইহার অস্তিত্বই বুঝা যাইত না, শিশির বলিয়া ভ্রম হইত), আবরোয়ান (ইরাণীয় শব্দ, অর্থ জল স্রোত, জলের মধ্যে একেবারে মিলাইয়া যাইত), সঙ্গতি, সরবতি, রং, সরকার আলি আলবাল্লে, তনজের, তরন্দাম, নয়নসুক, সরবন্দ, কুমসী, বদন খাস, মলমল খাস, খাসা (সর্ব্বশ্রেষ্ঠ খাসা নাম জঙ্গলখাসা) ইত্যাদি। নানা প্রকার ডুরে কাপড় ছিল; তাহাদের নাম, রাজকোট, কাগজাহি, পাদশাহীদার, কলাপাত প্রভৃতি। বিভিন্ন রঙের মস্‌লিন চারখানা নামে অভিহিত হইত; ইহাও নানারূপ ছিল, যথা নন্দনশাহী, আনারদানা, সাকুতা, কবুতরখোপা, পাছাদার প্রভৃতি। বুটা ও ফুলতোলা মস্‌লিন কসিদা নামে অভিহিত, ইহাও নানা প্রকারের, যথা কাটা-উরমী, নৌবত্তি, আজিজুল্লা, দোছাক প্রভৃতি। বিচিত্র কারুকার্য্য খচিত মসলিন বা জামদানীও নানা প্রকারের, যথা তোরাদার, কারেলা, বুটিদার, তেরছা, জলবার, পান্নাহাজার, মেল, দুবলীজাল, ছড়িয়াল, সাবুরগা ইত্যাদি। মস্‌লিন ছাড়া বাফতা নামে একপ্রকার সুন্দর মোটা গাত্র-বস্ত্রও নানা প্রকারের হইয়া থাকে, যথা, হাম্মাম, ডিমটি, সাল, জঙ্গলখাসা, গলাবন্দ প্রভৃতি। ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে নানা দেশের জন্য ঢাকায় ২৮,৫০,০০০ টাকার মস্‌লিন প্রভৃতি বস্ত্র বিক্রীত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। এখনও বাংলার সর্ব্বত্র ঢাকাই শাড়ী ও ধুতির বিশেষ আদর আছে।

মসলিনের জন্য প্রত্যুষে সূর্য্যোদয়ের আগে সূক্ষ্ম সূতা কাটার রীতি ছিল। চরকার দ্বারা অপেক্ষাকৃত মোটা সূতা ও ডলনকাঠি বা টাকুর সাহায্যে সূক্ষ্ম সূতা কাটা হইত। খাদি আন্দোলনের পর হইতে আমাদের আদিম কালের টাকু বা টেকো তক্‌লি নামে পরিচিত হইতেছে। ইহা সত্যই দুঃখের কথা।

মস্‌লিন ও অন্যান্য সূক্ষ্ম বস্ত্র ধৌত করিবার জন্য ঢাকার এখনও নাম আছে। সূক্ষ্ম বস্ত্র ধুইলে সূত্রগুলি স্থানচ্যুত হইলে "কাঁটা করিয়া" ইহাদিগকে স্থাপিত করিতে হয়। ঢাকা ভিন্ন অন্য কোথাও এই পদ্ধতি চলিত নাই বলিয়া আজও অনেকে ঢাকাই শাড়ী ঢাকায় ধুইতে পাঠান। ঢাকার কুমদীগরগণ শঙখ দ্বারা বস্ত্রাদি মাজর্জনা করিয়া উজজ্বল ও মসৃণ করিতে সুদক্ষ; ঢাকাই শঙখ-করা বস্ত্রের খ্যাতি আছে। ঢাকার রিফুগরদিগেরও সূক্ষ্মকার্য্যের জন্য নাম আছে।

ঢাকায় মসলিন প্রভৃতি বস্ত্রে রেশম ও জরির কাজ অতি সুন্দর হইয়া থাকে; এই কাজ জরদজী নামে খ্যাত।

ঢাকায় রূপার তারের কাজ (ফিলিগ্রী) শঙখশিল্প ও ঝিনুকের বোতাম, মাথার ফুল, ঘড়ির চেন প্রভৃতির খ্যাতি আছে। শাঁখের কাজের জন্য মাদ্রাজ, বোম্বাই, সিংহল মলয়দ্বীপ প্রভৃতি স্থান হইতে বহু পরিমাণে সামুদ্রিক শঙখ আনিতে হয়; তিনকৌড়ী, পাটি, জাহাজী, ধলা, বাড়বাকী, সুরতী ও আলাটিলা এই কয় প্রকার শঙখ উৎকৃষ্ট। প্রতি বৎসর প্রায় লক্ষ টাকার শঙখ আমদানী হয় ও পাচ লক্ষ টাকার কারুকার্য্যখচিত শাখা, চুড়ী, বালা, মালা, কানের ফুল, আংটি, বোতাম, ঘড়ির চেন প্রভৃতি ভারতের নানা স্থানে প্রেরিত হয়।

খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে ঢাকার অমৃতী, মালাই, পণীর ও নারানখাদা ও বাকরখানি রুটির খ্যাতি আছে।

নদী-বহুল ঢাকা অঞ্চলে নানাপ্রকারের নৌকা দৃষ্ট হয়, যথা—কোষা, বজরা, ভাওয়ালী, ছান্দী, ছিপ, নাওধুবী, সারেঙ্গা, কুমারিয়া, পলওয়ার, ডিঙ্গী, পানসী প্রভৃতি।

তালতলা—ঢাকা হইতে ১০ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে রূপগঞ্জ থানা অবস্থিত। এই থানার মধ্যে নিকটে লাক্ষ্যা নদীর তীরে ডাঙ্গাবাজার গ্রামের নিকট তালতলা গ্রামে সাধকপ্রবর কথুনাথের সমাধি ও উপাসনা-মন্দির অবস্থিত। কথিত আছে এই স্থান প্রথমে ভীষণ জঙ্গলাকীর্ণ ছিল, কথুনাথ আসিয়া গুরুদত্ত শিঙ্গা ধ্বনি করিতে থাকিলে জঙ্গলের পশুগুলি অন্যত্র চলিয়া যায় এবং ক্রমে লোকের বসতি হয়। প্রায় তিনশত বৎসর পূর্ব্বে শিলমন্দি গ্রামে কথুনাথের জন্ম হয়। তিনি জননীর একমাত্র পুত্র ছিলেন এবং যৌবনে মাতা ও পত্নীকে ফেলিয়া ধর্ম্ম সাধনার জন্য নানা স্থানে ঘুরিয়া শ্রীহট্ট জেলায় বিথঙ্গলে রামকৃষ্ণ গোঁসাইয়েরএ আখড়ায় উপস্থিত হন। কথুনাথকে পরীক্ষার্থ রামকৃষ্ণ পাদোদক আনিবেন বলিয়া তাঁহাকে অপেক্ষা করিতে নির্দ্দেশ দিয়া মন্দির মধ্যে প্রবেশ করেন এবং নয় দিন পরে বাহির হইয়া দেখেন কথুনাথ একই ভাবে দণ্ডায়মান। তখন প্রীত হইয়া রামকৃষ্ণ কথুনাথকে দীক্ষা দান করেন। কথুনাথ ধর্ম্ম সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া তালতলা গ্রামে আসিয়া বাস করেন।

বাছিলা—ঢাকা হইতে বুড়ীগঙ্গা তীরে উত্তর-পশ্চিমে ৫ মাইল দূরে অবস্থিত। মাঘী পূর্ণিমার স্নান উপলক্ষে এখানে ঢাকা হইতে বহু লোকের সমাগম হয়। "ইহা কুশাগাড়ার বান্নি" (বারুণী) নামে খ্যাত। প্রবাদ প্রাচীনকালে পাচজন মুনি এই স্থান কঠোর তপস্যা করিয়া 'কুশা' গাড়িয়া বা পুতিয়া রাখিয়াছিলেন।

কলাকোপা—ঢাকা হইতে ১৮ মাইল পশ্চিমে নবাবগঞ্জ থানা। এই থানার অন্তর্গত কলাকোপা গ্রামে মহাত্মা দাতা খেলারাম নির্ম্মিত নবরত্ন মন্দির ও ক্ষেপা রাণীর আখড়া ও বলাই বাউলের আখড়া নামে বাউল-সম্প্রদায়ের দুইটি আখড়া আছে। ধর্ম্মসাধনার জন্য ক্ষেপা রাণী খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। এ অঞ্চলে সুন্দর মাটির জিনিস তৈয়ারী হয়। তেল রাখিবার জন্য এখানকার মাটির মটকা গুলিতে চল্লিশ মণ পর্য্যন্ত তেল ধরে।

মীরপুর—ঢাকা হইতে ৮ মাইল উত্তর-পশ্চিমে তুরাগ নদীর তীরে উচচ ভূমির উপর অবস্থিত মীরপুরের দৃশ্য সুন্দর। প্রসিদ্ধ আউলিয়া হজরৎ শাহ আলি সাহেবের দরগাহ এখানে অবস্থিত। কথিত আছে, চারি শত বৎসর পূর্ব্বে বোগদাদের রাজকুমার হজরৎ শাহ আলি চারজন শিষ্য সহ এই স্থানে আসিয়া অবস্থান করেন। শিষ্যগণকে তাঁহার ধ্যানভঙ্গ করিতে নিষেধ করিয়া দেড় বছর অনশন ব্রত লইয়া তিনি মসজিদে দ্বাররুদ্ধ করিয়া সাধনায় মগ্ন হন। দেড় বছরের একদিন মাত্র বাকি থাকিতে শিষ্যগণ রুদ্ধদ্বার মসজিদ মধ্যে অস্পষ্ট আওয়াজ শুনিয়া দ্বার ভাঙ্গিয়া দেখিলেন আউলিয়া তথায় নাই এবং আগুনের উপর একটি পাত্রে রক্ত ফুটিতেছে। কিছু পরেই তাঁহারা গুরুর কণ্ঠস্বরে আকাশ বাণী শুনিলেন এবং পাত্রস্থ রক্ত সমাহিত করিতে আদিষ্ট হইলেন। সেইমত তাঁহারা রক্ত সমাহিত করিলেন। তদবধি এই স্থান বিশেষ পূত বলিয়া গণ্য হয় এবং সহস্র সহস্র নর নারী এই

সমাধি দর্শনে আসেন। হজরৎ শাহ্ আলি ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন, কিন্তু তিনি যে মস্‌জিদে সমাহিত উহা ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়। মীরপুরের নিকট স্থানে স্থানে তুরাগ নদীতে ঝিনুকের মধ্যে ছোট ছোট মুক্তা পাওয়া যায়।

সাভার—ঢাকা হইতে ১৬ মাইল উত্তর-পশ্চিমে ধলেশ্বরী ও বংশী নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত একটি বাণিজ্যকেন্দ্র। পূর্ব্বে এই স্থানে সম্ভার বা সম্ভাগ নামে একটি রাজ্য ছিল বলিয়া কথিত; পরে ইহা সর্ব্বেশ্বর নগরী নামে পরিচিত হয়। প্রবাদ রাজা হরিশ্চন্দ্র পাল মেদিনীপুর অঞ্চল হইতে এই স্থানে আসিয়া রাজ্য স্থাপন করেন। সাভারের পূর্ব্বদিকে বলীমোহর নামক স্থানে তাঁহার প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। তাঁহার দুর্গটি এখন "কোঠা বাড়ী" নামে একটি মৃত্তিকা-স্তূপ; ইহার মধ্যভাগের একটি গহ্বর হইতে গোলাবর্ষণ করিয়া সৈন্যগণ নিরাপদে যুদ্ধ করিত। ইহা আধুনিক কালের ট্রেঞ্চের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। হরিশ্চন্দ্রের দুই মহিষী কণাবতী ও ফুলেশ্বরীর নাম হইতে নিকটস্থ কণপাড়া ও ফুলবাড়িয়া গ্রামের নাম হয় ও তাঁহার দুই কন্যা উদুনা ও পদুনার সহিত পেটিকা নগরের রাজা গোবিন্দচন্দ্র বা গোপীচন্দ্রের বিবাহ হইয়াছিল বলিয়া কথিত। রংপুর ও কুড়িগ্রাম স্টেশন দ্রষ্টব্য। কর্ণপাড়ার রাজার "তাম্বুল বাড়ী" বলিয়া পরিচিত স্তূপটি একটি বিরাট চৈত্যের ধ্বংসাবশেষ বলিয়া অনেকে মনে করেন। রাজা হরিশ্চন্দ্র ৫০টি জলাশয় খনন করাইয়াছিলেন, উহা আজও "সাড়ে বার গণ্ডা" নামে খ্যাত। তিনি ধর্ম্মের জন্য স্বীয় পুত্রকে পর্য্যন্ত বলি দিয়াছিলেন বলিয়া কথিত। এ অঞ্চলের জঙ্গলমধ্যে খৃষ্টীয় নবম দশম শতাব্দীর কারুকার্য্য খচিত বহু পাথর ও ইটের টুকরা দৃষ্ট হয়। সাভার প্রভৃতি গ্রামে এই কবিতাটি চলিত আছে;

বংশাবতী পূর্ব্বতীরে সর্ব্বেশ্বর নগরী।
বৈসে রাজা হরিশ্চন্দ্র জিনি সুরপুরী।।

ধামরাই—সাভার হইতে ৪ মাইল ও ঢাকা হইতে ২০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে বংশী নদীর তীরে অবস্থিত একটি পুরাতন স্থান। পুরাতন কাগজ পত্রে ধামরাই ধর্ম্মরাজিয়া নামে উল্লিখিত বলিয়া অনেকে অনুমান করেন যে সম্রাট অশোক-প্রতিষ্ঠিত ৮৪ হাজার ধর্ম্মরাজিকাস্তম্ভের একটি এই গ্রামে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এখানে একটি বৃহৎ কারুকার্য্যখচিত রথ আছে; ইহা এবং এখানকার যশোমাধব বিগ্রহ মাধবপুরের রাজা যশোপাল কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় বলিয়া কথিত। ধামরাইএর ৬ মাইল উত্তরে বর্ত্তমান গাজীবীড়ী পূর্ব্বে মাধবপুর নামে পরিচিত ছিল। প্রবাদ রাজা যশোপাল একবার একদন্ত শ্বেতহস্তী চড়িয়া ভ্রমণকালে ধামরাই গ্রামের এক উচচ ঢিবির সম্মুখে আসিলে তাঁহার হস্তী আর কিছুতেই অগ্রসর হইতে চাহিল না এবং পিছনের দিকে চলিতে লাগিল। তখন রাজাদেশে স্থানটি খনিত হইলে মাধবের মূর্ত্তি ও মন্দির আবিস্কৃত হয়। যশোপালের নাম হইতে দেবতা যশোমাধব নামে পরিচিত হন। আরও প্রবাদ পুরীধামের প্রথম জগন্নাথ মূর্ত্তি নিম্মাণ করিয়া যে কাষ্ঠ অবশিষ্ট ছিল তাহা দিয়া যশোমাধবের মূর্ত্তি নির্ম্মিত হয়। রথের সময়ে এখানে বৃহৎ মেলা ও সহস্র সহস্র লোকের সমাগম হয়। এই মেলায় লোকশিল্পের নিদশন কিছু কিছু দ্রব্যাদি দৃষ্ট হয়। যশোমাধবের ভোগ বিনা লবণে প্রস্তুত হয়। যশোমাধব ব্যতীত ধামরাই গ্রামের আদ্যাশক্তি, বাসুদেব ও রাধানাথেরও বিশেষ খ্যাতি আছে। রাধানাথের নিকটে অনেকে চক্ষুঃপীড়ার শান্তির

জন্য মানসিক করিয়া থাকেন। ধামরাই গ্রামে চৈত্রমাসের শুক্লাত্রয়োদশী ও পরদিন মদন-চতুর্দ্দশী তিথিতে মদনোৎসব ও কামদেবের পূজা হইয়া থাকে; একটি কলাগাছ পুতিয়া এবং বহু লোক মিলিয়া ঢোল বাজাইয়া সুর করিয়া ছড়া আবৃতি করিয়া কামদেবের পূজা করা হয়। ছড়াটির প্রথম চার ছত্র নিম্নে প্রদত্ত হইল ;—

এই খলিতে আয়রে কামা এই খলিতে আয়।
ধবল পাঠা দিমু তোরে এই খলিতে আয়।।
লোচা বাচা দিমু তোরে এই খলিতে আয়।
ভাঙ্গ ভুজনা দিমু তোরে এই খলিতে আয়।।

এ অঞ্চলে শূকর বলি দিয়া বনদুর্গা পূজার প্রথা আছে। কেহ কেহ ইহাকে বৌদ্ধ যুগের চিহ্ন বলিয়া মনে করেন। ধামরাই সূক্ষ্ম বস্ত্রের জন্য খ্যাত; এই স্থানে ১৮০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ফরাসীদের একটি কুঠি ছিল।

বাজাসন—সাভার হইতে ৫ মাইল উত্তর-পশ্চিমে ও ঢাকা হইতে ২১ মাইল দূরে নান্নার ও সুয়াপুর গ্রামদ্বয়ের মধ্যে অবস্থিত প্রায় অর্দ্ধ মাইল ব্যাপিয়া বাজাসনের ভিটা নামে যে মৃত্তিকা স্তূপটি দৃষ্ট হয়, অনেকের মতে উহা সুপ্রসিদ্ধ বজ্রাসন বিহারের ধ্বংসাবশেষ। দ্বাদশ বৎসর ধরিয়া স্বনামধন্য দীপঙ্কর অতীশ এই বিহারে শিক্ষালাভ করেন। নাগার্জ্জুন প্রবর্ত্তিত মাধ্যমিক মহাযান সম্প্রদায়ের তান্ত্রিক সাধনায় বজ্রাসন নামে পরিচিত এক আসন আছে।

মাণিকগঞ্জ—ঢাকা হইতে প্রায় ৩০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে; ইহা ঢাকা জেলার একটি মহকুমা। ইহার দক্ষিণে শিববাড়ী গ্রামে একটি অতি প্রাচীন শিব ও মনোহারিণী বালা ভৈরবী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন। যোগী জাতীয় ব্যক্তিগণ এই শিবের পূজারীর কাজ করেন। শিবরাত্রির সময়ে এখানে বড় মেলা হয়। মাণিকগঞ্জ থানার অন্তর্গত খাবাশপুর গ্রামে নিম কাঠের নিমাইচাঁদ মহাদেব মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন। চৈত্র মাসে বিগ্রহটি লইয়া গ্রাম প্রদক্ষিণ করা হয় ও ১লা বৈশাখ একটি মেলা হয়। মাণিকগঞ্জ হইতে ঠিক ১৪ মাইল পশ্চিমে পদ্মা ও যমুনা বা ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গম স্থলের নিকটে অবস্থিত আড়িচা স্টীমার স্টেশন। আসাম-সুন্দরবন স্টীমার পথে উত্তর দিকে গোয়ালন্দের ঠিক পরের স্টেশন। এই পথেও মাণিকগঞ্জ আসা যায়। আড়িচার ঠিক্ উত্তরেই তেওতার রায়বংশীয় জমিদারগণ প্রসিদ্ধ। পদ্মা ও যমুনার মোহানা এ অঞ্চলে বাইশ কোদালিয়ার মোহানা নামে খ্যাত। কথিত আছে একবার বন্যার পর একটি কৃষক পরিবারের ২২টি লোক মিলিয়া জল নিবারণের জন্য জমি কাটিয়া পদ্মা ও যমুনার দিকে জলের পথ করিয়া দেয়; ক্রমে ২।৩ বৎসরে এই কাটা জলপথ দুটি দিয়া পদ্মা ও যমুনা মিলিত হয়। ইহা হইতে বাইশ কোদালিয়া মোহানা নামের উৎপত্তি হয়। এই গ্রাম্য কাহিনীতে আধুনিক কালে ব্রহ্মপুত্রের গতি পরিবর্ত্তন ও পদ্মার সহিত মিলনের কিছু ইঙ্গিত রহিয়াছে।

তেজগাঁও—নারায়ণগঞ্জ হইতে ১৪ মাইল। ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত একটি পর্ত্তুগীজ গির্জ্জা এখানে আছে; গির্জ্জাটি ব্যাণ্ডেলের প্রসিদ্ধ গির্জ্জার অব্যবহিত পরেই প্রতিষ্ঠিত হয়। এই

স্থানে ইংরেজ, পর্ত্তুগীজ, ফরাসী ও দিনেমারদের কুঠি ছিল। তেজগাঁওএ একটি বিস্তৃত সরকারী কৃষিক্ষেত্র আছে। এই কৃষিক্ষেত্রের মধ্যে ৩৭ ফুট উচচ একটি পুরাতন ইষ্টক-স্তম্ভ বিদ্যমান। কাহারও কাহারও মতে ইহা মগদিগের বিজয়স্তম্ভ, অপর মতে ইহা একটি সমাধি-স্তম্ভ। ইহার অনতিদূরে মণিপুর গ্রাম। এই গ্রামে মণিপুর রাজবংশের দেবেন্দ্র সিংহ ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের পর নজরবন্দী ছিলেন; এই জন্য গ্রামটির নাম মণিপুর হইয়াছে।

টঙ্গী জংশন—নারায়ণগঞ্জ হইতে কিঞ্চিদধিক ২৩ মাইল দূর। ভৈরববাজার জংশন হইতে আসাম-বাংলা রেলপথের একটি শাখা এইখানে আসিয়া মিলিয়াছে। ষ্টেশনের এক মাইল দক্ষিণে টঙ্গী নদীর উপর মীর জুমলা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত একটি পুরাতন সেতু আছে।

জয়দেবপুর—নারায়ণগঞ্জ হইতে কিঞ্চিদধিক ৩০ মাইল। ইহা প্রসিদ্ধ ভাওয়াল পরগণার জমিদার বংশের নিবাসভূমি। ভাওয়াল মোকর্দ্দমার জন্য ভাওয়ালের নাম আজকাল সর্ব্বত্রই পরিজ্ঞাত। এই বংশের বিখ্যাত ও বদান্য জমিদার কালীনারায়ণ রায় ও রাজেন্দ্র নারায়ণ রায় প্রভৃতি বিদ্যোৎসাহী ও মুক্তহস্ত বলিয়া পরিচিত। ভাওয়াল রাজবাড়ীর বিরাট অট্টালিকা, মন্দিরগুলি ও এই বংশের শ্মশানের স্মৃতিসৌধ বা মঠগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাংলার প্রসিদ্ধ পল্লী কবি গোবিন্দ দাস ভাওয়ালের অধিবাসী ছিলেন। বাংলার অন্যতম সাহিত্যরথী কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর মহাশয় একসময়ে এই জমিদারীর প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা ছিলেন। বারভুঁইয়ার অন্যতম ফজল গাজী ভাওয়ালের অধিপতি ছিলেন। ফজলগাজী প্রথমে ঈশা খাঁ মসনদ-ই-আলির একজন সহকারী ছিলেন। ফজল গাজীর বংশীয়গণ প্রথমে কালীগঞ্জে ও পরে জয়দেবপুর হইতে প্রায় ১৬ মাইল পশ্চিমে মাধবপুর গ্রামে বাস করিতেন; সেই জন্য মাধবপুর পরে গাজীবাড়ী নামে পরিচিত হয়। এই বংশের দৌলত গাজী মুঘল সরকারে ঠিক মত খাজনা দিতে অক্ষম হওয়ায় মুঘল সরকার তাঁহাদের কাছ হইতে জমিদারী বর্ত্তমান বংশের হাতে অর্পণ করেন।

জয়দেবপুর ষ্টেশন হইতে প্রায় ২৩ মাইল উত্তর-পশ্চিমে ময়মনসিংহ জেলার মীর্জাপুর গ্রাম ও থানা। টাঙ্গাইল মহকুমা হইতে ইহা ১৬ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে অবস্থিত। মীর্জাপুরের ২ মাইল দক্ষিণে কাঁটালিয়া গ্রামে প্রায় আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে বৈদ্যবংশীয় কবি ভবানী প্রসাদ রায় জন্মান্ধ হইয়াও মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর অনুবাদ করিয়া কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। মীর্জাপুরের ৫ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে শাকাসার গ্রামে ৬ ফুট্ উচচ একটি অতি পুরাতন অষ্টকোণ প্রস্তরস্তম্ভ আছে। ইহা এখন সিদ্ধি মাধব নামে পূজা পাইতেছে; হিন্দুগণ ইহার নিকটে বন্য বরাহ ও মুসলমানগণ কুক্কুট বলি দিয়া থাকেন। ইহার গাত্রে উৎকীর্ণ মূর্ত্তিগুলি ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে; অস্পষ্ট যাহা দেখা যায় তাহা হইতে মুদ্রাসীন ধ্যানস্থ মূর্ত্তি—মস্তকে কিরীট ও কর্ণে কুণ্ডল বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। অনেকে মনে করেন এগুলি বুদ্ধ মূর্ত্তি। "ঢাকার ইতিহাস" রচয়িতা যতীন্দ্র মোহন রায় মহাশয় লিখিয়াছেন যে ভারতের অন্য স্থানে প্রাপ্ত অশোকস্তম্ভের সহিত এই স্তম্ভের বিশেষ সৌসাদৃশ্য আছে এবং শাকাসার হইতে ধামরাই বহুদুর নয় বলিয়া তিনি অনুমান করেন যে ইহা ধামরাইএর ধর্ম্মরাজিকা স্তম্ভ হওয়া অসম্ভব নয়।

ভাওয়ালের প্রসিদ্ধ জঙ্গল ঢাকা জেলার উত্তরভাগ হইতে ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত মধুপুর জঙ্গলের পর্ব্বাংশ। পশ্চিমাংশটি কাশিমপুরের গড় বা জঙ্গল নামে খ্যাত।

গজালি গাছের প্রাধান্য হেতু এই বনভূমি গড়গজালি নামেও অভিহিত হয়। এই বনে বাঘের অভাব নাই। পূর্ব্বে এই বনে হাতী পাওয়া যাইত। এই জঙ্গলে ভালো মধু ও মোম পাওয়া যায়।

ভাওয়াল পরগণার অন্তর্গত সুবৃহৎ বেলাই বিলের বর্গফল ৮ বর্গ মাইল; পূর্ব্বে ইহা একটি নদী ছিল এবং স্থানীয় ভূস্বামী খট্টেশ্বর ঘোষ ইহা হইতে ৮০টি খাল কাটিলে ইহা ক্রমে বিলে পরিণত হয় বলিয়া কথিত। স্থানীয় লোক সঙ্গীতেও এই ঘটনা স্থান পাইয়াছে। যথা,—

খাইডা ডোস্কা ছিল রাজা মহাতেজা কায়েতের কূলে।
নানা স্থানে স্থানে শুভক্ষণে পুষ্করিণী কাটিল।
বেলাই বিল শুষ্ক করি নিজ প্রতাপ দেখাইল।
ভাই অদ্ভুত কাহিনী।।

ভাওয়ালের অন্তর্গত নাগরী গ্রামে ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত পর্ত্তুগীজদের একটি গির্জা আছে।

রাজেন্দ্রপুর—নারায়ণগঞ্জ হইতে কিঞ্চিদধিক ৩৭ মাইল। ভাওয়ালের জঙ্গল মধ্যে অবস্থিত এই স্থান হইতে বহু পরিমাণে জ্বালানি কাঠ চালান যায়। স্টেশনের নিকটেই রাজাবাড়ী নামক স্থানে চণ্ডাল রাজাদের বলিয়া কথিত একটি প্রাসাদ ও দুর্গ প্রাকারের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। প্রবাদ প্রতাপ ও প্রসন্ন রায় নামে চণ্ডালরাজা এই স্থানে রাজত্ব করিতেন। অনেকে অনুমান করেন ইহারা সম্ভবতঃ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। তাঁহাদের প্রাসাদের নিকটেই তাঁহাদের প্রতাপান্বিতা ভগিণী যোগ্গী প্রতিষ্ঠিত "যোগ্গীরমঠ" এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।

স্টেশন হইতে ১০ মাইল পশ্চিমে তুরাগ নদীর তীরে বোয়ালী গ্রাম; তথা হইতে ৪ মাইল উত্তর-পশ্চিমে ডাকুরাই গ্রামে ঢোলসমুদ্র নামে একটি বৃহৎ ও গভীর দীঘি আছে। কথিত আছে, দীঘি খনিত হইলে রাজা উহার গভীরতা দেখিবার জন্য একজন ঢুলীকে দীঘির তলে নামাইয়া দেন। কিন্তু উহা এত গভীর যে ঢুলী বহু জোরে ঢোল বাজাইলেও তাহার আওয়াজ দীঘির পাড়ে পৌছায় নাই; সেজন্য ইহার নাম হয় ঢোলসমুদ্র। ঢোলসমুদ্রের পাড়ে মঠের চালা নামে একটি প্রকাণ্ড উচচভূমি দৃষ্ট হয়; ইহা একটি বৌদ্ধচৈত্যের চিহ্ন বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। ঢোলসমুদ্রের নিকটেই কোটামণির পুকুর ও পাল বংশীয় বলিয়া কথিত যশোপাল নামে একজন স্থানীয় রাজার প্রাসাদাদির ভগ্নাবশেষ অবস্থিত।

স্টেশন হইতে পাঁচ মাইল পূর্ব্বদিকে বানার বা লাক্ষ্যা নদীর তীরে কাপাসিয়া একটি পুরাতন স্থান; এখানে বহু পরিমাণে উৎকৃষ্ট কাপাস তুলা উৎপন্ন হইত। কাপাসিয়ার নিকট নদীর উপর দুরদুরিয়া গ্রামে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি একটি বৃহৎ গড়ের ভগ্নাবশেষ অবস্থিত; ইহার বহিঃপ্রাকার সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় দুই মাইল। গড়ের অপর পারেও কিছু কিছু ভগ্নাবশেষ দেখিয়া মনে হয় এই স্থানে পূর্ব্বে একটি বড় নগর ছিল। মুসলমান আক্রমণের সময়ে ১২০৪ খৃষ্টাব্দে গড়টি রাণী ভবানী নামে

স্থানীয় একজন রাণী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। এই দুর্গ হইতে ৮ মাইল দক্ষিণে বানার নদী তীরে একডালা নামক স্থানেও একটি দুর্গ দৃষ্ট হয় ; কেহ কেহ মনে করেন ইহাই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ একডালা দুর্গ। রাণাঘাট-মুর্শিদাবাদ-মালদহ-কাটিহার শাখার আদিনা স্টেশন দ্রষ্টব্য।

শ্রীপুর—নারায়ণগঞ্জ হইতে ৪৫ মাইল দূর। স্টেশন হইতে ১৫ মাইল পশ্চিমে ভাওয়ালের জঙ্গল মধ্যে দীঘ্লির ছিট্ বা সিংহের দীঘি নামক স্থানে শিশুপাল নামক একজন স্থানীয় রাজার রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। স্টেশন হইতে ৫ মাইল দূরবর্ত্তী শৈলাট নামক স্থানেও তাঁহার প্রাসাদাদির ভগ্নাবশেষ আছে।

সাতখামাইর—নারায়ণগঞ্জ হইতে ৪৭ মাইল দূর। স্টেশন হইতে ১০ মাইল পূর্ব্বদিকে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র হইতে যে স্থানে বানার নদী বাহির হইয়াছে সেই স্থানে এগারসিন্দু নামক গ্রামে একটি প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। ইহা সোনারগাঁও রাজ্যের উত্তর সীমার ঘাটি ছিল। প্রসিদ্ধ ভুঁইয়া রাজা ঈশা খাঁ মহারাজ মানসিংহ কর্ত্তৃক নিজ রাজধানী হইতে তাড়িত হইয়া এই দুর্গে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং মুঘল আক্রমণের জন্য পুনরায় প্রস্তুত হন। কথিত আছে মুঘল বাহিনী বানার কূলে ছাউনী স্থাপন করিলে ঈশা খাঁ বানার হইতে ১৫টি খাল কাটিয়া হঠাৎ জলস্রোতে শত্রুপক্ষকে ভাসাইয়া দিয়া বিপর্য্যস্ত করিয়াছিলেন। ইহার বহু পরে মহারাজ মানসিংহের সহিত ১৫১৫ খৃষ্টাব্দে এই স্থানে ঈশা খাঁর যুদ্ধ হয়। (নারায়ণগঞ্জ দ্রষ্টব্য)।

ময়মনসিংহ জংশন—নারায়ণগঞ্জ হইতে ৮৬ মাইল দূর। কলিকাতা হইতে রেলপথে সিরাজগঞ্জ ঘাট, তথা হইতে স্টীমারে জগন্নাথগঞ্জ এবং জগন্নাথগঞ্জ হইতে ট্রেণে ময়মনসিংহ আসিবার পথই সুবিধার। আসাম-বাংলা রেলপথের একটি শাখা আখাউড়া জংশন হইতে এই স্থানে আসিয়া মিশিয়াছে। ময়মনসিংহ একটি নূতন শহর। ইহার পার্শ্বস্থ ব্রহ্মপুত্র নদ পূর্ব্বে উহার প্রধান খাত ছিল, এখন প্রায় মজিয়া আসিয়াছে বলিলেই হয়। অশোকাষ্টমীর সময়ে এই স্থানেও বহুলোক ব্রহ্মপুত্র স্নান করেন। ব্রহ্মপুত্রের গতি পরিবর্ত্তনের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। প্রধান লাইনের ঈশ্বরদি স্টেশন দ্রষ্টব্য। ময়মনসিংহ জেলা ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ জেলা এবং এই জেলায় বহু পরিমাণে উৎকৃষ্ট পাট উৎপন্ন হয়। পরলোকগত দেশনায়ক আনন্দমোহন বসুর নামে ময়মনসিংহ শহরে সুপ্রসিদ্ধ আনন্দ মোহন কলেজ প্রতিষ্ঠিত আছে। বালকদের বিদ্যালয় ছাড়া বালিকাদের জন্য এস্থানে বিদ্যাময়ী বালিকা বিদ্যালয় নামে একটি উৎকৃষ্ট শিক্ষালয় আছে।

ময়মনসিংহ শহর হইতে ৮ মাইল পশ্চিমে মুক্তাগাছায় আচার্য্য চৌধুরী উপাধিধারী প্রসিদ্ধ জমিদারগণের বাস।

সিংহজানি জংশন—নারায়ণগঞ্জ জংশন হইতে ১১৯ মাইল দূর। এই স্টেশন হইতে একটি শাখা নূতন ব্রহ্মপুত্র বা যমুনার কূলে প্রায় ১৭ মাইল দূরবর্ত্তী জগন্নাথগঞ্জ পর্য্যন্ত গিয়াছে। কলিকাতা হইতে রেলপথে সিরাজগঞ্জ ঘাট পর্য্যন্ত আসিয়া স্টীমারে জগন্নাথগঞ্জে আসিয়া ময়মনসিংহ চট্টগ্রাম প্রভৃতি যাইবার জন্য ট্রেণ ধরিতে হয়। জগন্নাথগঞ্জের আগের স্টেশন সরিষাবাড়ী

পাটের কারবারের জন্য বিখ্যাত। সিরাজগঞ্জঘাট-জগন্নাথগঞ্জ স্টীমার পথে ময়মনসিংহ জেলায় পিংনায় একটি স্টীমার স্টেশন আছে। ইহাও একটি পাটের বড় কেন্দ্র।

সিংহজানি স্টেশনে ময়মনসিংহ জেলার জামালপুর মহকুমা অবস্থিত। ইংরেজ শাসনের প্রথম দিকে জামালপুরে একটি সেনানিবাস ছিল। সেই সেনানিবাসের কর্ম্মচারিগণের সমাধিস্থল এখনও জামালপুর শহরের একপ্রান্তে বিদ্যমান আছে। সন্ন্যাসীরা আসাম হইতে আসিয়া ময়মনসিংহ জেলায় ভীষণ উপদ্রব করিত বলিয়া ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে সেনানিবাসটি স্থাপিত হয় এবং সিপাহী বিদ্রোহের বৎসরে ইহা উঠিয়া যায়। ৺নন্দকৃষ্ণ বসু যখন জামালপুর মহকুমার হাকিম তখন হইতে (১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে) তাঁহার চেষ্টায় এখানে একটি মেলা আরম্ভ হইয়াছে। সেই মেলা নিয়মিত ভাবে এখনও প্রতিবৎসর হইয়া থাকে।

সিংহজানি বা জামালপুর হইতে ৯ মাইল উত্তরে **শেরপুর** শহর অবস্থিত। এখানে বৈদ্যবংশীয় কয়েকটি জমিদারের বাস আছে। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় এই স্থানের অধিবাসী ছিলেন। শেরপুর হইতে ৮ মাইল উত্তর-পশ্চিমে গড়-জরিপা নামক স্থানে একটি বৃহৎ গড়ের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান। ৪৫ ফুট্ উচ্চ ও ৭৫ ফুট্ চওড়া ইহার পর ৭টি প্রাচীর ছিল। ইহা কোচ বংশীয় দলিপ সামন্ত কর্ত্তৃক গারোদের আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং ১৩৭০ খৃষ্টাব্দে ইহা মুসলমানগণের অধিকারে আসে।

সিংহজানি স্টেশন হইতে প্রায় ২২ মাইল দক্ষিণে মধুপুর গ্রামে পুঁটিয়ার রাণী হেমন্তকুমারী দেবী প্রতিষ্ঠিত একটি মদন গোপাল বিগ্রহ আছে। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দ বরাবর সন্ন্যাসী বিদ্রোহের সময়ে এই স্থানে একদল সন্ন্যাসীর কেন্দ্র ছিল।

সিংহজানি স্টেশন হইতে প্রায় ৫০ মাইল দক্ষিণে ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমা অবস্থিত। আসাম-সুন্দরবন স্টীমার পথের পোড়াবাড়ী স্টেশন ব্রহ্মপুত্র তীরে এখান হইতে ৮ মাইল পশ্চিমে। টাঙ্গাইলের সুন্দর রঙীন শাড়ী বাংলার সর্ব্বত্র পরিচিত। টাঙ্গাইলের ২ মাইল পশ্চিমে সুপ্রসিদ্ধ কাগমারী জমিদারগণের বাসস্থান সন্তোষ গ্রাম অবস্থিত। টাঙ্গাইলের ৬ মাইল পূর্ব্বদিকে করটিয়া গ্রামে পানি বংশীয় প্রসিদ্ধ মুসলমান জমিদারগণের বাস। এখানে একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ প্রতিষ্ঠিত আছে। টাঙ্গাইল হইতে ৭ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে দিলদুয়ার গ্রামে সুপ্রসিদ্ধ গজনবীবংশীয় জমিদারগণের বাস। টাঙ্গাইলের ৭ মাইল দক্ষিণে এলাশিন একটি প্রসিদ্ধ পাটের গঞ্জ। ইহার নিকট হইতেই ধলেশ্বরী নদী ব্রহ্মপুত্র হইতে নির্গত হইয়াছে।

বাহাদুরাবাদ—নারায়ণগঞ্জ হইতে কিঞ্চিদধিক ১৪৪ মাইল দূর। ব্রহ্মপুত্র নদের উপর অবস্থিত ইহা এই শাখার শেষ স্টেশন। এই স্থান হইতে পূর্ব্ব-বঙ্গ রেলপথের নিজ খেয়া জাহাজে

অপর তীরে তিস্তামুখ ঘাট ও ফুলছড়ি পর্য্যন্ত যাত্রী ও মালগাড়ী প্রভৃতি পারাপারের ব্যবস্থা আছে। বাহাদুরাবাদের উত্তরে ব্রহ্মপুত্রের কূলে গারোপাহাড়ের পাদদেশে রংপুর জেলার রৌমারী বন্দর ও নিকটে গোয়ালপাড়া জেলার মাণিকের চর নামক গঞ্জ অবস্থিত। মাণিকের চর হইয়া গারোপাহাড়ের প্রধান শহর তুরা যাইতে হয়।
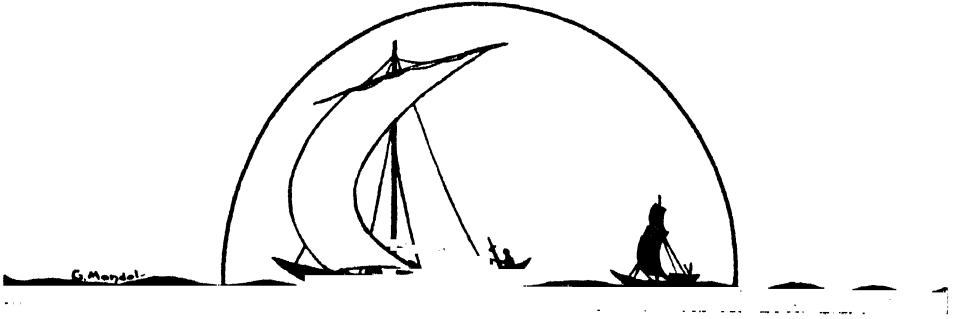
পূর্ব্ব ভারত রেলপথে বাংলাদেশ।

ঈস্ট্ ইণ্ডিয়ান্ রেলওয়ে কোম্পানি নামক একটি ব্যবসায়ীসঙ্ঘ ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ১৫ই অগষ্ট তারিখে হাওড়া হইতে হুগলী পর্য্যন্ত ২৩ মাইল রেলপথ খুলেন। ইহাই পূর্ব্ব ভারত রেলপথের সূচনা। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে এই রেল পথকে রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত বিস্তৃত করা হয়। ইহার পর কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত আর নূতন রেলপথ খোলা হয় নাই। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের সময় কলিকাতা হইতে উত্তর ভারতে প্রেরিত সৈন্যগণকে রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত রেলে যাইয়া অতঃপর পদব্রজে বা অন্য যান বাহনের সাহায্যে গন্তব্য স্থানে পৌছিতে হয়। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে এই রেলপথকে আসানসোলের নিকটবর্ত্তী সিয়ারসোল পর্য্যন্ত লইয়া যাওয়া হয়। ক্রমশঃ এই রেলপথ অগ্রসর হইয়া পাটনা, গয়া, মোগলসরাই, বিন্ধ্যাচল, এলাহাবাদ ও কানপুর প্রভৃতি স্থান দিয়া দিল্লী পর্য্যন্ত চলিয়া যায়।

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে সরকার এই রেলপথ কিনিয়া লন এবং ইহার পরিচালনার ভার একটি নবগঠিত কোম্পানির হস্তে ন্যস্ত করেন। সরকারের সহিত চুক্তি অনুসারে কোম্পানি ১৯২৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই রেলপথের পরিচালনা করেন। অতঃপর ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী তারিখে সরকার এই রেলপথের ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করেন।

ইতিপূর্ব্বে ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী তারিখে "আউধ-রোহিলখণ্ড" নামক রেল পথটি সরকার নিজের তত্ত্বাবধানে আনয়ন করিয়াছিলেন। এই রেলপথ মোগলসরাই হইতে সুরু করিয়া বেণারস, লক্ষ্ণৌ, অযোধ্যা, নিমসার, বেরিলী, সাজাহানপুর ও মোরাদাবাদ হইয়া হরিদ্বার ও সাহারাণপুর পর্য্যন্ত গিয়াছে। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে পূর্ব্ব ভারত রেলপথ সরকারী পরিচালনায় আসিবার পর উক্ত বৎসরে ১লা জুলাই হইতে "আউধ-রোহিলখণ্ড" রেলপথকে উহার সহিত সম্মিলিত করিয়া দেওয়া হয়। বর্ত্তমানে পূর্ব্ব ভারত রেলপথ বলিতে এই উভয় রেলপথের সমষ্টিকে বুঝায়। এই রেলপথের বিস্তৃত চারি হাজার মাইলেরও উপর। বাংলা, বিহার, যুক্তপ্রদেশ ও মধ্য প্রদেশের বহু স্থান এই রেলপথের দ্বারা সেবিত। আর্য্যাবর্ত্তের অধিকাংশ প্রাচীন নগর ও তীর্থক্ষেত্র এই রেলপথের উপর বা নিকটে অবস্থিত।

বাংলা দেশের হাওড়া, হুগলী, বর্দ্ধমান, মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম জেলার মধ্য দিয়া এই রেলপথ বিস্তৃত। এই সকল জেলার প্রসিদ্ধ স্থান এবং এই রেলপথের উপর অবস্থিত অধুনা বিহারের অন্তর্গত মানভূম প্রভৃতি বাংলাভাষাভাষী অঞ্চল অথবা সাঁওতাল পরগণা প্রভৃতি যে সকল স্থানের সহিত বাঙালীর ঘনিষ্ঠ সংশ্রব আছে তাহাদের বিবরণ এই স্থানে লিপিবদ্ধ করা হইল।
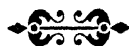
(ক) হাওড়া—বর্দ্ধমান—আসানসোল—সীতারামপুর
(প্রধান লাইন)

লিলুয়া—হাওড়া হইতে তিন মাইল দূর। এখানে পূর্ব্ব ভারত রেলপথের একটি ওয়র্কশপ্ বা গাড়ী তৈয়ারী ও মেরামতের কারখানা আছে। এই কারখানায় হাজার হাজার লোক কাজ করে। লিলুয়ার রেল-উপনিবেশটি অতি সুন্দর। এখানে বিদ্যালয়, উদ্যান, প্রমোদাগার, ভজনালয়, পাঠাগার প্রভৃতি আছে। লিলুয়ার অনাথ আশ্রম ও গো-শালা প্রভৃতি দ্রষ্টব্য স্থান।

বেলুড়—হাওড়া হইতে ৪ মাইল দূর। এখানে গঙ্গার তীরে জগৎ বিখ্যাত বেলুড় মঠ বা রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান কার্য্যালয় অবস্থিত। বেলুড়ে স্বামী বিবেকানন্দের সমাধি মন্দির, স্বামী ব্রহ্মানন্দের মন্দির, শ্রীসারদামণি দেবী বা রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের মাতা ঠাকুরাণীর মন্দির প্রভৃতি দেখিবার জন্য প্রত্যহ বহু লোক সমাগম হয়। সম্প্রতি বহু অর্থ ব্যয়ে বেলুড়ে রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের প্রস্তর মণ্ডিত মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে এবং তন্মধ্যে পরমহংসদেবের মর্ম্মর নির্ম্মিত মূর্ত্তির নিত্য পূজা হইতেছে। এই মন্দিরটি পরিকল্পনা করিয়াছিলেন স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ। অর্থাভাব বশতঃ তাঁহার জীবদ্দশায় এই মন্দির নির্ম্মাণের সুযোগ ঘটে নাই। দুইজন মহীয়সী মার্কিনী মহিলার প্রভূত অর্থ সাহায্যে স্বামী বিবেকানন্দের স্বপ্ন আজ বাস্তব মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। এরূপ বহুমূল্য ও বৃহৎ মন্দির বাংলা দেশে আর নাই। রামকৃষ্ণদেবের সন্ধ্যারতি দেখিবার জন্য বেলুড় মঠে প্রত্যহ বহু নরনারীর সমাবেশ হয়। প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে বেলুড় মঠে মহাসমারোহে পরমহংসদেবের জন্ম-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয় এবং তদুপলক্ষে প্রায় লক্ষাধিক লোকের সমাগম হয়।

বালী—হাওড়া হইতে ৬ মাইল দূর। ইহা গঙ্গাতীরে অবস্থিত একটি প্রাচীন ও বর্দ্ধিষ্ণু ভদ্র পল্লী। কয়েক বৎসর হইল এখানে গঙ্গার উপর এক প্রকাণ্ড রেলওয়ে সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে; এই সেতুটির উভয় পার্শ্বে গাড়ী-ঘোড়া, মোটরকার ও পদচারীদের জন্য স্বতন্ত্র রাস্তা আছে। ভারতের ভূতপূর্ব্ব রাজপ্রতিনিধি লর্ড ওয়েলিংডনের নামানুসারে ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে "ওয়েলিংডন সেতু"। পূর্ব্ব ভারত রেলপথের কয়েকটি যাত্রী-গাড়ী এই সেতুর উপর দিয়া শিয়ালদহ পর্য্যন্ত যাতায়াত করে। সুপ্রসিদ্ধ দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ী এই সেতুর ঠিক পার্শ্বে গঙ্গার পূর্ব্ব তীরে অবস্থিত।

বালীর দক্ষিণে ঘুসুড়ীতে ভোটবাগান নামে তিব্বতীয়দের একটি মন্দির আছে। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে ভুটিয়া যুদ্ধের পর তিব্বতের তাশীলামার মধ্যস্থতায় সন্ধি স্থাপিত হইলে, তাশীলামার অনুরোধে ভাগীরথী কূলে বৌদ্ধদিগের জন্য ওয়ারেন্ হেস্টিংস এই মন্দির নির্ম্মাণ করেন। বাংলা দেশের মন্দিরের মত ইহার ছাদ ও মন্দির গাত্রে তিব্বতীয় মূর্ত্তি উৎকীর্ণ। তাশীলামা মন্দিরের জন্য বহু শাস্ত্র গ্রন্থ ও পূজার উপকরণ পাঠাইয়াছিলেন এবং পুরাণগিরি গোঁসাই নামক শৈব সন্ন্যাসীকে মোহান্ত নিযুক্ত করেন। মন্দিরে বৌদ্ধ ও হিন্দু মূর্ত্তি দুই আছে। তাশীলামা চীন সম্রাটের দরবারে গমন কালে পুরাণগিরিকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন।

বালী গ্রামে পূর্ব্বে এক শ্রেণীর দেশীয় কাগজ প্রস্তুত হইত; উহা "বালীর কাগজ" নামে বিখ্যাত ছিল।

বালীতে "কল্যাণেশ্বর" নামে এক প্রাচীন শিবলিঙ্গ আছেন। এই শিবের মাহাত্ম্য এতদঞ্চলে সুপরিজ্ঞাত। শিবরাত্রির সময় এখানে বহু লোকের সমাগম হয়। পূর্ব্বে এখানে অনেকগুলি টোল ছিল এবং ছাপাখানার যুগের পূর্ব্বে এখানকার আচার্য্যরা যে পঞ্জিকা বাহির করিতেন তাহার বেশ আদর ছিল।

উত্তরপাড়া—হাওড়া হইতে ৬ মাইল দূর। বালীর পশ্চিম পার্শ্ব দিয়া একটি খাল আছে, উহাই হাওড়া জেলার শেষ সীমা। এই খালের অপর পারস্থিত উত্তরপাড়া গ্রাম হইতে হুগলী জেলার আরম্ভ। উত্তরপাড়া পূর্ব্বে বালী গ্রামেরই একটি পাড়া ছিল। কালক্রমে ইহা স্বতন্ত্র গ্রামে পরিণত হইয়াছে। বর্ত্তমানে উত্তরপাড়া একটি সুদৃশ্য শহর। এখানে একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ ও বহু দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান গ্রন্থ-সমন্বিত একটি প্রাচীন গ্রন্থাগার আছে। ইতালীয় স্থাপত্য রীতিতে নির্ম্মিত গ্রন্থাগার ভবনটি ভাগীরথী হইতে সুন্দর দেখায়। এখানকার মুখোপাধ্যায় বংশ বাংলার প্রসিদ্ধ জমিদারগণের অন্যতম।

কোন্নগর—হাওড়া হইতে ৯ মাইল দূর। ইহাও গঙ্গাতীরে অবস্থিত একটি প্রাচীন পল্লী। বৃটিশ আমলের পূর্ব্বে এখানে দিনেমারগণের একটি ডক্ ছিল। বর্ত্তমানে উহার চিহ্ন নাই। এখানে গঙ্গাতীরে দ্বাদশ মন্দির সংযুক্ত একটি ঘাট আছে; কলিকাতার হাটখোলা দত্তবংশের হরসুন্দর দত্ত উহার প্রতিষ্ঠাতা। জগৎ বিখ্যাত মনীষী শ্রীঅরবিন্দের পৈতৃক নিবাস কোন্নগরে। বিখ্যাত সমাজ-সংস্কারক শিবচন্দ্র দেবের জন্মস্থানও কোন্নগর। শিবচন্দ্রের জন্যই কোন্নগরের যাহা কিছু উন্নতি। তাঁহার চেষ্টায় এখানে ইংরেজী স্কুল, রেল স্টেশন, ডাকঘর, ডাক্তারখানা, ব্রাহ্মসমাজ ও গ্রন্থাগার প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়। শিবচন্দ্র সুবিখ্যাত কেশবচন্দ্র সেনের পিতৃব্য হরিমোহন সেনের সহিত মিলিত হইয়া আরব্য উপন্যাসের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন এবং স্বয়ং "শিশু পালন" ও "অধ্যাত্ম বিজ্ঞান" নামে দুইখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। প্রসিদ্ধ "পদ্যপাঠ" সঙ্কলয়িতা সুকবি যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় কোন্নগরের অধিবাসী ছিলেন।

প্রতিবৎসর মাঘী পূর্ণিমার দিন কোন্নগরে মহাসমারোহে রাজরাজেশ্বরী দেবীর পূজা হয় এবং উহা দেখিবার জন্য নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহ হইতে বহু লোকের সমাগম হয়।

রিষড়া—হাওড়া হইতে ১১ মাইল দূর। ইহা পূর্ব্বে একটি সমৃদ্ধ স্থান ছিল। বিপ্রদাসের "মনসা মঙ্গলে" এই স্থানের উল্লেখ আছে। এই স্থানে ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের একটি বাগান বাড়ী ছিল, উহার নাম ছিল "রিষড়া হাউস"। উহা এখন "হেষ্টিং মিল"এ পরিণত হইয়াছে। ইহার পশ্চিম দিকের প্রাচীরের নিকট যে আম্রবীথিকা রহিয়াছে, কথিত আছে, উহা হেষ্টিংস্-পত্নী কর্ত্তৃক রোপিত হইয়াছিল। হেষ্টিংস ঘাট নামে একটি ঘাট এখনও এখানে আছে। বর্ত্তমানে রিষড়া পাট কলের জন্য বিখ্যাত।

শ্রীরামপুর—হাওড়া হইতে ১৩ মাইল দূর। ইহা ভাগীরথী তীরে অবস্থিত এবং হুগলী জেলার অন্যতম মহকুমা। ব্রিটিশ অধিকারের প্রাক্কালে ইহা দিনেমারগণের অধিকৃত ছিল এবং ডেনমার্ক রাজের নামে ইহার নাম ছিল ফ্রেড্রিকনগর। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে ইংরেজগণ দিনেমারদিগকে পরাজিত করিয়া শ্রীরামপুর অধিকার করেন, কিন্তু ১৮১৫ খৃষ্টাব্দের সন্ধি অনুযায়ী ইহা পুনরায় দিনেমারগণের অধিকারভুক্ত হয়। শেষে দিনেমারগণ এই স্থানটি ইংরেজগণের নিকট বিক্রয় করিয়া চলিয়া যান। এইরূপে দিনেমারগণের বাংলায় প্রতিষ্ঠা লাভের শতবর্ষব্যাপী চেষ্টার অবসান হয়। শ্রীরামপুর আদালতের নিকটে তাঁহাদের গোরস্থান দৃষ্ট হয়।

খৃষ্টান মিশনারীগণের সংশ্রবের জন্যই শ্রীরামপুরের বিশেষ প্রসিদ্ধি। বর্ত্তমান বাংলা ভাষার গঠন ও পুষ্টিসাধনে এই স্থানের দান অমূল্য। সুবিখ্যাত পাদরী মার্শম্যান, ওয়ার্ড ও কেরি সাহেবের প্রচেষ্টায় বাংলা ভাষার যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। তাঁহাদের উদ্যোগে এই স্থানে সর্ব্বপ্রথম বাংলা ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম বাংলা সংবাদ পত্র "সমাচার দর্পণ" এবং প্রথম বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত ভারতের মানচিত্র এই স্থান হইতেই প্রকাশিত হয়। ১৮০১ খৃষ্টাব্দের ৭ই ফেব্রুয়ারী বাংলা বাইবেলের শেষ অংশ মুদ্রিত হইয়া বাহির হয়। শ্রীরামপুরের খৃষ্টান সমাধি ক্ষেত্রে এই মনীষিত্রয়ের সমাধি বাঙালী মাত্রেরই দর্শনীয়। শ্রীরামপুরের কলেজটিও এই মিশনারীগণের অন্যতম কীর্ত্তি। এই কলেজ-গৃহটি ১৮২১ খৃষ্টাব্দে নিৰ্ম্মিত হয়। ইহা গঙ্গাতীরে অবস্থিত একটি সুদৃশ্য ভবন। ইহার ঠিক্ বিপরীত দিকে গঙ্গার পূর্ব্বতীরে বারাকপুরে লাটসাহেবের মনোরম উদ্যান-বাটি অবস্থিত। শ্রীরামপুর কলেজের গ্রন্থাগারে কেরির ব্যবহৃত চেয়ার প্রভৃতি রক্ষিত আছে। ভারতবর্ষের মধ্যে একমাত্র এই কলেজ হইতেই খৃষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের উপাধি প্রদান করা হয়। "সেণ্ট্ ওলাফ্" নামক গির্জা শ্রীরামপুরের অন্যতম দ্রষ্টব্য। ইহা প্রথমে দিনেমার দিগের ছিল। গির্জার ফটকে ডেনমার্কের রাজা ষষ্ঠ ফ্রেডারিকের নামের আদ্যক্ষর এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান ম্যাজিস্ট্রেট্ আদালতের পূর্ব্বদিকে দিনেমার শাসন-কর্ত্তার বাস ভবন ছিল।

শ্রীরামপুরে কয়েকটি পাটকল ও কাপড়ের কল এবং একটি বয়ন বিদ্যালয় আছে।

শ্রীরামপুরের চাতরা নামক পল্লীতে একটি প্রাচীন শীতলা মন্দির আছে। এখানে বৈশাখ মাসে বহু যাত্রীর সমাগম হয়।

প্রতিবৎসর শিবচতুর্দ্দশীর পর দিন হইতে শ্রীরামপুরে একমাস স্থায়ী একটি মেলা হয়। এই মেলাটি "ক্ষেত্র সাহার মেলা" নামে প্রসিদ্ধ।

এখানকার গোস্বামিগণ বাংলার অন্যতম বিখ্যাত জমিদার বংশ।

শ্রীরামপুরের নিকটবর্ত্তী মাহেশ ও বল্লভপুর গ্রামে জগন্নাথ দেব ও রাধাবল্লভজীর দুইটি প্রাচীন মন্দির আছে। মাহেশের রথযাত্রা বিশেষ প্রসিদ্ধ। একমাত্র পুরী ছাড়া এত বড় রথের মেলা অন্য কোথাও দেখা যায় না। এই রথের মেলায় লোকশিল্পের নিদর্শন স্বরূপ জিনিসপত্র দেখিতে পাওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের "রাধারাণী" নামক উপন্যাসে মাহেশের রথের মেলার সুন্দর বর্ণনা আছে। রথযাত্রা উপলক্ষে শ্রীরামপুরে "দ্বাদশ গোপাল" নামে অপর একটি মেলা অনুষ্ঠিত হয়। বল্লভপুরের রাধাবল্লভের উৎপত্তি সম্বন্ধে গল্প প্রচলিত আছে যে, পূর্ব্বে এই স্থান অরণ্যময় ছিল এবং চাতরার রুদ্র-পণ্ডিত সংসার ত্যাগ করিয়া এখানে আসিয়া তপস্যা করিতে থাকেন; রাধাবল্লভ সন্তুষ্ট হইয়া সন্ন্যাসীর বেশে দেখা দিয়া তঁহাকে গৌড়ের সুলতানের শয়ন কক্ষের দ্বারদেশের প্রস্তরখণ্ড লইয়া আসিয়া তাহা হইতে বিগ্রহ নির্ম্মাণ করিতে বলেন। রুদ্র পণ্ডিত গৌড়ে উপস্থিত হইয়া সুলতানের হিন্দু প্রধান মন্ত্রীর সাহায্য প্রার্থী হন। ইতিমধ্যে সুলতানের শয়নকক্ষের প্রস্তর খণ্ডটি হইতে ফোঁটা ফোঁটা জল বাহির হইতে দেখা যায়। প্রধান মন্ত্রী তখন সুলতানকে সমস্ত ব্যাপার নিবেদন করিলেন এবং বলিলেন প্রস্তর খণ্ডটি হইতে অশ্রু বাহির হইতেছে এবং অবিলম্বে ইহাকে প্রাসাদের বাহির করা উচিত। রুদ্র পণ্ডিতকে তখন ইহা লইয়া যাইবার অনুমতি দেওয়া হইল। রুদ্র পণ্ডিত তখন মুস্কিলে পড়িলেন কি করিয়া এই ভারী পাথর বহিয়া লইয়া যান। রাধাবল্লভ তখন স্বপ্নে তাঁহাকে ঘরে ফিরিয়া গিয়া পাথরের জন্য অপেক্ষা করিতে বলিলেন। অল্পকাল মধ্যেই পাথরটি ভাসিতে

ভাসিতে বল্লভপুরের স্নানের ঘাটে আপনি গিয়া উপস্থিত হইল। রুদ্র পণ্ডিত একটি ভাস্করের সাহায্যে ইহা হইতে তিনটি বিগ্রহ নির্ম্মাণ করিয়া প্রতিষ্ঠা করিলেন। (পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথের "খড়দহ" স্টেশন দ্রষ্টব্য)। বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার কাহিনী শুনিয়া দলে দলে লোক পূজা দিতে আসিতে লাগিল এবং শীঘ্রই ইহার জন্য একটি মন্দির নির্ম্মিত হইল। নদীর ভাঙনের জন্য পুরাতন মন্দির পরিত্যাগ করিয়া বর্ত্তমান নূতন মন্দির কলিকাতার মল্লিকগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। লর্ড ক্লাইভের মুন্শী সুপ্রসিদ্ধ রাজা নবকৃষ্ণ রাধাবল্লভের বিশেষ ভক্ত ছিলেন এবং ইঁহার পূজার জন্য বহু দেবোত্তর সম্পত্তি দান করেন।

রাধাবল্লভের মূর্ত্তিটি ভাস্কর্য্য শিল্পের সুন্দর নিদর্শন।

বৈষ্ণবগণের প্রসিদ্ধ দ্বাদশ গোপালের অন্যতম গোপাল কমলাকর পিপলাই এর পাট মাহেশে অবস্থিত।

শেওড়াফুলি জংশন—হাওড়া হইতে ১৪ মাইল দূর। এখান হইতে একটি শাখা লাইন ২২ মাইল দূরবর্ত্তী প্রসিদ্ধ শৈবতীর্থ তারকেশ্বর পর্য্যন্ত গিয়াছে। এখানে রাজা নামে পরিচিত একঘর প্রাচীন জমিদারের বাস। এই বংশের রাজা মনোহরচন্দ্র বহু চতুষ্পাঠী ও মন্দির স্থাপন করেন। ইনিই মাহেশের প্রসিদ্ধ জগন্নাথদেবের মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। এখনও রথের দিনে শেওড়াফুলির জমিদার বাটীর অনুমতি লইয়া মাহেশের রথ চালানো হয়। শেওড়াফুলিতে নিস্তারিণী কালীর একটি মন্দির আছে। ইহা রাজা হরিশ্চন্দ্র কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। এই কালীর মাহাত্ম্য এতদঞ্চলে সুপরিজ্ঞাত। শেওড়াফুলির হাট খুব বিখ্যাত। এই হাট হইতে বহু তরীতরকারী কলিকাতায় আমদানি হয়।

বৈদ্যবাটী—হাওড়া হইতে ১৫ মাইল দূর। ইহাও একটি প্রাচীন পল্লী। ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত বিপ্রদাসের মনসা মঙ্গলে এই গ্রামের উল্লেখ আছে। বিপ্রদাস লিখিয়াছেন যে এই স্থানে গঙ্গাতীরে চাঁদসদাগর একটি নিমগাছে পদ্মফুল ফুটিতে দেখিয়াছিলেন। উহা নিমতীর্থের ঘাট নামে পরিচিত। কেহ কেহ বলেন যে পুরীগমন কালে শ্রীচৈতন্যদেব এই স্থানে গঙ্গার ঘাটে বিশ্রাম করিয়াছিলেন এবং তাঁহার আদেশে ঘাটের নিকট একটি নিমগাছ রোপিত হইয়াছিল ; তদবধি এই স্থান নিমাই তীর্থের ঘাট নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছে। বর্ত্তমানে অধিকাংশ লোকে এই শেষোক্তনামই ব্যবহার করেন। বৈদ্যবাটীর ভদ্রকালী দেবী বিশেষ জাগ্রত বলিয়া লোকের বিশ্বাস। এই দেবীর নামানুসারে পল্লীর এক অংশের নাম "ভদ্রকালী" হইয়াছে। বাংলার প্রথম উপন্যাস টেক্ চাঁদ ঠাকুর প্রণীত "আলালের ঘরের দুলাল"–এ বৈদ্যবাটীর উল্লেখ আছে। শেওড়াফুলির ন্যায় বৈদ্যবাটীতেও একটি বড় হাট আছে।

ভদ্রেশ্বর—হাওড়া হইতে ১৮ মাইল দূর। ইহাও ভাগীরথী কূলে একটি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ স্থান। ভদ্রেশ্বর শিবের নাম হইতে গ্রামের নাম ভদ্রেশ্বর হইয়াছে। সাধারণ লোকের বিশ্বাস যে কাশীর বিশ্বেশ্বর ও দেওঘরের বৈদ্যনাথদেবের ন্যায় ভদ্রেশ্বরও স্বয়ম্ভূলিঙ্গ। শিবরাত্রি, বারুণী ও পৌষসংক্রান্তির সময় এখানে বহু যাত্রীর সমাগম হয়। বিপ্রদাসের "মনসা মঙ্গলে" ভদ্রেশ্বরের উল্লেখ আছে। পূর্ব্বে এ স্থানে অনেকগুলি চতুষ্পাঠী ছিল। এখন অনেক গুলি পাটের কল স্থাপিত হইয়াছে।

ভদ্রেশ্বরের নিকটবর্ত্তী তেলিনীপাড়া একটি বিখ্যাত গ্রাম। এখানে বন্দ্যোপাধ্যায় উপাধিধারী একঘর জমিদারের বাস। জমিদারবংশের প্রতিষ্ঠিত অন্নপূর্ণাদেবীর মন্দির এদিককার একটি বিখ্যাত দ্রষ্টব্য বস্তু।

চন্দননগর—হাওড়া হইতে ২১ মাইল দূর। ভাগীরথী তীরে যে সকল পাশ্চাত্য জাতি উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে একমাত্র ফরাসী ভিন্ন অন্য কাহারও অধিকার বর্ত্তমানে নাই। চারিদিকে ব্রিটিশ অধিকৃত স্থানের মধ্যে একমাত্র চন্দননগরই ফরাসী অধিকারভুক্ত স্থান। বাংলায় যখন মুসলমান, ইংরেজ ও ফরাসীর মধ্যে ভাগ্যপরীক্ষার যুদ্ধ চলিতেছিল তখন চন্দননগরের উপর দিয়া অনেক উপদ্রবের ঝটিকা বহিয়া গিয়াছিল। ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে সম্রাট আওরঙ্গজেবের নিকট হইতে লব্ধ সনদের বলে ফরাসীগণ চন্দননগরের অধিকার লাভ করেন। ১৬০৭ খৃষ্টাব্দে চেতোয়াবরদার রাজা শোভা সিংহের অত্যাচার হইতে শহর রক্ষার জন্য ফরাসীগণ এখানে ফোর্ট দ্য আরলাঁ (Fort D'Orleans) নামে একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। বর্ত্তমানে এই দুর্গটি পুলিশভবন রূপে ব্যবহৃত হইতেছে। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ২৩এ মার্চ্চ তারিখে এই দুর্গের পাদমূলে ইংরেজ ও ফরাসীর ভাগ্য পরীক্ষা হইয়াছিল। চন্দননগরের সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবময় যুগ ছিল গবর্ণর ডুপ্লের শাসনকাল ১৭৩১—১৭৪১ খৃষ্টাব্দ। ডুপ্লে এখানে ফরাসী বাণিজ্যের বিশেষ উন্নতি সাধন করেন এবং ইহাকে একটি মনোরম শহরে পরিণত করেন। বর্ত্তমানে ইহার পূর্ব্ব সমৃদ্ধি আর নাই। পূর্ব্বে চন্দননগর বাণিজ্যের জন্য বিখ্যাত ছিল। এখানকার সূক্ষ্ম বস্ত্র তখন য়ুরোপেও রপ্তানি হইত। এখনও বাজারে ফরাসডাঙ্গার কাপড়ের যথেষ্ট নাম আছে। য়ুরোপে ইংরেজ ও ফরাসীদিগের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার যুগে চন্দননগর কয়েকবার ইংরেজগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হয় এবং উভয়পক্ষের মধ্যে সন্ধি সংস্থাপন হইলে উহা পুনরায় ফরাসীগণকে ফিরাইয়া দেওয়া হয়। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দ হইতে এই স্থান ফরাসীদিগের অধিকারে আছে। বর্ত্তমানে ফরাসী গবর্ণমেণ্টের অধিকার গরুটি (গৌরহাটি) চাঁপদানি, মানকুণ্ডু, গোঁদলপাড়া ও খাস চন্দননগরের কতকাংশ লইয়া বিস্তৃত। ইহা দৈর্ঘ্যে ৪ মাইল ও প্রস্থে ১ মাইল। চন্দননগরের গঙ্গাতীরবর্ত্তী পথটি বড় সুন্দর। সরকারী কার্য্যালয় ও হোটেল প্রভৃতি এই রাস্তার উপর অবস্থিত। গোঁদলপাড়ার এক অংশ আজও দিনেমার ডাঙ্গা নামে পরিচিত; ঐ স্থানে দিনেমারগণের একটি কুঠি ছিল। চন্দননগরে প্রুশিয়ান বা জার্ম্মানদেরও একটি কুঠি ছিল। সম্রাট্ ফ্রেডারিক দি গ্রেট "বেংগলিশে হাণ্ডেলজ গেজেল শাখাট" নামে একটি কোম্পানি গঠন করিয়া ব্যবসায়ের উৎসাহ প্রদান করেন। ফোর্ট্ দ্য আরলাঁর এক মাইল দক্ষিণে জার্ম্মণ্ কুঠি অবস্থিত ছিল।

চন্দননগরের সহিত প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। সুপ্রসিদ্ধ কবি-ওয়ালা রাসু, নৃসিংহ, গোরক্ষনাথ, নিতাই বৈরাগী, নীলমণি পাটনি, এণ্টনি ফিরিঙ্গি ও বলরাম কপালী, পাচালী গায়ক চিন্তামালা, নবীন গুঁই, কথক রঘুনাথ শিরোমণি এবং প্রসিদ্ধ যাত্রা-ওয়ালা মদন মাস্টার, ব্রজ অধিকারী ও মহেশ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি এই স্থানে বাস করিতেন। চন্দননগরের গোঁদলপাড়ায় পূর্ব্বে অনেকগুলি টোল ছিল।

এখানকার প্রাচীন গৌরবের মধ্যে নন্দদুলালের মন্দির, বোড়াইচণ্ডী, দশভুজা ও ভুবনেশ্বরী দেবীর মন্দির এবং তাউৎখানার বাগানে ওলন্দাজ গির্জার ধ্বংসাবশেষ, ভাগীরথী তীরে কনভেণ্ট সংলগ্ন গির্জা, কোম্পানীর আমলের গোরস্থান ও লালদীঘি প্রভৃতি দ্রষ্টব্য। ভাগীরথী তীরস্থ গির্জাটি ১৭২৩ খৃষ্টাব্দে ইতালীয় মিশনরীগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্ত্তমান যুগের দ্রষ্টব্য বস্তুর মধ্যে ডুপ্লে কলেজ ও স্কুল, চন্দননগর গ্রন্থাগার, নৃত্যগোপাল স্মৃতিমন্দির ও কৃষ্ণভাবিনী নারী শিক্ষা মন্দিরের নাম উল্লেখ যোগ্য।

চন্দননগরের প্রবর্ত্তক সঙেঘর উদ্যোগে অক্ষয় তৃতীয়ার সময় একটি মেলা হইয়া থাকে।

চুঁচুড়া—হাওড়া হইতে ২৩ মাইল দূর। ওলন্দাজগণের সহিত সংশ্রবের জন্যই চুঁচুড়ার প্রসিদ্ধি। ইহার পূর্ব্ব ইতিহাস কিছু অবগত হওয়া যায় না। ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজগণ মুঘল হস্তে বিধ্বস্ত হইলে ওলন্দাজগণ এদেশের বাণিজ্য ব্যাপারে প্রধান স্থান অধিকার করেন। তাঁহারা বণিকরূপেই এদেশে আসিয়াছিলেন। কিন্তু ইংরেজ দিগকে শাসন ক্ষমতা অর্জ্জন করিতে দেখিয়া তাঁহারাও সে দিকে মনোযোগ দেন। মীরজাফর গোপনে তাঁহাদের সাহায্য লইয়া ইংরেজদের প্রাধান্য নষ্ট করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। চুঁচুড়া কিছুকাল ব্যাটেভিয়া গবর্ণমেণ্টের অধীন ছিল। ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে ব্যাটেভিয়া হইতে কতকগুলি ওলন্দাজ রণতরী সৈন্যসামন্ত লইয়া এদেশে উপস্থিত হয়। ইংরেজগণ তখন ওলন্দাজগণকে বাধা প্রদান করেন। এই যুদ্ধে ওলন্দাজগণের সম্পূর্ণ পরাজয় ঘটে এবং তাঁহাদের রণতরীগুলি ধবংস প্রাপ্ত হয়। তদনন্তর ওলন্দাজগণ এদেশে শুধু বাণিজ্য কার্য্যেই লিপ্ত ছিলেন। ওলন্দাজগণের উন্নতির সময়ে তাঁহারা চুঁচুড়ায় ফোর্ট গাস্‌টেভাস্ নামে একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। চুঁচুড়া অধিকার করিবার পর ইংরেজগণ এই দুর্গটি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া তৎস্থলে একটি ব্যারাক্ নির্ম্মাণ করেন। বর্ত্তমানে এই ব্যারাকে হুগলী জেলার কাছারী ও কালেক্টরি অবস্থিত। এইরূপ দীর্ঘ অট্টালিকা খুব কমই দেখা যায়।

ইংরেজদিগের হস্তে পরাজিত হইবার পরও ওলন্দাজগণ বাণিজ্যসূত্রে বহুদিন পর্য্যন্ত এই দেশে বাস করিয়াছিলেন এবং ব্যবসায়ে যথেষ্ট উন্নতিও করিয়াছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর অষ্টম পাদে তাহাদের বাণিজ্য উন্নতির চরম শিখরে উঠিয়া পড়িতে আরম্ভ করে। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দের ৭ই মে ওলন্দাজগণ সুমাত্রার পরিবর্ত্তে ইংরেজগণকে চুঁচুড়া ছাড়িয়া দেন।

ওলন্দাজ শাসনকর্ত্তাগণ প্রাচ্য রীতি অনুযায়ী খুব জাঁকজমকের সহিত বাস করিতেন। চুঁচুড়াবাসী ওলন্দাজগণ বাঙালীদের সহিত মেলামেশা ও তাঁহাদের রীতিনীতির অনুসরণ করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই আহারান্তে আলবোলায় ধূমপান করিতেন।

ওলন্দাজদের সময়ে অনেক আর্ম্মেনীয় চুঁচুড়ায় বাস করিতেন। স্থানীয় আর্ম্মানি গি খোজা জোহানেসের পুত্র প্রসিদ্ধ আর্ম্মেনীয় মার্কার কর্ত্তৃক ১৬৯৫ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়। এই গির্জাটি "সেণ্ট জন্ দি ব্যাপটিস্ট" এর নামে উৎসর্গীকৃত হয়। আজিও প্রতিবৎসর ২৭এ জানুয়ারী এখানে একটি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ইহা বাংলার সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন গির্জার মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে।

হুগলীর মহশীন কলেজ, কলিজিয়েট স্কুল ও মাদ্রাসা চুঁচুড়ায় অবস্থিত। ইহা স্বনামধন্য দানবীর হাজী মহম্মদ মহশীনের অমর কীর্ত্তি।

এখানকার প্রাচীন কীর্ত্তির মধ্যে আর্ম্মেনীয়গণের দ্বারা নির্ম্মিত গির্জা, গঙ্গাতীরবর্ত্তী গির্জা এবং ওলন্দাজ ও আর্ম্মেনীয়গণের পুরাতন গোরস্থান উল্লেখযোগ্য। এখানকার আর্ম্মানিটোলা, মুঘল টুলি, ফিরিঙ্গিটোলা প্রভৃতি পাড়ার নাম চুঁচুড়ার পূর্ব্ব সমৃদ্ধি ও ইতিহাসের সাক্ষ্য দিতেছে। চুঁচুড়া ও চন্দননগরের মধ্যবর্ত্তী ভাগীরথী কূলে গোস্বামীঘাটে "কনে' বৌএর মন্দির" নামে একটি প্রকাণ্ড পরিত্যক্ত মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়, কথিত আছে পূর্ব্বে ইহা কালীর মন্দির ছিল এবং দেবী সরকার নামে এক ব্যক্তি বাটীর কনিষ্ঠা বধুর ইচ্ছানুসারে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন বলিয়া ইহার নাম হইয়াছে "কনে বৌএর মন্দির"।

চুঁচুড়ায় ষণ্ডেশ্বরজীউ নামে এক প্রাচীন শিবলিঙ্গ আছেন।

প্রথম ভারতীয় প্রিভিকাউনসিলার সুপণ্ডিত সৈয়দ স্যর আমীরআলি চুঁচুড়ার অধিবাসী ছিলেন।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা ভাষার অধ্যাপক "প্রতাপাদিত্য চরিত্র" প্রণেতা রামরাম বসু, স্বনামখ্যাত ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং "সাধারণী" সম্পাদক সাহিত্যাচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার চুঁচুড়ার অধিবাসী ছিলেন।

চুঁচুড়া হইতে কয়েক মাইল পশ্চিমে দাদপুর গ্রাম একবালে চিকণ শিল্পের জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। ইউরোপ ও আমেরিকার বহু পরিমানে চিকণ রপ্তানি হইত।

হুগলী—হাওড়া হইতে ২৪ মাইল দূর। ইহা হুগলী জেলার সদর শহর। হুগলীর প্রাচীন ইতিহাস বিশেষ কিছু অবগত হওয়া যায় না। অনেকে অনুমান করেন যে গঙ্গাতীরবর্ত্তী এই স্থানটিতে প্রচুর হোগলা বন ছিল বলিয়াই ইহার নাম হুগলী হইয়াছে। আবার কেহ কেহ বলেন পর্ত্তুগীজগণ গোলাকে গোলিন বলিতেন এবং এই স্থানে অবস্থিত তাঁহাদের গোলাগঞ্জকে তাঁহারা গোলিন নামে অভিহিত করিতেন বলিয়াই "হুগলী" নামের উৎপত্তি হইয়াছে। ভাগীরথীর তীরে যে কয়েকটি স্থানে পাশ্চাত্য জাতি উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে হুগলীর সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন এবং তাঁহাদের মধ্যে পর্ত্তুগীজেরাই সর্ব্বপ্রথম প্রাচ্যে আগমন করিয়াছিলেন। ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা সম্রাট আক্‌বরের অনুমতি লইয়া হুগলীতে একটি কুঠি স্থাপন করেন। পর্ত্তুগীজ জলদস্যুগণের অত্যাচারের ফলে বাংলার তৎকালীন সামুদ্রিক বাণিজ্য নষ্ট হইয়া যায় এবং পর্ত্তুগীজগণই উক্ত বাণিজ্যের অধিকারী হন। সামুদ্রিক বাণিজ্যের কল্যাণে হুগলীর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন বন্দর সপ্তগ্রামের অবনতি হয়। এইভাবে হুগলী তৎকালে প্রাচ্যের একটি প্রধান বন্দর হইয়া উঠে। সম্রাট হইবার পূর্ব্বে শাহজাহান বাংলায় আসিয়া দেশীয় লোকদের উপর পর্ত্তুগীজগণের নানারূপ অত্যাচার দেখিয়া গিয়াছিলেন। সম্রট হইবার পর তিনি পর্ত্তুগীজ দমনের জন্য সুবাদার কাসেম খাঁর নেতৃত্বে একদল মুঘল সৈন্য প্রেরণ করেন। এই সেনাবাহিনী প্রায় তিন চার মাস ধরিয়া হুগলী অবরোধ করিয়া থাকে এবং শ্রীরামপুরের নিকট ভাগীরথী বক্ষে একটি সেতুবন্ধন করে। পর্ত্তুগীজগণ আত্মসমর্পণ না করায় মুঘল সৈন্য ব্যাণ্ডেলের পর্ত্তুগীজ গির্জার সম্মুখের পরিখার জল সেচন করিয়া উহাতে বারুদ পুতিয়া অগ্নিসংযোগ করে এবং তৎফলে দুর্গপ্রাচীর কিয়দংশ উড়িয়া যায়। ভগ্নস্থানের মধ্য দিয়া মুঘল সৈন্য দুর্গমধ্যে প্রবেশ করে। এই যুদ্ধে প্রায় এক হাজার লোক নিহত ও চার হাজার পর্ত্তুগীজ মুঘলহস্তে বন্দী হয়। দুই হাজার লোকপূর্ণ পর্ত্তুগীজদিগের একখানি জাহাজ মুঘলহস্তে পড়িবার উপক্রম হইলে শত্রুহস্তে পড়া অপেক্ষা মৃত্যুই বাঞ্ছনীয় মনে করিয়া জাহাজের অধ্যক্ষ বারুদে আগুন দিয়া জাহাজখানি উড়াইয়া দেন। অন্যান্য অনেক পর্ত্তুগীজ জাহাজও এই পন্থা অবলম্বন করে। এই জাহাজ সকলের অগ্নিকাণ্ডের ফলে মুঘলনির্ম্মিত সেতু দগ্ধ হইয়া যায়। পর্ত্তুগীজগণের ৬৪ খানি বড় জাহাজ, ৫৭ খানি গ্রাব ও ২০০ স্লুপের মধ্যে মাত্র একখানি গ্রাব ও দুইখানি স্লুপ পলাইয়া গিয়া গোয়ায় পৌছিতে সক্ষম হয়। ইহা ১৬৩৯ খৃষ্টাব্দের ঘটনা। এই সময় হইতেই বাংলায় পর্ত্তুগীজ প্রাধান্য চিরকালের জন্য নষ্ট হইয়া যায়। এই সময়েই সপ্তগ্রামের ফৌজদারী কাছারি ও সরকারী কার্য্যালয় হুগলীতে স্থানান্তরিত করা হয় এবং হুগলী বন্দরের উন্নতির সূত্রপাত হয়।

১৭৪১ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রীয়গণ বাংলা আক্রমণ করিয়া নবাব আলিবর্দ্দীখাকে হটিয়া যাইতে বাধ্য করিয়া হুগলীর দুর্গ অধিকার করেন। মীর হাবিব দুর্গাধ্যক্ষ ও শিব রাও শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। পরে মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিত পরাজিত হইলে তাঁহারা হুগলী পরিত্যাগ করিয়া বিষ্ণুপুরে পলাইতে বাধ্য হন।

১৬৫১ খৃষ্টাব্দে ইংরেজগণ হুগলীতে একটি কুঠি স্থাপন করেন। প্রথম প্রথম ব্যবসায়ে বিশেষ সুবিধা না হওয়ায় বাংলায় কোম্পানির বাণিজ্য বন্ধ করিবার প্রস্তাব হয়। কিন্তু পরে ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে এই কুঠির অধীনে কাশীমবাজার, পাটনা ও বালেশ্বরে কুঠি স্থাপন করিয়া সোরা ও রেশমের ব্যবসায়ে কোম্পানি বিশেষ লাভবান হন। জব চার্ণকের সময়েই হুগলীর মুসলমান ফৌজদারের সহিত বিবাদের জন্য ইংরেজেরা এই স্থান ত্যাগ করিয়া ফৌজদারের কবল হইতে দূরে সুতানুটিতে বাণিজ্য-কুঠি স্থাপন করেন এবং তাহার ফলেই বর্ত্তমান কলিকাতা শহর গড়িয়া উঠে।

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে ক্লাইভের সময়ে ইংরেজ সৈন্য হুগলীর দুর্গ ও ফৌজদারের সমস্ত সম্পত্তি অধিকার করে এবং সপ্তাহকাল ধরিয়া হুগলী ও নিকটস্থ গ্রামগুলি লুণ্ঠন করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করে। বর্ত্তমানে যে স্থানে হুগলীর কলেক্টরের বাসভবন এবং পুরাতন কাছারী বাড়ী আছে সেই স্থানেই মুঘলদিগের দুর্গ ছিল।

বাংলার মধ্যে সর্ব্বপ্রথম ছাপাখানা স্থাপিত হয় হুগলীতে। পঞ্চানন কর্ম্মকার ও মনোহর দাসের সহযোগিতায় উইলকিন্স সহেব এই কায্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে এই ছাপাখানায় হ্যালহেড্ সাহেবের বাংলা ব্যাকরণ মুদ্রিত হইয়াছিল।

দানবীর হাজী মহম্মদ মহশীনের সুপ্রসিদ্ধ ইমাম্‌বাড়া এখানকার প্রধান দ্রষ্টব্য। ইহা প্রায় পৌনে তিন লাখ টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার গম্বুজ প্রায় ৮০ ফুট উচ্চ। ইহার দেওয়ালে কোর-আনের শ্লোক উৎকীর্ণ আছে। মহরমের সময় এখানে বিশেষ সমারোহ হয়। নিকটস্থ তাঁহার বাগিচা ও সমাধিও এখানকার দ্রষ্টব্য।

অতিরিক্ত বিলাসী ও অলস ব্যক্তির তুলনা করিতে গিয়া লোকে কথায় বলে, লোকটা যেন নবাব খাঞ্জা খা। খাজাহান খাঁ বা খাঞ্জা খাঁ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে পারস্যের রাজধানী তিহরাণ হইতে ভারতে আসিয়া মুঘল বাদ্‌শাহের অধীনে কার্য্য গ্রহণ করেন। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাংলা, বিহার ও ওড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করিলে ফৌজদার ওমরবেগের পর তিনি হুগলীতে ফৌজদার নিযুক্ত হইয়া আসেন। অতিরিক্ত বিলাসিতার জন্য তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে ফৌজদারের পদ উঠিয়া গেলে তিনি কোম্পানির নিকট হইতে মাসিক ২৫০৲ টাকা হিসাবে বৃত্তি পাইতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার স্ত্রী ১০০৲ টাকা হিসাবে বৃত্তি পাইতেন।

"লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন" এই প্রবাদবাক্যের প্রসিদ্ধ দানবীর গৌরী সেন প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বে হুগলী শহরের অন্তগত বালি মহাল্লায় জন্মগ্রহণ করেন। বাণিজ্যের দ্বারা তিনি প্রভূত অর্থোপার্জ্জন করেন এবং উহার অধিকাংশই দানকার্য্যে ব্যয় করেন। কথিত আছে অভাবগ্রস্ত ভদ্রলোকগণ পাছে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া সাহায্য প্রার্থনা করিতে সঙ্কোচ বা লজ্জাবোধ করেন সেই জন্য তিনি দোকানদারগণকে বলিয়া রাখিয়াছিলেন যে তাঁহার নাম লইয়া কেহ কিছু কিনিতে আসিলে তৎক্ষণাৎ যেন তাহা দেওয়া হয়। পরে তিনি উহার মূল্য দিয়া দিতেন। ইহা হইতেই প্রবাদবাক্যের উৎপত্তি। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শিব মন্দির হুগলীতে এখনও বর্ত্তমান আছে।

বালিতে রাধাকৃষ্ণের ঠাকুরবাড়ী ও চতুরদাস বাবাজী প্রতিষ্ঠিত বড় আখ্‌ড়া দ্রষ্টব্য স্থান। তিন শত বৎসরেরও পূর্ব্বে চতুর দাস বাবাজী এখানে আসিয়া আখড়া প্রতিষ্ঠা করেন। বাঁশবেড়িয়ার দক্ষিণাংশ খামারপাড়ায় একটি শাখা আখ্‌ড়া আছে। চতুর দাস বাবাজীর সমাধিকে সকলে ভক্তি করে।

হুগলীতে মল্লিক কাশীমের হাট নামে পরিচিত একটি বিখ্যাত হাট আছে।

ব্যাণ্ডেল জংশন—হাওড়া হইতে ২৫ মাইল দূর। বন্দর কথা হইতে ব্যাণ্ডেল নামের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। পূর্ব্বে ইহা পর্ত্তুগীজগণের অধিকারভুক্ত ছিল। ১৫৫৯ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজগণ এখানে একটি সুবৃহৎ গির্জ্জা নির্ম্মাণ করেন। অনেকের মতে ইহাই বাংলার আদি খৃষ্টীয় উপাসনা মন্দির। ইহার প্রাচীর গাত্রে অনেক উৎকৃষ্ট চিত্র অঙ্কিত আছে। বালক যীশু ও মাতা মেরীর মূর্ত্তি এখানে বিশেষ আড়ম্বরের সহিত পূজিত হয় এবং রোগ আরোগ্য ও মনস্কামনা পূর্ণ হইবার আশায় বহু রোম্যান ক্যাথলিক খৃষ্টান এই স্থানে আগমন করিয়া থাকেন। এই গির্জ্জাটি একটি দ্রষ্টব্য বস্তু।

এই গির্জ্জাটি একাধিকবার যুদ্ধবিগ্রহে ধ্বংস ও ভস্মীভূত হইয়াছে। ১৬৩১ খৃষ্টাব্দে মুঘলদের হস্তে পর্ত্তুগীজগণ পরাজিত এবং মুঘল কর্ত্তৃক হুগলী অধিকৃত হইবার সময় পর্ত্তুগীজগণের দুর্গ ও এই গির্জ্জা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। মুঘলগণ বহু খৃষ্টানকে বন্দী করিয়া আগ্রায় লইয়া যায়। কথিত আছে, সম্রাট জাহাঙ্গীরের আদেশে বন্দী পাদ্রী দা'ক্রুজকে একটি মত্ত হস্তীর সম্মুখে নিক্ষেপ করা হয়। কিন্তু হস্তী তাঁহাকে পদদলিত না করিয়া শুঁড় দিয়া আদর করিতে থাকে। ইহা দেখিয়া সম্রাট জাহাঙ্গীর ভীত ও বিস্মিত হইয়া দা'ক্রুজকে অব্যাহতি দেন এবং তাঁহার অনুরোধে ব্যাণ্ডেলের গির্জ্জা পুনরায় নির্ম্মাণ করিবার অনুমতি দেন এবং উহার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য বহু নিষ্কর জমি প্রদান করেন। মত্ত হস্তীর পদতল হইতে পাদ্রী দা'ক্রুজের আশ্চর্য্যরূপে রক্ষা পাওয়ার ঘটনাটির স্মরণে আজও প্রতিবৎসর এই গির্জ্জায় "ডোমিংগো দা'ক্রুজ" নামে একটি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রবাদ, এই গিজর্জায় মাতা মেরীর যে মূর্ত্তি আছে উহা পূর্ব্বে হুগলীস্থ পর্ত্তুগীজ সেনানিবাসে প্রতিষ্ঠিত ছিল। পাদ্রী দা'ক্রুজ ও তাঁহার এক স্বজাতীয় বণিক বন্ধু এই মূর্ত্তির বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। ১৬৩২ খৃষ্টাব্দের মুঘল পর্ত্তুগীজ সংঘর্ষের সময় উক্ত বণিক্ লাঞ্ছনার হাত হইতে এই মূর্ত্তিকে রক্ষা করিবার জন্য উহা লইয়া নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়েন, কিন্তু মূর্ত্তি বা তাঁহার আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। পাদ্রী দা'ক্রুজ ইহাতে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং মূর্ত্তিটির উদ্ধার সাধনের জন্য দিনরাত প্রার্থনা করিতে থাকেন। আগ্রা হইতে মুক্তি পাওয়ার পর তিনি ভারতবর্ষ ও সিংহলের খৃষ্টানগণের নিকট হইতে সংগৃহীত অর্থে ব্যাণ্ডেল গির্জ্জার সংস্কার আরম্ভ করেন। কাজ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে এমন সময় একদিন জ্যোৎস্না রাত্রে গির্জ্জার সম্মুখে নদীর জল ভীষণভাবে আলোড়িত হইয়া উঠে। সেই শব্দে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে পাদ্রী দা'ক্রুজ হঠাৎ শুনিতে পাইলেন যেন বহুদিন পূর্ব্বে জলমগ্ন তাঁহার সেই অন্তরঙ্গ বন্ধু তাঁহাকে ডাকিতেছেন। তিনি গবাক্ষপথে দেখিতে পাইলেন জ্যোৎস্নালোকে নদীর এক অংশ যেন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে এবং এক ব্যক্তি গির্জ্জার দিকে আসিতেছে। কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই সমস্ত কোলাহল থামিয়া গেল এবং নদীর আলোকিত অংশ পুনরায় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। পরদিন প্রাতঃকালে ঘুম ভাঙ্গিবার পর পাদ্রী দা'ক্রুজ দেখিলেন, বহু লোক গির্জ্জার সম্মুখে একত্র হইয়া বলাবলি করিতেছে "গুরুমা আসিয়াছেন"।

দা ক্রুজ অগ্রসর হইয়া দেখিলেন তাঁহার সেই অতি প্রিয় মেরীর মূর্ত্তিটি ফিরিয়া আসিয়াছেন। তখন তাঁহার মনে পড়িল পূর্ব্ব রাত্রে তিনি যে তাঁহার বণিক বন্ধুর কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়াছিলেন উহা কেবলমাত্র স্বপ্ন নহে। অতঃপর মহা আড়ম্বরে এই মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা হইল।

ব্যাণ্ডেল গির্জ্জার দক্ষিণে কয়েকটি সমাধির মধ্যে একটি জাহাজের মাস্তল প্রোথিত দেখা যায়। যে দিন মাতা মেরীর মূর্ত্তি মহাসমারোহে প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই দিন অকস্মাৎ একখানি বড় পর্ত্তুগীজ জাহাজ গির্জ্জার ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হয়। জাহাজের অধ্যক্ষ বলেন যে তাঁহারা বঙ্গোপসাগরে প্রবল ঝড়ের মধ্যে পড়েন; জাহাজ রক্ষার অন্য কোন উপায় না দেখিয়া তিনি মাতা মেরীর নিকট প্রাথনা ও মানত করেন যে তিনি যেন কৃপা করিয়া জাহাজখানিকে কোন নিরাপদ বন্দরে পৌঁছাইয়া দেন। কিছু পরে ঝড় থামিলে তিনি সবিস্ময়ে দেখিতে পান যে জাহাজখানি এই গির্জ্জার ঘাটে আসিয়া লাগিয়াছে। জাহাজের নাবিকগণ মহোৎসাহে মাতা মেরীর প্রতিষ্ঠা উৎসবে যোগদান করেন এবং মানত রক্ষার জন্য জাহাজের অধ্যক্ষ জাহাজ হইতে একটি মাস্তল লইয়া গির্জ্জায় উপহার প্রদান করেন। তদবধি এই উৎসর্গীকৃত মাস্তল গির্জ্জার প্রাঙ্গনে দাঁড়াইয়া আছে। দীর্ঘকাল ধরিয়া ঝড়, জল ও রৌদ্র ইহার কোনই ক্ষতি করিতে পারে নাই। এই জাহাজ বা অধ্যক্ষের নাম জানা যায় নাই।

ব্যাণ্ডেল জংশনের নিকটবর্ত্তী দেবানন্দপুর গ্রাম পরলোকগত সাহিত্যাচার্য্য শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মস্থান। সুপ্রসিদ্ধ কবি রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রও কিছুদিন দেবানন্দপুরে অবস্থান করিয়াছিলেন। সম্প্রতি এই গ্রামে শরৎ চন্দ্র ও ভারত চন্দ্রের উদ্দেশ্যে স্মৃতি-ফলক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ব্যাণ্ডেল হইতে একটি শাখা লাইন জুবিলী ব্রিজের উপর দিয়া গঙ্গা অতিক্রম করিয়া পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথের নৈহাটি স্টেশনের সহিত মিলিত হইয়াছে এবং অপর একটি শাখা নবদ্বীপ ও কাটোয়া হইয়া সাঁওতাল পরগণার অন্তগত বারহাড়োয়া পর্য্যন্ত গিয়াছে।

আদি সপ্তগ্রাম—হাওড়া হইতে ২৭ মাইল দূর। স্টেশনের নিকটেই প্রাচীন সপ্তগ্রামের ধবংসাবশেষ অবস্থিত। পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরাজগণের রাজত্বকালে সপ্তগ্রাম একটি বিখ্যাত স্থান ছিল ও তৎকালে ইহা একটি তীর্থ বলিয়া গণ্য হইত। কথিত আছে, পৌরাণিক যুগের রাজা প্রিয়ব্রতের সপ্ত পুত্র এই স্থানে তপস্যা করিয়া ঋষিত্ব লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম হয় সপ্তগ্রাম। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন, "সপ্ত ঋষির শাসনে বোলায় সপ্তগ্রাম"। বিপ্রদাসের মনসা-মঙ্গল, মাধবাচার্য্যে চণ্ডী এবং লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি ধোয়ী প্রণীত "পবনদূতম্" নামক কাব্যে এই স্থানের উল্লেখ আছে। এক সময়ে ইহার খ্যাতি সুদূর রোম পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কেহ কেহ ইহাকে গ্রীক্‌গণ বর্ণিত গঙ্গারিডি রাজ্যের দ্বিতীয় রাজধানী বলিয়া মনে করেন। ইংরেজ অধিকারের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত সপ্তগ্রাম একটি বিখ্যাত বন্দর ছিল এবং এখানে দেশবিদেশের বাণিজ্যতরীর সমাগম হইত। নিকটস্থ হুগলী বন্দরের অভ্যুথান এবং সরস্বতী নদী মজিয়া যাওয়ার সহিত সপ্তগ্রামের পতন ঘটে এবং ক্রমে ইহার সমুদয় ব্যবসাবাণিজ্য হুগলীতে স্থানান্তরিত হয়। মুঘলগণের হস্তে পর্ত্তুগীজগণের সম্পূণ পরাজয় ঘটিলে সপ্তগ্রামের ফৌজদার হুগলীতে গিয়া বসেন এবং সমস্ত সরকারী কার্য্যালয়ও তথায় চলিয়া যায়। পূর্ব্বকালে সরস্বতীর খাত দিয়াই ভাগীরথীর অধিকাংশ জলরাশি প্রবাহিত হইত এবং দেশের সামুদ্রিক বাণিজ্যের পথও ছিল সরস্বতী নদী।

সপ্তগ্রাম প্রাচ্যের একটি শ্রেষ্ঠ বন্দর হইয়া উঠিয়াছিল। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত সরস্বতীর তীরে অবস্থিত গ্রাম ও নগরগুলি বিশেষ ঐশ্বর্য্যশালী ছিল। শিয়াখালা, সিঙ্গুর, জনাই, চণ্ডীতলা, বেগমপুর, ঝাপড়দহ, মাকড়দহ, আন্দুল, হরিপাল প্রভৃতি সরস্বতী তীরবর্ত্তী গ্রামগুলি নিরন্তর কর্ম্মকোলাহলে মুখরিত হইত। খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত সপ্তগ্রামে বহু পরিমাণে কাগজ প্রস্তুত হইত।

১২৯৫ খৃষ্টাব্দে রুকন্-উদ্-দীন কৈকাউস্ শাহ যখন গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন সেই সময়ে উলুগ-ই-আজম্ জাফর খাঁ বাহরাম ইৎগীন রাঢ় দেশের তৎকালীন প্রধান নগর সপ্তগ্রাম জয় করেন। যে হিন্দু রাজাকে পরাস্ত করিয়া তিনি সপ্তগ্রাম অধিকার করেন তাঁহার নাম জানা যায় নাই। কবি কৃষ্ণরামের "ষষ্ঠীমঙ্গল" কাব্য হইতে অনুমান করা যায় যে শক্রজিৎ বা তাঁহার পরবর্ত্তী কোন রাজার সময়ে সপ্তগ্রাম মুসলমান অধিকারে আইসে। সপ্তগ্রাম জয় করিয়া জাফর খাঁ নিকটস্থ ত্রিবেণীতে একটি বৃহৎ মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করেন। ইহার একটি খিলানে আর্‌বী ভাষায় লিখিত যে লিপি আছে তাহা হইতে জানা যায় যে জাফর খা ৬৯৮ হিজরায় অথাৎ ১২৯৫ খৃষ্টাব্দে জনৈক হিন্দু রাজাকে পরাজিত ও এই মসজিদটি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৩১৩ খৃষ্টাব্দে জাফর খাঁর মৃত্যু হয়। ত্রিবেণীতে তৎকর্তৃক নিৰ্ম্মিত মসজিদের নিকট গঙ্গা-সরস্বতীর মিলনস্থলের অদূরে একটি পুরাতন প্রস্তরনির্ম্মিত মন্দিরের মধ্যে তাঁহার দেহ সমাহিত করা হয়। এই মন্দির পরে মস্‌জিদে পরিণত হয়।

কাহারও কাহারও মতে জাফর খাঁর অপর নাম দরাফ খা এবং তিনি নাকি গঙ্গার ভক্ত ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় রচিত একটি গঙ্গাস্তোত্র দরাফ্ খাঁর নামে প্রচলিত আছে।

১২৫০ খৃষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ মিশর দেশীয় পর্য্যটক ইবন বতুতা সপ্তগ্রামে আগমন করেন। তাঁহার লেখা হইতে জানা যায় যে সে সময়ে বল্‌বন বংশীয় রাজাদের প্রভুত্ব লোপ পাইলে তাঁহাদের ভৃত্য ফকর-উদ-দীন সপ্তগ্রাম ও সুবণগ্রাম অধিকার করেন।

গৌড়াধিপ প্রসিদ্ধ আলা-উদ্দীন হুসেন শাহের সময়ে সপ্তগ্রামের নাম "হুসেনাবাদ" রাখা হয়। এখানে একটি টাকশাল ছিল। সপ্তগ্রামে মুদ্রিত সের শাহ, হুসেন শাহ প্রভৃতি বহু মুসলমান নরপতির নামাঙ্কিত মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে।

গৌড়ের প্রসিদ্ধ নৃপতি সুলেমান কররানি যখন ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজ্য জয় করিতে উদ্যোগী হন তখন ভূরিশ্রেষ্ঠরাজ রুদ্রনারায়ণ ওড়িষ্যারাজ মুকুন্দদেব হরিচন্দনের সাহায্য গ্রহণ করেন। রুদ্রনারায়ণের জ্ঞাতিভ্রাতা বিখ্যাত বীর রাজীবলোচন রায় ভূরিশ্রেষ্ঠ ও ওড়িষ্যার সম্মিলিত সেনাবাহিনীর নায়কত্ব গ্রহণ করিয়া ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজ্য আক্রমণ পূর্ব্বক সপ্তগ্রামে আসিয়া সুলেমানের সৈন্যগণকে আক্রমণ করেন। ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে রাজীবলোচন কর্তৃক সপ্তগ্রাম অধিকৃত হয়। সপ্তগ্রাম পুনরধিকারের জন্য সুলেমান বহু চেষ্টা করেন কিন্তু পর পর চার বার রাজীবলোচনের নিকট তাঁহার পরাজয় ঘটে। অতঃপর তিনি রুদ্রনারায়ণকে বহু উপঢৌকন পাঠাইয়া দিয়া তাঁহার সহিত সন্ধি করেন ও সপ্তগ্রাম তাঁহাকে ছাড়িয়া দেন।

প্রাচীন সপ্তগ্রামের সমৃদ্ধির পরিচয় সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের "কপালকুণ্ডলা" ও মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর "বেণের মেয়ে" নামক উপন্যাসে বর্ণিত আছে।

খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে সপ্তগ্রামে রূপা বা পরম ভট্টারক শ্রীশ্রী ১০৮ রূপনারায়ণ সিংহ নামে বাগ্দী জাতীয় বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী একজন পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন। ইনি সপ্তগ্রামে একটি বিহার বা সঙঘারাম প্রতিষ্ঠা করেন; ইঁহার কীর্ত্তির কোন চিহ্নই এখন আর পাওয়া যায় না।

সপ্তগ্রাম একটি প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবতীর্থ। এখানে দ্বাদশগোপালের অন্যতম শ্রীমৎ উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের শ্রীপাট অবস্থিত। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রধান পার্ষদ নিত্যানন্দ এই স্থানে বহুদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। কথিত আছে শ্রীমৎ উদ্ধারণ দত্ত নিত্যানন্দের বিবাহে ১০ সহস্র টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। হুসেন শাহের সময়ে গোবর্দ্ধন ও হিরণ্য মজুমদার নামক দুই ভ্রাতা সপ্তগ্রামের "অধিকারী" বা রাজা ছিলেন। তাঁহাদের বার্ষিক আয় ১২ লক্ষ টাকার উপর ছিল। হিরণ্য মজুমদারের একমাত্র পুত্র রঘুনাথ শ্রীচৈতন্যদেবের একান্ত অনুরাগী ভক্ত ছিলেন। কপিলাবস্তুর রাজকুমার সিদ্ধার্থের ন্যায় বিপুল ঐশ্বর্য্য স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিয়া তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের পদে আত্মসমর্পণ করেন এবং কঠোর বৈরাগ্য সাধন ও অতুলনীয় ভক্তির প্রভাবে উত্তরকালে বৈষ্ণব জগতের চির-সম্মানিত ষট্ গোস্বামীর অন্যতমরূপে পরিচিত হন। প্রতিবৎসর অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণা দ্বাদশী তিথিতে সপ্তগ্রামে একটি বৈষ্ণব মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

চণ্ডী-রচয়িতা পরাশরপুত্র সপ্তগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন; পরে তিনি ময়মনসিংহ জেলার দক্ষিণে মেঘনা তীরে ন্যানপুর গ্রামে বাস স্থাপন করেন।

সপ্তগ্রামের প্রাচীন কীর্ত্তির মধ্যে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে নির্ম্মিত একটি মস্‌জিদ ও কয়েকটি কবর আছে। উহা এখন সরকারের "রক্ষিত কীর্ত্তি" বিভাগের অন্তর্গত। মসজিদের শিলা-লেখ হইতে জানা যায় যে ক্যাস্‌পিয়ান হ্রদের তীরবর্ত্তী আমুল নগর নিবাসী সৈয়দ ফক্‌রুদ্দীনের পুত্র সৈয়দ জমালদীন হুসেন ১৫২৯ খৃষ্টাব্দে আবুল মুজাফফর নুহ্‌স্‌রা শাহের রাজত্ব কালে এই মসজিদ নির্ম্মাণ করেন।

মগরা—হাওড়া হইতে ২৯ মাইল দূর। ইহা হুগলী জেলার একটি বাণিজ্যপ্রধান স্থান। বঙ্গীয় প্রাদেশিক রেলপথ নামক ছোট মাপের লাইট রেলওয়ে লাইনের সহিত ইহা একটি জংশন স্টেশন। মগরা হইতে এই ছোট রেল ত্রিবেণী ও অপরদিকে তারকেশ্বর পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই ছোট রেল দিয়া তারকেশ্বর যাইবার পথে মহানাদ ও দ্বারবাসিনী অতি প্রাচীন স্থান।

অনেকে অনুমান করেন যে মহানাদে এক সময়ে পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী ছিল। এই স্থানে হিন্দু আমলের পুরাতন কয়েকটি মন্দির, কয়েকটি প্রাচীন দীঘি ও রাজপ্রাসাদের ধবংসাবশেষ আছে। গড়পাড়া বা গড়ের বাগান নামক স্থানে রাজা চন্দ্রকেতুর গড় ছিল এইরূপ জনপ্রবাদ। গভীর জঙ্গলের মধ্যে এখনও গড়ের কিছু কিছু চিহ্ন দৃষ্ট হয়। সম্প্রতি খননের দ্বারা মহানাদের প্রাচীন কীর্ত্তি উদ্ধারের প্রচেষ্টা চলিতেছে। মহানাদের নিকটবর্ত্তী দ্বারবাসিনীতে দ্বারপাল প্রভৃতি গোপরাজগণের রাজধানী ছিল বলিয়া কথিত। এখানে জীয়ৎকুণ্ড নামক পুষ্করিণী, সাত সতীনের দীঘি, দ্বারবাসিনী দেবীর মন্দির ও পাপহরণ সরোবর প্রভৃতি দ্রষ্টব্য বস্তু।

মহানাদের জটেশ্বরনাথ মহাদেবের পুরাতন মন্দির দেখিতে অতি সুন্দর। ইহা রাজা চন্দ্রকেতু কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বলিয়া কথিত। শিবরাত্রির সময়ে এখানে একটি বড় মেলা হয়, উহা "মানাদের জাত" নামে বিখ্যাত। মন্দিরের সম্মুখস্থ জাততলায় কতকগুলি সমাধিস্তম্ভ আছে, এইগুলি প্রাচীনযুগের

বৌদ্ধশ্রমণ ও মহান্তগণের সমাধি বলিয়া অনুমিত হয়। একটি সমাধি "জীবন্ত সমাধি" নামে পরিচিত। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস যে ইহার মধ্যে একজন যোগী নির্বিকল্প সমাধিতে মগ্ন আছেন।

মহানাদের বশিষ্ঠগঙ্গা, জীয়ৎকুণ্ড, জামাইজাঙ্গাল প্রভৃতি দ্রষ্টব্য বস্তু। জীয়ৎকুণ্ড দেবখাত বলিয়া লোকের বিশ্বাস এবং মুসলমানযুগে ইহা অপবিত্র হইবার পূর্ব্বে এই কুণ্ডের জল সিঞ্চনে মৃতদেহেও প্রাণ সঞ্চার হইত বলিয়া প্রবাদ। মহানাদরাজ চন্দ্রকেতুর জামাতা ত্রিপুরার রাজপুত্রের অনুরোধে জামাইজাঙ্গাল নামক রাস্তা নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া জনশ্রুতি আছে।

পুরাকালে এই স্থানে মহাশঙ্খের নিনাদ হইয়াছিল বলিয়া গ্রামের নাম "মহানাদ" হয় এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে।

পাণ্ডুয়া—হাওড়া হইতে ৩৮ মাইল দূর। ইহার চলিত নাম পেঁড়ো। বাংলাদেশে মালদহ জেলায় আরও একটি পাণ্ডুয়া আছে। উহা পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথের আদিনা স্টেশন হইতে তিন মাইল দূরে অবস্থিত। অনেকে অনুমান করেন যে গৌড়ের পাণ্ডুয়ার অনুকরণে হুগলী জেলার পাণ্ডুয়ার নামকরণ হইয়াছে। আবার কাহারও কাহারও মতে ভূরিশ্রেষ্ঠরাজ পাণ্ডুদাসের নামানুসারে এই স্থানের নাম পাণ্ডুয়া হয়। এরূপও কথিত আছে, বুদ্ধদেবের খুল্লতাত অমৃতোদন শাক্যের পুত্র পাণ্ডুশাক্য পরিবারবর্গসহ পবিত্র তীর্থ ত্রিবেণীর নিকট গঙ্গাতীরে আসিয়া বাস করেন এবং তথায় একটি রাজ্য স্থাপন করেন। তাঁহারা নামানুসারেই রাজধানী পণ্ডুনগর বা পাণ্ডুয়া নামে খ্যাত হয়।

গৌড়রাজ শমস্-উদ্-দীন ইউসুফ শাহ (১৪৭৬-১৪৮৩ খৃষ্টাব্দ) পাণ্ডুয়ার হিন্দুরাজ্য জয় করেন। তখন পাণ্ডুয়ায় বহু মন্দির ছিল। এই নগর অধিকার করিয়া মুসলমানগণ এখানকার অতি প্রাচীন সূর্য্যমন্দিরকে মস্‌জিদে পরিণত করেন। এই মসজিদের ধ্বংসাবশেষ এখন "বাইশ দরওয়াজা" নামে পরিচিত। ইহার মধ্যে হিন্দু মন্দিরের বহু শিলা স্তম্ভ প্রভৃতি দৃষ্ট হয়। মস্‌জিদের বেদী বা মেম্বর একটি হিন্দু মন্দিরের গর্ভগৃহ। ব্রহ্ম শিলা নির্ম্মিত একটি প্রকাণ্ড সূর্য্যমূর্ত্তির পশ্চাতে উৎকীর্ণ আরবী শিলালিপি হইতে জানা যায় যে ইউসুফ শাহের রাজ্যকালে ১৪৭৭ খৃষ্টাব্দে মস্‌জিদটি নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার প্রাচীর গাত্রে উৎকীণ লিপি হইতে জানা যায় যে ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে লাল কুনওয়ার নাথ নামক জনৈক হিন্দু এই মস্‌জিদের সংস্কার করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া আরও একটি ভগ্ন-মস্‌জিদ আছে। পাণ্ডুয়ায় একটি মিনার আছে। উহার উচ্চতা ১২৭ ফুট। মিনারটি গোলাকার, পাচতল-ওয়ালা ও উপরদিকে ক্রমশঃ সরু। "পেঁড়োর পীর" নামে খ্যাত শাহ্ সুফী-উদ্দীন কর্ত্তৃক ইহা নির্ম্মিত হয়। কেহ কেহ বলেন যে এই মিনারটি পূর্ব্বে বিষ্ণুমন্দির ছিল। ইহার ভিতরকার দেওয়ালে মীনার কাজ আছে।

পীর শাহ্ সুফী-উদ্দীনের আস্তানা এ অঞ্চলে বিশেষ প্রসিদ্ধ।

পাণ্ডুয়ায় রোজাপুকুর ও পীরপুকুর নামে দুইটি দীঘি আছে। বাগেরহাটের খান্-জাহান্ আলীর দীঘির ন্যায় পাণ্ডুয়ার পীরপুকুরে কতকগুলি কুমীর আছে। উহারা ফকিরগণের আহ্বানে কিনারার নিকট পর্য্যন্ত আসিয়া খাদ্যাদি গ্রহণ করে। প্রতি বৎসর ২৯শে পৌষ এখানে মেলা বসে এবং রাত্রি ৩টা হইতে পীরপুকুরে স্নান করিয়া লোকে ধান ও কড়ি ছড়াইতে পীরের আস্তানায় যাইয়া অর্ঘ্য নিবেদন করেন। কেহ বা পথে বসিয়া কোরআন্ আবৃত্তি ও ধর্ম্মসঙ্গীত গান করেন। যাত্রীরা পীরপুকুরের জল লইয়া যান। চৈত্র মাসেও একটি মেলা বসে।
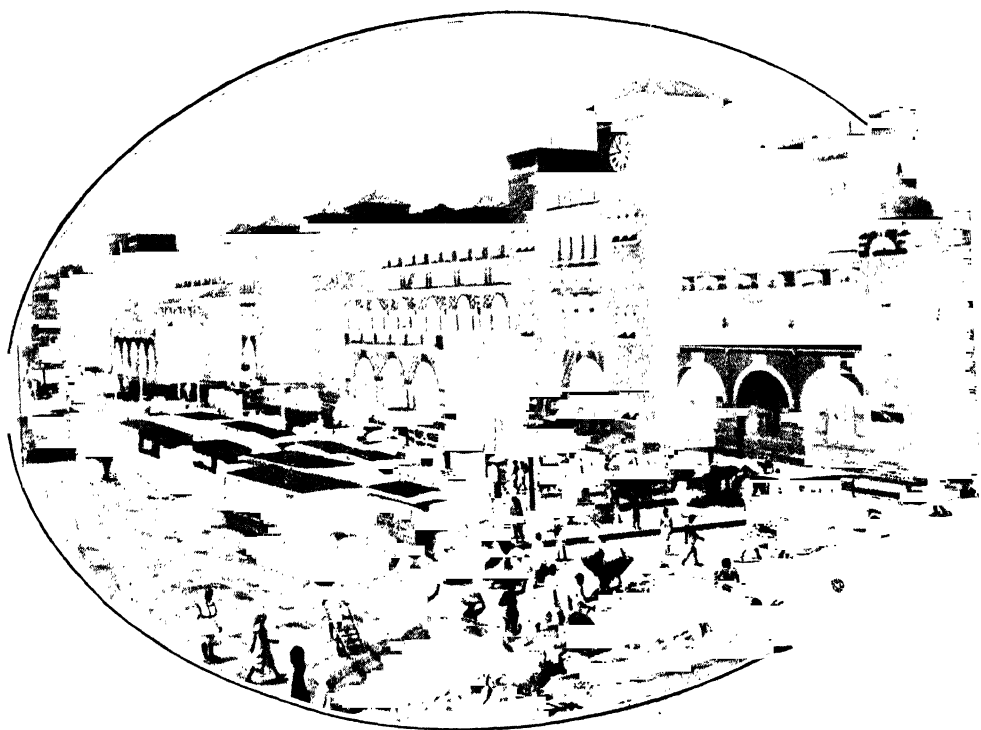
হাওড়া স্টেশন (পৃষ্ঠা ৬৭)
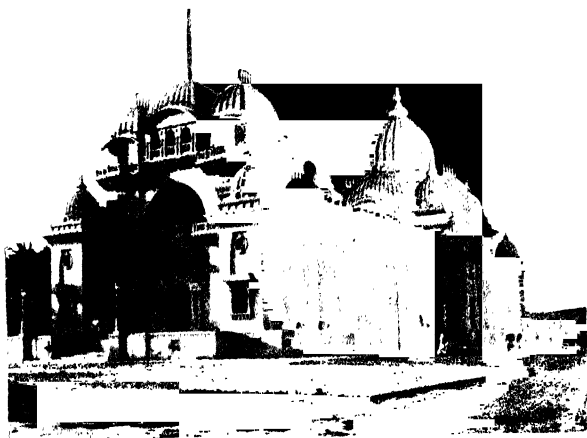
রামকৃষ্ণ মন্দির, বেলুড় (পৃষ্ঠা ৬৮)

ওয়েলিংডন সেতু, বালী (পৃষ্ঠা ৬৮)
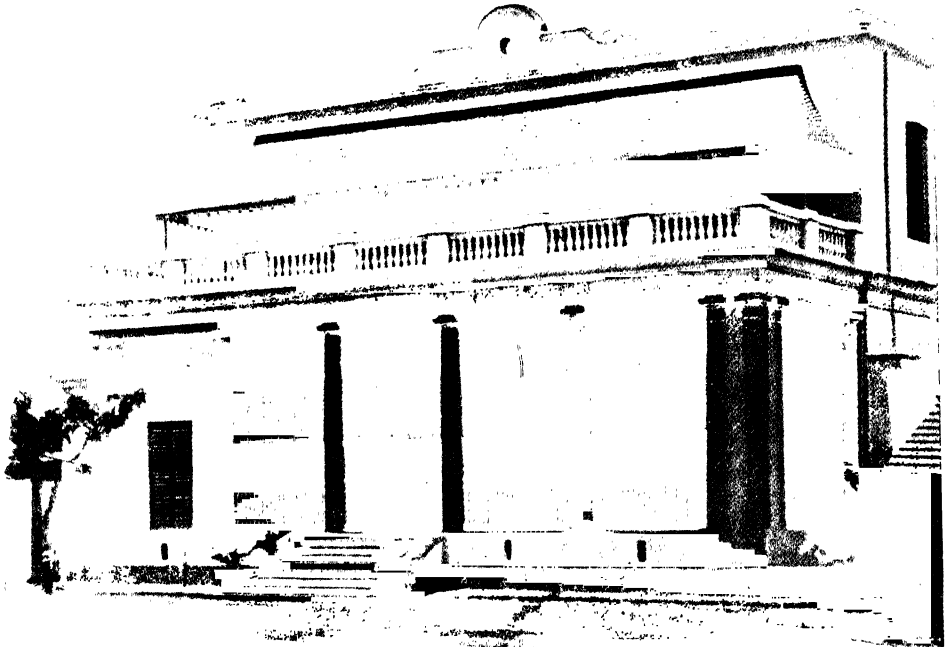
হেষ্টিংস হাউস, রিষড়া (পৃষ্ঠা ৬৯
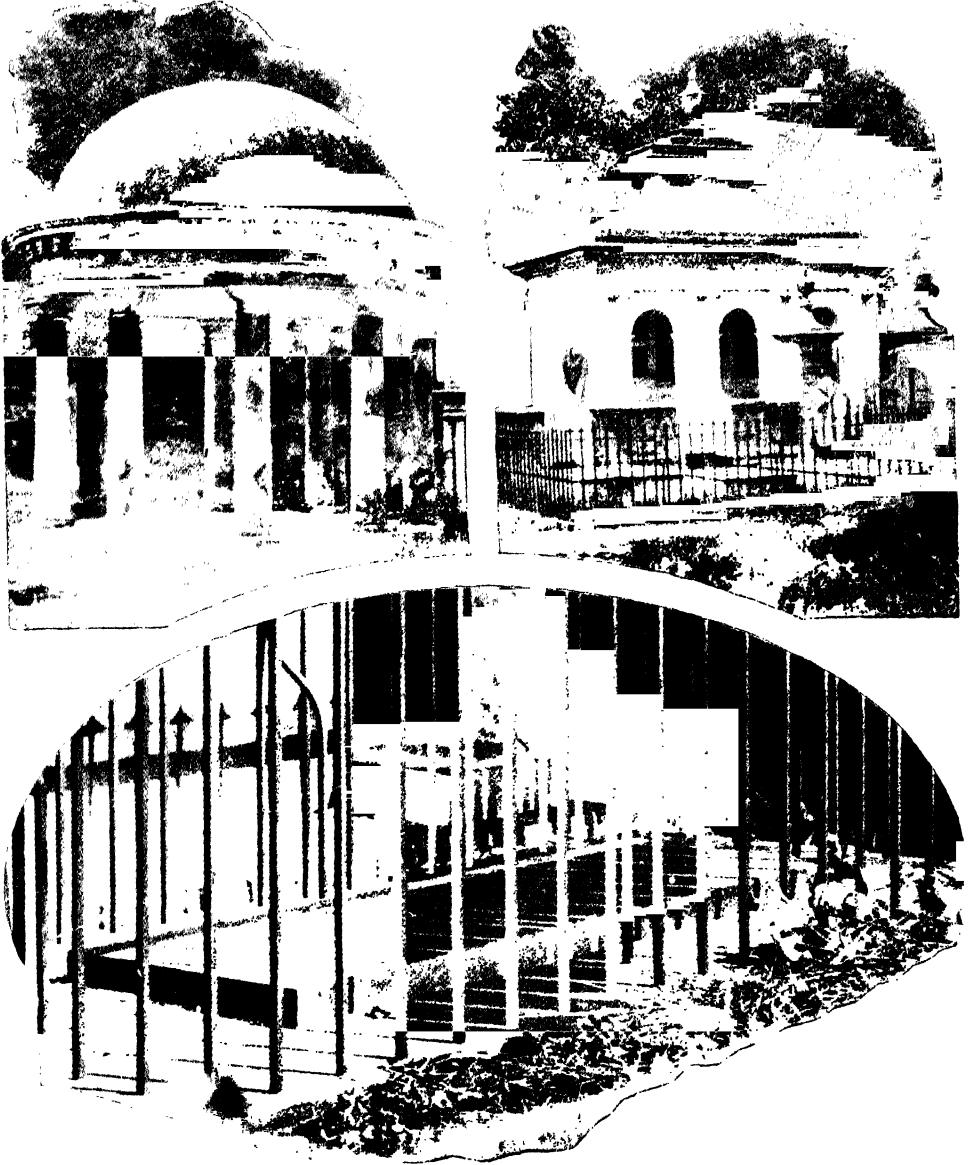
ওয়ার্ড, মার্শমান ও কেরির সমাধি (পৃষ্ঠা ৭০)
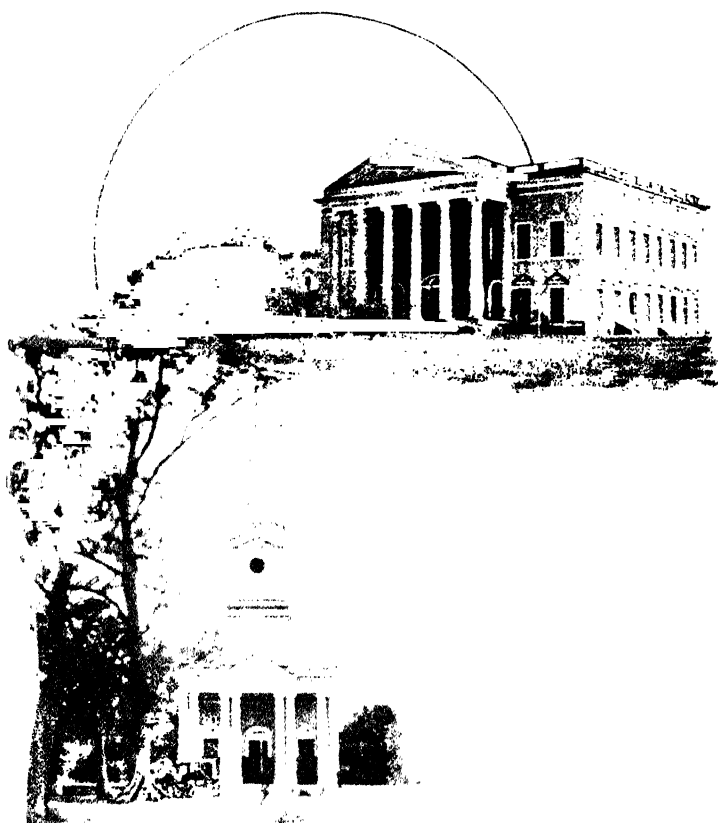
শ্রীরামপুর কলেজ, সেন্ট ওলাফ গির্জা (পৃষ্ঠা ৭০)

জগন্নাথ দেবের মন্দির, মাহেশ (পৃষ্ঠা ৭০)
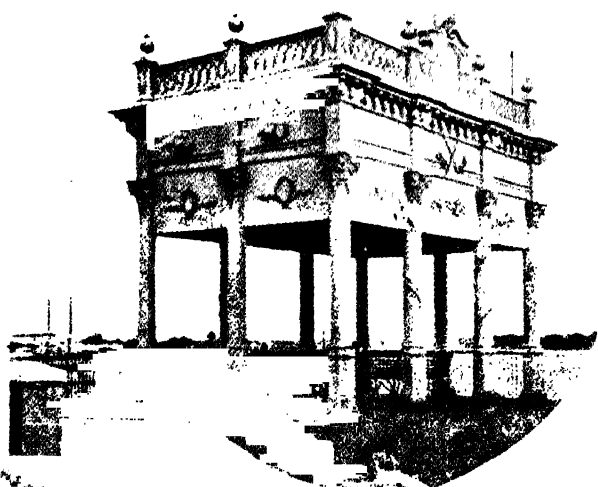
রাজপথ, ঘাট ও গির্জ্জা, চন্দননগর (পৃষ্ঠা ৭২)

গবর্ণরের বাটী, চন্দননগর (পৃষ্ঠা ৭২)
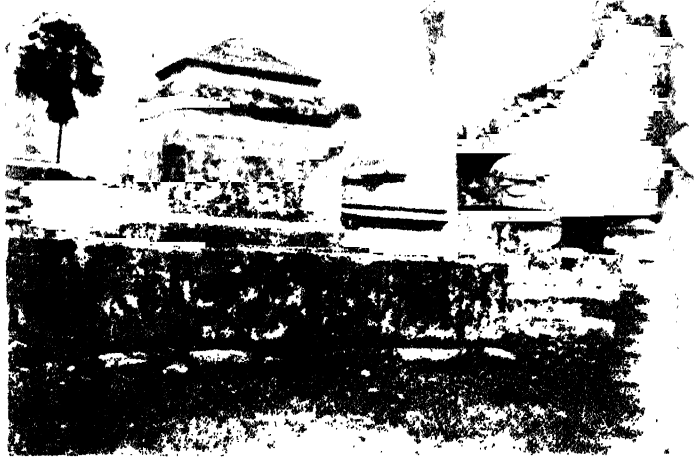
পুরাতন ওলন্দাজ কবরখানা, কবরের উপর দগ্ধ মৃত্তিকা নির্ম্মিত নরকপাল ও আর্ম্মানি গির্জা (পৃষ্ঠা ৭৩)

পীরের আস্তানা থাকার জন্য পাণ্ডুয়ায় বহুমুসলমান যাত্রীর সমাগম হয়।

পাণ্ডুয়ায় বহু সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারের বাস আছে। ইংরেজ রাজত্বের প্রথম যুগে বিচার কার্য্যের সাহায্যের জন্য যখন কাজী নিযুক্ত করা হইত সে সময়ে পাণ্ডুয়া হইতে বহু লোক এই কার্য্য করিতেন।

এক কালে পাণ্ডুয়া পাতলা ও মজবুত কাগজের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে হুগলীর ম্যাজিস্ট্রেট্ অন্যান্য ম্যাজিস্ট্রেট্‌কে এই কাগজ সরবরাহ করিতেন।

পাণ্ডুয়ার নিকটস্থ চাঁপতা গ্রামে ১৭৪১ খৃষ্টাব্দে কবিওয়ালা রামনিধি রায় জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার গান "নিধুর টপ্পা" নামে খ্যাত। তাঁহার সুন্দর প্রেমসঙ্গীতগুলি সেকালে বিশেষ লোকপ্রিয় হইয়াছিল।

বর্দ্ধমান জংশন—হাওড়া হইতে ৬৭ মাইল দূর। বর্দ্ধমান শহরটি বাঁকা নদীর তীরে অবস্থিত। ইহার ন্যায় প্রাচীন শহর বাংলাদেশে অতি অল্পই আছে। গ্রীক্ ঐতিহাসিকগণ বর্ণিত গঙ্গারিডি রাজ্যের রাজধানী পার্থেলিস্ বর্ত্তমান বর্দ্ধমান বলিয়া কাহারও কাহারও অভিমত। অনেকে অনুমান করেন যে প্রসিদ্ধ জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামীর পূর্ববাশ্রমের নাম "বর্দ্ধমান" হইতেই এই স্থানের নাম বর্দ্ধমান হইয়াছে। প্রাচীন জৈন ধর্ম্মগ্রন্থ "অঙ্গ" পাঠে জানা যায় যে মহাবীর স্বামী ৫৪২ হইতে ৫৩০ খৃষ্ট পূর্ববাব্দে রাঢ়দেশের চুয়াড়দিগের উন্নতিবিধানে উদ্যমশীল হন। প্রথমে তিনি চুয়াড়গণের নিকট অপমানিত ও প্রহৃত হন, পরে তিনি তাঁহাদিগের ও রাঢ়ের অন্যান্য অধিবাসগিণের নিকট পূজিত হন। কথিত আছে, বর্ত্তমান বর্দ্ধমান নগরেই তিনি প্রথম ধর্ম্মপ্রচার করেন। মহাকবি ভারতচন্দ্র বর্দ্ধমানকে বিদ্যাসুন্দরের ঘটনাস্থল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে আকবরের সেনাদল এই স্থানে দায়ুদ খাঁর পরিজনগণকে বন্দী করে। ১৬০৬ খৃষ্টাব্দে জগৎবিখ্যাত সুন্দরী ইতিহাস প্রসিদ্ধ নূরজাহানের প্রথম স্বামী শের অফগান এই স্থানে নিহত হন। যুবরাজ অবস্থায় জাহাঙ্গীর (সেলিম) নূরজাহান বা মেহেরুন্নিসার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু সম্রাট আকবর তাহাতে সম্মত না হইয়া শের আফগানের সহিত মেহেরুন্নিসার বিবাহ দেন ও তাঁহাদিগকে সুদূর বর্দ্ধমানে পাঠাইয়া দেন। জাহাঙ্গীর বাদশাহ হইয়া কুতব-উদ্-দীনকে বাংলার শাসন কর্ত্তা করিয়া পাঠান। কুতব শের আফগানকে পত্নীত্যাগের কথা বলিলে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ ও নিহত করেন, কিন্তু কুতবের অস্ত্রাঘাতে নিজেও প্রাণত্যাগ করেন। শের আফগান ও কুতব-উদ্-দীনের সমাধি বর্দ্ধমান শহরের পীর বহরাম নামক পল্লীতে পাশাপাশি অবস্থিত। শের আফগানের মৃত্যুর পর মেহেরুন্নিসাকে দিল্লীতে লইয়া যাওয়া যায়। পরে তিনি সম্রাটের সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন।

১৬২৪ খৃষ্টাব্দে যুবরাজ খুররম (সাজাহান) পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া দক্ষিণাত্যে পরাজিত হওয়ার পর বাংলায় পলাইয়া আসেন এবং বর্দ্ধমান আক্রমণ করেন। ভীষণযুদ্ধে সুবাদার ইব্রাহিম খাঁ নিহত হইলে খুররম তেলিয়াগড়ি দুর্গ অধিকার করেন। ইহার অত্যাল্পকাল পরেই বর্দ্ধমান রাজ্য ও রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। বর্দ্ধমানের যাহা কিছু গৌরব তাহা এই রাজবংশের জন্য। লাহোরের সঙ্গম রায় নামক জনৈক কাপুর ক্ষত্রিয় এই রাজবংশের আদি পুরুষ। তিনি জগন্নাথ দর্শন করিয়া প্রত্যাগমন পথে বর্দ্ধমানের নিকটবর্ত্তী বৈকুণ্ঠপুর গ্রামে ব্যবসায়ের জন্য বসবাস করেন। তাঁহার প্রপৌত্র আবু রায় রাজানুগ্রহ লাভে সমর্থ হইয়া বর্দ্ধমানের ফৌজদারের অধীনে রেখাবী বাজারের "চৌধুরী" এবং পরে "কোতোয়াল" নিযুক্ত হন। ইঁহার সময় হইতেই বর্দ্ধমান রাজ্যের সূত্রপাত

হয়। ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে চেতোয়া-বরদার রাজা শোভাসিংহ রহিম খাঁ নামক এক আফগান সর্দ্দারের সহিত মিলিত হইয়া দিল্লীর বাদশাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং বাদশাহের অনুগৃহীত বর্দ্ধমান রাজ্য আক্রমণ করিয়া বর্দ্ধমান অধিপতি কৃষ্ণরাম রায়কে নিহত ও তাঁহার পরিজনগণকে বন্দী করেন। কৃষ্ণরামের কন্যার উপর অত্যাচার করিতে গিয়া শোভাসিংহ ছুরিকাঘাতে তাঁহার হস্তে নিহত হন। সাধ্বী কুমারী পাপীর স্পর্শে দেহ অপবিত্র হইয়াছে মনে করিয়া আত্মঘাতিনী হন। শোভাসিংহের মৃত্যুর পর বিদ্রোহী দল রহিম খাঁকে নেতৃপদ প্রদান করে। এই বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য সম্রাট আওরঙ্গজেবের পৌত্র আজিম্-উস্‌শান বর্দ্ধমানে প্রেরিত হন। বিদ্রোহী দলকে পরাজিত ও রহিম খাঁকে নিহত করিয়া তিনি তিন বৎসরকাল বর্দ্ধমানে বাস করেন এবং এখানে একটি মসজিদ নির্ম্মাণ করেন। বিদ্রোহ দমনের পর কৃষ্ণরামের পুত্র জগৎরাম বর্দ্ধমান জমিদারী ও বাদশাহের নিকট হইতে রাজা খেতাব লাভ করেন। জগৎরামের পুত্র কীর্ত্তিচন্দ্র রায় বর্ত্তমান মেদিনীপুর জেলার অন্তগত চন্দ্রকোণা ও বরদার রাজাদিগকে পরাস্ত করিয়া তাঁহাদের অধিকৃত অঞ্চল স্বীয় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। পরবর্ত্তী বর্দ্ধমান রাজগণের মধ্যে তিলকচাঁদ ও মহাতাবচাঁদ বাহাদুরের নাম উল্লেখযোগ্য। তিলকচাঁদ দিল্লীর সম্রাট শাহআলমের নিকট হইতে "মহারাজাধিরাজ" উপাধি ও পাঁচহাজারী সনদ লাভ করিয়াছিলেন। কোন বিষয় লইয়া ঈস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির সহিত তাঁহার মনোমালিন্য হওয়ায় তিনি স্বীয় অধিকারের মধ্যে কোম্পানির জাহাজের প্রবেশ নিষেধ করেন। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে নবাব মীরকাসিম বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম ইংরেজদিগের হস্তে সমপণ করেন। এই ব্যবস্থায় অসন্তুষ্ট হইয়া তিলকচাঁদ বীরভূমরাজের সহিত মিলিত হইয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করেন ; কোম্পানির সহিত যুদ্ধে তাঁহাদের পরাজয় ঘটে। তিলকচাঁদের পর মহারাজ তেজচন্দ্র বর্দ্ধমানের গদীপ্রাপ্ত হন। তিলকচাঁদের এক পুত্র প্রতাপচাঁদ অল্প বয়সে গৃহত্যাগ করেন। দীর্ঘকাল পরে এক ব্যক্তি বর্দ্ধমানে আসিয়া প্রতাপচাঁদ নামে আত্মপরিচয় দেন। ইহাতে এক জটিল সমস্যার উদ্ভব হয়। শেষ অবধি জাল প্রতাপচাঁদের দাবী টিকে নাই। সুসাহিত্যিক সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "জাল প্রতাপচাঁদ" নামক পুস্তকে এই ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ আছে। তেজচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁহার দত্তকপুত্র মহারাজাধিরাজ মহাতাবচাঁদ বাহাদুর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় গবর্ণমেণ্টকে যথেষ্ট সাহায্য করায় তিনি ব্যক্তিগতভাবে "হিজ্ হাইনেস্" উপাধি ও তোপের সম্মান লাভ করেন। বর্দ্ধমানের বর্ত্তমান মহারাজা ইঁহার পৌত্র।

পূর্ব্বাপর হইতেই বর্দ্ধমানের রাজগণ বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া আসিতেছেন। অধ্যাপক, শিল্পী, গায়ক, বাদক, কবি, চিত্রকর ও গ্রন্থকারগণের মধ্যে অনেকেই বর্দ্ধমান রাজের বৃত্তিভোগ করিয়াছেন। সুবিখ্যাত সাধক কবি কমলাকান্ত ও নীলকণ্ঠ বর্দ্ধমানের রাজসভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। মহারাজ মহাতাবচাঁদ বহু অর্থব্যয়ে মূল মহাভারতের একটি বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়া উহা বিনামূল্যে বিতরণ করেন।

বর্দ্ধমান শহরের দ্রষ্টব্য বস্তুর মধ্যে মহারাজার প্রাসাদ, গোলাপবাগ, দিলখোস্ বাগ, শ্যামসায়র ও কৃষ্ণসায়র নামক দীঘি, সর্ব্বমঙ্গলা দেবীর মন্দির এবং লর্ড কার্জনের সম্মানার্থ নির্ম্মিত "স্টার অফ্ ইণ্ডিয়া" নামক তোরণ উল্লেখযোগ্য। রাজপ্রাসাদটি মহারাজ মহাতাবচাঁদ কর্ত্তৃক বহু অর্থব্যয়ে নির্ম্মিত হয়। গোলাপবাগে একটি পশুশালা আছে। কৃষ্ণসায়র দীঘি রাজা কৃষ্ণরাম রায় কর্ত্তৃক খনিত। জনশ্রুতি যে দুর্ব্বৃত্তগণ এই দীঘির মধ্যেই তাঁহাকে নিহত করে।

বর্দ্ধমান শহর হইতে দুই মাইল দূরে নবাবহাট নামক স্থানে রাজবংশের প্রতিষ্ঠিত ১০৮টি শিবমন্দির আছে। এই মন্দিরগুলির নিকটেই তালিতগড় বা তেলিয়াগড়ির দুর্গ অবস্থিত। তালিত রেল স্টেশনে নামিয়া এই দুর্গটি ও শিবমন্দিরগুলি দেখিতে পাওয়া যায়। বর্গীর হাঙ্গামার সময় বর্দ্ধমান রাজপরিবার তালিতগড়ের দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিতেন।

পূর্ব্বে বর্দ্ধমান স্বাস্থ্যকর স্থান ছিল। ইংরেজ শাসনের প্রথম যুগেও এ অঞ্চল কৃষি সম্পদে ভারতের শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিত এবং বর্দ্ধমানকে "বাংলার বাগিচা" বলা হইত। কিন্তু ১৮৬২ খৃষ্টাব্দ হইতে "বর্দ্ধমান জ্বর" নামে পরিচিত এক প্রকার ম্যালেরিয়া জ্বরের জন্য ইহা ক্রমশঃ অস্বাস্থ্যকর হইয়া পড়িয়াছে। অবশ্য শহরের স্বাস্থ্য বর্ত্তমানে অপেক্ষাকৃত উন্নত হইয়াছে।

বর্দ্ধমানে মহারাজাধিরাজ বাহাদুর কর্ত্তৃক স্থাপিত একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজ, জেলাবোর্ড পরিচালিত একটি টেক্‌নিক্যাল্ স্কুল ও গবর্ণমেণ্ট পরিচালিত একটি মেডিক্যাল স্কুল আছে। এখানকার সীতাভোগ, মিহিদানা, খাজা ও ওলা নামক মিষ্টান্ন বিশেষ বিখ্যাত।

বর্দ্ধমান মিউনিসিপ্যালিটির অন্তগত কাঞ্চননগর ছুরি ও কাঁচি প্রভৃতির জন্য প্রসিদ্ধ। কেহ কেহ অনুমান করেন যে বঙ্গরাজ শশাঙ্কদেব কিছুকাল এখানে অবস্থান করিয়াছিলেন। কাঞ্চননগরের নিকটে দামোদর নদের পশ্চিমতীরে রাঙ্গামাটি নামক গ্রাম হইতে ছয় মাইল পশ্চিমে শশাঙ্ক নামে একটি গ্রাম আছে। নিকটেই পুরাতন দামোদর খাতের উত্তরে গৌরনদের তীরে আর একটি শশাঙ্ক গ্রাম আছে। এই জন্য অনেকে মনে করেন যে এই অঞ্চলে শশাঙ্কদেবের বংশধরগণ বহুকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন।

বর্দ্ধমান হইতে একটি ছোট মাপের লাইন এই জেলার কাটোয়া মহকুমা হইয়া বীরভূম জেলার অন্তর্গত আহ্‌মদপুর পর্য্যন্ত গিয়াছে।

খানা জংশন—হাওড়া হইতে ৭৬ মাইল দূর। ইহা একটি সমৃদ্ধ গ্রাম। এই স্থান হইতে সাহেবগঞ্জ লুপ লাইন বাহির হইয়াছে।

মানকর—হাওড়া হইতে ৯০ মাইল। এই স্থানটি রেশমের কারখানার জন্য বিখ্যাত। এখানে খৃষ্টান মিশনারীগণ কর্ত্তৃক স্থাপিত একটি দাতব্য চিকিৎসালয় ও হাঁসপাতাল আছে। মানকরের কদমা, ওলা, খাজা প্রভৃতি মিষ্টান্ন প্রসিদ্ধ।

মানকর স্টেশন হইতে এক মাইল উত্তরে অমরারগড় নামক স্থানে প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। প্রবাদ এই স্থানে গোপভূমের সদ্‌গোপ বংশীয় রাজা মহেন্দ্রের রাজধানী ছিল। ইহার সুরক্ষিত গড়ের চিহ্ন এখনও দৃষ্ট হয়।

অনেকের মতে নব্য ন্যায়ের প্রবর্ত্তক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত রঘুনাথ শিরোমণি মানকরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অতি শৈশবেই ইঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। রঘুনাথ জন্মাবধি একচক্ষু ছিলেন। দরিদ্র জননী তাঁহার একচক্ষু অসাধারণ বুদ্ধিমান সন্তানকে বিদ্যাশিক্ষা দিবার আশায় নবদ্বীপে গমন করেন। বালকের অসামান্য বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাইয়া পণ্ডিত প্রবর বাসুদেব সার্ব্বভৌম মাতাপুত্রের ভার গ্রহণ করেন। অল্পকালের মধ্যেই বাসুদেব সার্ব্বভৌমের নিকট শিক্ষা সমাপন করিয়া রঘুনাথ

মিথিলার অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক পক্ষধর মিশ্রের সহিত ন্যায়ালোচনার জন্য মিথিলা গমন করেন। কিছুদিন মিথিলায় অবস্থান করিয়া পক্ষধরের সহিত ন্যায়বিচারে জয়লাভ করিয়া রঘুনাথ শিরোমণি নবদ্বীপে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার কৃতিত্বে নবদ্বীপ ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ন্যায় শিক্ষার কেন্দ্র হইয়া উঠে। "প্রামাণ্যবাদ" "পদার্থতত্ত্বনিরূপণ" "চিন্তামণি দীধিতি" প্রভৃতি গ্রন্থরচনার দ্বারা নব্য ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করিয়া রঘুনাথ শিরোমণি বাংলার মুখোজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন।

পানাগড়—হাওড়া হইতে ৯৭ মাইল। স্টেশনের পর হইতেই প্রাচীন জঙ্গল মহালের অল্প অল্প জঙ্গল দেখা যায়। পানাগড় স্টেশন হইতে অর্দ্ধ মাইল উত্তরে অবস্থিত কাঁক্সা একটি প্রাচীন স্থান। গোপভূম রাজবংশের এক শাখা এখানে বাস করিতেন। কথিত আছে যে সৈয়দ বোখারী নামক জনৈক মুসলমান সর্দ্দার কাঁকসার দুর্গ জয় করেন। এই দুর্গের ধ্বংসাবশেষ আজিও বর্ত্তমান আছে। দুর্গের অনতিদূরে রাজার মস্‌জিদ্ নামে একটি মস্‌জিদ্ আছে। ইহার প্রস্তর গাত্রে হিন্দু ভাস্কর্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

অণ্ডাল জংশন—হাওড়া হইতে ১১৬ মাইল দূর। এখান হইতে একটি শাখা লাইন বীরভূম জেলার সাঁইথিয়া পর্য্যন্ত গিয়াছে এবং অপরটি উত্তর রাণীগঞ্জের খনিঅঞ্চলে অবস্থিত গৌরাঙ্গদি পর্য্যন্ত গিয়াছে। শেষোক্ত শাখা পথে ইকড়া নামক জংশন স্টেশন হইতে অপর একটি শাখা বড়বানী হইয়া ১২ মাইল দূরবর্ত্তী প্রধান লাইনের সীতারামপুর স্টেশনের সহিত মিলিত হইয়াছে।

অণ্ডাল-সাঁইথিয়া শাখা লাইনের উপর উখড়া, পাণ্ডবেশ্বর, দুবরাজপুর ও শিউড়ী প্রসিদ্ধ স্টেশন।

উখড়া—অণ্ডাল জংশন হইতে ৮ মাইল দূর। ইহা বর্দ্ধমান জেলার একটি প্রধান গ্রাম ও বাণিজ্য-প্রধান স্থান। এখানে বহু সুন্দর সুন্দর দেবালয় আছে।

পাণ্ডবেশ্বর—অণ্ডাল জংশন হইতে ১৩ মাইল দূর। এখানে অজয় তীরে পণ্ডবেশ্বর নামে একটি প্রাচীন শিবলিঙ্গ আছে। প্রবাদ, বনবাসকালে পঞ্চপাণ্ডব এই অঞ্চলে কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন এবং এখানে এই শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ভীমগড় নামে একটি পুরাতন গড়ের ভগ্নাবশেষও এখানে দৃষ্ট হয়।

দুবরাজপুর—অণ্ডাল জংশন হইতে ২২ মাইল দূর। ইহা বীরভূম জেলার একটি বিখ্যাত বাণিজ্য কেন্দ্র। পিতল ও কাঁসার বাসন এবং জাঁতি ও অন্যান্য লৌহ নির্ম্মিত দ্রব্যাদির জন্য এই স্থান প্রসিদ্ধ। এখানে একটি মুনসেফী আদালত আছে। এই স্থানে বহু প্রাচীন শিবমন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। এখানকার নৈসর্গিক শোভা অতি সুন্দর।

দুবরাজপুর অঞ্চলের বেলে পাথর প্রসিদ্ধ। এক একটি প্রস্তরখণ্ডের উচ্চতা ও পরিধি ৫০ ফুটেরও অধিক। শহরে এক এক জায়গায় অনেকগুলি এইরূপ পাথর দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল পাথর দিয়া বহুকাল হইতে দেবমন্দির ও বাসভবন প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়া আসিতেছে। এই পাথর গুলি সম্বন্ধে নানারূপ গল্প প্রচলিত আছে। রামচন্দ্র কুমারিকা হইতে লঙ্কা পর্য্যন্ত সেতু বাঁধিবার জন্য নাকি হিমালয় হইতে পুষ্পক রথে করিয়া পাথর লইয়া যাইতেছিলেন; দুবরাজপুরের উপর দিয়া যাইবার সময়ে রথের ঘোড়া ভয় পাইলে রথ নড়িয়া যায় ও কতকগুলি পাথর এখানে পড়িয়া যায়।

দুবরাজপুর হইতে ৫ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে প্রসিদ্ধ তীর্থ বক্রেশ্বর বা বক্রনাথ অবস্থিত। ইহা একটি পীঠস্থান। এখানে দেবীর ভ্রূমধ্য পতিত হইয়াছিল, দেবীর নাম মহিষমর্দ্দিনী, ভৈরব বক্রনাথ। মহাশ্মশানের উপর এই মহাপীঠ অবস্থিত। এখানে সাতটি উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। দেবীর মন্দির প্রাঙ্গনে শ্বেত সরোবর নামক উষ্ণ কুণ্ড আছে। উহাতে স্নান করিয়া একটি গহ্বরের মধ্যে নামিয়া বক্রনাথ মহাদেবকে দর্শন করিতে হয়।

বক্রনাথ তীর্থ সম্বন্ধে কাহিনী আছে যে পুরাকালে ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত হিরণ্যকশিপু দৈত্যকে বিনাশ করায় ব্রহ্মবধজনিত পাপে ভগবান নৃসিংহদেবের নখরে দারুণ জ্বালা অনুভূত হয়। দেব সমাজে এই কথা প্রচারিত হইলে মহামুনি অষ্টাবক্র নৃসিংহদেবকে জ্বালামুক্ত করিবার জন্য স্বেচ্ছায় এই জ্বালা স্বীয় মস্তকে ধারণ করেন। জ্বালাপ্রভাবে অষ্টাবক্রকে নিদারুণ কষ্ট ভোগ করিতে দেখিয়া নৃসিংহদেব তাঁহাকে বক্রনাথ মহাদেবকে স্পর্শ করিতে বলেন। গহ্বর মধ্যে নামিয়া অষ্টাবক্র মুনি বক্রনাথকে স্পর্শ করিয়া উপবিষ্ট হইলে গুহামধ্য দিয়া সর্ব্বতীর্থের বারি আসিয়া তাঁহাকে অভিষিক্ত করে ও তিনি জ্বালামুক্ত হন। শিবরাত্রির সময় বক্রনাথে বহু যাত্রীর সমাগম হয়। শিবরাত্রির মেলায় লোক-শিল্পের পরিচায়ক কিছু কিছু দ্রব্য দেখিতে পাওয়া যায়। শ্বেত সরোবর ছাড়া আর যে ৭টি উষ্ণকুণ্ড আছে তাহাদের নাম অগ্নিকুণ্ড, ব্রহ্মকুণ্ড, সৌভাগ্য কুণ্ড, সূর্য্য কুণ্ড, জীবন কুণ্ড, ভৈরব কুণ্ড ও খর কুণ্ড। প্রত্যেকটি কুণ্ড সম্বন্ধে এক একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। সূর্য্যকুণ্ড সম্বন্ধে কথিত আছে যে একবার নারদ ঋষি বিন্ধ্যপর্ব্বতের নিকট গিয়া সুমেরু পর্ব্বতের উচ্চতার গুণগান করেন; বিন্ধ্য ইহাতে অপমানিত বোধ করিয়া সগর্ব্বে স্ফীত হইয়া এত উচ্চে মস্তক উত্তোলন করিলেন যে সূর্য্য আর পৃথিবীতে আলোক ও তাপ দান করিতে সমর্থ হইলেন না। বিপন্ন হইয়া সূর্য্যদেব এই কুণ্ডে আসিয়া শিবের শরণাপন্ন হইয়া তপস্যায় নিমগ্ন হইলেন। শিব তুষ্ট হইয়া বিন্ধকে মস্তক সঙ্কুচিত ও অবনমন করিতে বাধ্য করিলেন। জীবন কুণ্ডের কাহিনী এইরূপ। পুরাকালে সর্ব্ব ও চারুমতী নামে এক বৃদ্ধ ও ধর্ম্মপরায়ণ দম্পত্তি সংসার ছাড়িয়া বনে গিয়া ধর্ম্মচর্চ্চায় মনোনিবেশ করিলেন। একদিন একটি বাঘ আসিয়া সর্ব্বকে মারিয়া ফেলেন। চারুমতী দুঃখে তাঁহার স্বামীর প্রাণ ফিরাইয়া দিবার জন্য মহাদেবের নিকট তপস্যা করিতে লাগিলেন। মহাদেব প্রীত হইয়া তাঁহাকে স্বামীর হাড়গুলি একত্র করিয়া বক্রেশ্বর তীর্থে গিয়া এই কুণ্ডের জলে ধৌত করিতে বলিলেন। চারুমতী এইরূপ করিবা মাত্র সর্ব্ব বাঁচিয়া উঠিলেন। ভৈরব কুণ্ড সম্বন্ধে কথিত আছে, যে পূর্ব্বে ব্রহ্মারও পাচটি মুখ থাকায় তিনি শিবের সমকক্ষ বলিয়া দাবী করিলে শিব রুষ্ট হইয়া নিজ মস্তক হইতে একটি জটা ছিঁড়িয়া ফেলিলেন; জটা হইতে তৎক্ষণাৎ বটুক ভৈরব বাহির হইয়া আসিয়া শিবের আজ্ঞা প্রার্থনা করিলেন। শিব তাঁহাকে ব্রহ্মার প্রধান মুখটি কাটিয়া ফেলিতে বলিলেন। বটুক ভৈরব অবিলম্বে আজ্ঞা পালন করিলেন, কিন্তু ব্রহ্মার কর্ত্তিত মুখটি তাঁহার অঙ্গুলিতে আটিয়া লাগিয়া রহিল; ভারতের নানা তীর্থে গিয়া তিনি মস্তকটি ঝাড়িয়া ফেলিতে পারিলেন না; অবশেষে বারাণসীতে যাইলে মস্তকটি পড়িয়া গেল কিন্তু বটুক ভৈরব আঙ্গুলের ক্ষতে কষ্ট পাইতে লাগিলেন। নানা স্থানে ঘুরিয়া শেষে বক্রেশ্বর তীর্থে আসিয়া এই কুণ্ডে স্নান করিলে তিনি আরোগ্যলাভ করেন; তদবধি কুণ্ডটি ভৈরব কুণ্ড নামে পরিচিত হয়।

এই উষ্ণকুণ্ড গুলির জলের নানা রোগ আরোগ্য করিবার ক্ষমতা আছে বলিয়া কথিত। অধুনা বৈজ্ঞানিকগণের দৃষ্টি এই দিকে পড়িয়াছে; কালে হয়তো বক্রেশ্বর একটি আধুনিক আরোগ্য নিকেতনে পরিণত হইবে।

দুবরাজপুর হইতে ২ মাইল পশ্চিমে ফুলবেরা গ্রামে দন্তিন্ দীঘি নামক সুবৃহৎ পুষ্করিণীর তীরে দন্তেশ্বরীর মন্দির সুপ্রসিদ্ধ ; ইহা একটি পীঠস্থান এবং সতীর দন্ত এ স্থানে পড়িয়াছিল বলিয়া কথিত। প্রবাদ দীঘিটি খগাদিত্য রাজা কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় ; তাঁহার প্রতিষ্ঠিত খগেশ্বর শিব পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম খাগড়ায় দৃষ্ট হয়। দুবরাজপুর হইতে ৫ মাইল দক্ষিণে জোফলাই গ্রামে পদকর্ত্তা জগদানন্দের নিবাস ছিল ; বৈষ্ণবদাসের পদকল্পতরুতে তাঁহার কয়েকটি পদ আছে। ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যু তিথিতে এই গ্রামে প্রতি বৎসর একটি মহোৎসব হয়।

শিউড়ী—অণ্ডাল জংশন হইতে ৩১ মাইল দূর। ইহা বীরভূম জেলার সদর শহর। শহরের অনতিদূরে ময়ূরাক্ষী নদী প্রবাহিতা। এই স্থানটি বিশেষ স্বাস্থ্যকর এবং পাল্কী, নানাপ্রকার কাঠের দ্রব্য ও উৎকৃষ্ট মোরববার জন্য বিখ্যাত। শহরের সোনাতোর মহল্লার কারুকার্য্যখচিত রাসমঞ্চটি এখানকার দ্রষ্টব্য বস্তু। বহু দেবমূর্ত্তি ইহাতে খোদিত আছে। শিউড়ীর নিকটবর্ত্তী কালীপুর করিধা নামক পল্লীতে উত্তম তসর ও বাপ্তার কাপড় প্রস্তুত হয়। এই গ্রামে প্রতি বৎসর গোপাষ্টমী উপলক্ষে একটি প্রকাণ্ড মেলা বসে।

এ অঞ্চলের যাদুপটুয়া সম্প্রদায় পুরাকাল হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিত্র আঁকিয়া আসিতেছেন। কাহারও মৃত্যু হইলে তাঁহার ছবি আঁকিয়া আত্মীয়দের নিকট গিয়া ইঁহারা অর্থ গ্রহণ করেন। বাঘ, সিংহ প্রভৃতি প্রাণী, কৃষ্ণলীলা, রামলীলার ছবিও ইঁহারা আঁকেন।

বীরসিংহপুর—শিউড়ীর ছয় মাইল পশ্চিমে বীরসিংহপুর গ্রামের পূর্ব্বভাগে জঙ্গলাকীর্ণ ধ্বংসস্তূপ বিদ্যমান। ইহা রাজা বীরসিংহের রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ বলিয়া পরিচিত। কথিত আছে, প্রায় আট শত বৎসর পূর্ব্বে পশ্চিম অঞ্চল হইতে বীরসিংহ, চৈতন্যসিংহ ও ফতেসিংহ নামক তিন রাজপুত্র মুসলমান হস্তে তাঁহাদের পিতার মৃত্যু ঘটিবার পর এদেশে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং যৌবনে তাঁহারা এ অঞ্চলের আদিম অধিবাসিগণকে পরাজিত করিয়া তিন ভ্রাতা তিনটি পৃথক রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। বীরসিংহ স্বীয় নামানুসারে রাজধানীর নাম বীরসিংহপুর রাখেন। কেহ কেহ বলেন বীরসিংহ জরাসন্ধ বা তাঁহার পুরোহিতের বংশধর। বীরসিংহ তাঁহার রাজধানীতে যে কালীমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করেন লোকে অদ্যাপি তাহা দেখাইয়া থাকে। তিনি বিশেষ ধর্ম্মপরায়ণ ও বীর ছিলেন বলিয়া তাঁহার সম্বন্ধে নানারূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে।

কথিত আছে, তিনি প্রত্যহ বেগবান্ অশ্বে আরোহণ করিয়া বীরসিংহপুর হইতে কাটোয়ায় গিয়া গঙ্গাস্নান ও আহ্নিক করিয়া ফিরিয়া আসিতেন। তিনি এত বলশালী ছিলেন যে স্নানের সময় তৈল মাখিবার জন্য দুই হাতে সরিষা পিষিয়া তৈল বাহির করিতেন। স্নান করিয়া ফিরিবার সময় তিনি পথে নোয়াডিহি নামক স্থানে বিশ্রাম করিতেন বলিয়া তথাকার একটি উচচ ভূখণ্ডকে লোকে আজও বিশ্রামপীঠ বলে।

১২২৬ খৃষ্টাব্দে বাংলার সুবাদার গিয়াস্উদ্দীন বীরসিংহের রাজ্য আক্রমণ করেন। কিন্তু বীরসিংহ, চৈতন্যসিংহ ও ফতেসিংহ ভ্রাতৃত্রয়ের বীরবিক্রমে তিনি পরাস্ত হন। প্রবাদ, পরে গিয়াস্উদ্দীন কূটবুদ্ধির আশ্রয় লইয়া এই ভ্রাতৃত্রয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটান এবং ফতেসিংহের

পরামর্শক্রমে রাত্রিবেলায় সৈন্যবাহিনীর পুরোভাগে একদল গাভী রাখিয়া বীরসিংহপুর আক্রমণ করেন। বীরসিংহ এই অতর্কিত আক্রমণ প্রতিহত করিতে আসিয়া দেখিলেন যে অস্ত্রব্যবহার করিতে হইলে গো-হত্যা করিতে হয়। তখন তিনি মর্ম্মাহত হইয়া নিজ সৈন্যকে অস্ত্র ক্ষেপণ করিতে নিষেধ করিলেন। শত্রুসৈন্য বিনা বাধায় সসৈন্যে বীরসিংহকে নিহত করিল। রাজমহিষী নিকটস্থ কালী দীঘিতে প্রাণ বিসর্জ্জন দিলেন। তদবধি কালীদীঘি "রাণীদহ" বা "রাণীর বাঁধ" নামে পরিচিত হইয়াছে।

কিংবদন্তী, এই বীরসিংহের নাম হইতেই জেলার নাম বীরভূম হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, সাঁওতালী ভাষায় বীর শব্দের অর্থ জঙ্গল এবং পূর্ব্বে এই অঞ্চল জঙ্গলময় ছিল বলিয়াই সাঁওতালগণ উহাকে বীর ভূইয়া নামে অভিহিত করিত। বীর ভূইয়া হইতেই বীরভূম শব্দের উৎপত্তি। বীরভূম নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে অপর এইরূপ একটি কাহিনীও প্রচলিত আছে। একদা বিষ্ণুপুরের এক রাজা তাঁহার শিক্ষিত বাজপাখীর দ্বারা অন্য পাখী শিকার করিতে বাহির হইয়া এই অঞ্চলে আসিয়া পড়েন। কিছু দুরে একটি বক দেখিতে পাইয়া তিনি বাজপাখীকে উহার উদ্দেশে ছাড়িয়া দিলেন। বকটি কিন্তু পলাইবার কোনরূপ চেষ্টা না করিয়া বাজপাখীকে প্রতি-আক্রমণ করিল। বাজপাখী পরাজিত হইয়া রাজার নিকট ফিরিয়া গেল এবং বক পূর্ব্বের ন্যায় আহার অন্বেষণে রত হইল। বাজপাখী অতি সহজেই বক শিকার করিয়া থাকে। কিন্তু এই স্থলে বিপরীত ব্যাপার দেখিয়া রাজা অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন এবং ভাবিলেন, যে দেশের পাখী এত সাহসী হয় সে দেশের মানুষ নিশ্চয়ই অতিশয় বীর ও সাহসী হইবে। তিনি সেই জন্য এই অঞ্চলের নাম রাখিলেন বীরভূমি বা বীরভূম।

বীরসিংহপুরের রাজবাটীর ধ্বংসাবশেষের নিকটেই রাজধানীর অপর অংশ জঙ্গলপূর্ণ হইয়া এখন "ভাণ্ডীরবন" নামে পরিচিত হইয়াছে। এই বনে "সিদ্ধনাথ" বা ভাণ্ডেশ্বর নামে অনাদিলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন। প্রবাদ, রামায়ণে উল্লিখিত বিভাণ্ডক মুনি বহুকাল ধরিয়া এই শিবের পূজা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া এই শিবের নাম হয় ভাণ্ডেশ্বর।

রাজনগর—শিউড়ী হইতে ১৪ মাইল পশ্চিমে নগর নামক একটি প্রাচীন রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ অনুমান করেন যে ১২২৭ খৃষ্টাব্দে সুলতান গিয়াসুউদ্দীনের মৃত্যুর পর বীরসিংহপুরের রাজা বীরসিংহের পলায়িত পুত্র সুযোগ বুঝিয়া বীরসিংহপুরের অনতিদূরে নাগর বা নগর নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন। তিনি বীররাজ নাম গ্রহণ করেন। পলায়নকালে তিনি বীরসিংহপুর হইতে কুলদেবতা কালিকা দেবীর মূর্ত্তি সঙ্গে লইয়া আসেন এবং নূতন রাজধানী নগরে কালীদহ নামে একটি প্রকাণ্ড দীঘি খনন করাইয়া উহার তীরে এক মন্দির মধ্যে দেবীমূর্ত্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। কথিত আছে বীররাজের বংশধরগণ খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্য্যন্ত নগরে রাজত্ব করেন। বীররাজবংশের পতনের পর কালিকামূর্ত্তি পুনরায় বীরসিংহপুরে স্থানান্তরিত করা হয়।

নগর সম্বন্ধে অন্য জনশ্রুতি এই যে মহারাজ বল্লালসেনের দ্বারা কৃত কোন ধর্ম্মবিগর্হিত কার্য্যে অসন্তুষ্ট হইয়া তৎপুত্র লক্ষ্মণসেন পিতৃরাজ্য ত্যাগ করিয়া অজয় নদের দক্ষিণ তীরে সেনপাহাড়ী নামক স্থানে আসিয়া বাস করেন। সেনপাহাড়ী নাম তাঁহারই নামানুসারে হয়। বর্ত্তমানে সেনপাহাড়ী বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত। সেনপাহাড়ীর নিকটে লক্ষ্মণসেন নিজ নামে

লখ্‌নর নামক একটি নগর প্রতিষ্ঠা করেন। উত্তরকালে উহা লখনৌর নগর, নাগর, নগর ও রাজনগর নামে পরিচিত হয়। শেষ বীররাজের পতনের পর রাজনগরে মুসলমান ফৌজদার-গণের প্রতিষ্ঠা হয়। ফৌজদার বাহাদুর খাঁ ১৬০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজনগরের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি বীরত্ব ও রণনৈপুণ্যের জন্য রণমস্ত খাঁ নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র দেওয়ান খাজা কামাল খাঁ বাহাদুর কালীদহের মধ্যস্থলে একটি হাওয়াখানা এবং রাজপ্রাসাদের উত্তরে একটি হাম্মাম নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। খাজা কামালের পুত্র দেওয়ান আসাদুল্লা খাঁ পরম ধার্ম্মিক, দয়ালু ও জ্ঞানী শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি রাজ্যের আয়ের অর্দ্ধাংশ সাধু ও ফকিরগণের সেবায় ব্যয় করিতেন এবং বহু দীঘি খনন করাইয়া প্রজাদিগের জলকষ্ট দূর করিয়াছিলেন। তিনি রাজ্যের বহুস্থানে চৌকিদারী ঘাঁটি বসাইয়াছিলেন। ঘাঁটির রক্ষী সেনাগণ ঘাটোয়াল নামে অভিহিত হইত। ইহা ছাড়া বর্গীর আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য তিনি নগরের চারিদিকে ৩২ মাইল পরিধি বিশিষ্ট ও প্রায় দশ বার হাত উচচ প্রাচীর নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। নগরের অরণ্য মধ্যে এই প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ আজও বিদ্যমান আছে। দেওয়ান আসাদুল্লা খাঁর পুত্র দেওয়ান বাদি উজজ্‌মান খাঁ বিলাসপরায়ণ হইলেও ন্যায়নিষ্ঠ ছিলেন এবং হিন্দু মুসলমান নির্বিবশেষে বহু পীরোত্তর, ব্রহ্মোত্তর ও দেবোত্তর জমি দান করিয়াছিলেন। ইনি তৎকালীন নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর নিকট হইতে বীরভূম অঞ্চল রক্ষা করিবার ভার গ্রহণ করেন। নূতন ব্যবস্থা অনুযায়ী নবাব সরকারে ইঁহাকে বার্ষিক ৩,৪৬,০০০৲ টাকা কর দিতে হইত। ইঁহারই সময়ে ভাস্কর পণ্ডিত ও রঘুজী ভোঁসলের নেতৃত্বে বর্গীদিগের উপর্য্যুপরি অত্যাচারের ফলে এই অঞ্চল বিশেষ উপদ্রুত হয়। বর্গীর অত্যাচার দমনের জন্য ইনি নবাব আলিবর্দ্দীকে নানারূপে সাহায্য করিয়াছিলেন। শেষ বয়সে বাদি উজজ্‌মান খাঁ একজন ফকিরের সহিত ধর্ম্মালোচনায় অধিকাংশ সময় যাপন করিতেন এবং রাজকার্য্যের বিশেষ কিছুই দেখিতেন না। ফলে রাজ্যমধ্যে বিশৃঙখলা দেখা দেয়। এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য তাঁহার দুই পুত্র আহম্মদ উজজ্‌মান খাঁ ও আলিনকি খাঁ গুপ্তঘাতকের দ্বারা ফকিরকে হত্যা করান। ইহাতে মর্ম্মাহত হইয়া বাদি উজজ্‌মান রাজ্যভার পুত্রগণকে অপণ করিয়া আরও গভীরভাবে ধর্ম্ম চর্চায় নিবিষ্ট হন। আহম্মদ উজজ্‌মান ও আলিনকি খাঁ নিজেরা রাজ্য গ্রহণ না করিয়া বৈমাত্রেয় ভ্রাতা আসাদ উজজমানকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। কথিত আছে, আসাদের মাতাকে যখন বাদি উজজ্‌মান বিবাহ করেন তখন তিনি ভাবী পত্নীর মাতাকে প্রতিশ্রুতি দেন যে তাঁহার কন্যার গর্ভজাত পুত্রকেই তিনি রাজ্যভার অর্পণ করিবেন। পিতার এই সত্য রক্ষা করিবার জন্য আহম্মদ উজজ্‌মান ও আলিনকি খাঁ স্বেচ্ছায় রাজ্য ত্যাগ পত্র লিখিয়া দেন। পরে দুই ভ্রাতা মুর্শিদাবাদে গিয়া নবাব সরকারে চাকুরী গ্রহণ করেন।

নবাব আলিবর্দ্দীর মৃত্যুর পর তরুণ নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলা যখন ইংরেজগণের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন, তখন আহম্মদ উজজ্‌মান ও আলিনকি তাঁহার পক্ষে সেনাপতিত্ব করেন। কলিকাতার যুদ্ধে নবাব সৈন্য জয়ী হইলে আলিনকির অধীন সৈন্যগণ কলিকাতা লুঠ করিয়াছিল। রাজনগরের মহরমের শোভাযাত্রায় "লুঠের কাপড়" নামে যে বস্ত্র বাহির করা হয় উহা নাকি আলিনকি খাঁ কলিকাতা লুঠের সময় সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন যে আলিনকি খাঁর নামানুসারে কলিকাতার আলিপুরের নাম হইয়াছে। আলিনকির বীরত্ব ও সাহসের জন্য লোকে তাহাকে "কলির ভীম" বলিত।

আসাদ উজজ্‌মান খাঁর মৃত্যুর পর হইতে রাজনগরের পতন ঘটে।

খুশতিনগরী—শিউড়ী হইতে ১২ মাইল দক্ষিণে ইরাণের কিরমান হইতে আগত সৈয়দ শাহ্ আবদুল্লা কিরমানী নামক পীরের দরগাহ্ এ অঞ্চলে বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত পূজিত হয়।

রাণীগঞ্জ—হাওড়া হইতে ১২১ মাইল দূর। ইহা একটি বিখ্যাত শ্রমিক কেন্দ্র। কয়লার খনির জন্যই ইহার প্রসিদ্ধি। ইহার চারিদিকের স্থানকে খনির রাজ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এখানে কাগজের কল, মাটীর বাসন ও টালির কারখানা, তেলের কল প্রভৃতি বহু কলকারখানা আছে। রাণীগঞ্জ শহরটি অতি সুন্দররূপে সজ্জিত ও বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন।

রাণীগঞ্জ শহরের নিকটবর্ত্তী সিয়ারসোল একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। এই গ্রামে রাজা উপাধিধারী একঘর পশ্চিম দেশীয় ব্রাহ্মণ জমিদারের বাস।

রাণীগঞ্জ হইতে ৩ মাইল দক্ষিণে দামোদর নদের অপরপারে বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত মেঝিয়া গ্রামে প্রচুর গালা প্রস্তুত হয়। মেঝিয়া হইতে ৩ মাইল পশ্চিমে ভুলুই গ্রামে আড়াইশত বৎসরের উপর হইল জগৎরাম রায় জন্মগ্রহণ করেন। ইনি এবং ইঁহার পুত্র রামপ্রসাদ রায় মিলিয়া "অদ্ভুত অষ্টকাণ্ড রামায়ণ" নামে একখানি রামায়ণ রচনা করেন। ইহা ছাড়া জগৎ-রাম "দুর্গাপঞ্চরাত্রি" নামে শিবদুর্গার দাম্পত্য-কলহের একখানি সুন্দর অম্লমধুর কাব্য রচনা করেন। রামপ্রসাদও "কৃষ্ণলীলামৃতরস" নামে একখানি বৃহৎ কাব্য রচনা করেন।

আসানসোল জংশন—হাওড়া হইতে ১৩২ মাইল দূর। ইহা বর্দ্ধমান জেলার অন্যতম মহকুমা এবং খনি অঞ্চলের প্রধান শহর। রেল লাইন খুলিবার পূর্ব্বে এই অঞ্চল জঙ্গলময় ছিল ও এখানে লুণ্ঠনবৃত্তিধারী চুয়াড় প্রভৃতি জাতি বাস করিত। বর্ত্তমানে ইহা আধুনিক সভ্যতার সর্ব্বপ্রকার নিদর্শনপূর্ণ সমৃদ্ধ শহর। বিখ্যাত গ্রাণ্ড্ ট্রাঙ্ক রোড এই শহরের মধ্য দিয়া গিয়াছে। ইহা পূর্ব্বভারত রেলপথের একটি প্রসিদ্ধ বিভাগীয় সদর। বাংলা নাগপুর রেলপথের একটি শাখা মানভূম জেলার মধ্য দিয়া পুরুলিয়া ও আদড়া হইয়া এখানে আসিয়া মিলিয়াছে।

সীতারামপুর জংশন—হাওড়া হইতে ১৩৮ মাইল দূর। ইহা রাণীগঞ্জ ও বরাকরের কয়লার খনির প্রায় মধ্যস্থলে অবস্থিত। এখান হইতে গ্রাণ্ড কর্ড লাইন বাহির হইয়াছে ও অণ্ডাল হইতে একটি ছোট লুপ শাখা আসিয়া এখানে মিলিত হইয়াছে।

প্রধান লাইনের উপর সীতারামপুর জংশনের পরের স্টেশন রূপনারায়ণপুর। ইহা হাওড়া হইতে ১৪৫ মাইল দূর এবং বর্দ্ধমান জেলার ও বাংলা দেশের শেষ রেলস্টেশন। ইহা একটি স্বাস্থ্যকর স্থান।

রূপনারায়ণপুর অতিক্রম করিবার পর গাড়ী সাঁওতাল পরগণার এলাকায় পড়ে। এই অঞ্চলে বহুদিন হইতেই বঙালীর বসবাস আছে। বস্তুতঃ বাঙালীরা গিয়া দলে দলে এই সকল স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিবার পর হইতেই এই অঞ্চল সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। এদিককার সাধারণ দৃশ্যের বৈশিষ্ট্য এই যে ইহার প্রায় সর্ব্বত্রই পাহাড় পর্ব্বত, পার্ব্বত্য নদ নদী শোভিত উন্মুক্ত প্রান্তর, পর্ব্বতগাত্রে ও প্রান্তরে শাল, মহুয়া, আম, জাম ও নিম প্রভৃতি বৃক্ষের শোভা ও মনোহরম পুষ্পবীথিকা দৃষ্ট হয়। সমুদ্রের ঢেউএর মত এখানকার মাটি যেন ঢেউ খেলিয়া গিয়াছে। এতদঞ্চলে দীঘি বা পুষ্করিণী বড় একটা নাই। কূপের জলই সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়। মিহিজাম, জামতাড়া, কর্ম্মাটাড়, মধুপুর, জগদীশপুর, গিরিডি, জসিডি, দেওঘর, শিমুলতলা প্রভৃতি স্থান বাঙালীর স্বাস্থ্যনিবাসরূপে গড়িয়া উঠিয়াছে। এই সকল স্থানে বহু কলিকাতাবাসী বাঙালীর

বাড়ী আছে। পূজা ও বড়দিন উপলক্ষে দলে দলে বাঙালীরা বায়ু পরিবর্ত্তন ও ছুটি উপভোগের জন্য এই অঞ্চলে আসিয়া থাকেন।

কর্ম্মাটাড়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একটি বাসভবন ছিল। প্রকৃতপক্ষে সাঁওতাল অধ্যুষিত এই পল্লীতে বাঙালীর উপনিবেশ স্থাপনে তাঁহাকেই অগ্রণী বলা যাইতে পারে।

মধুপুর একটি জংশন স্টেশন। হাওড়া হইতে ইহার দূরত্ব ১৮৩ মাইল। ইহাও একটি প্রসিদ্ধ স্বাস্থ্যনিবাস ও বঙালীবহুল শহর। আগন্তুকদিগের অবস্থানের জন্য এখানে ধর্ম্মশালা আছে। এখান হইতে একটি শাখা লাইন ২৩ মাইল দূরবর্ত্তী হাজারিবাগ জেলার অন্তর্গত বিখ্যাত স্বাস্থ্যনিবাস গিরিডি পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই শাখা লাইনের জগদীশপুর ও গিরিডিতে বহু বাঙালীর বাস।

মধুপুরের পরবর্ত্তী স্টেশন জসিডি জংশন হাওড়া হইতে ২০১ মাইল দুর। এখান হইতে একটি শাখা লাইন সুপ্রসিদ্ধ তীর্থ দেওঘর বা বৈদ্যনাথধাম পর্যন্ত গিয়াছে। কাশীর বিশ্বেশ্বরের ন্যায় বৈদ্যনাথদেবেরও বিশেষ মাহাত্ম্য ও প্রসিদ্ধি আছে। এখানে প্রত্যহ বহু যাত্রীর সমাগম হয়। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জনতা হয় শিবরাত্রির সময়। বৈদ্যনাথদেবের মন্দির প্রাঙ্গনে অন্নপূর্ণা, কালী, গণেশ, লক্ষ্মীনারায়ণ ও আনন্দভৈরব প্রভৃতি বহু দেবদেবীর মূর্ত্তি ও মন্দির আছে। শহরের মধ্যস্থ শিবগঙ্গা সরোবর ও রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ এবং শহরের উপকণ্ঠস্থ নন্দন পাহাড় ও শহর হইতে যথাক্রমে পাঁচ ও এগারো মাইল দূরে অবস্থিত "তপোবন" ও "ত্রিকূট" পাহাড় বিশেষ দ্রষ্টব্য বস্তু। তপোবন ও ত্রিকূট পাহাড়ের নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য অতি মনোরম।

বৈদ্যনাথের দই, পেড়া, পেঁপে ও গোলাপফুল প্রসিদ্ধ।

(খ) হাওড়া বর্দ্ধমান কর্ড লাইন ও তারকেশ্বর শাখা।

কলিকাতা ও বর্দ্ধমানের মধ্যে যাতায়াতের সময় কমাইবার জন্য এই কর্ড বা সোজা লাইনটি নির্ম্মিত হয়। এই লাইনটি বেলুড় স্টেশনের পর হইতে পৃথক্ হইয়া বদ্ধমানের দুই স্টেশন পর্ব্ববর্ত্তী শক্তিগড়ে মেন বা প্রধান লাইনের সহিত মিলিত হইয়াছে। প্রধান লাইনের শেওড়াফুলি জংশন হইতে একটি শাখা এই লাইনের কামারকুণ্ডু স্টেশন হইয়া তারকেশ্বর পর্য্যন্ত গিয়াছে।

জৌগ্রাম—হাওড়া হইতে কর্ড লাইনে ৪১ মাইল দূর। জৌগ্রাম স্টেশন হইতে ৩ মাইল দূরে কুলীনগ্রাম। ইহা কর্ড লাইনের নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের মধ্যে একটি বিশেষ প্রসিদ্ধস্থান। প্রধান লাইনের মেমারি স্টেশনে নামিয়াও এই স্থানে যাওয়া যায়। মেমারি হইতে কুলীনগ্রাম ৫ মাইল দূর।

কুলীনগ্রাম একটি বিখ্যাত বৈষ্ণব শ্রীপাট। ইহা বসু রামানন্দ ঠাকুরের পাট নামে প্রসিদ্ধ। কুলীনগ্রামের পরম বৈষ্ণব বসু বংশের খ্যাতি বৈষ্ণব সাহিত্যে অতি উজ্জ্বল অক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে।

আদিশূর কর্ত্তৃক আনীত দশরথ বসু হইতে ত্রয়োদশ পুরুষ অধস্তন এই বংশীয় মালাধর বসু ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধ অবলম্বনে "শ্রীকৃষ্ণ বিজয়" কাব্য রচনা করেন। অনেকের মতে ইহাই বাংলা ভাষার আদি কাব্য। ১৪৭৩ খৃষ্টাব্দে শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ের রচনা আরম্ভ হয় এবং ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে উহা শেষ হয়। কবি মালাধর গৌড়েশ্বর সামস্-উদ্-দীন ইউসুফ শাহের নিকট হইতে "গুণরাজ খাঁ" উপাধি লাভ করেন। আত্ম পরিচয় প্রসঙ্গে মালাধর লিখিয়াছেন :—

"বাপ ভগীরথ মোর মাতা ইন্দুমতী।
যাঁহার পুণ্যে হইল মোর কৃষ্ণচন্দ্রে মতি।।
যক্ষ রক্ষ সর্ব্বজনে করিয়া বিনয়।
মালাধর বসু কহে শ্রীকৃষ্ণ বিজয়।।"
"গুণ নাহি অধম মুঞি নাহি কোন জ্ঞান।
গৌড়েশ্বর দিলা নাম গুণরাজ খান।।"
"কায়স্থ কুলেতে জন্ম কুলীনগ্রামে বাস।
স্বপ্নে আদেশ দিলেন প্রভু ব্যাস।।"

শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ের বন্দনার দ্বিতীয় পদটি এইরূপ :—

"এক ভাবে বন্দ হরি যোড় করি হাত।
নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ।।"

এই পদটি চৈতন্য দেবের অতি প্রিয় ছিল। এ সম্বন্ধে তাঁহার নিজ মুখের উক্তি যথা :—

"গুণরাজ খান কৈল শ্রীকৃষ্ণ বিজয়।
তঁহি তাঁর বাক্য এক আছে প্রেমময়।।
'নন্দ নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ'।
এই বাক্যে বিকাইনু তাঁর বংশের হাত।।"

কুলীনগ্রাম এবং এই বসু বংশকে চৈতন্যদেব অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখিতেন ও প্রাণের তুল্য ভালবাসিতেন।

গুণরাজ খানের পুত্র সত্যরাজ খান (প্রকৃত নাম লক্ষ্মীকান্ত) ও তৎপুত্র বসু রামানন্দ শ্রীচৈতন্যদেবের বিশেষ অন্তরঙ্গ সহচর ছিলেন। কুলীনগ্রামবাসিগণের একটি সঙ্কীর্ত্তনের দল ছিল, পুরীতে রথাগ্রে শ্রীচৈতন্যদেব যখন নৃত্য করেন, তখন এই কুলীনগ্রামের কীর্ত্তন সমাজও তথায় নৃত্যগীতাদিতে যোগদান করিয়াছিলেন।

একবার জগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রার সময় একটি পট্টডোরী বা রজ্জু ছিন্ন হইয়া যায়। শ্রীচৈতন্যদেব ঐ পট্টডোরীর ছিন্ন অংশ লইয়া রামানন্দ বসুর হাতে দিয়া বলেন—

"এই পট্টডোরীর তুমি হও যজমান।
প্রতি বর্ষ আনিবে ডোরী করিয়া নির্ম্মাণ।।"

সেই হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত কুলীনগ্রামের বসুবংশ জগন্নাথদেবের পট্টডোরী যোগাইয়া আসিতেছেন। আজিও কুলীনগ্রাম হইতে পট্টডোরী না পৌঁছানো পর্য্যন্ত পুরীতে জগন্নাথদেবের রথ টানা হয় না। বসু রামানন্দ একজন পদকর্ত্তা ছিলেন। বৈষ্ণব সাহিত্যে তাঁহার নামের ভনিতাযুক্ত কতকগুলি সুন্দর পদ আছে।

"যবন হরিদাস" নামে পরিচিত পরম ভক্ত ব্রহ্ম হরিদাস ঠাকুর বহু দিন কুলীনগ্রামে অবস্থান করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রভাবে কুলীনগ্রামে বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিশেষ প্রসার ঘটে।

"কুলীনগ্রামীর ভাগ্য কহনে না যায়।
শূকর চরায় ডোম সেহ কৃষ্ণ গায়।।"

কুলীনগ্রামের দক্ষিণাংশে যে নির্জ্জন স্থানে হরিদাস ঠাকুর সাধন ভজন করিয়াছিলেন উহা হরিদাস ঠাকুরের পাটবাড়ী নামে পরিচিত। এই পাটবাড়ীর মন্দিরে গৌরাঙ্গদেব ও হরিদাস ঠাকুরের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। যে কেলিকদম্ব তলে হরিদাস ঠাকুর উপবেশন করিতেন উহা আজিও বিদ্যমান আছে। কথিত আছে যে চৈতন্যদেব এই স্থানে পদার্পণ করিয়াছিলেন। প্রতি বৎসর অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে গৌরাঙ্গদেবের আগমন স্মরণ ও মাঘ মাসের শুক্লা চতুর্দ্দশীতে হরিদাস ঠাকুরের তিরোভাব উপলক্ষে এই স্থানে মেলা ও মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

কুলীনগ্রামে বহু প্রাচীন কীর্ত্তি আছে। উহার মধ্যে শিবানীদেবী, গোপেশ্বর মহাদেব, মদন-গোপালজীউ ও গোপীনাথের মন্দির সমধিক বিখ্যাত। আদ্যাশক্তি শিবানীদেবীর মূর্ত্তি পাষাণময়ী। মন্দির গাত্রের উৎকীর্ণ লিপি হইতে জানা যায় যে ৯৬৩ শকে অথাৎ ১০৪১ খৃষ্টাব্দে মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হয়। শিবানী মন্দিরের পার্শ্ব দিয়া লুপ্তস্রোতা কংস নদীর খাত দেখা যায়।

গোপেশ্বর মহাদেবের মন্দির কুলীনগ্রামের বিখ্যাত সরোবর গোপালদীঘির নৈঋত কোণে অবস্থিত। এই মন্দির গাত্রে উৎকীর্ণ একটি লিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে ১৬৬৬ শকে কুলীনগ্রামের অন্তর্গত চৈতন্যপুর নিবাসী নারায়ণ দাস নামক জনৈক ব্যক্তি এই মন্দিরের সংস্কার করেন। সুতরাং মন্দিরটি যে ইহার অন্ততঃ ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে।

চৈতন্যপুর কুলীনগ্রামবাসী বসুবংশের অন্যতম বাসস্থল ছিল। চৈতন্যদেবের নামানুসারেই যে স্থানটির এইরূপ নামকরণ হইয়াছিল তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। এই গ্রামের চতুর্দ্দিকে গড় ছিল। সাধারণ লোকে আজিও ইহাকে "রামানন্দ ঠাকুরের গড় বাড়ী" নামে অভিহিত করে।

গোপেশ্বর মহাদেবের মন্দিরের অলিন্দে একটি কষ্টিপাথরের বৃষ আছে। বৃষটি প্রায় দেড় হাত লম্বা ও এক হাত উচচ। ইহার গলকম্বলে উৎকীর্ণ লিপি হইতে জানা যায় যে সত্যরাজ খান এই বৃষের প্রতিষ্ঠাতা। বৃষটির কারুকার্য্য অতি সুন্দর।

শিবচতুর্দ্দশী উপলক্ষে গোপেশ্বর মহাদেবের মন্দিরের নিকট একটি বিরাট মেলার অধিবেশন হয়।

বসুবংশের অভ্যুদয়ের পূর্বের্ব কুলীনগ্রাম সম্ভবতঃ শক্তি উপসনার কেন্দ্র ছিল। আদ্যা জননী শিবানীদেবীর মন্দির ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। মালাধর, লক্ষ্মীকান্ত ও রামানন্দ বসুবংশের এই তিন কীর্ত্তিমান পুরুষ হইতেই কুলীনগ্রামের নাম উজ্জ্বল হইয়াছে। ইঁহাদেরই কৃতিত্বে কুলীনগ্রাম তীর্থের গৌরব অর্জ্জন করিয়াছে। বৈষ্ণব সাহিত্যে উল্লিখিত আছে যে বসু রামানন্দকে চৈতন্যদেব "সখা" সম্বোধন করিতেন।

মদন গোপাল, রঘুনাথ, কৃষ্ণরায়, গোপীনাথ, গোবিন্দ, জগন্নাথ ও ভুবনেশ্বরী প্রভৃতি দেবদেবীর মন্দির বসুবংশের অমর কীর্ত্তি। রথ ও দোলযাত্রা উপলক্ষে মদন গোপাল, গোপীনাথ ও জগন্নাথ মন্দিরে বিশেষ সমারোহ হয় এবং নানাস্থানে হইতে বহু যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে।

জৌগ্রাম স্টেশন হইতে একটি আকাশচুম্বী শিবমন্দিরের চূড়া দেখিতে পাওয়া যায়। উহা জলেশ্বর শিবের মন্দির নামে পরিচিত। আনুমানিক দশম শতাব্দীতে এই শিবের প্রতিষ্ঠা হয়। "যোগগ্রাম" হইতে জৌগ্রাম নাম হইয়াছে, কেহ কেহ এইরূপ অনুমান করেন।

সিঙ্গুর—তারকেশ্বর শাখা লাইনে শেওড়াফুলি ও কামারকুণ্ডু জংশনের মধ্যে অবস্থিত। হাওড়া হইতে ইহার দূরত্ব ২১ মাইল। ইহা একটি বর্দ্ধিষ্ণু ভদ্রপল্লী। এই স্থানের প্রাচীন নাম সিংহপুর। অনেকে অনুমান করেন যে এই স্থানেই বঙ্গরাজ সিংহবাহুর রাজধানী ছিল। সিংহলের প্রাচীন ইতিহাস "মহাবংশ" পাঠে জানা যায় যে সুপ্রদেবী নামে একটি বাঙালী রাজকন্যা যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হইলে সাথসিংহ নামে এক সার্থপতিকে পতিত্বে বরণ করেন। ইঁহাদের পুত্র প্রবল পরাক্রান্ত রাজা সিংহবাহু রাঢ়দেশে একটি বিস্তীর্ণ জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া সিংহপুর রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। মহাবংশে এই রাজ্য "লাড়রট্ট" অথাৎ রাঢ়রাষ্ট্র বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। সিংহবাহু স্বীয় ভগিনী সিংহশীবলিকে মহিষী করিয়াছিলেন। এই সিংহবাহুর পুত্র বিজয়সিংহ পিতা কর্ত্তৃক নিবর্বাসিত হইয়া সাত শত বীর সহচর সমভিব্যাহারে জাহাজে করিয়া তাম্রপর্ণি বা লঙ্কাদ্বীপে উপস্থিত হন এবং উহা জয় করেন। তদবধি লঙ্কাদ্বীপের নাম হইয়াছে সিংহল। কথিত আছে, বুদ্ধদেব যে দিন দেহত্যাগ করেন, বিজয়সিংহ ঠিক সেই দিনেই লঙ্কাদ্বীপে পদার্পণ করেন।

সিঙ্গুরের নিকটবর্ত্তী কতকগুলি উচচ স্থান ও জাঙ্গাল প্রভৃতি দেখিলে ইহার প্রাচীনত্ব উপলব্ধি করিতে পারা যায়।

সিঙ্গুরের বসুমল্লিক বংশ বিশেষ সম্ভ্রান্ত। এই বংশের সুসন্তান পরলোকগত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক, সি আই ই মহাশয় বহু অথব্যয়ে রেল স্টেশনের নিকট স্বীয় পিতার নামে আধুনিক প্রথায় সুসজ্জিত হাঁসপাতাল ও মাতার স্মৃতিরক্ষাথে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

হরিপাল—তারকেশ্বর শাখা লাইনে কামারকুণ্ডু জংশন ও তারকেশ্বরের মধ্যে অবস্থিত। হাওড়া হইতে দূরত্ব ২৮ মাইল। ইহাও একটি প্রাচীন স্থান। ইহার পুরাতন নাম সিমুল। "দিগ্বিজয় প্রকাশ" নামে প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে নৃপতি কুলপালের হরিপাল ও

অহিপাল নামে দুই পুত্র ছিল। হরিপাল সিংহপুর বা সিঙ্গুরের পশ্চিমে হাটবাজার ও দীঘি-সরোবর শোভিত একটি মহাগ্রাম স্থাপন করিয়া স্বীয় নামানুসারে উহার নাম "হরিপাল" রাখেন। এই হরিপালের কন্যা কানেড়ার বীরত্ব কাহিনী মাণিকরাম গাঙ্গুলী প্রণীত ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যে বর্ণিত আছে। গৌড়েশ্বর ধর্ম্মপাল কানেড়ার সৌন্দর্য্য ও সাহসের খ্যাতি শুনিয়া তাঁহাকে পত্নীরূপে লাভ করিবার জন্য হরিপালের নিকট ভাট প্রেরণ করেন। গৌড়েশ্বরের প্রতাপে ভীত হরিপাল তাঁহাকে কন্যাদানে সম্মত থাকিলেও কানেড়া এই বিবাহে অসম্মত হন। ধর্ম্মপালের তরুণ সেনাপতি মহাবীর লাউসেনের বীরত্বের কাহিনী শুনিয়া কানেড়া মনে মনে তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি ভাটকে অপমান করিয়া বিদায় করিয়া দেন। ক্রুদ্ধ গৌড়েশ্বর সসৈন্যে সিমুল বা হরিপাল আক্রমণ করিলে পুরবাসীসহ রাজা হরিপাল দূরে পলায়ন করেন। একমাত্র দাসী ধুমসীকে সঙ্গে লইয়া বীরবালা কানেড়া রণসাজে সজ্জিত হইয়া গৌড় সেনাবাহিনীর সম্মুখবর্ত্তী হইলেন। তাঁহার অপূর্ব্ব রণসজ্জা দেখিয়া গৌড়াধিপের সৈন্যগণ অস্ত্র সংবরণ করিল। তখন সম্মুখবর্ত্তী বৃদ্ধ গৌড়েশ্বর ধর্ম্মপালকে সম্বোধন করিয়া কানেড়া বলিলেন যে তাঁহার একটি পণ আছে যে, যে ব্যক্তি তরবারির একচোটে একটি লৌহ নির্ম্মিত গণ্ডারকে দ্বিখণ্ডিত করিতে পারিবে তাঁহাকেই তিনি পতিত্বে বরণ করিবেন। এই দুষ্কর কার্য্য স্বীয় শক্তির সাধ্য নহে বিবেচনা করিয়া গৌড়েশ্বর গৌড় হইতে সেনাপতি লাউসেনকে সংবাদ দিয়া আনয়ন করিলেন। ধর্ম্মের বরপুত্র লাউসেন তরবারির একচোটে লৌহ গণ্ডারকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার কণ্ঠে বরমাল্য প্রদানে উদ্যতা রাজপুত্রীকে বলিলেন যে তাঁহার প্রভু গৌড়েশ্বরের আদেশক্রমেই তিনি এই দুষ্কর কার্য্য সাধন করিয়াছেন, সুতরাং কানেড়ার বরমাল্য ধর্ম্মপালের কণ্ঠেই শোভা পাওয়া উচিত। কানেড়া তাঁহার এই যুক্তি না শুনিয়া তাঁহাকেই পতিত্বে বরণ করিলেন।

তারকেশ্বর—হাওড়া হইতে ৩৬ মাইল দূর। বাংলাদেশে একমাত্র চন্দ্রনাথ ছাড়া তারকেশ্বরের ন্যায় বিখ্যাত শৈবতীর্থ আর নাই। তারকনাথ শিব স্বয়ম্ভূলিঙ্গ বলিয়া প্রসিদ্ধ। যে স্থানে বর্ত্তমান মন্দিরটি অবস্থিত, পর্ব্বে উহা জঙ্গলে আবৃত ছিল এবং উহার চতুর্দ্দিকের নিম্নভূমি নল ও খাগড়ায় পূর্ণ ছিল। উচ্চ ভূভাগ সিংহলদ্বীপ নামে পরিচিত ছিল। এই দ্বীপের অরণ্যমধ্যে পাষাণময় তারকনাথ বিরাজিত ছিলেন। কথিত আছে, গ্রাম্য স্ত্রীগণ শিবলিঙ্গকে সামান্য পাষাণখণ্ড-জ্ঞানে উহার উপর ধান ভানিত। ইহার ফলে শিবলিঙ্গের উপরিভাগে একটি গর্ত্ত হইয়া যায়। এই গর্ত্ত আজও তারকনাথের মাথায় দেখিতে পাওয়া যায়। তারকনাথের প্রকাশ সম্বন্ধে কথিত আছে যে মুকুন্দ ঘোষ নামক জনৈক গোপ একদিন সবিস্ময়ে দেখিতে পায় যে তাহার একটি দুগ্ধবতী গাভী জঙ্গলমধ্যে একখণ্ড পাষাণের উপর দুগ্ধবর্ষণ করিতেছে। সেইদিন রাত্রিকালে তারকনাথদেব স্বপ্নযোগে মুকুন্দ ঘোষকে নিজের স্বরূপ পরিচয় প্রদান করেন এবং তাহাকে বলেন সে যেন সন্ন্যাসী হইয়া তাঁহার সেবায় আত্মনিয়োগ করে। মুকুন্দ ঘোষ হইতেই তারকনাথের প্রথম প্রকাশ এবং এবং মুকুন্দই তাঁহার প্রথম সেবক। তারকনাথের মন্দিরের পার্শ্বে মুকুন্দ ঘোষের সমাধি বিরাজিত আছে। যাত্রিগণ এই স্থানেও পূজা দিয়া থাকেন। হুগলী জেলার বাহিরগড়ের ক্ষত্রিয় রাজবংশীয় রাজা ভারামল্ল বা বরাহমল্ল মুকুন্দ ঘোষের আবিষ্কৃত তারকনাথের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন। রাজা ভারামল্ল সংসার ত্যাগ করিয়া তারকনাথের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন এবং তাঁহার পূজার জন্য সন্ন্যাসী মহান্ত নিযুক্ত করেন। তারকেশ্বরের নিকটবর্ত্তী ভারামলপুর গ্রাম আজও এই ত্যাগী নৃপতির স্মৃতি বহন করিতেছে। ভারামল্লের পর বর্দ্ধমানরাজও স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন এবং দেবসেবার জন্য বহু ভূসম্পত্তি দান করেন। এই প্রকার দানের ফলে তারকনাথদেবের

বহু ভূসম্পত্তি হয়। মুকুন্দ ঘোষের পর দশনামী সম্প্রদায়ভক্ত "গিরি" উপাধিধারী সন্ন্যাসীগণ তারকেশ্বরের মোহান্তের পদ লাভ করেন। সম্প্রতি পশ্চিম দেশীয় এই মোহান্ত সম্প্রদায়কে অপসারিত করিয়া দণ্ডীস্বামী জগন্নাথ আশ্রম মহারাজ নামক জনৈক বাঙালী সন্ন্যাসীকে মোহান্তের পদে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে।

তারকনাথের মন্দিরের পার্শ্বে দুধ পুকুর নামে একটি পুষ্করিণী আছে। এই পুকুরে স্নান করিয়া যাত্রিগণ তারকনাথের দর্শন ও পূজা করিয়া থাকেন। নিকটেই অপর একটি মন্দিরে দশভুজা দেবী বিরাজিতা আছেন। মন্দিরের সম্মুখস্থ নাটমন্দিরে মনস্কামনা পূর্ণ ও রোগমুক্তির আশায় বহু নরনারীকে ধর্ণা দিতে দেখা যায়।

তারকেশ্বর তীর্থে পূর্ব্বে যে সকল অনাচার ছিল তাহা এখন দূরীভূত হইয়াছে। এই স্থানকে এখন একটি আদর্শ তীর্থ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বাঁধানো রাস্তা, নলকূপের জল, উজ্জ্বল আলো প্রভৃতির ব্যবস্থা থাকায় যাত্রীদের আর কোন প্রকার অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। এখানে একটি ধর্ম্মশালা ও পাণ্ডাদের দ্বারা পরিচালিত বহু যাত্রীনিবাস আছে।

তারকেশ্বরে প্রত্যহ বহু যাত্রীর সমাগম হয়, তবে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জনতা হয় শিবরাত্রি ও চৈত্র সংক্রান্তির সময়। এই উপলক্ষে প্রায় লক্ষাধিক লোকের সমাবেশ হয়।

তারকেশ্বর একটি জংশন স্টেশন। এখান হইতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রেলপথের ছোট গাড়ীতে করিয়া হুগলী জেলার অন্তর্গত দশঘরা, ধনিয়াখালি, মগরা প্রভৃতি হইয়া গঙ্গাতীরবর্ত্তী ত্রিবেণী পর্য্যন্ত যাওয়া যায়। দশঘরা হইতে অপর একটি শাখা লাইন বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত চকদীঘি ও জামালপুর-গঞ্জ পর্য্যন্ত গিয়াছে।

(গ) ব্যাণ্ডেল—বারহাড়োয়া লুপ শাখা।

বংশবাটী—হাওড়া হইতে ২৮ ও ব্যাণ্ডেল জংশন হইতে ৩ মাইল দূর। এই স্থানের চলিত নাম বাঁশবেড়ে। রায় মহাশয় উপাধিধারী এখানকার প্রাচীন জমিদার বংশের জন্য এই স্থানের প্রসিদ্ধি। এই বংশের আদিপুরুষের নাম রামেশ্বর রায়চৌধুরী। তিনি সম্রাট আওরঙ্গজেবের নিকট হইতে "রাজা মহাশয়" উপাধি লাভ করেন। সেই হইতে তাঁহার বংশধরগণ রায় মহাশয় নামে খ্যাত। রাজা মহাশয়গণের গড়-বেষ্টিত বাটী এখানকার প্রধান দ্রষ্টব্য। এই গড়ের মধ্যে বাসুদেব, স্বয়ম্বরা কালী, সুপ্রসিদ্ধ হংসেশ্বরী, ও চতুর্দ্দশেশ্বরের মন্দির অবস্থিত। হংসেশ্বরীর মন্দিরের অনুরূপ মন্দির বাংলাদেশে আর একটিও নাই। ছয়তল ও ত্রয়োদশ চূড়া সমন্বিত ৭০ ফুট উচচ এই মন্দিরটি বারাণসীর স্থাপত্য শিল্পের আদর্শে নির্ম্মিত। ইহার গঠন প্রণালীতে যৌগিক ষট্‌চক্রভেদের রহস্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে। নরদেহে ষট্‌চক্রভেদের ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না, বজ্রাক্ষ ও চিত্রিনী নামে যে পাঁচটি নাড়ী আছে, সেরূপ এই মন্দিরে উহাদের প্রতীক পাঁচটি সোপান আছে এবং হংসেশ্বরী দেবী কুলকুণ্ডলিনী রূপে অবস্থিতা। বাঁশবেড়িয়ার রাজা নৃসিংহদেব এই মন্দিরের নির্ম্মাণ আরম্ভ করেন এবং তৎপত্নী রাণী শঙ্করীদেবী কর্ত্তৃক ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে ইহা সম্পন্ন হয়। এই মন্দির নির্ম্মাণে আনুমানিক ৫ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল। লুপ্ত বিষয় উদ্ধারের উদ্দেশ্যে রাজা নৃসিংহদেব ব্যয় সঙ্কোচের জন্য রাজধানী বংশবাটী হইতে কাশীতে গিয়া বাস করিতেছিলেন। সেখানে কাশীখণ্ডের বঙ্গানুবাদে তিনি খিদিরপুর ভূ-কৈলাসের রাজা জয়নারায়ণ ঘোষালকে বিশেষ সাহায্য করেন এবং স্বয়ং "উদ্দিশতন্ত্রের" বঙ্গানুবাদ করেন। শাস্ত্রালোচনা ও যোগসাধনার ফলে নৃসিংহদেবের বিষয় বাসনা তিরোহিত হইয়া যায় এবং সংগৃহীত অর্থ মামলা-মোকদ্দমায় ব্যয় না করিয়া হংসেশ্বরী দেবীর মন্দির নির্ম্মাণে তিনি উহা ব্যয় করেন। হংসেশ্বরী দেবীর প্রতিমূর্ত্তি নিমকাঠের দ্বারা প্রস্তুত দেবীর বর্ণ নীল, শবরূপী শিবের নাভিপদ্মের উপর দেবী উপবিষ্টা। মন্দিরের দক্ষিণ অর্থাৎ সম্মুখভাগের বারান্দায় ১২টি কারুকার্য্যখচিত খিলান আছে। মধ্যভাগের চূড়াটি প্রায় ৭০ ফুট উচচ। মন্দিরের ছাদে উঠিবার জন্য তিনটি সিঁড়ি আছে। ছাদের উপর হইতে অদূরবর্ত্তী গঙ্গার দৃশ্য অতি সুন্দর দেখায়। বাসুদেব মন্দিরটি বাঁশবেড়িয়ার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। ইহা ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়। এই মন্দিরের ছাদে একটি বড় গুম্বজ আছে এবং সম্মুখ ভাগের প্রাচীর গাত্রে ইষ্টকের উপর বহু পৌরাণিক চিত্র উৎকীর্ণ আছে। প্রাচীন বাংলার শিল্প-নিদর্শন হিসাবে ইহাও একটি দ্রষ্টব্য বস্তু।

বংশবাটী এক সময়ে সংস্কৃত চর্চ্চার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল এবং এখানে বহু পণ্ডিতের জন্ম হইয়াছিল। পূর্ব্বে এখানে নীলের চাষ হইত। সুসাহিত্যিক দীনবন্ধু মিত্রের নীল দর্পণ নাটকে বর্ণিত নীলকুঠি বাঁশবেড়েয় অবস্থিত ছিল।

পরলোকগত প্রসিদ্ধ সমাজ সংস্কারক হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বংশবাটীর অধিবাসী ছিলেন।

১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার তত্ত্ববোধিনী সভা এখানে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন; বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা বেদান্তের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলে বহু অভিভাবক ছাত্রদের বিদ্যালয় হইতে ছাড়াইয়া লন। বিদ্যালয়টি পরে উঠিয়া যায়।

ঈস্‌ট্‌ ইণ্ডিয়া কোম্পানির ব্যারাক, চুঁচুড়া (পৃষ্ঠা ৭৬)

মহশীন কলেজ, হুগলী (পৃষ্ঠা ৭৩)
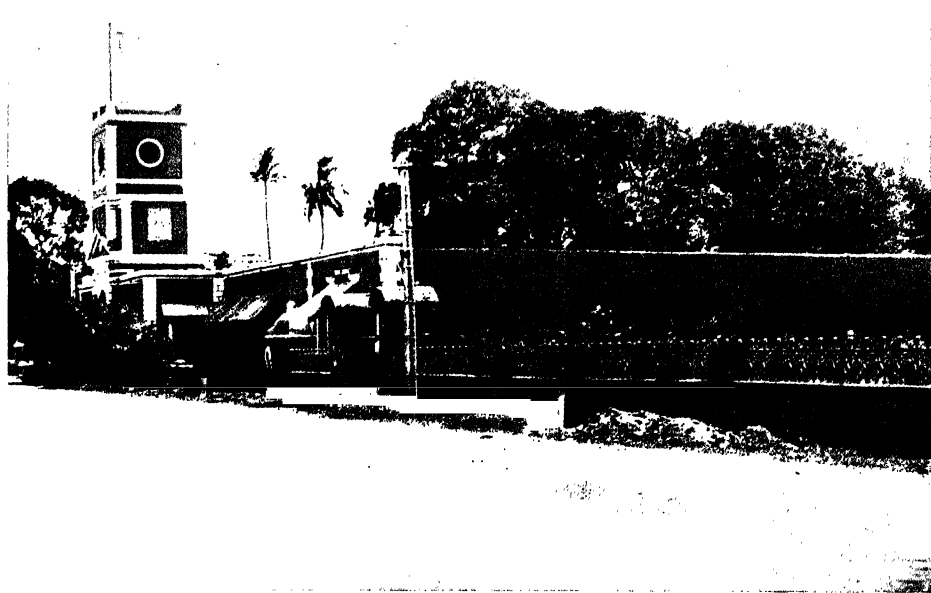
ফোর্ট দ্য আরলাঁ, চন্দননগর (পৃষ্ঠা ৭২)
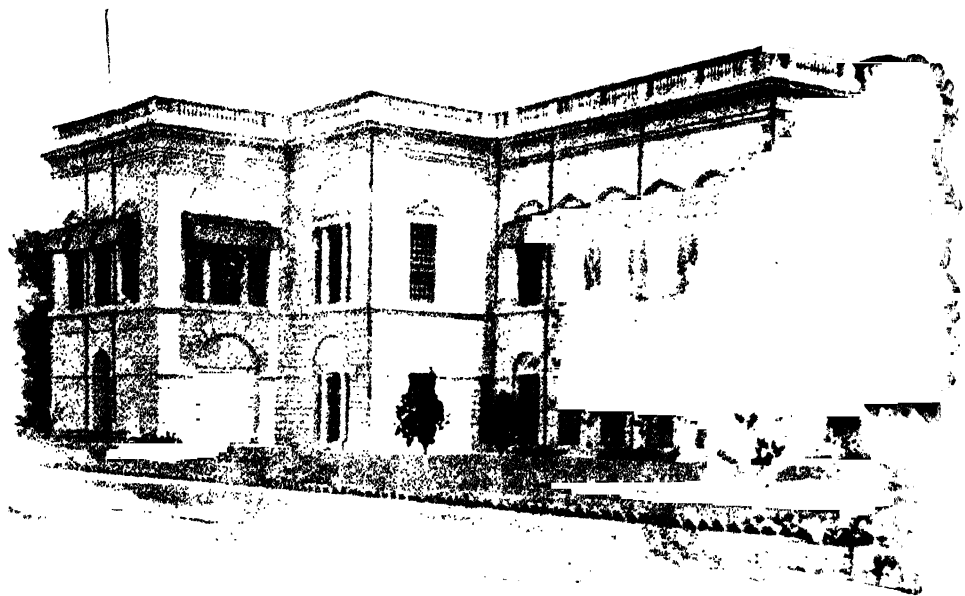
আদালত ভবন, চুঁচুড়া (পৃষ্ঠা ৭৩)

ইমামবাড়া, হুগলী (পৃষ্ঠা ৭৫)

কুঞ্জ, উৎসর্গীকৃত মাস্তুল, ব্যাণ্ডেল গির্জার অভ্যন্তর ও ব্যাণ্ডেল গির্জা (পৃষ্ঠা ৭৭)

গ্রাণ্ড্‌ট্রাঙ্ক রোড, সপ্তগ্রাম (পৃষ্ঠা ৭৮)

জাফর খাঁর মসজিদ্, ত্রিবেণী (পৃষ্ঠা ৯৭
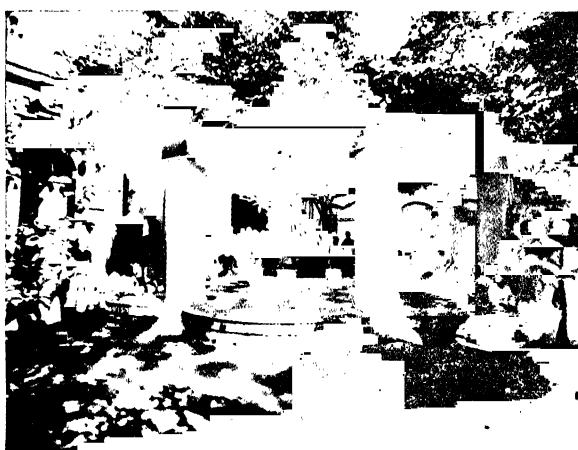
উদ্ধারণ দত্তের শ্রীপাট, সপ্তগ্রাম (পৃষ্ঠা ৭৯)

প্রাচীন কবর, সপ্তগ্রাম (পৃষ্ঠা ৭৯)
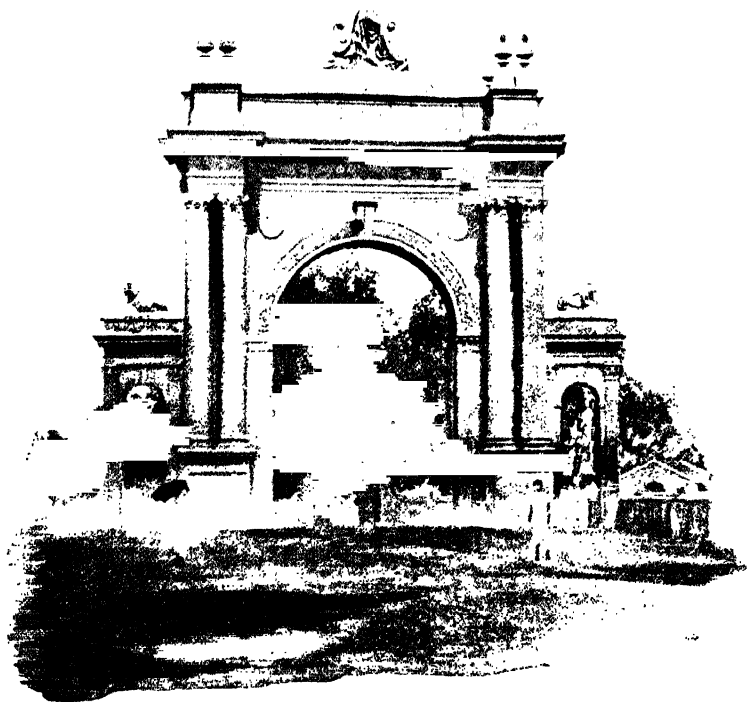
স্টার অফ ইণ্ডিয়া তোরণ, বর্দ্ধমান (পৃষ্ঠা ৮২)
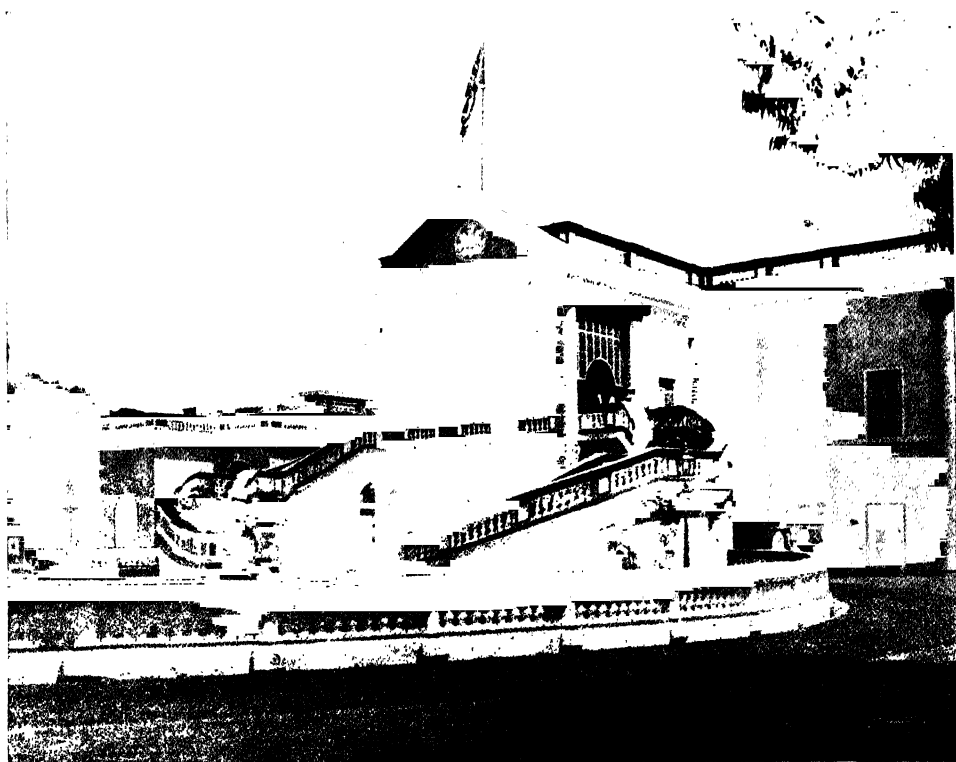
দিলখোসবাগ, বৰ্দ্ধমান (পৃষ্ঠা ৮২)

বাঁশবেড়িয়ায় বহুপূর্ব্বে একটি গির্জা ছিল ; ইহার আচার্য্য ছিলেন ইংরেজী, ফরাসী ও পর্ত্তুগীজ ভাষাবিদ তারাচাঁদ নামে একজন দেশীয় লোক। কেহ কেহ বলেন এই গির্জাটিই বাংলাদেশের সর্ব্বপ্রথম গির্জা।

বাঁশবেড়িয়ায় খামারপাড়ায় একটি আখ্ড়া আছে ; হুগ্লীর চতুরদাস বাবাজীর বড় আখ্ড়ার সহিত ইহার সম্বন্ধ আছে। খামারপাড়ার আখ্ড়ার প্রতিষ্ঠাতা ভিখারীদাস সম্বন্ধে নানারপ কাহিনী প্রচলিত আছে। কথিত আছে, একদিন সকালে ভিখারীদাস যখন দন্তধাবন করিতেছিলেন ত্রিবেণীর দরাফগাজী ব্যাঘ্রপৃষ্ঠে তথায় উপস্থিত হন। তাঁহাকে দেখিয়া ভিখারীদাস যে দাওয়ায় বসিয়াছিলেন তাহাকে হস্ত দ্বারা আঘাত করিয়া আগাইয়া যাইতে বলিলেন। দাওয়া আগাইয়া যাইলে ভিখারীদাস দরাফ গাজীর সম্মুখস্থ হইলেন এবং উভয়ে নামিয়া আলিঙ্গন করিলেন। কথিত আছে ইহার পর দরাফগাজী সংস্কৃত ও শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং গঙ্গা স্তোত্র লিখিয়া প্রসিদ্ধ হন। দরাফগাজী ত্রিবেণীর জাফর খাঁ বলিয়া কথিত।

ত্রিবেণী—ব্যাণ্ডেল জংশন হইতে ৫ মাইল দূর। ইহা একটি প্রসিদ্ধ তীর্থ ও মুক্তবেণী নামে পরিচিত। যুক্তপ্রদেশের এলাহাবাদ বা প্রয়াগে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী একধারায় মিলিত হইয়া এই স্থানে আসিয়া পুনরায় পৃথক ধারায় প্রবাহিত বলিয়া লোকের বিশ্বাস। সেই জন্য এই স্থানকে মুক্ত বেণী বলা হয়। ত্রিবেণীতে গঙ্গাস্নান হিন্দু মাত্রেরই কাম্য। ইহা অতি প্রাচীন স্থান। দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত ধোয়ী কবির "পবন দূতম" নামক কাব্যে ইহার উল্লেখ আছে।

মুসলমান ঐতিহাসিকগণ এই স্থানকে "তিরপানি" ও "ফিরোজাবাদ" নামে অভিহিত করিয়াছেন। বঙ্গাধিপ ফিরোজ শাহ কিছুকাল এই স্থানে বাস করিয়াছিলেন। মুসলমান আমলের কীর্ত্তির মধ্যে ত্রিবেণীতে জাফর খাঁর মসজিদ্ উল্লেখযোগ্য। এই মসজিদের প্রাচীর গাত্রে আরবী ভাষায় কোর-আনের বচন উৎকীর্ণ আছে। অদিসপ্তগ্রাম দ্রষ্টব্য।

মুঘল আমলে ত্রিবেণী একটি প্রসিদ্ধ বন্দর ও শহর ছিল এবং তীর্থ হিসাবেও ইহার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম লিখিয়াছেন,

"বামদিকে হালিশহর দক্ষিণে ত্রিবেণী।
যাত্রীদের কোলাহলে কিছুই না শুনি।।"

ত্রিবেণীতে ওড়িষ্যারাজ মুকুন্দদেব হরিচন্দনের নির্ম্মিত একটি পুরাতন ঘাটের ধ্বংসাবশেষ আজিও বর্ত্তমান আছে।

সপ্তগ্রাম-বিজেতা জাফর খাঁ ভাগীরথী ও সরস্বতীর সঙ্গম-স্থলে একটি পুরাতন প্রস্তরের দেব মন্দিরের মধ্যে সমাহিত আছেন। সমাধির নিকটে একটি বৃহৎ মসজিদ ; ইহা প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ লইয়া নির্ম্মিত। মসজিদের একটি খিলান মস্জিদ অপেক্ষাও প্রাচীন ও জাফর খাঁ নির্ম্মিত পূর্ব্বেকার মস্জিদের মিহরাব। এই মিহরাবটি বর্ত্তমান মস্জিদের অন্য মিহরাব হইতে দেখিতে সম্পূর্ণ পৃথক এবং ইহার শিলালেখ হইতে জানা যায় যে ১২৯৮ খৃষ্টাব্দে জাফর খাঁ একটি মস্জিদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই মিহরাবটি বাংলা, বিহার ও ওড়িষ্যার মুসলমান রাজত্বকালের প্রাচীনতম স্থাপত্য নিদর্শন। জাফর খাঁর মসজিদটি ভাঙ্গিয়া গেলে বর্ত্তমান মস্জিদ নির্ম্মাণকালে এই পুরাতন মিহরাবটি ব্যবহৃত হইয়াছে।

ত্রিবেণী তাহার পূর্ব্ব সমৃদ্ধি হারাইলেও তীর্থ গৌরব হারায় নাই। যাঁহারা প্রয়াগের যুক্ত বেণীতে স্নান করেন, তাঁহারা ত্রিবেণীর মুক্ত বেণীতে স্নান করাও অবশ্য কর্ত্তব্য মনে করেন। দশহরা, বারুণী, মকরসংক্রান্তি, মাঘীপূর্ণিমা, বিষ্ণুপদী সংক্রান্তি ও গ্রহণ উপলক্ষে সহস্র সহস্র যাত্রীর সমাগম হয়। এখানকার বেণীমাধবের মন্দিরে বহু যাত্রী দেবদর্শন ও দেবার্চ্চনা করিয়া থাকেন।

ত্রিবেণীর মহাশ্মশানে লোকে বহুদূর হইতে শবদাহ করিতে আসে।

নবদ্বীপের ন্যায় ত্রিবেণীও এককালে সংস্কৃত চর্চ্চার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। দেশবিশ্রুত শ্রুতিধর পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ত্রিবেণীর অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার অসাধারণ স্মৃতিশক্তি সম্বন্ধে এইরূপ গল্প প্রচলিত আছে, যে একদিন গঙ্গার ঘাটে বসিয়া তিনি সন্ধ্যা করিতেছেন এমন সময় নৌকাযোগে দুইজন গোরা সেখানে উপস্থিত হইয়া প্রথমে বচসা ও পরে মারামারি করে। জগন্নাথ ইংরেজী আদৌ জানিতেন না, কিন্তু এই ব্যাপারে আদালতে সাক্ষ্য দিতে গিয়া গোরা দুইটির ইংরেজী বাদানুবাদ অবিকল বলিয়া দিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

ত্রিবেণীর নিকটস্থ বাঘাটি গ্রাম হিন্দুকলেজের খ্যাতনামা ছাত্র বাগ্মীপ্রবর রামগোপাল ঘোষের পৈতৃক বাসস্থান। রামগোপাল ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ ও ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন। তাঁহার সমসাময়িককালে তিনি ইংরেজী শিক্ষিত সমাজের অন্যতম নেতা ছিলেন এবং দেশের হিতকর বহু প্রতিষ্ঠানর সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। অপূর্ব্ব বক্তৃতাশক্তির জন্য লোকে তাঁহাকে সুবিখ্যাত বাগ্মী এডমণ্ডবার্কের সহিত তুলনা করিত। এক সময়ে কলিকাতার নিমতলাস্থ শ্মশান ঘাটে শবদাহ বন্ধ করিবার জন্য সরকার কর্ত্তৃক প্রস্তাব হয়। রামগোপাল বাক্পটুতা ও যুক্তিতর্কের সাহায্যে গঙ্গাগর্ভে হিন্দুর শব সৎকারের এই অধিকার অক্ষুন্ন রাখেন। নিমতলার শ্মশান ঘাটে তাঁহার একটি মর্ম্মর নির্ম্মিত স্মৃতি-ফলক আছে।

বাঘাটি গ্রামে "ডাকাতে কালী" নামে এক প্রাচীন কালী আছেন। প্রবাদ, ডাকাতেরা এই কালীর নিকট নরবলি দিয়া ডাকাতি করিতে বাহির হইত।

বলাগড়—ব্যাণ্ডেল জংশন হইতে ১৬ মাইল দূর। ইহাও একটি প্রাচীন স্থান। এখানে পঞ্চমুণ্ডী আসন সংযুক্ত এক চণ্ডীমন্দির আছে। উহা বলয়োপপীঠ নামে প্রসিদ্ধ। বলাগড়ের রাধাগোবিন্দ মন্দির একটি দ্রষ্টব্য বস্তু। এখানকার চণ্ডী মন্দিরের প্রাচীর গাত্রে ইষ্টকের উপর অতি সুন্দর কারুকার্য্য আছে। নিত্যানন্দের দুহিতা ৺গঙ্গাগোস্বামিনীর বংশধরগণ এই স্থানে বাস করেন বলিয়া ইহা বৈষ্ণবগণের নিকট শ্রীপাট বলিয়া সম্মানিত। বাংলার বরণ্যে সন্তান পরলোকগত স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পৈতৃক নিবাস ছিল বলাগড়ে।

গুপ্তিপাড়া—ব্যাণ্ডেল জংশন হইতে ২২ মাইল দূর। অনেকে অনুমান করেন যে ইহার পূর্ব্বনাম গুপ্তপল্লী। এই স্থানে বহু প্রাচীন দেবালয় আছে। তন্মধ্যে বৃন্দাবনচন্দ্র, কৃষ্ণচন্দ্র, রামচন্দ্র ও চৈতন্যদেবের মন্দির সমধিক প্রসিদ্ধ। বৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দির সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর এবং ইহার কারুকার্য্য অতি অপূর্ব্ব। লাল ইটে নির্ম্মিত মন্দির গাত্রে দেব দেবীর মূর্ত্তি, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতির ঘটনাবলী ও বৈষ্ণবদিগের আখ্যান উৎকীর্ণ আছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে

শেওড়াফুলির রাজা হরিশচন্দ্র রায় চৌধুরী কর্তৃক ইহা নির্ম্মিত হয় বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। এই মন্দির মধ্যে বৃন্দাবনচন্দ্র, কৃষ্ণচন্দ্র, রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার দারুময়ী মূর্ত্তি আছে। ইহা গুপ্তিপাড়ার মঠ নামে পরিচিত। এখানে জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা ও গরুড়ের মূর্ত্তি আছে। চৈতন্যদেবের মন্দিরটি সপ্তদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত হয়। ইহার আকৃতি জোড় বাংলার ন্যায়। এই মন্দিরটি সর্ব্বাপেক্ষা ছোট ও আড়ম্বরবিহীন। রাসযাত্রা, দোলযাত্রা ও পুনর্যাত্রার সময় গুপ্তিপাড়ায় বিশেষ সমারোহ হয়।

ভাগীরথী তীরবর্ত্তী অন্যান্য প্রাচীন স্থানের ন্যায় গুপ্তিপাড়ায়ও বহু সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের জন্ম হইয়াছিল। ইঁহাদের মধ্যে "শ্যামাকল্পলতিকা" প্রণেতা ৺মথুরানাথ ভট্টাচার্য্য ও "বিদ্যোন্মাদ তরঙ্গিনী" প্রণেতা ৺চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য্যের নাম উল্লেখযোগ্য। আধুনিক কালের খ্যাতনামা বক্তা ও ধর্ম্মোপদেশক ৺কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন এখানে জন্মগ্রহণ করেন।

গুপ্তিপাড়ার সন্নিকটে ভাগীরথী তীরে সুখুরিয়া গ্রামে উলার বিখ্যাত মুস্তৌফী বংশের এক শাখার বাস। ইঁহাদের প্রতিষ্ঠিত দেবালয়গুলিও এ অঞ্চলের দ্রষ্টব্য বস্তু।

কালনা কোর্ট—ব্যাণ্ডেল জংশন হইতে ২৬ মাইল দূর। ইহা বর্দ্ধমান জেলার অন্যতম মহকুমা। মুসলমান আমলে এই স্থান অতি সমৃদ্ধ ছিল। এখনও এখানে একটি পুরাতন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। কালনায় বদর সাহেব ও মজলিস্ সাহেব নামক দুইজন ফকিরের সমাধি আছে। স্থানীয় লোকেরা এই সমাধি দুইটিকে বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখেন ও ফুল, ফল, মিষ্টান্ন ও ছোট ছোট মাটির ঘোড়ার অর্ঘ্য দান করেন। কালনায় বর্দ্ধমান মহারাজের গঙ্গাবাসের জন্য একটি প্রাসাদ ও ১০৯টি শিব মন্দির আছে। বর্ত্তমানে উহাই কালনার একমাত্র দ্রষ্টব্য বস্তু। এই মন্দিরগুলি ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে মহারাজ তেজচন্দ্র কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। প্রাসাদের মধ্যে একটি শিবের, দুটি কৃষ্ণের ও আরও কয়েকটি সুন্দর কারুকার্য্যখচিত ইষ্টক-নির্ম্মিত মন্দির আছে। রাজপ্রাসাদের পার্শ্ববর্ত্তী সমাজ বাড়ীতে বর্দ্ধমান রাজপরিবারস্থ ব্যক্তিগণের চিতাভস্ম ও স্মৃতিস্তম্ভ আছে। সুপ্রসিদ্ধ সাধক কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য কালনায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; তাঁহার রচিত সুমিষ্ট শ্যামা-সঙ্গীত রামপ্রসাদী গানের মত জনপ্রিয়।

কালনার নিকটবর্ত্তী অম্বিকা গ্রাম বাঙ্গালী বৈষ্ণবগণের একটি বিখ্যাত তীর্থ। ইহা দ্বাদশ গোপালের অন্যতম গৌরীদাস পণ্ডিত ঠাকুরের শ্রীপাট। গৌরীদাস গৌরাঙ্গদেবের অতি অন্তরঙ্গ ভক্ত ছিলেন এবং মহাপ্রভুর প্রকটকালে তিনিই সর্ব্বপ্রথম নিম্বকাষ্ঠ নির্ম্মিত গৌর নিতাইএর বিগ্রহ প্রস্তুত করিয়া নিত্য সেবা প্রকাশ করেন। গৌরীদাসকে মহাপ্রভুর স্বহস্ত প্রদত্ত উপঢৌকন "গীতা" ও নৌকা বাহিবার একখানি "বৈঠা" শ্রীপাট অম্বিকায় অতি সমাদরে রক্ষিত আছে। অম্বিকা বাজারের নিকটে "শ্রীনাম ব্রহ্ম" নামক অপর একটি মন্দির আছে। এই মন্দিরের প্রাঙ্গনে ভগবানদাস বাবাজী নামক এক প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব সাধুর সমাধি আছে। প্রতিবৎসর মাঘ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব উপলক্ষে শ্রীপাট অম্বিকায় বৈষ্ণবগণের মহোৎসব হয়।

অম্বিকা গ্রামের নামোৎপত্তি সম্বন্ধে জনশ্রুতি এই, যে প্রাচীনকালে এই স্থানে অম্বরীষ নামক জনৈক ঋষি প্রস্তর খণ্ডের উপর ঘটস্থাপনা করিয়া দেবী অম্বিকার পূজা করিতেন। দেবীর নাম

হইতেই গ্রামের নাম অম্বিকা হয়। গ্রামের মধ্যভাগে আজিও অম্বিকা পুষ্করিণী নামে একটি জলাশয় ও ঋষি প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধেশ্বরী বিগ্রহ বর্ত্তমান আছে।

বাঘনাপাড়া—ব্যাণ্ডেল জংশন হইতে ২৯ মাইল। ইহাও একটি বৈষ্ণব শ্রীপাট। এখানে গোপেশ্বর নামক এক প্রাচীন শিবলিঙ্গ ও শ্রীরামকৃষ্ণ জীউর মন্দির আছে। পরম বৈষ্ণব রামচন্দ্র গোস্বামীর তিরোভাব উপলক্ষে প্রতিবৎসর মাঘ মাসের কৃষ্ণা তৃতীয়া তিথিতে ও রামকৃষ্ণ জীউর দোলযাত্রা উপলক্ষে এখানে বহু যাত্রীর সমাগম হয়। শিবরাত্রির দিন গোপেশ্বর শিবের মন্দিরেও বহু ভক্তের আগমন হয়। নিত্যানন্দের পত্নী জাহ্নবাদেবীর পোষ্যপুত্র রামচন্দ্র বা রামাই গোঁসাই বৃন্দাবন হইতে কানাই-বলাই বা রামকৃষ্ণ বিগ্রহ আনিয়া এই স্থানে প্রতিষ্ঠা করেন। "বংশী শিক্ষা" গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে এই স্থানে জঙ্গলের মধ্যে একটি বাঘ বাস করিত। রামচন্দ্র গোস্বামী এই বাঘকেও হরিনাম দিয়া উদ্ধার করেন এবং বাঘের নামানুসারে গ্রামের নাম বাঘনাপাড়া রাখেন।

সমুদ্রগড়—ব্যাণ্ডেল জংশন হইতে ৩৬ মাইল। ইহা প্রাচীন রাঢ়ের অন্তর্গত একটি প্রসিদ্ধ স্থান। পূর্ব্বে ইহা ভাগীরথীর তীরে অবস্থিত ছিল। এখন ভাগীরথী দূরে সরিয়া গিয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন যে মহাভারতোক্ত বঙ্গরাজ সমুদ্রসেন এই স্থানে রাজত্ব করিতেন। আবার কাহারও কাহারও মতে গুপ্তবংশীয় সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের সহিত এই স্থানের সম্বন্ধ ছিল; এখানে তাঁহার গড় ও স্থানীয় রাজধানী ছিল এবং কাহারও কাহারও মতে মহাকবি কালিদাস ইঁহার নিকটেই বাস করিতেন। মকুট রায় নামে সমুদ্রগড়ের একজন ক্ষমতাশালী ব্রাহ্মণ রাজার প্রসিদ্ধি আছে। পাঠান জায়গীরদারদের সহিত তাঁহার বহুবার যুদ্ধ হয় এবং শেষে তিনি পরাজিত ও নিহত হন। মোটের উপর স্থানটি যে খুব প্রাচীন তাহা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। চৈতন্য ভাগবত, কবিকঙ্কণ চণ্ডী প্রভৃতি গ্রন্থে এই স্থানের উল্লেখ আছে।

অনেকে অনুমান করেন যে বাংলা দেশের আদি সারস্বত ব্রাহ্মণগণ সপ্তশতী নামক পরগণায় বাস করিতেন। সমুদ্রগড়ের বর্ত্তমান পরগণা সাতসইকা ও সপ্তশতী অভিন্ন বলিয়া অনেকের অভিমত।

নবদ্বীপধাম—ব্যাণ্ডেল জংশন হইতে ৪১ মাইল দূর। ষ্টেশন হইতে নবদ্বীপ শহর প্রায় দুই মাইল। ষ্টেশনে ঘোড়ার গাড়ী পাওয়া যায়। আশে পাশের সমস্ত স্থান বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত হইলেও নবদ্বীপ শহরটি গঙ্গার পূর্ব্বতীরবর্ত্তী নদীয়া জেলার অধীন। বস্তুতঃ নবদ্বীপ হইতেই "নদীয়া" নামের উৎপত্তি। সুতরাং নবদ্বীপকে বাদ দিয়া নদীয়া জেলা হইতে পারে না। নবদ্বীপ বাংলার শ্রেষ্ঠ গৌরবের স্থান, কিন্তু ইহার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে তাদৃশ প্রমাণাদি নাই। পুরাণ, রামায়ণ ও মহাভারত প্রভৃতিতে ইহার উল্লেখ নাই। খ্রীষ্টীয় একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে সেনরাজগণের গঙ্গাবাস স্থান স্বরূপ নবদ্বীপের প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার নামকরণ সম্বন্ধেও নানা মত প্রচলিত আছে। কেহ বলেন গঙ্গার গর্ভ হইতে নূতন উত্থিত হওয়ায় ইহার নাম হয় নূতন বা নবদ্বীপ; কাহারও কাহারও মতে জনৈক তান্ত্রিক সন্ন্যাসী এই দ্বীপে রাত্রিকালে নয়টি আলোক জ্বালিয়া যোগসাধনা করিতেন বলিয়া ইহাকে "নবদীপ" বা "নদীয়া" বলা হইত। অধিকাংশের

মতে গঙ্গা গর্ভোত্থিত এই পবিত্র ভূমি নয়টি দ্বীপের সমষ্টি লইয়া গঠিত বলিয়া ইহার নাম হয় নবদ্বীপ। নবদ্বীপের উপর যাঁহাদের দাবী সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সেই বৈষ্ণবগণ এই শেষোক্ত মতই গ্রহণ করিয়াছেন। "নবদ্বীপ পরিক্রমা" প্রণেতা নরহরি চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—

"নদীয়া পৃথক গ্রাম নয়।
নবদ্বীপে নবদ্বীপ বেষ্টিত যে হয়॥"

এই নয়টি দ্বীপের পরিচয় প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন—

"গঙ্গা পূর্ব্ব পশ্চিম তীরেতে দ্বীপ নয়।
পূর্ব্বে অন্তর্দ্বীপ শ্রীসীমন্ত দ্বীপ চতুষ্টয়।
কোলদ্বীপ ঋতু জহ্নু মোদদ্রুম আর।
রুদ্রদ্বীপ এই পঞ্চ পশ্চিমে প্রচার॥"

বর্ত্তমান নবদ্বীপের আশে পাশে ও গঙ্গার পূর্ব্বতীরে অবস্থিত কতিপয় গ্রামকে প্রাচীন নয়টি দ্বীপের সহিত অভিন্ন বলিয়া মনে করা হয় এবং এই সকল স্থান প্রদক্ষিণ করিয়া ভক্ত বৈষ্ণবগণ "নবদ্বীপ পরিক্রমা" উৎসব সম্পন্ন করেন।

সেন রাজগণের সময় হইতেই নবদ্বীপ একটি সমৃদ্ধ নগরে পরিণত হয় এবং এখানকার ব্রাহ্মণগণের পাণ্ডিত্য খ্যাতি বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত লাভ করে। চৈতন্য দেবের আবির্ভাব কালে নবদ্বীপ অতি সমৃদ্ধ জনপদ ছিল। "চৈতন্য ভাগবত" কার বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন,

"নবদ্বীপ হেন গ্রাম ত্রিভুবনে নাই।
যঁহি অবতীর্ণ হৈলা চৈতন্য গোঁসাই॥"
"নবদ্বীপের ঐশ্বর্য্য কে বর্ণিবারে পারে।
একো গঙ্গাঘাটে লক্ষ্য লোক স্নান করে॥"

বাসুদেব সার্ব্বভৌম, রঘুনাথ শিরোমণি, মথুরানাথ তর্কবাগীশ, স্মার্ত্ত রঘুনন্দন, রামভদ্র সার্ব্বভৌম, ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ, রুদ্ররাম তর্কবাগীশ, বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন, জগদীশ তর্কালঙ্কার, রঘুদেব ন্যায়ালঙ্কার, রামভদ্র ন্যায়ালঙ্কার, রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত, কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ, প্রভৃতি ন্যায়, স্মৃতি পঞ্চতন্ত্র শাস্ত্রজ্ঞ জগজ্জয়ী পণ্ডিতগণের অধ্যাপনা ও জ্ঞান চর্চ্চার জন্য নবদ্বীপের খ্যাতি উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বহুদূর দেশ হইতে ছাত্রগণ জ্ঞান লাভের জন্য নবদ্বীপে আসিত। এই সকল বিখ্যাত পণ্ডিতগণের অসাধারণ শক্তি সম্বন্ধে নানারূপ কাহিনী আছে। কথিত আছে, সর্ব্বপ্রথম একজন যোগী নবদ্বীপের গঙ্গার চরে একটি কুটিরে কয়েকটি ছাত্রকে শিক্ষাদান আরম্ভ করেন। ইঁহার ছাত্রদের মধ্যে শঙ্কর তর্কবাগীশ ও ব্যায়াপ্তি শিরোমণি ন্যায় শাস্ত্রের বহু গ্রন্থের রচয়িতা। ইঁহাদের পর খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে মহেশ্বর বিশারদের পুত্র বাসুদেব মিথিলার বিখ্যাত পণ্ডিত ও অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক পক্ষধর মিশ্রের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া শলাকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পক্ষধর মিশ্র তৎকালে জগজ্জয়ী পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার প্রকৃত নাম ছিল জয়ধর মিশ্র তর্কালঙ্কার; শাস্ত্রীয় বিচারে তিনি যে পক্ষ অবলম্বন করিতেন সেই পক্ষই জয়ী

হইত এবং তিনি যাহা কিছু শুনিতেন এক পক্ষকাল ধরিয়া অবিকল মনে রাখিতে পারিতেন বলিয়া তাঁহার নাম হয় পক্ষধর। শলাকা পরীক্ষা এই প্রকার—একটি সূক্ষ্মাগ্র লৌহশলাকা সবলে পুঁথির উপর নিক্ষেপ করিলে সর্ব্বশেষে যে পত্র খানি বিদ্ধ হয়, পরীক্ষার্থী ছাত্রকে সেই পত্রখানি ব্যাখ্যা করিতে দেওয়া হয়। বাসুদেব এই ভাবে শত শলাকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে পক্ষধর মিশ্র তাঁহাকে "সার্ব্বভৌম" উপাধি প্রদান করেন। তৎকালে মিথিলা ছাড়া অন্যত্র ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপনা ছিল না। পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র যাহাতে ন্যায় শাস্ত্রের পুঁথি বা উহার কোন অংশ স্বদেশে না লইয়া যাইতে পারে তৎপ্রতি মিথিলার পণ্ডিতদিগের সতর্ক দৃষ্টি ছিল। বাসুদেব অনন্যসুলভ মেধাশক্তি বলে গঙ্গেশ উপাধ্যায় কৃত চারি খণ্ড চিন্তামণি শাস্ত্র ও উদয়ন আচার্য্যের ন্যায় কুসুমাঞ্জলির শ্লোকাংশ কণ্ঠস্থ করিয়া নবদ্বীপে আসিয়া ন্যায় গ্রন্থের প্রচলন ও অধ্যাপনা করেন। তাঁহার প্রতিভার নিকট ন্যায়শাস্ত্রে মিথিলার একাধিপত্য আর টিকিতে পারে নাই। উত্তরকালে বাসুদেব সার্ব্বভৌম ওড়িষ্যারাজ প্রতাপ রুদ্রদেবের সভাপণ্ডিত পদে বৃত হইয়াছিলেন এবং তথায় শ্রীচৈতন্য দেবের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার অনুরাগী ভক্ত হন। বাসুদেব সার্ব্বভৌমের শিষ্যগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি ও "অনুমান মণিব্যাখ্যা" প্রণেতা কণাদ প্রধান। রঘুনাথ বাসুদেবের নিকট পাঠ সমাপনান্তে মিথিলার পক্ষধর মিশ্রের নিকট প্রেরিত হন। পক্ষধর রঘুনাথের মেধা দেখিয়া অতিমাত্র বিস্মিত হন এবং সভা করিয়া তাঁহাকে সর্ব্বপ্রথম নবদ্বীপ হইতে উপাধি বিতরণের ক্ষমতা ও অধিকার প্রদান করেন। কথিত আছে রঘুনাথ নবদ্বীপে ফিরিয়া হরিঘোষ নামক একব্যক্তি প্রদত্ত গোশালায় তাঁহার চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন। তাঁহার এত ছাত্র হইয়াছিল যে তাহাদের পাঠ অভ্যাসের কোলাহল বহু দূর হইতে শুনা যাইত; ইহা হইতেই "হরিঘোষের গোয়াল" এই প্রবাদ বাক্যের উৎপত্তি বলিয়া কথিত। নবদ্বীপে বহুকাল হইতে ন্যায়ের চর্চ্চা থাকিলেও রঘুনাথের সময় হইতেই নবদ্বীপে ন্যায়ের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাঁহার সময় হইতেই নবদ্বীপের নৈয়ায়িক-গণের মধ্যে একজন করিয়া প্রধান নৈয়ায়িক পদে বৃত হইয়া আসিতেছেন। রঘুনাথের গ্রন্থগুলির মধ্যে "চিন্তামণি-দীধিতি" বা "নব্যন্যায়" সর্ব্বপ্রধান। নৈয়ায়িক মথুরানাথ তর্কবাগীশ, ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ, রঘুদেব ন্যায়ালঙ্কার, জগদীশ তর্কালঙ্কার ন্যায় শাস্ত্রের যে সকল মূল্যবান ভাষ্য প্রভৃতি রচনা করিয়াছিলেন সে গুলি আজও যথাক্রমে "মাথুরী রহস্য" "ভবানন্দী" "রঘুদেবী" ও "জগদীশী" নামে পরিচিত। বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চাননের "ভাষা-পরিচ্ছেদ" নামক প্রসিদ্ধ ন্যায় শাস্ত্রের ভাষ্য আজও ভারতের সর্ব্বত্র অধীত হয়; কথিত আছে তাঁহার পিতা বিদ্যানিবাস মুগ্ধবোধ ব্যকরণের টীকা লিখিয়া এদেশে কলাপ ব্যাকরণের পরিবর্ত্তে মুগ্ধবোধের প্রচলন করেন; তিনি বারাণসীতে জগৎগুরু নারায়ণ ভট্টকে বিচারে পরাস্ত করিয়াছিলেন। রামনাথ তর্কসিদ্ধান্তের সময়ে নবদ্বীপের সকল পণ্ডিত চতুষ্পাঠী চালাইবার জন্য কৃষ্ণনগরের রাজাদিগের সাহায্য গ্রহণ করিতেন; কিন্তু রামনাথ অসাধারণ আত্মমর্য্যাদা সম্পন্ন ছিলেন, সেজন্য রাজার নিকট হইতে কোনও সাহায্য গ্রহণ করিতে সম্মত হন নাই এবং নবদ্বীপের নিকট বনমধ্যে দারিদ্র্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহার টোল চালাইতেন, এজন্য তিনি বুনো রামনাথ নামে খ্যাত। নবদ্বীপের আনন্দরাম তর্কবাগীশ পূজার অর্ঘ্য দিবার সুবিধার জন্য কোশার মুখ বড় করিয়াছিলেন, তদবধি কোশার অপর নাম আনন্দার্ঘ্য।

ন্যায় শাস্ত্রের ন্যায় স্মৃতি শাস্ত্রেও বহুকাল অবধি নবদ্বীপের প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছে। মনুসংহিতার টীকা "মন্বর্থ মুক্তাবলী" প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ বাঙালী কুল্লুকভট্ট অনুমান খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ

শতাব্দীতে বারাণসী ধামে অধ্যয়ন করেন। উক্ত শতাব্দীর শেষভাগে শ্রীনাথ আচার্য্য চূড়ামণির সময় হইতেই নবদ্বীপে স্মৃতিশাস্ত্র চর্চ্চার আরম্ভ হয় এবং খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের সময় ইহা বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে। তাঁহার স্থাপিত নব্যস্মৃতি এখনও বাঙালী হিন্দুদের আচার ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাবদীতে শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার জীমুতবাহনের দায়ভাগের টীকা ও "দায়ক্রম সংগ্রহ" নামক গ্রন্থ রচনা করেন। শেষোক্ত গ্রন্থ কোলব্রুক সাহেব কর্ত্তৃক ইংরেজীতে অনুদিত হয়। ওয়ারেন হেষ্টিংস হিন্দু আইনের প্রামাণিক বিধি প্রস্তুতের জন্য বাংলার নানা স্থান হইতে এগার জন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতকে নিয়োজিত করেন; ইহাদের মধ্যে দুইজন রামগোপাল ন্যায়ালঙ্কার ও বীরেশ্বর পঞ্চানন নবদ্বীপের অধিবাসী ছিলেন। এই পণ্ডিত মণ্ডলী "বিবাদার্ণব সেতু" নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেন; উহা প্রথমে ইরাণীয় ও পরে ইংরেজীতে অনুদিত হয়।

নবদ্বীপে বহুকাল হইতে জোতিঃশাস্ত্রেরও বিশেষ চর্চ্চা আছে। "জ্যোতিঃসার সংগ্রহ" নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ প্রণেতা জোতিষী হৃদয়ানন্দ বিদ্যার্ণব, তৎকালের নবদ্বীপের পঞ্জিকাকার রামচন্দ্র বিদ্যানিধি, রামজয় শিরোমণি, শতানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ, কমলাকর জ্যোতিষী, গণিতাচার্য্য বংশীয় বিশ্বেশ্বর বাচস্পতি, হারাধন বিদ্যাভরণ, নানা শাস্ত্রবিদ রাজীবলোচন বিদ্যাসাগর প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাবদীর শেষভাগে নবদ্বীপে কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ নামে একজন বিশিষ্ট সাধক ও মহাপুরুষ ছিলেন; তন্ত্র বা আগম শাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি আগমবাগীশ নামে পরিচিত হন। তিনি তন্ত্রশাস্ত্রের দেবী মূর্ত্তির সাকার পূজাবিধির প্রচলন করেন। আধুনিক কালের কালী বা শ্যামা মূর্ত্তি কৃষ্ণানন্দের উদ্ভাবিত বলিয়া কথিত। "তন্ত্রসার" নামক তাঁহার গ্রন্থ সুপ্রসিদ্ধ।

আজিও নবদ্বীপের পণ্ডিতগণের "বঙ্গবিবুধ জননী সভা" যাহা পূর্ব্বে "বিদগ্ধ জননী সভা" নামে খ্যাত ছিল ও "নবদ্বীপ সমাজ" নামে দুইটি সুপরিচিত প্রতিষ্ঠান আছে।

নানা শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিতগণের নিবাসভূমি এই নবদ্বীপের সর্ব্বপ্রধান গৌরব ইহা শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব ভূমি বলিয়া। এই জন্যই ইহার তীর্থ গৌরব, এই জন্যই ইহার "শ্রীধাম" আখ্যা, এই জন্যই ইহা বাংলার "বৃন্দাবন" রূপে সম্মানিত।

শ্রীচৈতন্যদেবের পিতা জগন্নাথ মিশ্র ও মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী মহামারী ও দুর্ভিক্ষের জন্য তাহাদের আদি বাসস্থান শ্রীহট্ট পরিত্যাগ করিয়া পরিজনগণসহ নবদ্বীপে আসিয়া বসবাস করেন। ইঁহারা পাশ্চাত্য বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ।

১৪০৭ শকে (১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে) বাসন্তী সন্ধ্যার ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে চৈতন্যদেব জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মের পূর্ব্বে তদীয় জননী শচীদেবীর আটটি সন্তানের অকাল মৃত্যু ঘটিয়াছিল। তাঁহার জন্ম সময়ে তদীয় অগ্রজ বিশ্বরূপ কিশোরবয়স্ক বালক ছিলেন। বিশ্বরূপ পরে ষোল বৎসর বয়সে গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হয়েন। জগন্নাথ মিশ্র নবজাত পুত্রের নাম রাখিয়াছিলেন বিশ্বম্ভর,—অকাল মৃত্যুর হাত হইতে সন্তানকে বাঁচাইবার জন্য পুরস্ত্রীগণের পরামর্শ মত শচীদেবী পুত্রের নাম রাখেন নিমাই। নিমাইএর গায়ের রং অতি উজ্জ্বল গৌরবর্ণ ছিল বলিয়া কেহ কেহ তাঁহাকে গৌরাঙ্গ বা গৌর বলিতেন। ষোল বৎসর বয়সে পড়াশুনা শেষ করিয়া নিমাই "পণ্ডিত"

নামে প্রসিদ্ধ হন এবং নবদ্বীপবাসী মুকুন্দ সঞ্জয়ের চণ্ডীমণ্ডপে টোল খুলিয়া অধ্যাপক হইয়া বসেন। ইতিমধ্যে তিনি তাঁহাদের প্রতিবেশী বল্লভাচার্য্যের কন্যা লক্ষ্মীদেবীকে বিবাহ করেন। নিমাই পণ্ডিত পূর্ব্ববঙ্গ ভ্রমণে বাহির হইলে সপদংশনে লক্ষ্মীদেবীর লোকান্তর ঘটে। গৃহে প্রত্যাগমন করিবার পর তিনি রাজপণ্ডিত সনাতন মিশ্রের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে বিবাহ করেন। অধ্যাপক হিসাবে অতি অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার বিপুল খ্যাতি হয় এবং দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে জয় করিয়া তিনি নবদ্বীপের অদ্বিতীয় পণ্ডিতরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

গয়াধামে পিতার পিণ্ডদান করিতে গিয়া গদাধরের পাদপদ্ম দর্শনে তাঁহার মনে অভূতপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হয় এবং সেই স্থানেই তিনি ভক্তিপন্থী সন্ন্যাসী ঈশ্বরপুরীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। নবদ্বীপে ফিরিয়া আসিবার পর তিনি সংকীর্ত্তনে মাতিয়া উঠেন এবং ক্রমে ক্রমে তাঁহার অসংখ্য ভক্ত পরিকরের সহিত তাঁহার মিলন ঘটে। নবদ্বীপের বিখ্যাত পাষণ্ড জগাই ও মাধাইকে তিনি প্রেমের দ্বারা বশীভূত করেন এবং সবর্বত্রই তাঁহার অসাধারণ প্রেমভক্তির খ্যাতি বিস্তৃত হয়। গয়া হইতে ফিরিবার তিন বৎসর পরে ১৪৩১ শকে (১৫৫৯ খৃষ্টাব্দে) উত্তরায়ণের দিন কাটোয়ায় মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য কেশব ভারতীর আশ্রমে গমন করিয়া তিনি সন্ন্যাস দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং তাঁহার নব নামকরণ হয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। তিনি যৎকালে সংকীর্ত্তন রসে মগ্ন ছিলেন, সেই সময়ে বৈষ্ণব প্রধান নিত্যানন্দের সহিত তাঁহার মিলন হয়। নবদ্বীপবাসিগণ ক্রমে চৈতন্যদেবকে শ্রীকৃষ্ণের ও নিত্যানন্দকে বলরামের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিতে থাকেন। অতঃপর চৈতন্যদেব বহু তীর্থ পর্য্যটন করিয়া বহু স্থানে প্রেমধর্ম্ম প্রচার করেন। ১৪৫৫ শকের (১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে) আষাঢ় মাসে তিনি এই নশ্বর জগৎ পরিত্যাগ করেন। মাত্র ৪৮ বৎসর এই জগতে থাকিয়া তিনি যে প্রেমধর্ম্মের প্রচার করিয়া গিয়াছেন, ভারতের ভাবধারায় উহা বাঙালীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ দান। তাঁহার মহান্ জীবন অবলম্বন করিয়া যে বিরাট বৈষ্ণব সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে, বাংলা ভাষার তাহা অপূর্ব্ব সম্পদ। তাঁহার পুণ্যপদস্পর্শে বাংলা ও ওড়িষ্যার বহু অখ্যাত স্থান তীর্থের গৌরব অর্জ্জন করিয়াছে। বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে সাক্ষাৎ ভগবান জ্ঞানে অর্চ্চনা করেন এবং অপরাপর ব্যক্তিগণ তাঁহাকে ঈশ্বর-প্রেমিক মহাপুরুষ জ্ঞানে শ্রদ্ধা করেন।

বাংলার বৃন্দাবন নবদ্বীপে দেখিবার বস্তু আছে অনেক। তন্মধ্যে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহ সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। যে মন্দিরে এই বিগ্রহের পূজা হয় উহা "মহাপ্রভু বাটী" নামে পরিচিত। নবদ্বীপের অধিষ্ঠাত্রীদেবী বিদগ্ধজননী বা পোড়া-মা তলা, বুড়া শিবের মন্দির, পাড়ার মা সিদ্ধেশ্বরী কালী, আগমেশ্বরী তলা, সোনার গৌরাঙ্গ, বড় আখড়া বা শ্যামসুন্দর মন্দির, অদ্বৈত প্রভুর ঠাকুর বাটী, নিত্যানন্দ মন্দির, ষড়ভুজ গৌরাঙ্গ মন্দির, শ্রীবাস অঙ্গন, মণিপুর রাজের স্বর্ণচূড় মন্দির, কাচকামিনীর মন্দির, চরণদাস বাবজীর সমাজ বাগ, মাধাইএর ঘাট, প্রভৃতি তীর্থযাত্রী ও ভ্রমণকারী মাত্রেরই দ্রষ্টব্য। পোড়া-মা তলা বা জগন্মাতা দেবীর ঘট বৃহদ্রথ নামে এক সিদ্ধ সন্ন্যাসী কর্ত্তৃক স্থাপিত বলিয়া কথিত। সাধকের তপস্যায় প্রীত হইয়া দেবী প্রত্যহ দুই দণ্ডকাল নবদ্বীপে অধিষ্ঠান করিতে প্রতিশ্রুত হন। বাসুদেব সার্ব্বভৌম চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া দেবীর ঘটটিকে গ্রামের মধ্যে আনিয়া বর্ত্তমান বটবৃক্ষের ছায়ায় স্থাপন করেন; একবার গাছটি পুড়িয়া গেলে দেবী বিদগ্ধজননী বা পোড়ামা নামে আখ্যাতা হন। নবদ্বীপের পল্লীমাতা বা পাড়ার মা সিদ্ধেশ্বরী কালী এখানকার সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন দেবতা। কথিত আছে একজন সিদ্ধপুরুষ ইঁহার প্রতিষ্ঠা করেন এবং বহু সাধক এই স্থানে সাধনা করিয়া সিদ্ধ হন। ইনি বিশেষ জাগ্রত বলিয়া খ্যাত।

কাশী বৃন্দাবনের ন্যায় নবদ্বীপে নিত্যই মহোৎসব লাগিয়া আছে। প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে এখানকার দেবমন্দিরগুলিতে কীর্ত্তন, পাঠ ও কথকতা প্রভৃতি হয়। নবদ্বীপের উৎসবের মধ্যে বৈশাখে চন্দন যাত্রা, শ্রাবণে ঝুলন, ভাদ্রে জন্মাষ্টমী, মাঘে ধুলোট ও ফাল্গুনে গৌর পূর্ণিমা বা দোলযাত্রা বিশেষ বিখ্যাত। মাঘী শুক্লা একাদশী হইতে ১২ দিন ধরিয়া ধুলোট মেলায় বাংলার সমস্ত প্রসিদ্ধ কীর্ত্তনিয়াগণ সদলবলে মিলিত হন। গৌর বা ফাল্গুনী পূর্ণিমায় চৈতন্য দেবের আবির্ভাব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ইহা ছাড়া প্রধান বৈষ্ণব মহান্তগণের মৃত্যু তিথিতে এবং গ্রহণ প্রভৃতি গঙ্গাস্নানের যোগে নবদ্বীপে দেশ বিদেশ হইতে বহু যাত্রীর সমাগম হয়। কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় বৃহৎ কালী মূর্ত্তি গড়িয়া পূজা ও দুইদিন ব্যাপী মেলা হয়। ইহা পট পূর্ণিমার মেলা নামে খ্যাত।

নবদ্বীপে যাত্রিগণের থাকিবার জন্য বহু ধর্ম্মশালা, যাত্রীনিবাস ও আখড়া আছে।

এখানকার ঢালাই করা দেব দেবীর মূর্ত্তির বিশেষ খ্যাতি আছে।

আদি নবদ্বীপের অবস্থান সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতদ্বৈধ আছে। কাহারও কাহারও মতে ভাগীরথীর গতি পরিবর্ত্তনের জন্য আদি নবদ্বীপ লুপ্ত হওয়ার ফলে বর্ত্তমান নবদ্বীপের প্রতিষ্ঠা হয় এবং আদি নবদ্বীপ বর্ত্তমান নবদ্বীপের নিকটে উত্তরদিকে একটি স্থানে এবং মতান্তরে গঙ্গার পরর্বতীরবর্ত্তী মায়াপুরে অবস্থিত ছিল। পূর্ববঙ্গ রেলপথের নবদ্বীপ ঘাট স্টেশন দ্রষ্টব্য।

নবদ্বীপ বাসী শ্রীচৈতন্য দেবের প্রিয় পার্ষদ ও কীর্ত্তনিয়া ছোট হরিদাস অধুনা ব্যবহৃত মৃদঙ্গ বা খোলের আবিষ্কর্ত্তা বলিয়া কথিত। ইনি একবার শিখি মাহাতির বৃদ্ধা ভগিনীর নিকট ভিক্ষা লইলে চৈতন্যদেব রুষ্ট হইয়া বলেন—

"বৈরাগী হইয়া করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন।।"

চৈতন্য চরিতামৃত।

হরিদাস দুঃখে ক্ষোভে প্রয়াগে ত্রিবেণী সঙ্গমে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন।

১৫৬৭ খৃষ্টাব্দে শ্রীনিবাস আচার্য্যের ভ্রাতুষ্পুত্রী নারায়ণীর পুত্র বৃন্দাবন দাস নবদ্বীপে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি নিত্যানন্দের বিশেষ ভক্ত ছিলেন। তাঁহার রচিত "চৈতন্য ভাগবত" ও "নিত্যানন্দ বংশমালা" প্রসিদ্ধ পুস্তক। প্রথমোক্ত গ্রন্থ চৈতন্য দেবের জীবনী সম্বন্ধীয় বাংলা ভাষায় একখানি মূল্যবান্ পুস্তক।

নবদ্বীপের সহুজে পাড়ায় সহজিয়া সম্প্রদায়ের একটি কেন্দ্র আছে। এই সম্প্রদায় বাউল সম্প্রদায়ের প্রকার ভেদ। ইহাদের বহু গুরু মানিতে বাধা নাই; ইহারা বলেন,

গুরু করব শত শত মন্ত্র করব সার।
মনের আঁধার যে ঘুচাবে দায় দিব তার।।

নবদ্বীপের মতিলাল রায়ের যাত্রার দল আধুনিক কালে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। তিনি বহু পালা রচনা করিয়াছিলেন এবং নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট হইতে কবিরত্ন উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

নবদ্বীপের নিকটস্থ পিরল্যা গ্রাম হইতে পিরালী ব্রাহ্মণগণের উৎপত্তি বলিয়া প্রবাদ আছে। পূর্ব্ব-বঙ্গ রেলপথের ঘাটগম্বজ রোড স্টেশন দ্রষ্টব্য।

নবদ্বীপের পার্শ্ববর্ত্তী বর্দ্ধমান জেলার আমাইপুরা গ্রামে ১৫১৩ খৃষ্টাব্দে স্মার্ত্ত রঘুনন্দন বংশীয় সুবুদ্ধি মিশ্রের পুত্র, "চৈতন্য মঙ্গল" প্রণেতা কবি জয়ানন্দের জন্ম হয়। চৈতন্য দেবই বাল্য কালে তাঁহাকে জয়ানন্দ নাম দেন। নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র ও গদাধর পণ্ডিতের অনুরোধে জয়ানন্দ "চৈতন্য মঙ্গল" রচনা করেন। ইহা একখানি বৈষ্ণব ইতিহাসের তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ। চৈতন্যদেবের অলৌকিক ভাবে তিরোধানের কাহিনী প্রচলিত থাকিলেও জয়ানন্দ লিখিয়াছেন যে কীর্ত্তন করিতে করিতে পায়ে ইষ্টকবিদ্ধ হইয়া তিনি শয্যাশায়ী হন ও আষাঢ়ের শুক্লা সপ্তমীতে পুরীধামে পরলোক গমন করিলে জগন্নাথ মন্দিরে প্রস্তরমধ্যে তাঁহাকে সমাহিত করা হয়। জয়ানন্দ "ধ্রুবচরিত্র" ও "প্রহলাদ চরিত্র" নামে দুখানি ক্ষুদ্র কাব্যও লিখিয়াছিলেন।

নবদ্বীপের পশ্চিমদিকে একডালা পরাণপুর নামক গ্রামে ইংরেজ রাজত্বের প্রথম যুগে মনোহর দাস নামে একটি দুর্দ্দান্ত ডাকাতের সর্দ্দার বাস করিত। তাহার সঙ্গী নয়না ও মানিকার সহিত নানাস্থানে অত্যাচার করিত; অবশেষে ধরা পড়িলে মনোহরের নির্ব্বাসন দণ্ড হয় এবং ক্লারিসা নামক জাহাজযোগে তাহাকে ব্রহ্মে পাঠান হয়। জাহাজ সমুদ্রে পড়িলে মনোহর অন্যান্য কয়েদীদের সহিত মিলিয়া বিদ্রোহী হয় এবং অতর্কিতে কাপ্তেন প্রভৃতিকে হত্যা করে; কয়েকজন দেশীয় খালাসীর প্রাণ রক্ষা পায় এবং তাহাদের সাহায্যে মনোহর জাহাজ লইয়া অন্যত্র পলাইতে থাকে। শেষে একখানি রণতরী আসিয়া তাহাদের ধরিয়া আকিয়বে লইয়া যায়। তথায় তাহাদের ফাঁসী হয়।

পূর্ব্বস্থলী—ব্যাণ্ডেল জংশন হইতে ৪৫ মাইল। আধুনিক কালের বিশিষ্ট পণ্ডিত, বহু গ্রন্থ ও ভাষ্য প্রণেতা কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন এখানকার অধিবাসী ছিলেন। ইনি ভারত ধর্ম্ম মহামণ্ডলের ব্যবস্থাপক পদে বৃত ও দ্বারভাঙ্গার মহারাজ কর্ত্তৃক "পণ্ডিতকুল চক্রবর্ত্তী" উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ইনি পরলোক গমন করেন।

পূর্ব্বস্থলীর নিকটবর্ত্তী জহ্নু নগরে পূর্ব্বে বহু মন্দির ও চতুষ্পাঠী ছিল। প্রবাদ জহ্নুমুনি এই স্থানে এক গণ্ডুষে গঙ্গাকে পান করিয়াছিলেন। প্রতি বৎসর ভাদ্র সংক্রান্তিতে এখানে বহুকাল হইতে ব্রাহ্মণী মেলা ও "গাছ পূজা" হইতেছে। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে ইহাকে ব্রাহ্মণী পজা বলা হইয়াছে। গাছ পূজার পদ্ধতি দেখিয়া অনেকে ইহা বৌদ্ধযুগ হইতে চলিয়া আসিতেছে মনে করেন।

পূর্ব্বস্থলীর পার্শ্বস্থ চুপীগ্রামে সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক অক্ষয় কুমার দত্ত মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়" নামক গ্রন্থ বাংলা ভাষার অমূল্য সম্পদ। ইঁহারই পৌত্র কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁহার অনুপম ছন্দ ঝঙ্কারে বাঙালীকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। "বেণু ও বীণা," "কুহু ও কেকা" "তীর্থ সলিল," "হোমশিখা" প্রভৃতি বহু কাব্য গ্রন্থ ইঁনি রচনা করিয়াছিলেন। ইঁহার বিখ্যাত কবিতা "আমরা বাঙ্গালী বাস করি এই তীর্থে বরদবঙ্গে" ইঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে।

পূর্ব্বস্থলী স্টেশন হইতে আন্দাজ ৬ মাইল পশ্চিমে মন্তেশ্বর থানায় শুক্রো বা শুরো বলিয়া যে গ্রাম আছে উহার প্রাচীন নাম শূরনগর বলিয়া কথিত। মহারাজ আদিশূরের বৃদ্ধাবস্থায় গৌড়ীয় বৌদ্ধগণ তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া পরম বৌদ্ধ গোপাল দেবকে সিংহাসনে বসাইলে আদিশূরের পুত্র ভূশূর গৌড় ত্যাগ করিয়া রাঢ়দেশে ব্রাহ্মণ রাজাদের সান্নিধ্যে শূরনগর স্থাপন করিয়া তথায় রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেন। ভূশূর ও তাঁহার পুত্র ক্ষিতিশূর ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে যত্নবান হন। ক্ষিতিশূর গৌড়ের বৌদ্ধ নৃপতি দেবপালের নিকট পরাজিত হইয়া তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করেন বলিয়া কথিত। শুকরোর ৩ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে রাইগাঁর সহিত মহারাজ আদিশূরের সম্বন্ধ ছিল বলিয়া কথিত। সমুদ্রগড় স্টেশন দ্রষ্টব্য।

পূর্ব্বস্থলী স্টেশন হইতে আন্দাজ ১১ মাইল পশ্চিমে শুক্রো ছাড়াইয়া মন্তেশ্বর থানার অন্তর্গত দেনুড় গ্রামে "চৈতন্য ভাগবত" প্রণেতা বৃন্দাবন দাস প্রতিষ্ঠিত একটি পুরাতন মন্দির আছে। বৈষ্ণবগণের নিকট উহা দেনুড় শ্রীপাট নামে পরিচিত।

অগ্রদ্বীপ—ব্যাণ্ডেল জংশন হইতে ৫৭ মাইল দূর। ইহা প্রাচীন নবদ্বীপের অন্তর্গত একটি পল্লী। এখানে চারি শত বৎসরের অধিককাল পূর্ব্বের প্রতিষ্ঠিত গোপীনাথ নামক এক বিগ্রহ আছেন। চৈতন্যদেবের অন্যতম পার্ষদ গোবিন্দ ঘোষ ঠাকুর এই বিগ্রহের প্রতিষ্ঠাতা। চৈতন্যদেব যখন গঙ্গাতীরের পথ দিয়া বৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করেন তখন গোবিন্দ ঘোষ তাঁহার সহচর ছিলেন। একদিন আহারের পর চৈতন্যদেব মুখশুদ্ধি চাহিলে গোবিন্দ নিকটস্থ এক গৃহস্থ বাটি হইতে একটি হরিতকী চাহিয়া আনিয়া উহার এক খণ্ড তাঁহাকে প্রদান করেন। পরদিন অগ্রদ্বীপে পৌছিয়া ভোজনান্তে চৈতন্যদেব গোবিন্দের নিকট পুনরায় মুখশুদ্ধি চাহিলে গোবিন্দ পূর্ব্ব দিনের সঞ্চিত হরিতকী খণ্ড তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ বাহির করিয়া দিলেন। ইহা দেখিয়া ঈষৎ হাস্য সহকারে চৈতন্যদেব বলিলেন, "গোবিন্দ, তোমার বিষয় বাসনা এখনও যায় নাই; বৃন্দাবনে তোমার যাওয়া হইবে না।" ইহাতে গোবিন্দ অতিশয় দুঃখিত ও কাতর হইয়া বলিলেন, "তোমার সেবা করিব বলিয়াই আমি গৃহ হইতে বাহির হইয়াছি, আমি তোমাকে ছাড়িয়া কিছুতেই এখানে থাকিব না।" তখন চৈতন্যদেব বলিলেন, "তুমি এখানে এক বিষ্ণুবিগ্রহ স্থাপন করিয়া তাঁহার সেবা কর, তাহা হইলে আমার সেবা করা হইবে।" শ্রীচৈতন্যদেবের কথা মত গোবিন্দ ঘোষ গোপীনাথ বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করেন। কথিত আছে যে গোবিন্দ ঘোষ ঠাকুরের অন্তিমকালে তাঁহার ভক্তগণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে তাঁহাদের মধ্যে কে তাঁহার শ্রাদ্ধের অধিকারী হইবেন। ইহাতে ঘোষ ঠাকুর উত্তর দেন যে গোপীনাথকে তিনি পুত্রবৎ স্নেহ করেন, গোপীনাথ দেবই তাঁহার শ্রাদ্ধের অধিকারী। আজিও প্রতি বৎসর চৈত্র মাসের কৃষ্ণা দ্বাদশী তিথিতে গোপীনাথ বিগ্রহকে শ্রাদ্ধোপযোগী বেশভূষায় সজ্জিত করা হয়। বারুণী উপলক্ষে অগ্রদ্বীপে বহু লোকের সমাগম হইয়া থাকে।

কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের অনুরূপ সাহেবধনী নামক সম্প্রদায়ের একটি উৎসব প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে অগ্রদ্বীপে অনুষ্ঠিত হয়। সাহেবধনী নামক একজন ফকিরের দুই জন হিন্দু ও এক জন মুসলমান শিষ্য মিলিয়া এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তন করেন।

দাঁইহাট—ব্যাণ্ডেল জংশন হইতে ৬১ মাইল। কথিত আছে, মহারাষ্ট্র বর্গীদলের নেতা ভাস্কর পণ্ডিত এই স্থানে ছাউনি করিয়া দুর্গা পূজা করিয়াছিলেন। বর্দ্ধমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা আবুরায় হইতে মহারাজ জগৎরাম রায়ের চিতাভস্ম এই স্থানে রক্ষিত আছে।

দাঁইহাট পূর্ব্বে একটি বিখ্যাত বন্দর ছিল। এখনও এই স্থানে পিতল ও কাঁসার বাসন এবং উত্তম তসরের কাপড় প্রস্তুত হইয়া থাকে। এখানকার ভাস্করগণ এখনও সুন্দর সুন্দর পাথরের দেবমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন।

এখানে একটি মিউনিসিপ্যালিটি আছে।

দাঁইহাটের নিকটবর্ত্তী নলাহাটি গ্রামে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত রুদ্ররাম তর্কবাগীশ নবদ্বীপ হইতে আসিয়া বাস স্থাপন করেন। তাঁহার সংস্কৃত গ্রন্থ "বৈশেষিক শাস্ত্রীয় পদার্থ নিরূপণ" ও রৌদ্রী" নামক টীকা গুলি প্রসিদ্ধ।

দাঁইহাট হইতে প্রায় দুই মাইল উত্তর-পূর্ব্বে ভাগীরথীর পূর্ব্বপারে নদীয়া জেলার মেটেরী গ্রামের রামমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এক খানি রামায়ণ রচনা করেন। ইহা ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে সমাপ্ত হয়।

কাটোয়া জংশন—ব্যাণ্ডেল জংশন হইতে ৬৫ মাইল দূর। ইহা বর্দ্ধমান জেলার অন্যতম মহকুমা। শহরটি ভাগীরথীর সহিত অজয়নদের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। মুসলমান আমলে কাটোয়া একটি বিখ্যাত বন্দর ছিল এবং শাসন কার্য্যের সুবিধার জন্য এখানে একটি দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই দুর্গের অনতিদুরে নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে ভাস্কর পণ্ডিত পরিচালিত মহারাষ্ট্রীয়দিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন। কিছুদিন এই দুর্গ মহারাষ্ট্রীয় দিগের অধিকারে ছিল। পলাশীর যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে ক্লাইভ এই দুর্গ অধিকার করিয়া তথায় ইংরেজ সৈন্যের সমাবেশ করেন এবং এখান হইতেই তিনি সিরাজউদ্‌দৌলার সহিত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন। এই দুর্গের ভগ্নাবশেষ এখন লোকালয়ে পরিণত হইয়াছে। কাটোয়ায় মুর্শিদকুলী খাঁ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত একটি বড় মসজিদ্ আছে।

কাটোয়া একটি প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব তীর্থ। শ্রীচৈতন্যদেব এই স্থানে দণ্ডী কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস দীক্ষা গ্রহণ করেন। বৈষ্ণব সাহিত্যের স্থানে স্থানে কাটোয়া "কন্টকনগর" নামে উল্লিখিত হইয়াছে। এখানে দাস গদাধর নামক চৈতন্যদেবের একজন অন্তরঙ্গ ভক্তের পাট অবস্থিত।

কাটোয়া হইতে ২ মাইল দূরে ঝামটপুর গ্রামে সুপ্রসিদ্ধ "চৈতন্যচরিতামৃত"-কার কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীপাট। অনুমান ১৫১৭ খৃষ্টাব্দে তিনি এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি চিরকাল অবিবাহিত ছিলেন। কথিত আছে, নিত্যানন্দের নিকট হইতে স্বপ্নাদেশ পাইয়া তিনি বৃন্দাবনে গমন করেন এবং তথায় বাংলায় "অদ্বৈত সূত্রকড়চা" "স্বরূপ বর্ণন," "রাগময়ী কণা" প্রভৃতি গ্রন্থ ও সংস্কৃতে "গোবিন্দ লীলামৃত" ও "কৃষ্ণকর্ণামৃতের" টীকা প্রভৃতি রচনা করেন। বৃন্দাবন দাস কৃত প্রামাণিক গ্রন্থ "চৈতন্য-ভাগবতে" শ্রীচৈতন্যদেবের অন্ত্যলীলা বিস্তারিত না থাকায় বৃন্দাবনের শ্রদ্ধেয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া ৮০ বৎসর বয়সে আরম্ভ করিয়া ৯ বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া কৃষ্ণদাস ১৬১৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার বিরাট্ গ্রন্থ "চৈতন্য চরিতামৃত" শেষ করেন। এই গ্রন্থে ১২০৫১টি শ্লোক আছে। গ্রন্থ শেষ হইলে জীব গোস্বামী প্রভৃতি প্রধান প্রধান বৈষ্ণবাচার্য্য-গণ ইহা অনুমোদন করিলে কৃষ্ণদাসের নিজ হস্ত লিখিত পুঁথি শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভৃতির তত্ত্বাবধানে গৌড়ে প্রেরিত হয়। পথে বন বিষ্ণুপুরে বীরহাম্বীরের লোক কর্ত্তৃক উহা অপহৃত হয়; এই সংবাদ পাইয়া বৃদ্ধ কৃষ্ণদাস বৃন্দাবনে শোকে ও হতাশায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন এবং তদবস্থাতেই প্রাণত্যাগ করেন। বাংলা-নাগপুর রেলপথের বিষ্ণুপুর স্টেশন দ্রষ্টব্য।

কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী ইন্দ্রেশ্বর বা ইন্দ্রাণী অতি প্রাচীন স্থান। প্রবাদ যে দেবরাজ ইন্দ্র এই স্থানে গঙ্গাস্নান করেন বলিয়া স্থানের নাম ইন্দ্রেশ্বর বা ইন্দ্রাণী হয়। এ বিষয়ে কৃত্তিবাসী রামায়ণে আছে—

"নিমেষেতে আইলেন গ্রাম ইন্দ্রেশ্বর।
গঙ্গা লয়ে ভগীরথ চলিল সত্বর।।
গঙ্গা জলে যথা ইন্দ্র করিলেন স্নান।
ইন্দ্রেশ্বর বলি নাম হইল সে স্থান।।"

ইন্দ্রেশ্বর বা ইন্দ্রাণীতে পূর্ব্বে বারটি ঘাট ছিল এবং উহার প্রত্যেকটি তীর্থরূপে গণ্য হইত। কাশীরাম দাসের মহাভারতে আছে—

"ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ পূর্ব্বাপর স্থিতি।
দ্বাদশ তীর্থেতে যথা বৈসে ভাগীরথী।।"

বর্ত্তমানে ইন্দ্রাণী একটি পরগণার নাম। ইন্দ্রাণীর অন্তগত সিঙ্গিগ্রাম বাংলা মহাভারত প্রণেতা মহাকবি কাশীরাম দাসের জন্মস্থান। প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বে দেব উপাধিধারী এক কায়স্থবংশে কাশীরাম জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম কমলাকান্ত দেব; কমলাকান্তের তিন পুত্র, কৃষ্ণদাস, কাশীরাম ও গদাধর। এই তিন ভ্রাতাই কবিত্বশক্তিসম্পন্ন ছিলেন। কৃষ্ণদাস "শ্রীকৃষ্ণ বিলাস" নামক কাব্য রচনা করেন, তাঁহার গুরুদত্ত নাম ছিল শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর। কাশীরামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধর জগন্নাথদেবের মাহাত্ম্য প্রকাশক "জগন্নাথ মঙ্গল বা জগৎ মঙ্গল" নামে এক কাব্য রচনা করেন। অনেকে অনুমান করেন যে কাশীরাম মহাভারতের আদি, সভা, বন এবং বিরাট পর্ব্বের কতকাংশ রচনা করিবার পর পরলোক গমন করেন। বিরাট অষ্টাদশপর্ব্ব মহাভারতের অবশিষ্ট ভাগ তদীয় সুযোগ্য পুত্র নন্দরামের রচনা। নন্দরাম পিতার আরব্ধ কার্য্য পিতার নামের ভনিতা দিয়াই সমাপন করেন। সিঙ্গিগ্রামের এই দেব বংশের মত একই বংশে একই সময়ে এতগুলি প্রতিভাসম্পন্ন কবির আবির্ভাব বড় একটা দেখা যায় না। সিঙ্গিগ্রামে এখনও "কাশীর ভিটা" ও কেশে-পুকুর কবির স্মৃতি বহন করিতেছে।

কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী সীতাহাটি গ্রামে প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বে মহারাজ বল্লালসেনের একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয়। উহা কলিকাতা যাদুঘরে রক্ষিত আছে। এই তাম্রশাসন খানির দ্বারা বল্লালসেন রাজমাতা বিলাস দেবীর সূর্য্যগ্রহণ কালীন হোমাশ্ব মহাদানের দক্ষিণা স্বরূপ বর্দ্ধমান ভুক্তির অন্তগত উত্তর রাঢ়া মণ্ডলের বাল্লহিট্ট গ্রাম সামবেদী শ্রীবাসুদেব শর্ম্মাকে দান করেন।

কাটোয়ার নিকটস্থ খাজুর ডিহি গ্রামে বাংলার প্রথম "বঙ্গাধিকারী" ভগবান্ রায় জন্মগ্রহণ করেন। পূর্ব্ব-বঙ্গ রেলপথের মুর্শিদাবাদ স্টেশন দ্রষ্টব্য।

কাটোয়ার নিকটস্থ যাজিগ্রামে সুপ্রসিদ্ধ শ্রীনিবাস আচার্য্যের মাতুলালয় ছিল। নদীয়া জেলার চাকন্দী গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়; তথায় কিছুকাল সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া তিনি যাজিগ্রামে আসিয়া বাস করেন; তথা হইতে তিনি বৃন্দাবনে গিয়া শাস্ত্র অধ্যয়ন ও দীক্ষা গ্রহণ করিয়া আচার্য্য উপাধি লাভ করেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজের "চৈতন্য চরিতামৃত" শেষ হইলে সেই গ্রন্থ লইয়া গৌড়ে আসা কালীন বনবিষ্ণুপুরে রাজা বীর হাম্বীরকে দীক্ষা দিয়া যাজিগ্রামে ফিরিয়া আসেন ও ধর্ম্মচর্চ্চাতে আত্মনিয়োগ করেন।

কাটোয়া একটি জংশন স্টেশন। ইহা বৰ্দ্ধমান-কাটোয়া ও আহম্মদপুর-কাটোয়া নামক ছোট মাপের লাইট রেলওয়ে রেলপথের সংযোগস্থল।

কাটোয়া হইতে বৰ্দ্ধমানের দিকে এই রেলপথে শ্রীখণ্ড, কৈচর ও নিগন উল্লেখযোগ্য স্টেশন। কাটোয়া জংশন হইতে শ্রীখণ্ড ৫ মাইল দূর। ইহা একটি বৰ্দ্ধিষ্ণু ভদ্রপল্লী ও প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব শ্রীপাট। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রিয় পার্ষদ নরহরি সরকার ঠাকুর এবং অনুরক্ত ভক্ত রঘুনন্দন ও মুকুন্দ শ্রীখণ্ডের অধিবাসী ছিলেন। "নরহরি গৌর-লীলার পদ রচনার প্রবর্ত্তক বলিয়া বৈষ্ণব সমাজে আদৃত।" এই স্থানে সরকার ঠাকুরের শ্রীপাটে গৌরাঙ্গদেবের বিগ্রহের নিত্য পূজা হয়। নরহরি নাগরীভাবের উপাসক ছিলেন। কবি কর্ণপুর তৎকৃত গৌরগণোদ্দেশ দীপিকায় নরহরিকে ব্রজের মধুমতী সখীর অবতার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। প্রতি বৎসর কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণা-দ্বাদশী তিথিতে নরহরি সরকার ঠাকুরের তিরোভাব উপলক্ষে শ্রীখণ্ডে "মধুমতী উৎসব" নামে একটি মেলা হয়। ১৪৭৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম ও ১৫৪৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। শ্রীখণ্ড পণ্ডিতপ্রধান স্থান।

কাটোয়া জংশন হইতে কৈচর ১০ মাইল দূর। এই স্থানে নামিয়া ৩ মাইল দূরবর্ত্তী পীঠস্থান ক্ষীরগ্রামে যাইতে হয়। ক্ষীরগ্রামে দেবীর দক্ষিণ চরণের অঙ্গুষ্ঠ পড়িয়াছিল, দেবীর নাম যোগদ্যা, ভৈরব ক্ষীরখণ্ডক। দেবীপ্রতিমা সারা বৎসর ধরিয়া একটি দীঘির জলে ডুবানো থাকে। বৈশাখ-সংক্রান্তির দিন জল হইতে দেবীকে তুলিয়া মহাসমারোহে পূজা করা হয় ও তদুপলক্ষে একটি মেলা বসে। যোগদ্যার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বহু কিংবদন্তী আছে। কথিত আছে একবার দেবী যোগাদ্যা একটি কুমারীর বেশ ধারণ করিয়া জনৈক শাঁখারির নিকট হইতে শাঁখা পরিধান করেন এবং পরে জলমধ্যে হইতে শঙখশোভিত হস্ত উত্তোলন করিয়া শাঁখারি ও স্থানীয় ধনী সেবাইতকে উহা দেখান। এই কাহিনী অবলম্বনে বিখ্যাত মহিলা কবি তরু দত্তের একটি সুন্দর ইংরেজী কবিতা আছে। প্রবাদ পূৰ্ব্বে যোগদ্যার পূজার দিন প্রতি বৎসর তাঁহার নিকট একটি করিয়া নরবলি হইত।

কাটোয়া জংশন হইতে নিগন ১৩ মাইল দূর। এখানে নামিয়া ৫ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত বৰ্দ্ধমান জেলার অন্যতম প্রাচীন স্থান মঙ্গলকোটে যাইতে হয়। মঙ্গলকোটে কয়েকজন মুসলমান ফকীরের সমাধি ও কয়েকটি পুরাতন মসজিদ আছে। এই ফকিরগণের মধ্যে পীর দানেশমন্দের নাম উল্লেখযোগ্য। ইঁহার মৃত্যু তিথি বা উর্স্ উপলক্ষে মঙ্গলকোটে মুসলমানদের একটি মেলা হয়। মঙ্গলকোটের নিকটবর্ত্তী উজানি গ্রাম শ্রীমন্ত সদাগরের জন্মস্থান বলিয়া কথিত। পূৰ্ব্বকালে এখানে বিক্রমকেশরী নামে এক রাজা ছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে। এখানে পীঠস্থানও আছে। উজানিতে সতীর দক্ষিণ কনুই পড়িয়াছিল, দেবীর নাম সৰ্ব্বমঙ্গলা, ভৈরব কপিলাম্বর। সৰ্ব্বমঙ্গলা বা মঙ্গলচণ্ডীর মূর্ত্তি পিত্তল নির্ম্মিত, দেবী দশভূজসমন্বিতা ও সিংহবাহিনী; কপিলাম্বর ভৈরব পলতোলা কষ্টি পাথরের দ্বারা নির্ম্মিত। উজানির মহাশ্মশানের এক পার্শ্বে খড়গমোক্ষণ নামে একটি তীর্থ আছে। প্রবাদ, বেতালসিদ্ধ রাজা বিক্রমাদিত্য জনৈক সন্ন্যাসীর শিরশ্ছেদ করায় তাঁহার হস্তে খড়গ আবদ্ধ হইয়া যায়। বহু তীর্থ ভ্রমণের পর উজানির মহাশ্মশানে আসিয়া তাঁহার হস্ত হইতে খড়গ খসিয়া পড়ে। সেই হইতে এই স্থানের নাম হয় খড়গমোক্ষণ তীর্থ। এখানে প্রতি বৎসর পৌষ সংক্রান্তিতে মেলা হয়। উজানিতে "ভ্রমরার দহ" ও "শ্রীমন্তডাঙ্গা" প্রভৃতি প্রাচীন স্থানও বিশেষ দ্রষ্টব্য। উজানির নিকটবর্ত্তী কোগ্রাম বিখ্যাত "চৈতন্য মঙ্গল"

প্রণেতা লোচন দাসের জন্মস্থান। লোচন দাসের সমাজ বা সমাধির আকৃতি ছোট পিরামিডের মত। এখানকার গৌর-নিতাইএর মন্দির বৈষ্ণবগণের বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থান। "চৈতন্য মঙ্গল" ছাড়া লোচন দাস "আনন্দ লতিকা" ও "দুর্লভসার" নামে আরও দুইখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

কাটোয়া হইতে আহম্মদপুরের দিকে কাটোয়া হইতে ১০ মাইল দুর নিরোল স্টেশনের এক মাইল দক্ষিণে কেতুগ্রাম একটি পীঠস্থান। এই স্থানের প্রাচীন নাম বহুলা। এখানে দেবীর বাম পদ পতিত হইয়াছিল। দেবী বহুলা ও ভৈরব ভীরুক এখানে নিত্য পূজিত হন। কাটোয়া হইতে এই লাইনে বীরভূম জেলার অন্তর্গত লাভপুর স্টেশন ২৫ মাইল দূর। লাভপুরও একটি মহাপীঠ। এখানে দেবীর অধঃওষ্ঠ পড়িয়াছিল, দেবীর নাম ফুল্লরা, ভৈরব বিশ্বেশ। দেবীর কোন বিগ্রহ নাই, প্রায় দশ বার হাত বিস্তৃত একখানি শিলাখণ্ড দেবীর ওষ্ঠরূপে পূজিত হয়। এই স্থানে তান্ত্রিকমতে শিবাভোগ দেওয়া হয়। ভোগ দিবার সময়ে "রূপী স্থুপী" বলিয়া ডাকিলে বহু শৃগাল পালিত পশুর ন্যায় আহারের জন্য জঙ্গল হইতে আসিয়া থাকে। মন্দিরের পার্শ্বে দলদলি নামক একটি মজা দীঘি আছে। প্রবাদ রামচন্দ্র যখন অকালে দুর্গা পূজা করেন তখন এই দেবী দহ হইতেই নাকি নীলোৎপল লইয়াছিলেন। লাভপুর একটি বর্দ্ধিষ্ণু ভদ্রপল্লী। এখানে বন্দ্যোপাধ্যায় উপাধিধারী একঘর জমিদারের বাস। লাভপুরের দুই মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে দুবসো গোপালপুর নামে একটি গ্রাম আছে। প্রবাদ, এই স্থানে দুর্ব্বাসা ঋষির আশ্রম ছিল এবং ইহা হইতেই গ্রামের নাম দুবসো গোপালপুর হইয়াছে।

সালার—ব্যাণ্ডেল জংশন হইতে ৭৬ মাইল। স্টেশন হইতে ৩ মাইল পূর্ব্বদিকে কাগ্রাম পুরাতন কঙ্কগ্রাম নগর বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। পূর্ব্বকালে অজয় ও ভাগীরথীর মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ কঙ্কগ্রামভুক্তি নামে অভিহিত হইত। ইহারই প্রধান নগর কঙ্কগ্রাম চৈনিক পরিব্রাজক য়ুয়ান চোয়াং বর্ণিত কাজঙ্গল বলিয়া অনুমিত হয়। তিনি এ অঞ্চলে অনেক মন্দির ও বিহার দেখিয়াছিলেন, এগুলি সম্ভবতঃ এখনও মাটির নীচে গুপ্ত হইয়া আছে।

মালিহাটী হল্‌ট্—ব্যাণ্ডেল জংশন হইতে ৭৮ মাইল। মালিহাটী বা মেলেটি প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা যদুনন্দন দাসের জন্মস্থান। পূর্ব্ব-বঙ্গ রেলপথের বহরমপুর স্টেশন দ্রষ্টব্য।

বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শ্রীনিবাস আচার্য্যের প্রপৌত্র রাধামোহন ঠাকুরও খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে এই গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তৎকালে তাঁহার ন্যায় পণ্ডিত বৈষ্ণব সমাজে আর কেহ ছিলেন না। একবার ভক্ত বৈষ্ণব জয়পুররাজ জয়সিংহের সভায় বৃন্দাবনস্থ গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের সহিত পশ্চিম দেশীয় বৈষ্ণবগণের পরকীয়া ও স্বকীয়া মত লইয়া বিচার হয়। গৌড়ীয়গণের পরাজয় ঘটিলে তাঁহারা এই বিচার বাংলা দেশের পণ্ডিতগণের সহিত করিয়া শেষ সিদ্ধান্ত করিতে অনুরোধ করেন। রাজা তখন বিচারে জয়ী স্বকীয়া মতাবলম্বী নিজ সভাসদ্ কৃষ্ণদেব ভট্টাচার্য্যকে বাংলায় প্রেরণ করেন। পথিমধ্যে প্রয়াগ বারাণসী প্রভৃতি স্থানে নিজ মত প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি শ্রীখণ্ড ও যাজিগ্রামে উপস্থিত হইলে, বৈষ্ণব পণ্ডিতগণ রাধামোহনের সহিত বিচার প্রার্থনা করিলেন। নবাব মুর্শিদ কুলী খাঁ এই বিচারের অনুমতি প্রদান করেন এবং নবদ্বীপ, ওড়িষ্যা বারাণসী প্রভৃতি স্থানের পণ্ডিতগণ সভায় আগমন করেন। কৃষ্ণদেব রাধামোহনের নিকট পরাজিত হইয়া পরকীয়া মত অবলম্বন করিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থানে গিয়া এই মতের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৭১৮ খৃষ্টাব্দে এই বিচার হইয়াছিল। ইহা ছাড়া রাধামোহনের নাম বৈষ্ণব-পদাবলী সংগ্রাহক

হিসাবে স্মরণীয় থাকিবে। আউল মনোহর দাসের পদাবলীর প্রথম ও বিরাট সংগ্রহ "পদ সমুদ্রের" পর রাধামোহন ঠাকুরের "পদামৃত সমুদ্র" সঙ্কলিত হয়; ইহার ৮৫২টি পদের মধ্যে ৪00টি রাধামোহনের নিজের। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রাধামোহন ঠাকুরের প্রিয় শিষ্য গোকুলানন্দ সেন বা বৈষ্ণবদাস তাঁহার প্রসিদ্ধ সংগ্রহ "পদ কল্পতরু" সঙ্কলন করেন; ইহাতে ৩১০১টি পদ আছে। এই গ্রন্থে বৈষ্ণবদাস তাঁহার গুরু রাধামোহন ঠাকুরকে অদ্বৈতাচার্য্যের দ্বিতীয় প্রকাশ বলিয়াছেন। পদাবলী সংগ্রহ গুলির মধ্যে পদকল্পতরুই সচরাচর ব্যবহারের পক্ষে প্রকৃষ্ট।

হালিহাটী হইতে ৫ মাইল পশ্চিমে ভরতপুর থানা, এই থানার অন্তর্গত কাঞ্চনগড়িয়া গ্রামে চৈতন্যদেবের পরম ভক্ত হরিদাস আচার্য্যের জন্মস্থান। চৈতন্যদেবের তিরোভাবে হরিদাস অত্যন্ত আঘাত পান এবং শীঘ্রই মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার মৃত্যু তিথিতে সুপ্রসিদ্ধ শ্রীনিবাস আচার্য্য কাঞ্চনগড়িয়ায় আসিয়া একটি বিরাট উৎসব সমাধান করিয়াছিলেন।

চিরতী—ব্যাণ্ডেল জংশন হইতে ৯৪ মাইল। স্টেশন হইতে দেড় মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে ভাগীরথীর পশ্চিম কূলে রাঙ্গামাটি নামে একটি প্রাচীন স্থানের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। নদীর অপর পারে পূর্ব্ব-বঙ্গ রেলপথে অবস্থিত বহরমপুর শহর এখান হইতে ৬ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত। এই স্থানের মৃত্তিকা কঠিন ও রক্তাভ। গঙ্গার ভাঙ্গনে ইহার অধিকাংশ স্থান বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। এখনও এখানে যে সকল উচ্চ ভূখণ্ড ও ঢিবি আছে তাহা ভগ্ন মৃৎপাত্র ও পুরাতন ইষ্টকাদির দ্বারা পরিপূর্ণ। বর্ত্তমানে এই স্থানের নিম্নে এক বিস্তৃত চর পড়িয়াছে এবং পুরাতন খাত পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গা প্রায় এক মাইল দূরে নূতন খাত দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। যৎকালে গঙ্গার ভাঙ্গনে রাঙ্গামাটি ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল, সেই সময়ে অনেকগুলি বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর খণ্ড, গৃহের ছাদ ও খিলান ও নানাপ্রকার ধাতুনির্ম্মিত দ্রব্যাদি গঙ্গাগর্ভে পতিত হইয়াছিল। এককালে যে এখানে একটি বৃহৎ সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল তাহা ইহার বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়াও বুঝিতে পারা যায়।

ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন যে চৈনিক পর্য্যটক য়ুয়ান্ চোয়াঙের বর্ণিত কর্ণসুবর্ণ রাজ্যের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ নগরী এই স্থানেই অবস্থিত ছিল। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে য়ুয়ান্ চোয়াঙ কর্ণসুবর্ণ রাজধানীর নিকট "লো-টো-বী-চী" বা রক্তভিত্তি নামে বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম দেখিয়াছিলেন বলিয়া তাহার ভ্রমণ বৃত্তান্তে বর্ণিত আছে। "রক্তভিত্তি" বা "রক্তমৃত্তি" নাম হইতেই রাঙামাটি নাম হইয়াছে, অনেকে এইরূপ অনুমান করেন। কর্ণসুবর্ণের সহিত রাঙামাটির সম্বন্ধের বা অভিন্নত্বের প্রমাণ স্বরূপ আরও বলা হয়, যে পূর্ব্বে এই স্থান কানসোণা নামেও অভিহিত হইত। কানসোণা নামটি যে কর্ণসুবর্ণ নামেরই অপভ্রংশ তাহা বোধ হয় বলার অপেক্ষা রাখে না। য়ুয়ান্ চোয়াং লিখিয়াছেন যে কর্ণসুবর্ণ রাজ্যের পরিধি প্রায় তিনশত মাইল ও রাজধানী প্রায় চারি মাইল বিস্তৃত ছিল। এখানকার জলবায়ু অতি স্বাস্থ্যকর ছিল এবং অধিবাসীরা অর্থশালী, বিদ্যানুরাগী ও ভদ্র-ব্যবহার সম্পন্ন ছিলেন। কর্ণসুবর্ণ রাজ্যে ৩0টি সঙ্ঘারামে সম্মতীয় সম্প্রদায়ের প্রায় দহাজার বৌদ্ধ ভিক্ষু ছিলেন। তাহা ছাড়া দেবদত্ত সম্প্রদায়ের তিনটি সঙ্ঘারাম ছিল; তথায় দুগ্ধ বা দুগ্ধ হইতে প্রস্তুত খাদ্য নিষিদ্ধ ছিল। এখানে নানা ধর্ম্মের লোক বাস করিতেন এবং ৫0টি হিন্দু মন্দির ছিল। রাজধানীর অন্তঃপাতী "রক্তমৃত্তি" বিহারে দেশ বিদেশ হইতে বহু বৌদ্ধ পণ্ডিতের সমাবেশ হইত। এই সঙ্ঘারামের উচ্চ চূড়া রাত্রিকালে আলোক মণ্ডিত করা হইত। ইহা ছাড়া রাজধানীতে অশোক প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি চৈত্যও য়ুয়ান্ চোয়াঙ দেখিয়াছিলেন। য়ুয়ান্ চোয়াঙের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে মহারাজ শশাঙ্কের বহু পূর্ব্ব হইতেই রাঙ্গমাটি একটি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধকেন্দ্র ছিল। য়ুয়ান

ভাণ্ডেশ্বর শিবের মন্দির (পৃষ্ঠা ৮৭)
[প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সৌজন্যে]

মধুপুর অঞ্চলের সাধারণ দৃশ্য (পৃষ্ঠা ৯০)
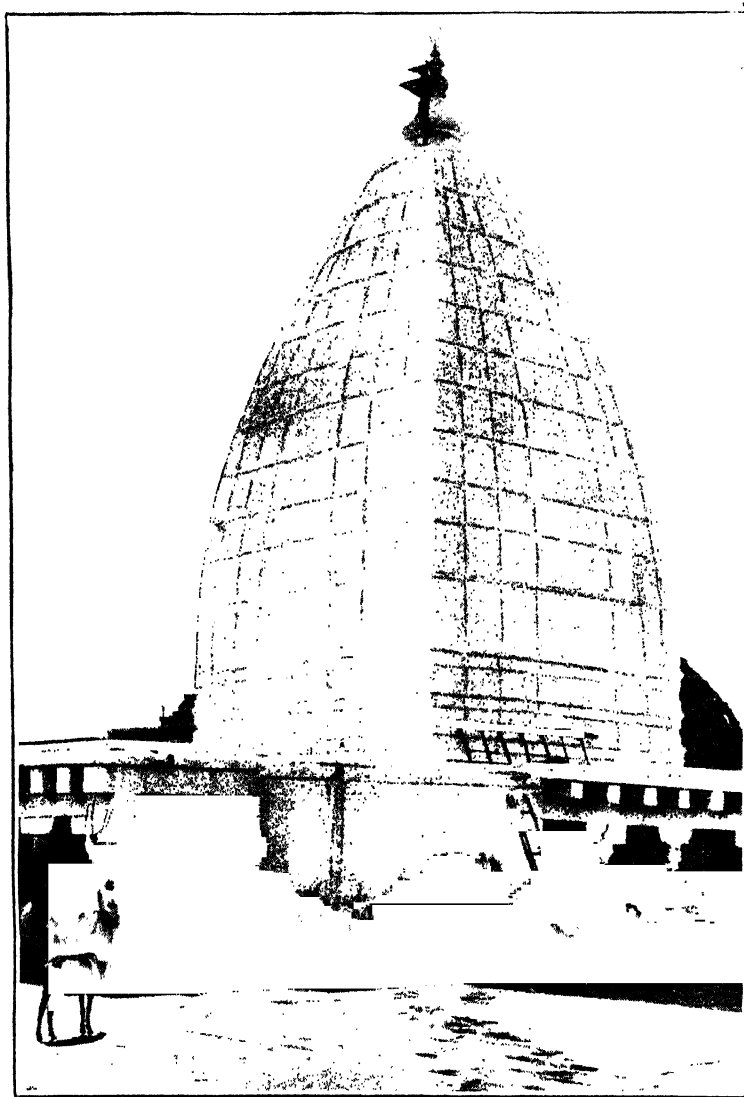
বৈদ্যনাথদেবের মন্দির (পৃষ্ঠা ৯০)

গোপীনাথ মন্দির, কুলীন গ্রাম (পৃষ্ঠা ৯২
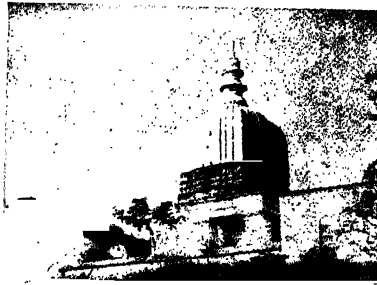
জলেশ্বর মন্দির, জৌগ্রাম (পৃষ্ঠা ৯৩)
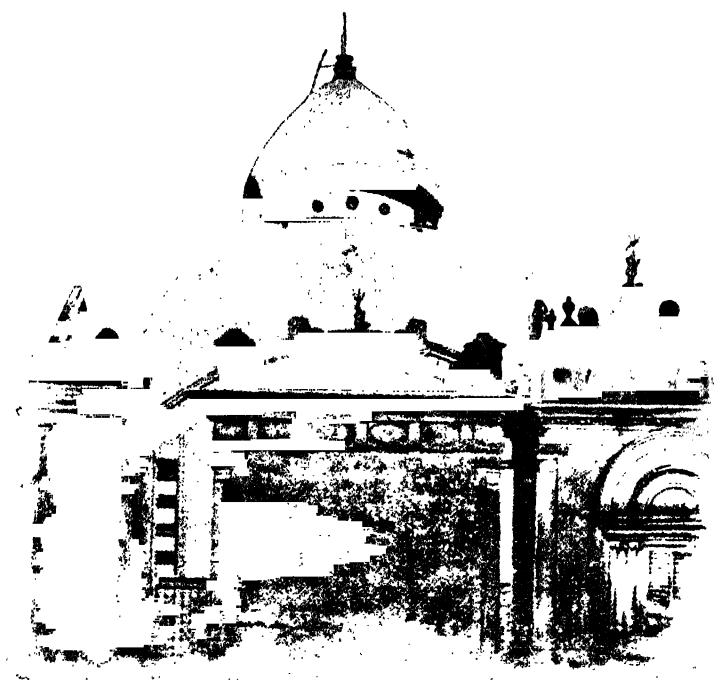
তারকেশ্বরের মন্দির (পৃষ্ঠা ৯৪)

হংসেশ্বরী মন্দির, বংশবাটী (পৃষ্ঠা ৯৬)

বাসুদেব মন্দির, বংশবাটী (পৃষ্ঠা ৯৬)
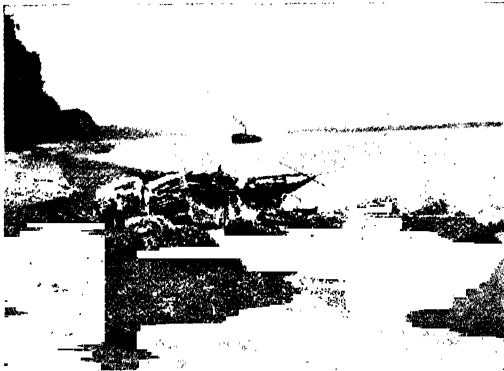
প্রাচীন ঘাট, ত্রিবেণী, (পৃষ্ঠা ৯৭)
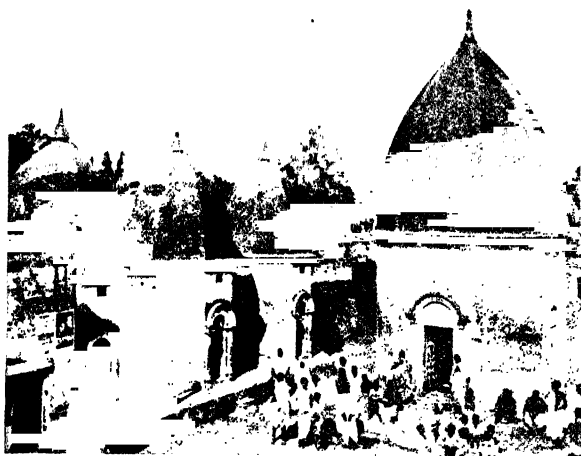
বেণীমাধবের মন্দির, ত্রিবেণী (পৃষ্ঠা ৯৭)

বৃন্দাবন চন্দ্রের মন্দির, গুপ্তিপাড়া (পৃষ্ঠা ৯৮)

[প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সৌজন্যে]

পোড়া মা তলা, নবদ্বীপ (পৃষ্ঠা ১০৪)

সর্ব্বমঙ্গলা, উজানি (পৃষ্ঠা ১১০)
[প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সৌজন্যে]
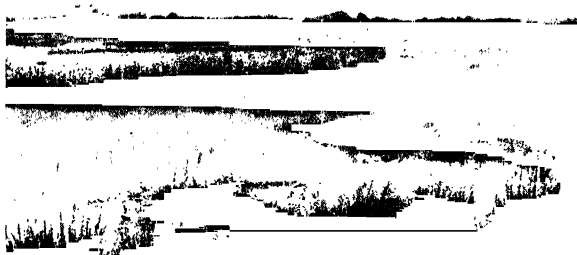
রাঙামাটীর ধ্বংসাবশেষ (পৃষ্ঠা ১১২)
[প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সৌজন্যে]

চোয়াঙ লিখিয়াছেন যে রক্তমৃত্তি সঙ্ঘারামের পার্শ্বে একটি অশোকস্তূপ ছিল এবং সেই স্থানে বুদ্ধদেব সপ্তাহকাল ধরিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া এই নগরীতে আরও কতকগুলি অশোক স্তূপও ছিল।

কর্ণসুবর্ণ নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে জনশ্রুতি, যে এই স্থানে দাতাকর্ণের রাজধানী ছিল। তাঁহার পুত্র বৃষসেনের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে স্বর্ণলঙ্কার অধিপতি রাক্ষসরাজ বিভীষণ নিমন্ত্রিত হইয়া এই স্থানে আগমন করেন। তিনি শিশুর কল্যাণ কামনায় এই স্থানে স্বর্ণবৃষ্টি করায় ইহার মৃত্তিকা রক্তবর্ণাভ হয় এবং তজ্জন্য উহার নাম কর্ণসুবর্ণ ও রাঙ্গামাটি হয়। এই স্থানের অদূরবর্ত্তী গোকর্ণ নামক স্থানে কর্ণের গোশালা ছিল বলিয়া প্রবাদ আছে।

রাঙ্গামাটির বেশীর ভাগ স্থানই গঙ্গাসাৎ হইয়াছে। ঠাকুরবাড়ী ডাঙ্গা, রাক্ষসী ডাঙ্গা ও রাজবাড়ী ডাঙ্গা নামক কতিপয় ডাঙ্গা বা উচচভূমি এখনও অতীতের সাক্ষ্যস্বরূপ বর্ত্তমান আছে। ঠাকুরবাড়ী ডাঙ্গা নামক স্থানটিতে পূর্ব্বে একটি প্রকাণ্ড শিবমন্দির ছিল বলিয়া কথিত। রাজবাড়ী ডাঙ্গায় রাজপ্রাসাদ অবস্থিত ছিল। রাক্ষসী ডাঙ্গাটি একটি ছোট পাহাড়ের ন্যায় উচচ ও অসংখ্য ইষ্টক ও প্রস্তরাদির দ্বারা পরিপূর্ণ। ইহার পাদমূলে অবস্থিত একটি বটবৃক্ষের নীচে একখানি পর্ণকুটিরের মধ্যে পীর তুর্কাণ সাহেব নামে একজন মুসলমান সাধুর সমাধি আছে। প্রবাদ, রাক্ষসী ডাঙ্গায় এক রাক্ষসী বাস করিত। তাহার সহিত তর্ক করিবার জন্য রাজাকে প্রত্যহ একজন করিয়া পণ্ডিত পাঠাইতে হইত। পণ্ডিতেরা তর্কে পরাস্ত হইলে রাক্ষসী তাঁহাদিগকে ধরিয়া খাইয়া ফেলিত। অবশেষে পীর তুর্কান সাহেব রাক্ষসীকে তর্কযুদ্ধে পরাজিত করিয়া নিহত করেন। পীর সাহেবের ইচ্ছানুসারে তাঁহার মৃত্যুর পর এই স্থানে তাঁহার দেহ সমাহিত করা হয়। তাঁহার কবরে ইষ্টক সংযোগ করিবার আদেশ না থাকায় উহার উপর একখানি চালাঘর নির্ম্মিত হয়। রাজবাড়ী ডাঙ্গার দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে সন্ন্যাসী ডাঙ্গা নামে একটি উচচ স্তূপ আছে। অনেকে অনুমান করেন রক্তমৃত্তি সঙ্ঘারাম এই খানেই অবস্থিত ছিল। পীরপুকুর, যমুনা পুষ্করিণী প্রভৃতি নামধেয় কতকগুলি পুরাতন পুকুর রাঙ্গামাটিতে দেখিতে পাওয়া যায়। যমুনা পুষ্করিণী হইতে একটি বৃহৎ প্রস্তর নির্ম্মিত ভগ্ন অষ্টভুজা মহিষ মর্দ্দিনী মূর্ত্তি আবিস্কৃত হইয়াছিল। বর্তমানে ঐ মূর্ত্তিটি রাঙ্গামাটির রেশমকুঠির নিকট এক বট বৃক্ষতলে রক্ষিত আছে। দেবী প্রতিমার মুখ মণ্ডল ভগ্ন হওয়ায় দরুণ বিকৃত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু পদতলস্থ মহিষটি সম্পূর্ণ অভগ্ন অবস্থায় আছে। ঠাকুরবাড়ী ডাঙ্গা যখন ভাঙ্গিয়া গঙ্গার মধ্যে পড়ে তখন উহা হইতে এক খানি স্বর্ণ প্রতিমা আবিস্কৃত হইয়াছিল। জনৈক লোক উহা পাইয়া আত্মসাৎ করে। প্রতিমাটি লক্ষ্মী প্রতিমা বলিয়া অনেকের অনুমান। কুষাণ ও গুপ্তযুগের বহুমুদ্রা এখানে পাওয়া গিয়াছে।

খাগড়াঘাট রোড—ব্যাণ্ডেল জংশন হইতে ১৩৭ মাইল দূর। এই স্থানে নামিয়া খেয়া নৌকায় গঙ্গা পার হইয়া বহরমপুরের শহরতলী খাগড়া বাজারে যাওয়া যায়। পূর্ব্ব-বঙ্গ রেলপথের বহরমপুর স্টেশন দ্রষ্টব্য।

খাগড়া ঘাট রোড স্টেশন হইতে ৬ মাইল পশ্চিমে তেলকর বিলের উপর অমরকুণ্ড গ্রামে গঙ্গাদিত্য নামে অশ্বারূঢ় একটি প্রাচীন সূর্য্য মূর্ত্তির মন্দির আছে। তেলকর বিল পূর্ব্বে গঙ্গার খাত ছিল বলিয়া অনুমিত হয় এবং সেই সময়ে সম্ভবতঃ সূর্য্য মূর্ত্তিটি প্রতিষ্ঠিত হইয়া গঙ্গাদিত্য নাম

প্রাপ্ত হয়। এই স্টেশন হইতে মোটরবাসযোগে ১৬ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে মুর্শিদাবাদ জেলার অন্যতম মহকুমা কান্দীতে যাইতে হয়। এই শাখা পথের চৌরীগাছা স্টেশন হইতে কান্দী ৮ মাইল পশ্চিমে। কান্দী শহর ময়ূরাক্ষী নদীর পূর্ববতীরে অবস্থিত। সুপ্রসিদ্ধ দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ও তাঁহার পৌত্র লালাবাবু কান্দী শহরের অধিবাসী ছিলেন। তাঁহাদিগের বাটী কান্দীর রাজবাটী নামে পরিচিত। গঙ্গাগোবিন্দ ওয়ারেন হেষ্টীংসের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিলেন। লালাবাবু সংসার ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে ধর্ম্ম সাধনায় কাটাইয়াছিলেন। রাজবংশের প্রতিষ্ঠিত রাধাবল্লভজীউ বিগ্রহ এ অঞ্চলে বিশেষ প্রসিদ্ধ। রাসযাত্রার মেলার সময়ে এখানে মহাসমারোহ ও বহুলোকসমাগম হয়। কথিত আছে রাধাবল্লভ জীউর পূজাদির দৈনিক খরচ ৫০০৲ টাকা ছিল। কান্দীর দক্ষিণাকালীর মন্দির প্রাঙ্গণে দুর্গাপূজার পর চতুর্দ্দশী তিথিতে বিশেষ ধুমধাম হয়। কান্দীর রাজবংশীয়গণ অনেকদিন কলিকাতার উপকণ্ঠে পাইকপাড়ায় বাস করিতেছেন বলিয়া তাঁহারা পাইকপাড়ার রাজা নামে খ্যাত।

কান্দী মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত জেমো একটি পুরাতন পল্লী। স্বনামধন্য আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এখানে রুদ্রদেব নামে এক শিব আছেন। এই শিব প্রাচীন বুদ্ধমূর্ত্তি বলিয়া অনেকের অভিমত। শিবরাত্রি ও চড়কের সময় এখানে বহু নরনারীর সমাগম হয়।

কান্দী হইতে ৬ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত পাঁচথুপি একটি প্রাচীন ও বর্দ্ধিষ্ণু ভদ্রপল্লী। এখানে কয়েক ঘর ধনী জমিদারের বাস। এই গ্রামের উত্তর-পূর্ব্ব দিকে "বারকোণার দোল" নামে একটি ধ্বংসাবশেষ আছে। অনেকের মতে ইহা একটি প্রাচীন বৌদ্ধ বিহারের ভগ্নাবশেষ। এই বিহারটিতে পাঁচটি স্তূপ ছিল বলিয়াই নাকি গ্রামের নাম পাচথুপি হইয়াছে।

লালবাগ কোর্ট রোড—ব্যাণ্ডেল জংশন হইতে ১০৬ মাইল। এই স্থানে নামিয়া গঙ্গার পূর্ববতীরবর্ত্তী মুর্শিদাবাদ জেলার অন্যতম মহকুমা লালবাগে যাইতে হয়। পূর্ববঙ্গ রেলপথের মুর্শিদাবাদ স্টেশন দ্রষ্টব্য।

লালবাগ কোর্ট রোড ষ্টেশন হইতে প্রায় ৩ মাইল পশ্চিমে কিরীটকণা একটি বিখ্যাত স্থান। এখানে দেবীর কিরীটের একটি কণা পড়িয়াছিল, দেবীর নাম বিমলা বা কিরীটেশ্বরী, ভৈরব সম্বর্ত্ত। কিরীটকণা বহুকাল হইতেই প্রসিদ্ধ তীর্থস্থানরূপে সম্মানিত। ইহা পীঠস্থান বলিয়া পূজিত; তবে কাহারও কাহারও মতে এখানে দেবীর অঙ্গ না পড়িয়া কিরীটের অংশ পড়িয়াছিল বলিয়া ইহা একটি উপপীঠ। "তন্ত্রচূড়ামণি" ও "মহানীলতন্ত্র"এ কিরীটকণার উল্লেখ আছে। পাঠান ও মুঘলযুগে এই স্থানের বিশেষ প্রসিদ্ধি ছিল। শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক মঙ্গল নামক জনৈক বৈষ্ণবের পূর্ব্বপুরুষগণ কিরীটেশ্বরীর সেবক ছিলেন বলিয়া জ্ঞাত হওয়া যায়। শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত সাক্ষাতের পর মঙ্গল বৈষ্ণব-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বর্দ্ধমান জেলার চাঁদরা গ্রামে গিয়া বাস করেন; তাঁহারই পৌত্র বদনচাঁদ ঠাকুর মনোহর সাহী সঙ্কীর্ত্তন রীতির প্রবর্ত্তক। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বঙ্গাধিকারী দর্পনারায়ণ রায় কিরীটেশ্বরীর প্রাচীন মন্দিরের সংস্কার করেন ও এই স্থানে কয়েকটি শিব প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি এই স্থানে কালীসাগর নামে একটি পুষ্করিণী খনন করাইয়া তাহার ঘাট বাঁধাইয়া দেন ও "কিরীটেশ্বরীর মেলা" নামে একটি মেলার প্রবর্ত্তন করেন। আজিও পৌষ মাসের প্রতি মঙ্গলবারে এই স্থানে মেলা বসিয়া থাকে। মুর্শিদাবাদে রাজধানী আসিবার পর

হইতে এই তীর্থ বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। "সয়ের মুতক্ষরীণ" নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে নবাব জাফর আলি খাঁ বা মীরজাফর অন্তিমকালে শান্তি লাভের আশায় তাঁহার দেওয়ান মহারাজ নন্দকুমারের অনুরোধে কিরীটেশ্বরীর চরণামৃত পান করিয়াছিলেন। নাটোরের সাধক রাজা রামকৃষ্ণ নিকটস্থ বড়নগর হইতে এখানে প্রায়ই আসিতেন এবং সাধন ভজনে মগ্ন থাকিতেন ; এখনও দুইখানি প্রস্তরখণ্ড তাঁহার আসন বলিয়া পরিচিত আছে। মুর্শিদাবাদ হইতে রাজধানী উঠিয়া যাওয়ার পর কিরীটেশ্বরীর অবস্থা ক্রমশঃ শোচনীয় হইয়া পড়ে। বর্ত্তমানে লালগোলার মহারাজ; বহু অর্থব্যয়ে কিরীটেশ্বরীর মন্দিরের সংস্কার করিয়া দিয়াছেন। কিরীটেশ্বরীর মন্দির পশ্চিমদ্বারী মন্দির মধ্যে কোন প্রতিমূর্ত্তি নাই। কেবল একটি উচচ প্রস্তরবেদী আছে। উচচ বেদীর উপর আর একটি ক্ষুদ্র বেদী আছে, উহাই দেবীর কিরীটরূপে পূজিত হয়। মন্দির প্রাঙ্গনে প্রবেশ করিবার তোরণের দুই দিকে দুইটি শিবমন্দির আছে। উহার মধ্যে দক্ষিণ দিকের মন্দিরটি রাজা রাজবল্লভের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া কথিত। নিকটেই আর একটি প্রাচীন মন্দিরে এক বৃহৎকায় বিদীর্ণ শিবলিঙ্গ অবস্থিত। উহাও রাজা রাজবল্লভের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া কথিত। প্রবাদ যে রাজা রাজবল্লভের পুত্র নিষ্ঠুরভাবে নিহত হইলে এই শিবলিঙ্গ আপনা হইতে বিদীর্ণ হইয়া যায়। কিরীটেশ্বরীর ভৈরব বলিয়া যে মূর্ত্তির পূজা করা হয় উহা প্রকৃত পক্ষে একটি বুদ্ধমূর্ত্তি। গ্রামের মধ্যে গুপ্তমঠ নামে আর একটি নূতন মন্দিরেও কিরীটেশ্বরীর পূজার ব্যবস্থা আছে। পুরাতন মন্দির হইতে পূজারীরা দেবীর কিরীট এই নূতন মন্দিরে লইয়া আসিয়াছেন ; উহা সর্ব্বদা লাল কাপড়ে ঢাকা থাকে এবং দেখিতে নিষেধ।

আজিমগঞ্জ জংশন—ব্যাণ্ডেল জংশন হইতে ১১০ মাইল দূর। ইহা একটি বাণিজ্য প্রধান স্থান। এই স্থানে দুধোরিয়া ও নওলাক্ষা উপাধিধারী দুইটি ধনী জমিদার বংশের বাস। বাংলা দেশের মধ্যে আজিমগঞ্জ ও গঙ্গার পূর্ব্বপারে স্থিত জিয়াগঞ্জে বহু জৈন বণিকের বসতি আছে। মুর্শিদাবাদের অভ্যুদয়ের সময় এই সকল পশ্চিমদেশীয় বণিক বাংলায় আসিয়া স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। আজিমগঞ্জে অনেকগুলি জৈন মন্দির আছে। এখানকার বিখ্যাত ধনী ধনপৎ সিং নওলাক্ষার "গোলাপবাগ" নামক মনোরম উদ্যানবাটী বিশেষ দ্রষ্টব্য বস্তু আজিমগঞ্জ এককালে মুর্শিদাবাদের শহরতলী বলিয়া গণ্য হইত। সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের পৌত্র আজিম্-উস-সাণের নাম হইতে এই শহরের নাম আজিমগঞ্জ হয়।

আজিমগঞ্জের এক মাইল উত্তরে অবস্থিত ভাগীরথীর পশ্চিমকূলে **বড়নগর** একটি প্রসিদ্ধ স্থান। এখানে নাটোর রাজবংশের "গঙ্গাবাস" ছিল। বড়নগর মন্দিরে পরিপূর্ণ এই স্থানে রাণী ভবানীর অনেক পুণ্যকীর্ত্তি আছে। ভবানীশ্বর শিবের মন্দির বড়নগরের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। বাংলা দেশে ইহার মত উচচ মন্দির অল্পই আছে। ইহার চারিদিকে বারান্দা ও আটটি প্রবেশ পথ আছে। এই মন্দিরের কারুকার্য্য অতি সুন্দর। বারাণসী ধামেও রাণী ভবানী স্থাপিত ভবানীশ্বর আছেন ; কথিত আছে দুইটি মন্দির একই কালে স্থাপিত। রাণী ভবানীর কন্যা তারাসুন্দরীর স্থাপিত গোপাল মন্দির ও ভবানীর প্রতিষ্ঠিত সিংহবাহিনী দশভুজা অন্নপূর্ণারূপিনী রাজরাজেশ্বরীর মন্দির, মদনগোপালের মন্দির ও চারি বাংলার মন্দির দ্রষ্টব্য বস্তু। মদনগোপালের মন্দিরটি বড়নগরের আদি রাজা উদয়নারায়ণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। নবাব মুর্শিদ কুলীর সহিত বিবাদের ফলে উদয়নারায়ণ বড়নগর ত্যাগ করিয়া গিয়া বীরকিটিতে বাস করেন। তথায় নবাবের সহিত যুদ্ধে তাঁহার পরাজয় ও পতন হইলে বড়নগর নাটোরের জমিদারীভুক্ত হয়। রাণী ভবানী প্রতিষ্ঠিত

চারি বাংলার মন্দিরের প্রত্যেক খানি ইষ্টকের গাত্রে অতিসুন্দর কারুকার্য্যময় পৌরাণিক চিত্রাবলী উৎকীর্ণ আছে। চারিদিকে চারিটি বাংলা ধরণের শিবমন্দির পরস্পর সংলগ্ন হইয়া চারিবাংলার মন্দির নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ইহার প্রত্যেক মন্দিরে তিনটি করিয়া শিবলিঙ্গ স্থাপিত আছে। চারি বাংলা মুর্শিদাবাদ জেলার একটি প্রধান দ্রষ্টব্য।

১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে এই বড়নগরেই রাণী ভবানী ৭৯ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। তাঁহার দত্তকপুত্র সাধক রাজা রামকৃষ্ণের পঞ্চমুণ্ডী আসন এই স্থানে দৃষ্ট হয়। বড়নগরের অষ্টভূজ গণেশের মন্দির, রাণী ভবানীর গুরু বংশীয়দের মঠবাড়ী, ব্রহ্মানন্দ নামক সন্ন্যাসী প্রতিষ্ঠিত দয়াময়ী বাড়ীর অতি সুন্দর পাথরের কালী মূর্ত্তি প্রভৃতিও উল্লেখযোগ্য। খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বড়নগর এ অঞ্চলের একটি প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। বড়নগরের ঘড়া বাংলার সর্ব্বত্র আদৃত ছিল। বহরমপুর খাগড়ার অধিকাংশ বাসন-নির্ম্মাতা বড়নগর হইতে আগত।

আজিমগঞ্জ হইতে প্রায় ৫ মাইল উত্তরে অবস্থিত গয়সাবাদ একটি প্রাচীন স্থান। এখানে বহু ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। আজিমগঞ্জের পরের স্টেশনে মহীপাল হল্ট্ হইতে গয়সাবাদ ৪ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত এবং ইহা প্রাচীন মহীপাল নগরীর অংশ বলিয়া অনুমিত হয়। পাঠান রাজত্বকালে গয়সাবাদ একটি সমৃদ্ধ স্থান ছিল। প্রবাদ বঙ্গেশ্বর গিয়াস-উদ্-দীন কর্ত্তৃক এই নগরের প্রতিষ্ঠা হয়। গৌড়ে গিয়াস উদ্দীন নামে দুইজন নৃপতি রাজত্ব করিয়াছিলেন। কেহ কেহ অনুমান করেন প্রথম গিয়াস্ উদ্দীনের সময়ে খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে প্রাচীন মহীপাল নগরীর প্রস্তরাদি লইয়া নগরটি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে একটি দরগাহ আছে, উহার মধ্যে চারিটি সমাধি দৃষ্ট হয়। সর্ব্বাপেক্ষা উচচ সমাধিটি জনৈক ফকীরের সমাধি বলিয়া পরিচিত। দরগাহের সোপান-গুলি প্রাচীন মহীপাল নগরীর প্রস্তর লইয়া নির্ম্মিত। ইহার নিকট পালি ভাষায় খোদিত দুইটি প্রস্তর খণ্ড ও কয়েকটি স্বর্ণ মুদ্রা পাওয়া গিয়াছিল। গয়সাবাদে নশীপুর রাজবংশের নির্ম্মিত একটি উচচ তুলসী বিহার মন্দির আছে। বর্ত্তমানে এখানে কোন উৎসব হয় না। মন্দিরটির এখন ভগ্নদশা।

আজিমগঞ্জ জংশন হইতে একটি শাখা লাইন সাহেবগঞ্জ লুপ শাখায় অবস্থিত বীরভূম জেলার বিখ্যাত স্বাস্থ্যনিবাস নলহাটি জংশন পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই শাখা পথে সাগরদীঘি, মোরগ্রাম ও লোহাপুর উল্লেখযোগ্য স্থান।

আজিমগঞ্জ জংশন হইতে সাগরদীঘি স্টেশন ৯ মাইল দুর। স্টেশন হইতে সাগরদীঘির দূরত্ব প্রায় এক মাইল। দীঘিটি প্রায় এক মাইল দীর্ঘ। কথিত আছে, যে এই দীঘি খুব গভীর করিয়া খনন করা সত্ত্বেও উহাতে জল উঠে নাই। অতঃপর রাজার প্রতি স্বপ্নাদেশ হয় যে সাগর নামক জনৈক কুম্ভকার যদি দীঘির মধ্য হইতে এক কোদালী মাটি তুলিয়া ফেলে, তবেই জল উঠিবে। রাজার আদেশে সাগর এক কোদালী মাটি তুলে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই দীঘি জলে পূর্ণ হইয়া যাওয়ায় সে জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করে। সাগরের নাম হইতেই দীঘির নাম হয় সাগরদীঘি। স্থানীয় লোকেরা এই দীঘির জল ব্যবহার করে না বা ইহাতে মাছ ধরে না। তাহারা এই দীঘিটিকে বিশেষ ভয়ের চক্ষে দেখে। সাগর দীঘির উৎপত্তি সম্বন্ধে অন্য প্রকার কাহিনীও প্রচলিত আছে। এক সময়ে রাজা মহীপাল তাঁহার পরিবারবর্গসহ স্থানান্তরে যাইবার পথে এখানে শিবির সন্নিবেশ করেন। রাজসৈন্য ও কর্ম্মচারিগণকে দেখিয়া স্থানীয় দুইটি ব্রাহ্মণ বালক বিশেষ ভয় পাইয়া এক বৃক্ষে আরোহণ করে। উহাদের মধ্যে একজন এতদূর ভয় পায় যে সে বৃক্ষশাখায় প্রাণত্যাগ করে।

হাতে কলমে শিক্ষা, শ্রীনিকেতন (পৃষ্ঠা ১২৩)

মুক্তবায়ুতে অধ্যাপনা, শান্তিনিকেতন (পৃষ্ঠা ১২৩)

নলহাটির দৃশ্য (পৃষ্ঠা ১২৬)

হরিদাস ঠাকুরের পাটবাড়ী,
কুলীনগ্রাম (পৃষ্ঠা ৯২)

এই সংবাদ রাজার কর্ণগোচর হইলে তাঁহারই জন্য ব্রহ্মহত্যা ঘটিয়াছে এইরূপ মনে করিয়া তিনি অত্যন্ত ম্রিয়মান হইয়া পড়েন। তৎকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া পণ্ডিতগণ ব্যবস্থা দেন যে রাজা ও রাণী যতদূর পর্য্যন্ত একসঙ্গে পদব্রজে গমন করিতে পারিবেন ততদূর পর্যন্ত একটি জলাশয় খনন করাইয়া দিলে ব্রহ্মহত্যার পাপ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। প্রায় অর্দ্ধক্রোশ পর্য্যন্ত চলিবার পর রাণী ক্লান্ত হইয়া বসিয়া পড়েন। সুতরাং সাগরদীঘির দৈর্ঘ্য প্রায় অর্দ্ধক্রোশ পরিমিত হয়। সাগরদীঘি পূর্ব্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ, ইহার উত্তর ও দক্ষিণ পারে তিনটি করিয়া ছয়টি এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিম পারে দুইটি করিয়া চারিটি, মোট দশটি বাঁধাঘাট ছিল। ঘাটগুলির চিহ্ন এখনও কিছু কিছু বর্ত্তমান আছে। এই দীঘির তীরে একখানি প্রস্তরফলকে একটি শ্লোক উৎকীর্ণ ছিল, উহা হইতে জানা যায় যে পালবংশীয় রাজা ব্রহ্মহত্যা পাপ ক্ষালনের জন্য ৭৪০ শকে ইহার প্রতিষ্ঠা করেন। এই দীঘি খনন করিতে ১০ হাজার কুলী, ৬ হাজার খনক, ১০ লক্ষ ইট ও ২ লক্ষ করিয়া তৃণ ও কাষ্ঠ লাগিয়াছিল এবং শত সহস্র গরু, অসংখ্য শীতবস্ত্র, ধৌতবস্ত্র, স্বুবর্ণ ও ভূমি ব্রাহ্মণগণকে দান করা হইয়াছিল। প্রবাদ অনুসারে পালবংশীয় রাজা মহীপাল এই দীঘির প্রতিষ্ঠাতা। পাল বংশীয়গণ বৌদ্ধ হইলেও হিন্দু-ধর্ম্মের প্রতি তাঁহাদের শ্রদ্ধা ছিল। সাগরদীঘির পশ্চিমে লস্করদীঘি নামে আর একটি ক্ষুদ্র দীঘি আছে। সাগর দীঘি স্টেশনের ছয় মাইল দক্ষিণে গুড়ে ও পশলা নামে দুইটি গ্রামের নিকট দিয়া যে প্রকাণ্ড বিলটি দক্ষিণদিকে গিয়াছে তাহার নাম "বসিয়ে" বা বশিষ্ঠ বিল। এই বিলের কিয়দংশ "বশিষ্ঠ কুণ্ড" নামে অভিহিত এবং তথায় বশিষ্ঠদেবের পূজা হয়। গ্রীষ্মকালে জল শুকাইলে এই বিলের স্থানে স্থানে শীতল জলের উৎস বাহির হয়।

আজিমগঞ্জ জংশন হইতে **মোরগ্রাম** স্টেশন ১৬ মাইল দূর। মোরগ্রামের ১৬ মাইল দক্ষিণে খড়গ্রাম থানা পর্য্যন্ত রাস্তা আছে। খড়গ্রাম হইতে ৬ মাইল উত্তরে শেরপুর ও ৩ মাইল উত্তরে আতাই গ্রাম। মহারাজ মানসিংহের সহিত পাঠান বিদ্রোহিগণের শেরপুর আতাইএর যুদ্ধ মুর্শিদাবাদ জেলার একটি প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ঘটনা। ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে গৌড়েশ্বর দায়ুদ খাঁর মৃত্যুর পর গৌড় রাজত্ব মুঘল অধিকারে আসিলেও অল্পকাল মধ্যে পাঠানগণ কত্‌লুখার নেতৃত্বে বিদ্রোহী হইয়া ওড়িষ্যা জয় করেন। কতলুখাঁর মৃত্যুর পর ওড়িষ্যা পুনরায় মুঘলদিগের অধিকারে আসে; কিন্তু মহারাজ মানসিংহ বাংলা ছাড়িয়া দাক্ষিণাত্য অভিযানে বাহির হইলে পাঠাণগণ কত্‌লখাঁর পুত্র উস্‌মানের নেতৃত্বে পুনরায় বিদ্রোহী হন। মহারাজ মানসিংহকে বিদ্রোহ দমনের জন্য পুনরায় বাংলায় আসিতে হয়। শেরপুর ও আতাইএর মধ্যে অবস্থিত মরিচা বা মুর্চা নামক স্থানে উভয় পক্ষের ভীষণ যুদ্ধ হয়; রিয়াজ-উস্‌-সলাতীন অনুসারে ২০ হাজার পাঠান সৈন্য এই যুদ্ধে যোগ দিয়াছিল। মানসিংহ এইবার পাঠানদিগকে পরাজিত করিয়া একেবারে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেন। যুদ্ধজয়ের জন্য মহারাজ মানসিংহ সম্রাট্ আকবরের নিকট হইতে সাত-হাজারী-মনসবদার পদ প্রাপ্ত হন। মরিচার যুদ্ধপ্রান্তর এখনও গড়ের মাঠ নামে খ্যাত। আতাইএর গড়ের চিহ্ন এখনও দৃষ্ট হয়। আতাই গ্রামে যুদ্ধে নিহত ব্যক্তিগণের সমাধি স্থান লোকের সম্মান আকর্ষণ করে। আতাইএর পার্শ্বস্থ নগর গ্রামে দাদাপীর নামক এক প্রসিদ্ধ ফকিরের আস্তানা আছে। প্রবাদ গৌড়েশ্বর হুসেন শাহ তাঁহার নানারূপ অদ্ভুত ক্ষমতার কথা শুনিয়া রূপ ও সনাতন সমভিব্যহারে তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। কথিত আছে, একবার এক ব্রাহ্মণ আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইলে দাদাপীর দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে বাধা দেন এবং নিজের শিষ্য করিয়া লন; তদবধি সেই ব্রাহ্মণ শাহ মুরাদ নামে খ্যাত হন। তাঁহার সম্বন্ধে কাহিনী প্রচলিত আছে যে তিনি দাদাপীরের খাদ্য প্রস্তুত করিতেন এবং একবার অবিশ্রান্ত বর্ষার দুর্য্যোগে কাঠ না পাইয়া উনানের মধ্যে নিজের একখানি

পা ঢুকাইয়া দেন। দাদাপীর এইরূপ ভক্তি দেখিয়া বিশেষ প্রীত হন এবং নির্দ্দেশ দান করেন যে তাঁহাদের মৃত্যুর পর প্রথম দিন শাহ্ মুরাদের এবং পরদিন তাঁহার নিজের ফতেহা হইবে। এখনও প্রতি বৎসর পৌষ মাসের ১৯এ শাহ্ মুরাদের এবং ২০এ দাদাপীরের ফতেহা বা মৃত্যু-উৎসব পালিত হয়; এই সময়ে নগর গ্রামে একটি বড় মেলা হয়।

আজিমগঞ্জ জংশন হইতে লোহাপুর ১৮ মাইল দূর। এই স্টেশনের উত্তরে গম্ভীরা নদীর তীরে বারা বা বালানগর নামে একটি গ্রাম আছে। ইহা বাণরাজা, মতান্তরে বালা রাজার রাজধানী ছিল বলিয়া কথিত। আরও কিংবদন্তী আছে যে বারা ও তাহার নিকটবর্ত্তী বাণেশ্বর ও নগর এই তিনটি গ্রাম লইয়া মহাভারতের বর্ণিত বারণাবত নগর ছিল। পাণ্ডবগণ কিছুকাল এই অঞ্চলে অজ্ঞাতবাস যাপন করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত এবং এই স্থানেই নাকি জতুগৃহ দাহ হয়। স্টেশনের ৪ মাইল দক্ষিণে ভদ্রপুর গ্রাম ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মহারাজ নন্দ কুমারের জন্মস্থান। তাঁহার বসত বাটী ও তাঁহার খনিত রাণী সাগর ও গুরু সাগর দীঘি এখনও বর্ত্তমান।

মহীপাল হল্ট্—ব্যাণ্ডেল জংশন হইতে ১১৭ মাইল। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর প্রথমভাগে উত্তর রাঢ়ে মহীপাল নামে এক পাল বংশীয় রাজা রাজত্ব করিতেন এবং মহীপাল নগরে তাঁহার রাজধানী ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। ইনি প্রসিদ্ধ পাল বংশীয় রাজা মহীপাল হইতে ভিন্নব্যক্তি; সম্ভবতঃ ইনি গৌড়াধিপতি পালবংশের অপর কোন শাখা-সম্ভূত। এই স্থানে মহীপাল নগরের ভগ্না-বশেষ অদ্যাপি বর্ত্তমান। মহীপাল নগর প্রায় ৭।৮ মাইল বিস্তৃত ছিল; আজিমগঞ্জ নলহাটি শাখার বাড়ালা স্টেশন হইতে আরম্ভ করিয়া ভাগীরথী কূলে গয়সাবাদ পর্য্যন্ত মহীপাল নগরের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। উক্ত শাখা লাইনে মহীপাল খনিত সাগর দীঘির কথা কিছু আগে বলা হইয়াছে। যে স্থানে রাজার প্রাসাদ ছিল উহাই এখন মহীপাল নামে পরিচিত; প্রাসাদটি এখন ভগ্নস্তূপ মাত্র; ইহার মধ্যে দুইটি পুরাতন পুষ্করিণী আছে। ভগ্নস্তূপের নিকট বহু প্রস্তর খণ্ড দৃষ্ট হয়; একটি অস্বাভাবিক প্রস্তর মূর্ত্তিকে লোকে রাক্ষসের দেহ বলিয়া থাকে; ইহার আকৃতি হস্তীর ন্যায়, কিন্তু দুইটি শিংও আছে; অনেকে অনুমান করেন ইহা কোনও বৌদ্ধ মন্দিরের প্রস্তর মূর্ত্তি হইবে। মহীপালের নিকটস্থ একটি প্রাচীন জলাশয় হইতে একটি দ্বাদশ হস্ত বিশিষ্ট বিরাট দণ্ডায়মান পুরুষ মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছিল; মূর্ত্তিটি এখন কলিকাতার যাদুঘরে রক্ষিত আছে; ইহার দুই পাশে দুইটি দণ্ডায়মান সহচর ও তাহাদের পাশে দুইটি স্ত্রীমর্ত্তি বসিয়া আছে। ইহা হিন্দু কি বৌদ্ধমূর্ত্তি তাহা ঠিক নির্দ্দিষ্ট হয় নাই।

মণিগ্রাম—ব্যাণ্ডেল জংশন হইতে ১২৩ মাইল; স্টেশনের প্রায় একমাইল উত্তরে চাঁদপাড়া বা একআনা চাঁদপাড়া গ্রাম। সাগরদীঘি রেল স্টেশন হইতে এই গ্রাম প্রায় ৮ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত। কথিত আছে, গৌড়েশ্বর হুসেন শাহ বাল্য কালে এই গ্রামের জমিদার সুবুদ্ধি রায়ের অধীনে কার্য্য করিতেন। প্রবাদ, হুসেন তাঁহার পিতার সহিত আরব হইতে এখানে আসিয়া উপস্থিত হন। কথিত আছে একদিন হুসেন সুবুদ্ধি রায়ের গরু চরাইতে গিয়া মাঠে ঘুমাইয়া পড়িলে দুইটি সাপ আসিয়া রৌদ্র হইতে তাঁহার মাথা ঢাকিয়া রাখে। সুবুদ্ধি রায় ইহা দেখিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন তিনি রাজা হইবেন এবং তখন যেন পুরাতন মনিবকে ভুলিয়া না যান। চাঁদপাড়ায় থাকা কালীন গ্রামের কাজীর কন্যার সহিত হুসেনের বিবাহ হয়। কাজীর বাড়ীতে তিনি লেখা পড়া শিখেন, এবং কাজীর গৌড় দরবারে যাতায়াত থাকায় তাঁহার সাহায্যে হুসেন রাজ

দরবারে একটি চাকুরি গ্রহণ করেন এবং শীঘ্রই উজির পদে উন্নীত হন। উত্তরকালে বাদশাহ হইয়া তিনি সুবুদ্ধি রায়কে এই গ্রাম নিষ্কর দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ সুবদ্ধি রায় মুসলমান বাদশাহের দান গ্রহণে সম্মত না হওয়ায় হুসেন শাহ এই গ্রামের খাজনা মাত্র এক আনা ধার্য্য করেন। তদবধি গ্রামের নাম হয় একআনা-চাঁদপাড়া। চৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত আছে যে সুবুদ্ধি রায় একবার একটি পুষ্করিণী খনন করাইবার সময় হুসেনকে উহার তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন। এই কার্য্যে হুসেনের অবহেলা দেখিতে পাইয়া তিনি তাঁহার পৃষ্ঠে চাবুকের দ্বারা আঘাত করেন। এই আঘাতের চিহ্ন তাঁহার দেহে চিরদিনের জন্য থাকিয়া যায়। উত্তরকালে হুসেন বাদশাহ হইলে তাঁহার বেগম এই চিহ্ন দেখিয়া এবং উহার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ শুনিয়া ক্রোধে সুবুদ্ধি রায়ের প্রাণনাশের জন্য হুসেনকে উত্তেজিত করেন। কিন্তু ধীরবুদ্ধি হুসেন শাহ তাঁহার বাল্যকালের প্রতিপালক ও অন্নদাতার প্রাণনাশে অস্বীকৃত হন। ইহাতে বেগম তাঁহার জাতি নাশ করিবার জন্য হুসেনকে অনুরোধ করেন। কৃতজ্ঞ হুসেন তাহাতেও সম্মত না হইলে স্বয়ং বেগম সাহেবা সুবুদ্ধি রায়ের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিতে উদ্যতা হইলে অনন্যোপায় হুসেন অগত্যা করোয়া হইতে জল লইয়া সুবুদ্ধি রায়ের মুখে নিক্ষেপ করিতে আদেশ দেন। ইহাতে অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়া সুবুদ্ধি রায় বিষয়সম্পত্তি ত্যাগ করিয়া কাশীধামে গমন করেন। তথাকার পণ্ডিতগণ তাঁহাকে তপ্ত ঘৃতপানে জীবন বিসর্জ্জন দেওয়ার ব্যবস্থা দেন। সুবুদ্ধি রায় কাশীতেই শ্রীচৈতন্যদেবের সাক্ষাৎ পান এবং তাঁহার পরামর্শ মত বৃন্দাবনে গমন ও নিরন্তর কৃষ্ণনাম জপে আত্মনিয়োগ করেন। সুবুদ্ধি রায় যে দীঘি খননের কার্য্যে হুসেন শাহকে নিযক্ত করেন, চাঁদপাড়ায় অদ্যাপি লোকে তাহা দেখাইয়া থাকে। ইহার নিকটেই সুবুদ্ধি রায়ের বাসভবনের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়; ইহা চাঁদরায়ের ভিটা বলিয়া পরিচিত।

মণিগ্রাম স্টেশন হইতে ৫ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরে নর্শীপুর ও পানিশালা গ্রাম। ইহাদের নিকটস্থ রেয়াপুরে প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব পণ্ডিত নরহরিদাস চক্রবর্ত্তী খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে জন্মগ্রহণ করেন; তাঁহার অপর নাম ঘনশ্যাম দাস। তিনি ভাল ভোগ রাঁধিতে পারিতেন বলিয়া রসুয়া নরহরি নামে অভিহিত হইতেন। তৎকৃত বিরাট গ্রন্থ "ভক্তিরত্নাকর" ও "নরোত্তম-বিলাস" বৈষ্ণব সমাজে আদৃত। সংস্কৃত ছন্দ শাস্ত্র অবলম্বনে বাংলায় "ছন্দ সমুদ্র" নামে একখানি পুস্তকও তিনি রচনা করেন।

গণকর—ব্যাণ্ডেল জংশন হইতে ১২৮ মাইল। স্টেশনের নিকটে বৌদ্ধযুগের বলিয়া অনুমিত ভীমের গদা নামে প্রস্তরস্তম্ভ দৃষ্ট হয়। স্টেশনের ৩ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে ও আজিমগঞ্জ নলহাটি শাখার মোরগ্রাম স্টেশনের ৫ মাইল উত্তরে জঙ্গীপুর রোড নামক রাজ পথের পার্শ্বে "শেখের দীঘি" নামে একটি বৃহৎ জলাশয় আছে। মুর্শিদাবাদ জেলায় সাগর দীঘি ও মহেশালের দীঘির পর এত বড় দীঘি আর নাই। দীঘির পার্শ্বস্থ গ্রামটিও শেখের দীঘি নামে পরিচিত, দীঘির পশ্চিম তীরে একটি প্রস্তর ফলক হইতে জানিতে পারা যায় যে গৌড়রাজ হুসেন শাহ্ ১৫১৪ খৃষ্টাব্দে এই দীঘি প্রতিষ্ঠা করেন। শেখের দীঘির ধারে আবু সৈয়দ ত্রিমিজ নামক একজন ফকিরের সমাধি আছে। ইহার নানারূপ অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল বলিয়া প্রকাশ। কথিত আছে, দীঘি খননের পর জল বাহির না হইলে হুসেন শাহের অনুরোধে ফকিরের আদেশ মত তাঁহার এক চেলা তাঁহার নিকট হইতে একটি দণ্ড লইয়া দীঘির গর্ভে পুতিলে জল বাহির হয়।

জঙ্গীপুর রোড—ব্যাণ্ডেল জংশন হইতে ১৩২ মাইল দূর। এখানে নামিয়া মুর্শিদাবাদের অন্যতম মহকুমা দুই মাইল পূর্ব্বদিকে ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরে অবস্থিত জঙ্গীপুরে যাইতে হয়। জঙ্গীপুরের বিপরীতদিকে গঙ্গার পশ্চিম তীরবর্ত্তী রঘুনাথগঞ্জ নামক স্থানে জঙ্গীপুরের মহকুমা-আদালত প্রভৃতি অবস্থিত। কিংবদন্তী অনুসারে স্থানটি সম্রাট্ জাহাঙ্গীর কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাঁহার নামের অপভ্রংশ হইতে ইহার নাম জঙ্গীপুর হইয়াছে। জঙ্গীপুরে প্রতি বৎসর বৈশাখী সংক্রান্তিতে মহাসমারোহে তুলসী বিহার মেলা হয়।

ইংরেজ যুগের প্রথম আমলে এখানে ইংরেজদের রেশমের একটি বড় কুঠি ছিল। শহরের বালিঘাটা পাড়াটি মহাকবি বাল্মীকির নাম হইতে হইয়াছে বলিয়া জনপ্রবাদ আছে। নদীর ধারে একটি প্রাচীন বটগাছ দেখাইয়া লোকে বলে ঐ স্থানে কবি স্নান করিতেন।

জঙ্গীপুরে একটি প্রাচীন মস্জিদ আছে, ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে সৈয়দ কাসিম কর্ত্তৃক উহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। কেহ কেহ অনুমান করেন তাহার নাম হইতেই কাশীম-বাজার শহরের নামকরণ হয়।

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে সৈয়দ মর্ত্তুজা হিন্দ নামে একজন মুসলমান ফকীর জঙ্গীপুরে বাস করিতেন। জঙ্গীপুরের বালিঘাটায় তিনি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত। বেরিলী জেলায় তাহার পৈতৃক নিবাস ছিল। তাঁহার পিতা সৈয়দ হাসেন কাদেরী একজন ফকীর ছিলেন। মর্ত্তুজা বাল্যকাল হইতেই জঙ্গীপুর ও নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে বাস করিতেন। তিনি অতি অল্প বয়সে ফকীর হন ও ঈশ্বর উপাসনায় আত্মনিয়োগ করেন। জঙ্গীপুরের দুই মাইল দক্ষিণে চড়কা গ্রামের রাজাক সাহেব তাঁহার গুরু ছিলেন। মর্ত্তুজা সুতীর নিকট ছাপঘাটিতে এক আস্তানা নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বাস করিতেন। এই শাখার খিদিরপুর হল্ট স্টেশন দ্রষ্টব্য। প্রায় ৮০ বৎসর বয়সে এই স্থানেই তিনি দেহত্যাগ করেন। তিনি মুসলমান ফকীর হইয়াও হিন্দুধর্ম্মের অনুশীলন করিতেন বলিয়া তিনি মর্ত্তুজা হিন্দ নামে পরিচিত ছিলেন। আনন্দময়ী নামে এক ব্রাহ্মণ কন্যা তাঁহার ভৈরবী বা সাধন-সহচরী ছিলেন। এজন্যে উভয়ে মর্ত্তুজানন্দ নামে অভিহিত হইতেন। মর্ত্তুজার কবরের পার্শ্বে আনন্দময়ীর সমাধি আজও দেখিতে পাওয়া যায়। মর্ত্তুজা অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ছিলেন বলিয়া লোকের বিশ্বাস। পশ্চিম দেশীয় মুসলমান হইয়াও তিনি সুললিত ও মধুর বাংলা পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত কয়েকটি বৈষ্ণবপদাবলী পদকল্পতরু গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট আছে। তাঁহার একটি পদের কিছু অংশ প্রদত্ত হইল,

মোরে কর দয়া, দেহ পদছায়া, শুনহ পরাণ-কানু।
কুল শীল সব ভাসাইনু জলে, প্রাণ না রহে তোমা বিনু।।
সৈয়দ মর্ত্তুজা ভণে কানুর চরণে নিবেদন শুন হরি।
সকল ছাড়িয়া রহিনু তুয়া পায়ে জীবন মরণ ভরি।।

মুসলমান, তান্ত্রিক, বৈষ্ণব সকলে তাঁহাকে আপনার ভাবিয়া ভক্তি করিত। ছাপঘাটিতে তাঁহার দরগাহ হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায় কর্ত্তৃক পূজিত হয়। প্রতি বৎসর রজব মাসে তথায় একটি মেলা বসে এবং বহু ফকীর ও গৃহী আসিয়া সমাধি দুটির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। মর্ত্তুজার স্ত্রীর নাম ছিল নিজাম বিবি এবং তাঁহাদের চারি পুত্র ও দুই কন্যা লাভ হয়; তাঁহার এক কন্যার সহিত জঙ্গীপুরের প্রাচীন মসজিদ প্রতিষ্ঠাতা সৈয়দ কাসিমের বিবাহ হয়। সৈয়দ মর্ত্তুজার বংশ বিদ্যমান আছে।

জঙ্গীপুর শহর হইতে তিন মাইল উত্তর-পূর্ব্বে ভাগীরথীর পূর্ব্বকূলে গিরিয়া নামে একটি গ্রাম আছে। ইহার চারিপাশে নদীর উভয় কূলে প্রায় ৮।১০ মাইল ব্যাপী প্রান্তর গিরিয়ার প্রান্তর নামে অভিহিত। ভাগীরথীর পশ্চিমে অবস্থিত এই প্রান্তরের অংশকে সূতীর ময়দানও বলা হয়; গিরিয়ার ৬ মাইল উত্তরে সূতী একটি প্রসিদ্ধ স্থান। এই গিরিয়ার প্রান্তর দুইবার সমরক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। গিরিয়ার প্রথম যুদ্ধ ১৭৪০ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে বাংলার নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর দৌহিত্র নবাব সরফরাজ খাঁ ও তাঁহার বিহারের সুবাদার বিদ্রোহী আলিবর্দ্দী খাঁর মধ্যে গিরিয়া গ্রামের নিকটে ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরে সংঘটিত হয়। যুদ্ধে সরফরাজ নিহত হন। পূর্ব্ব-বঙ্গ রেলপথের মুর্শিদাবাদ স্টেশন দ্রষ্টব্য। নবাবের মৃত্যুর পর তাঁহার অনুরক্ত সেনাপতি গওস খাঁ তাঁহার দুই পত্রের সহিত বীর বিক্রমে যুদ্ধ করিয়া নিহত হন। আলিবর্দ্দী খাঁ সম্পূর্ণ জয়লাভ করেন। গওস খাঁর বীরত্ব ও প্রভুভক্তি এ অঞ্চলে গ্রাম্য গাথায় স্থান পাইয়াছে। যে স্থানে গওস খাঁ নিহত হন তথায় একটি দরগাহ্ নির্ম্মিত হইয়াছিল; পরে তাঁহার গুরু ফকির শাহ্ হায়দরী তাঁহার ও তাঁহার পুত্রদ্বয়ের মৃতদেহ ভাগলপুরে লইয়া গিয়া পুনরায় সমাহিত করেন। গিরিয়ার আদি দরগাহটি ভাগীরথী গর্ভে যাইলে, নদীর পশ্চিম কূলে চাঁদপুর গ্রামে একটি ক্ষুদ্র দরগাহ্ নির্ম্মিত হয়; উহা এ অঞ্চলের মুসলমানগণের বিশেষ শ্রদ্ধার স্থল। এই যুদ্ধে গওস খাঁর পতনের পরই নবাব সরফরাজ খাঁর রাজপুত জাতীয় সেনাপতি বিজয় সিংহ সাহসের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে নিহত হন; তাঁহার সহিত তাঁহার নবমবর্ষীয় পুত্র জালিম সিংহ রণক্ষেত্রে উপস্থিত ছিল; বালক পিতার মৃতদেহ রক্ষার্থে তরবারী হস্তে জয়োন্মত্ত শত্রু সৈন্যদের সম্মুখে অগ্রসর হইয়া বীরদর্পে তাহাদের আটকাইয়া রাখিল যাহাতে পিতার মৃতদেহ কেহ স্পর্শ করিতে না পারে। রিয়াজ-উস-সলাতীনে লিখিত আছে যে আলিবর্দ্দী খাঁ বালকের এইরূপ দুর্ব্বার সাহসে মুগ্ধ হইয়া নিজ হিন্দু সেনাগণের সাহায্যে বিজয় সিংহের মৃতদেহের শাস্ত্রমত সৎকারের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। আলিবর্দ্দীর কয়েকটি গোলন্দাজ সৈন্য বালককে স্কন্ধে করিয়া নৃত্য করিয়াছিল। এই ঘটনা স্মরণ করিয়া গিরিয়া গ্রামের এক মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে মিঠিপুর গ্রাম হইতে পূর্ব্বদিকে খামরা গ্রাম পর্য্যন্ত গিরিয়া-প্রান্তরের অংশটি আজও "জালিম সিংহের মাঠ" নামে পরিচিত।

গিরিয়ার দ্বিতীয় যুদ্ধ ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে বাঁশলই নদীর সঙ্গমের নিকট নবাব মীর কাসিম ও ইংরেজ সৈন্যের মধ্যে ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দের অগস্ট মাসে সংঘটিত হয়। ইহা সূতীর যুদ্ধ নামেও অভিহিত হয়। মুর্শিদাবাদে মোতিঝিলের নিকট মীর কাসিমের সৈন্যদল পরাজিত হইয়া মীর কাসিম প্রেরিত সসৈন্য সেনাপতি সমরু, মার্কার, আসাদ উল্লা প্রভৃতির সহিত সূতীর নিকটে মিলিত হন। মেজর আডামসের অধীনে ইংরেজগণ ভাগীরথী পার হইয়া উত্তরে আগাইয়া যুদ্ধ করেন। এই যুদ্ধে মীর কাসিমের সেনাদল পরাজিত হইয়া রাজমহলের নিকট উধুয়ানালায় পলায়ন করিয়া শিবির স্থাপন করেন। তথায় ইংরেজ সৈন্য শিবির আক্রমণ করিয়া নবাব পক্ষকে একেবারে বিপর্য্যস্ত করিয়া দেয়।

বিভারিজ সাহেব গিরিয়া প্রান্তরকে মুর্শিদাবাদের পাণিপথ বলিয়াছেন। রাজধানী দিল্লীর অনতিদূরে পাণিপথে যেরূপ মুঘল সাম্রাজ্যের সূত্রপাত ও মহারাষ্ট্রীয় শক্তির পরাভব ঘটে, গিরিয়ার রণ ক্ষেত্রে সেইরূপ আলিবর্দ্দী খাঁর অভ্যুদয় ও মীর কাসিমের পরাভব ঘটে।

খিদিরপুর হল্ট্—ব্যাণ্ডেল জংশন হইতে ১৪১ মাইল। স্টেশন হইতে প্রায় ২ মাইল পশ্চিমে মহেশাল গ্রামে প্রায় দেড় মাইল দীর্ঘ একটি প্রকাণ্ড দীঘি আছে; ইহার নিকট

গৌড়পতি হুসেন শাহের জনৈক উচচ কর্ম্মচারী বলিয়া কথিত রাজা মঙ্গল সেনের বাটির ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়; এই স্থান হইতে হুসেন শাহের রজত মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। মহেশাল হইতে ৩ মাইল পশ্চিমে জীয়ৎকুঁড়ি গ্রাম, এই স্থানের একটি অতি প্রাচীন জলাশয়ের নাম "জীবৎকুণ্ড"। এই জলাশয়ের নাম হইতেই গ্রামের নাম জীয়ৎকুণ্ড বা জীয়ৎকুঁড়ি হইয়াছে। এই জলাশয়ের চতুঃপার্শ্বে অনেক ইষ্টকস্তূপ ও দেবদেবীর ভগ্নমূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। জলাশয়টির মধ্যে একটি অর্দ্ধ প্রেথিত দেবমূর্ত্তি কুণ্ডের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিয়া অভিহিত হন। জীয়ৎকুঁড়ি গ্রামটি যে এককালে একটি সমৃদ্ধ নগর ছিল তাহা ইহার বর্ত্তমান অবস্থা হইতেও অনেকটা উপলব্ধি করিতে পারা যায়। এইরূপ কথিত আছে যে হুসেন শাহ যখন গৌড়ের অধীশ্বর তখন এই স্থানে একজন পরাক্রমশালী ব্রাহ্মণ জমিদার বাস করিতেন। তাঁহার এক তিওর জাতীয় ভৃত্য ছিল। ভৃত্যটি অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও প্রভুর প্রিয়পাত্র ছিল এবং জমিদারী পরিচালনা বিষয়ে অনেক সময়ে প্রভুকে পরামর্শ প্রদান করিত। উক্ত ব্রাহ্মণ জমিদার নিঃসন্তান ছিলেন। সস্ত্রীক তীর্থ পর্য্যটনে বাহির হইবার সময় তিনি তিওর-ভৃত্যকে জমিদারী পরিচালনার ভার অর্পণ করিয়া যান। ব্রাহ্মণের প্রত্যাগমন করিতে বিলম্ব হয়। ইতিমধ্যে ভৃত্য রটাইয়া দেয় যে তাঁহার প্রভুর মৃত্যু হইয়াছে এবং দানসূত্রে সেই এখন সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। তীর্থকৃত্য করিবার পর ফিরিয়া আসিয়া ব্রাহ্মণ এই ব্যাপার দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তিনি ভৃত্যকে ডাকিয়া সম্পত্তি পুনঃ প্রত্যর্পণ করিতে বলিলে সে উত্তর দিল, "প্রভু, আপনি তীর্থযাত্রায় বাহির হইবার সময় আমার নিকট সম্পত্তি ন্যাস রাখার সাক্ষ্যস্বরূপ চর্বিবত তাম্বুল রাখিয়া গিয়াছিলেন। যদি ফিরাইয়া লইতে হয় উহাশুদ্ধই লউন।" প্রবাদ, এই কথার পর ব্রাহ্মণ সস্ত্রীক সেই স্থান চিরদিনের জন্য পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। ব্রাহ্মণের বিপুল ঐশ্বর্য্যলাভে তিওরের মনে দম্ভের সঞ্চার হয় এবং সে নিজেকে "রাজা" বলিয়া প্রচার করে ও অত্যাচারী হইয়া উঠে। তাহার দমনের জন্য হুসেন শাহ একদল সৈন্য প্রেরণ করেন, কিন্তু তিওররাজকে তাহারা পরাজিত করিতে অসমর্থ হয়। প্রবাদ, যে নিকটস্থ একটি কুণ্ডের জলস্পর্শে মৃত তিওর সৈন্যগণ পুনর্জীবন লাভ করায় বাদশাহী ফৌজ তাহাদিগের সহিত আটিয়া উঠিতে পারে না। এই কুণ্ডই "জীয়ৎকুণ্ড" নামে খ্যাত। অবশেষে মুসলমান সেনাপতি গোরক্তের দ্বারা কুণ্ডের জল অপবিত্র করিয়া দিলে উহার সঞ্জীবনী শক্তি লোপ পায় এবং তিওররাজের পতন ঘটে। কথিত আছে যে তিওররাজ কুণ্ডের সুড়ঙ্গ পথ দিয়া পাতালে গিয়া এখনও অবস্থান করিতেছেন।

খিদিরপুর হল্‌ট্‌ স্টেশনের এক মাইলের কিছু অধিক পূর্ব্বদিকে ভাগীরথীর পশ্চিম কূলে সূতী একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। সূতীর নিকটেই গঙ্গার প্রধান ধারা হইতে ভাগীরথী বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। সূতীর পার্শ্বে বাজিতপুর গ্রামে সর্বেশ্বর মহাদেবের মন্দিরের গাত্রে একটি যুদ্ধের ছবি অঙ্কিত আছে; প্রবাদ ইহা সূতীর যুদ্ধের (গিরিয়ার দ্বিতীয় যুদ্ধের) স্মরণে অঙ্কিত।

সূতীর নিকট ছাপঘাটি গ্রামে প্রসিদ্ধ ফকির সৈয়দ মর্ত্তুজা হিন্দ ও আনন্দময়ীর সমাধি এ অঞ্চলের সকলেরই দ্রষ্টব্য। জঙ্গীপুর রোড স্টেশনের প্রসঙ্গে ইহাদের কথা বলা হইয়াছে।

ধুলিয়ান্ গ্যান্জেস—ব্যাণ্ডেল জংশন হইতে ১৪৯ মাইল দূর। ইহা মুর্শিদাবাদ জেলা তথা বাংলার শেষ স্টেশন। ইহার নিকট দিয়া ভাগীরথী ও পদ্মা এই উভয় নদী প্রবাহিত। ইহা একটি উন্নতিশীল বাণিজ্যপ্রধান স্থান। এখানকার তালা ও জাঁতি অতি উৎকৃষ্ট। এখানে একটি মিউনিসিপ্যালিটি আছে।

(ঘ) খানা জংশন—সাঁইথিয়া—নলহাটি—বারহাড়োয়া
(সাহেবগঞ্জ লুপ শাখা)

গুস্‌করা—খানা জংশন হইতে ১২ মাইল দূর। ইহা বর্দ্ধমান জেলার একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম ও বাণিজ্যপ্রধান স্থান। এখানে ধান্য ও চাউলের খুব বড় কারবার আছে। প্রতি মঙ্গল ও শুক্রবারে এখানে খুব বড় হাট হয় এবং ঐ হাটে ধান্য ও চাউল ক্রয় বিক্রয়ের জন্য বহু দূর হইতে লোক আসে। এখান হইতে ৭ মাইল দূরে মাহত গ্রাম পূর্ব্বে সংস্কৃত চর্চ্চার জন্য খ্যাত ছিল। মাঘ মাসে এখানে গোবিন্দ জীউর মন্দিরে একটি মেলা বসে।

বোলপুর—খানা জংশন হইতে ২৪ এবং হাওড়া হইতে ৯৯ মাইল দূর। ইহা বীরভূম জেলার অন্তর্গত একটি বিখ্যাত বাণিজ্য কেন্দ্র। এখানে একটি মুনসেফী আদালত আছে। আধুনিক কালের শ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার আশ্রম শান্তি-নিকেতনের জন্য বোলপুরের নাম জগৎবিখ্যাত হইয়াছে। বোলপুর স্টেশন হইতে এক মাইল পশ্চিমে এই আশ্রম অবস্থিত। পূর্ব্বে এই স্থান অনুর্ব্বর প্রান্তর ছিল। রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর এই স্থানের নির্জ্জনতা ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে এখানকার একখণ্ড জমি ক্রয় করেন এবং তথায় একটি মন্দির ও অতিথিশালা নির্ম্মাণ করেন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে মহর্ষি শান্তিনিকেতন আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করিয়া উহা সর্ব্বসাধারণের ঈশ্বর আরাধনার জন্য উৎসর্গ করেন। কোনও ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের নিন্দা বা আমিষ আহার এই আশ্রমে নিষিদ্ধ। মহর্ষি যে দুইটি ছাতিম (সপ্তপর্ণ) গাছের তলায় ধ্যান ও আরাধনা করিতে ভালবাসিতেন তাহা আজও বর্ত্তমান আছে। একটি মর্ম্মর প্রস্তরে মহর্ষির নিম্নলিখিত প্রার্থনাটি উৎকীর্ণ আছে,

"তিনি
আমার প্রাণের আরাম
মনের আনন্দ
আত্মার শান্তি।"

১৯০১ খৃষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম নাম দিয়া সম্পূর্ণ নূতন আদর্শে এখানে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। প্রাচীন ভারতের গুরুগৃহের ন্যায় শহরের কোলাহল ও কৃত্রিমতা হইতে দূরে মুক্ত আকাশের তলে স্বাভাবিক পরিবেষ্টনীর মধ্যে যাহাতে সহজে স্বাধীনভাবে ছেলে মেয়েরা গড়িয়া উঠিতে ও শিক্ষালাভ করিতে পারে ইহাই হইল কবির স্বপ্ন ও সাধনা। যতদূর সম্ভব এখানে খোলা আকাশের তলে মুক্তবায়ুতে উদ্যানের মধ্যে অধ্যাপনা করা হয়। প্রতিষ্ঠাতার একাগ্র সাধনা ও পরিশ্রমের ফলে বিদ্যালয়টি বড় হইয়া উঠে এবং পৃথিবীর নানাস্থানের মনীষী ও চিন্তাশীল বিদ্বদ্ সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৯২২ খৃষ্টাব্দের ১৬ই মে কবি এই বিদ্যালয়ের কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তৃত ও পুনর্গঠন করিয়া বিশ্বভারতী নাম দিয়া একটি সত্যকার আন্তর্জ্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সংস্কৃতির বিভিন্ন ধারা বিষয়ে শ্রদ্ধা ও সহানুভতির সহিত অনুশীলন ও গবেষণা করা এবং তাহাদের ঐক্য ও মিলনের সাহায্যে জগৎ হইতে আন্তর্জ্জাতিক হিংসা ও বিদ্বেষ নির্ম্মূল করিয়া মানবতার বিজয় গৌরব ঘোষণা করা। এখন এই শিক্ষায়তনে শিশুশ্রেণী হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চতম গবেষণার নানারূপ ব্যবস্থা রহিয়াছে। পাঠভবন (স্কুল) শিক্ষাভবন (কলেজ) কলাভবন (আর্ট স্কুল) সঙ্গীতভবন, বিদ্যাভবন গবেষণা মন্দির ও নিকটস্থ সুরুল গ্রামে শ্রীনিকেতন (আদর্শ পল্লী গঠন ও কৃষি প্রভৃতি বিষয়ক শিক্ষাকেন্দ্র)

প্রভৃতি বিশ্বভারতীর বিভিন্ন বিভাগ। সুরুলে পূর্ব্বে ইংরেজদের একটি কুঠি ছিল। এখানকার প্রথম কুঠিয়াল শ্রীযুত জন্ চীপ্ ৪১ বৎসর কাল সুরুলে অবস্থান করিয়াছিলেন। সাধারণ শিক্ষার জন্য বিশ্বভারতীর আদ্য, মধ্য ও অন্ত পরীক্ষার এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন, আই-এ, আই-এসসি ও বি, এ, পরীক্ষার ব্যবস্থাও এখানে আছে। ইহা ছাড়া চিত্রবিদ্যা, ভাস্কর্য্য, কণ্ঠ ও যন্ত্র সঙ্গীত, ভারতীয় নৃত্য, কৃষিবিদ্যা, বয়নশিল্প, প্রভৃতির ব্যবস্থাও আছে। শান্তিনিকেতনে পৃথক ডাক ও তারঘর, বিজলীআলো, জলের কল ও ছোট একটি হাঁসপাতাল আছে। এখানে একটি প্রকাণ্ড গ্রন্থাগার, বালকদের জন্য অনেকগুলি ছাত্রাবাস ও বালিকাদের জন্য শ্রীভবন নামে একটি সুন্দর ছাত্রীনিবাস আছে। বিশ্বভারতীর খ্যাতি আজ সমগ্র বিশ্বব্যাপী। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইতালী, জার্ম্মানী, চীন, জাপান, ইরাণ প্রভৃতি বহু দেশের মনীষী এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা সূত্রে আগমন করিয়াছেন। শান্তিনিকেতন শুধু বাংলার বা ভারতের নহে, সমগ্র এশিয়ার গৌরবস্থল।

বোলপুর হইতে ভারতীয়গণের মধ্যে প্রথম প্রাদেশিক শাসন কর্ত্তা লর্ড সিংহের জন্মস্থান রাইপুর যাইতে হয়। পার্শ্ববর্ত্তী পল্লী সুপুরে সুরথরাজার পূজিত বলিয়া কথিত সুরথেশ্বর শিব বর্ত্তমান। প্রবাদ সুরথ রাজা চণ্ডিকার নিকট লক্ষ বলি প্রদান করিলে এই স্থানের নাম হয় বলিপুর। বোলপুর নাম বলিপুর হইতে হইয়াছে বলিয়া লোকের বিশ্বাস।

বোলপুরের চারি মাইল পূর্ব্বোত্তরে শিয়ান নামক গ্রামে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির আশ্রম ছিল বলিয়া জনশ্রুতি আছে। এখানে মুনিকুণ্ড নামক একটি শীতল প্রস্রবণ আছে। উত্তরায়ণ সংক্রান্তিতে এখানে একটি বড় মেলা হয় ও বহুলোক এই কুণ্ডে স্নান করিয়া থাকেন। কথিত আছে যে অঙ্গদেশের রাজা লোমপাদ ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে ভুলাইয়া লইয়া গিয়া নিজ কন্যার সহিত বিবাহ দিলে তাঁহার পিতা বিভাণ্ডক মুনি এই স্থান হইতে চলিয়া গিয়া ভাণ্ডীরবনে নূতন আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। [শিউড়ী দ্রষ্টব্য ।]

বোলপুর হইতে ১১ মাইল পশ্চিমে **ইলামবাজার** গালা ও লাক্ষা শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ। ইলামবাজার ছাড়াইয়া বোলপুর স্টেশন হইতে ১৮ মাইল পশ্চিমে মোটরবাসযোগে গীতগোবিন্দের কবি জয়দেবের জন্মস্থান **কেন্দুবিল্ব** বা কেঁদুলিতে যাওয়া যায়। কবির প্রতিষ্ঠিত রাধামাধবজীউ আজও নিত্য পূজিত হইতেছেন। যে আসনে বসিয়া কবি সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন তাহা আজিও সযত্নে রক্ষিত আছে। মকর সংক্রান্তির দিন কেঁদুলীতে জয়দেব গোস্বামীর মহোৎসব নামে একটি বৃহৎ মেলা হয়। মেলায় লোকশিল্পের নিদর্শন স্বরূপ কিছু কিছু জিনিস পাওয়া যায়। এই মেলার একটি বিশেষ অঙ্গ হইল গীতগোবিন্দ গান করা। এই কাব্যের আদর ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র। পুরীধামে জগন্নাথদেবের পূজা পাঠে ইহা নিত্য গীত হয়। অণ্ডাল জংশনের নিকটবর্ত্তী মেন্ লাইনের দুর্গাপুর স্টেশন হইতেও মোটরবাসযোগে কেন্দুবিল্বে যাওয়া যায়। অণ্ডাল-সাঁইথিয়া শাখার দুবরাজপুর স্টেশন হইতেও যাওয়া চলে।

কেঁদুলীর অনতিদূরে অজয় নদের দক্ষিণ তীরে প্রাচীন ত্রিষষ্ঠীগড় বা ইছাই ঘোষের অজয় ঢেকুরের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যসমূহে ইছাই ঘোষের বিস্তৃত বর্ণনা আছে। ইছাই ঘোষ শক্তির উপাসক ছিলেন। ত্রিষষ্ঠীগড়ের রাজা কর্ণসেনকে পরাজিত করিয়া তিনি অজয়তীরে এক দেউল নির্ম্মাণ করেন ও তথায় তাঁহার উপাস্যা দেবী শ্যামারূপাকে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই শ্যামারূপা আজও পূজা পাইতেছেন। ঢেকুরের নিকটবর্ত্তী লাউসেনতালাও,

ছোটদের শিক্ষা, শান্তিনিকেতন (পৃষ্ঠা ১২৩)

পল্লী উন্নয়ন কার্য্য, শ্রীনিকেতন (পৃষ্ঠা ১২৩)
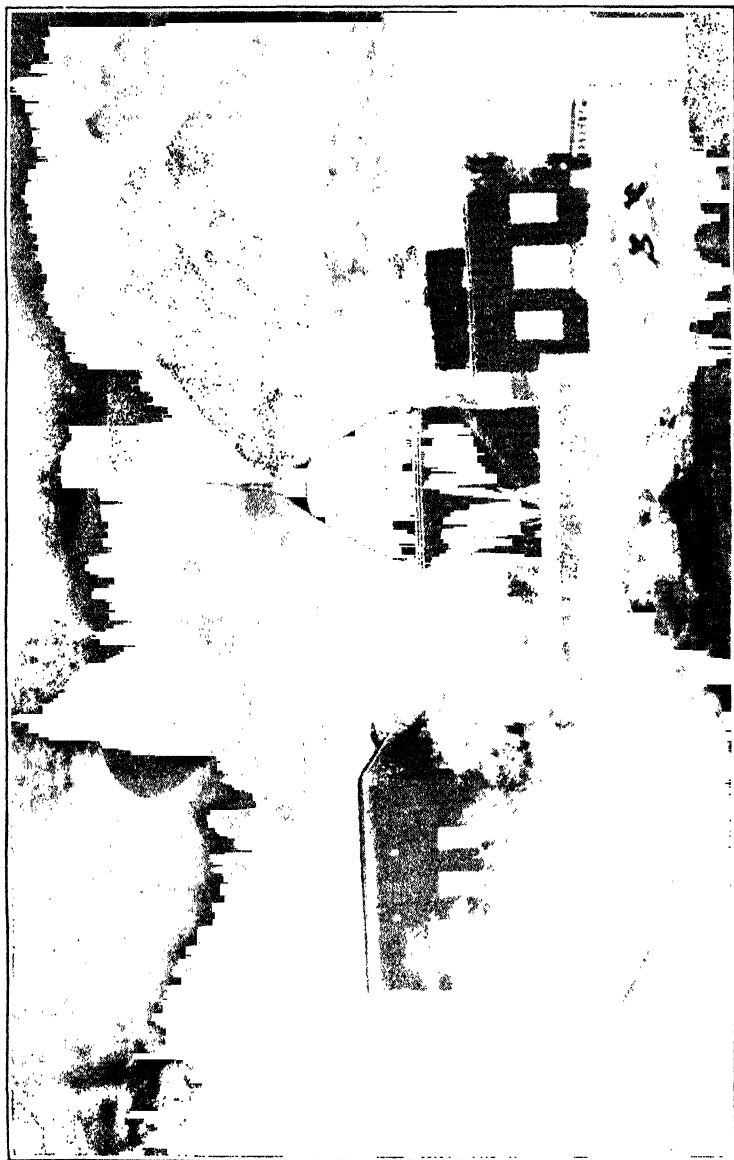
তপোবন, বৈদ্যনাথধাম (পৃষ্ঠা ৯০)

কান্দুনেডাঙ্গা ও রক্তনালী প্রভৃতি স্থান মহাবীর লাউসেন ও ইছাই ঘোষের যুদ্ধের স্মৃতি বহন করিতেছে। লাউসেনের সেনাপতি কালু ডোমের হস্তে ইছাই ঘোষ নিহত হন।

কোপাই—খানা জংশন হইতে ৩০ মাইল দূর। স্টেশনের অনতিদূরে কোপাই নামক উত্তরবাহিনী নদীর তীরে একটি পীঠস্থান আছে। এখানে দেবীর কঙ্কাল পড়িয়াছিল, দেবীর নাম বেদগর্ভা, ভৈরব রুরু। এই স্থান কঙ্কালীতলা নামে পরিচিত। এই স্থানের একটি কুণ্ডের জল বিশেষ পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হয়। যাত্রিগণ এই কুণ্ডে দেবীর পূজা করিয়া থাকেন। চৈত্র সংক্রান্তিতে এখানে একটি মেলা হইয়া থাকে।

আহমদপুর জংশন—খানা জংশন হইতে ৩৬ মাইল। ইহাও একটি বাণিজ্য-প্রধান স্থান। ইহা আহমদপুর-কাটোয়া নামক লাইট রেলওয়ের সহিত একটি জংশন স্টেশন।

আহমদপুরের দুই মাইল দূরে বেলিয়া বা বেলে নামক গ্রামে ধর্ম্মরাজ ঠাকুরের এক মন্দির আছে। বাত রোগের দৈব ঔষধ প্রাপ্তির জন্য এই স্থানে বহু যাত্রীর সমাগম হয়। রাঢ় দেশে ধর্ম্মঠাকুরের যতগুলি মন্দির আছে, বেলের মন্দির তাহাদের মধ্যে বিশেষ পরিচিত।

সাঁইথিয়া জংশন—খানা জংশন হইতে ৪৪ মাইল দূর। ইহা বীরভূম জেলার একটি প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র। সাঁইথিয়া স্টেশনের নিকটে একটি পীঠস্থান আছে, উহার প্রাচীন নাম নন্দীপুর। এই স্থানে দেবীর হাড় পড়িয়াছিল, দেবীর নাম নন্দিনী, ভৈরব নন্দিকেশ্বর। রেল লাইনের পার্শ্বে একটি প্রাচীন বটবৃক্ষতলে দেবীর পাষাণময়ী মূর্ত্তি বিরাজিত। সাঁইথিয়ার ৬ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে মৌড়েশ্বর গ্রামে মৌড়েশ্বর নামে এক প্রাচীন শিব আছেন। এই গ্রামের রাজা মুকুটরায় বৈষ্ণবশিরোমণি নিত্যানন্দের মাতামহ ছিলেন। সাঁইথিয়ার পাচ মাইল পূর্ব্বদিকে কোটাসুর নামে একটি গ্রাম আছে। প্রবাদ, এই স্থানে হিড়িম্ব ও বক রাক্ষসের বাসস্থান ছিল। অসুরের কোট বা বাসস্থান বলিয়া গ্রামের নাম কোটাসুর হইয়াছে। সাঁইথিয়ার ১১ মাইল পূর্ব্বদিকে অবস্থিত গনুতিয়া গ্রাম রেশম শিল্পের জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল।

অণ্ডাল জংশন হইতে একটি শাখা লাইন সাঁইথিয়ায় আসিয়া মিলিত হইয়াছে।

মল্লারপুর—খানা জংশন হইতে ৫৪ মাইল দূর। ইহা একটি সমৃদ্ধিশালী গ্রাম। এই গ্রামে মল্লেশ্বর নামে এক প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ শিব আছেন। গ্রামের পূর্ব্বাংশে শিবপাহাড়ী নামে একটি পাহাড় আছে। কথিত আছে যে দ্রৌপদীর হরণে অকৃতকার্য্য ও ভীম কর্ত্তৃক অপমানিত জয়দ্রথ এই শিবপাহাড়ীতে আসিয়া সিদ্ধনাথ শিবের উপাসনা করিয়া যুদ্ধে অজেয়তার বর লাভ করেন। শিবরাত্রি ও চৈত্র সংক্রান্তির সময় এখানে মেলা হয়।

মল্লারপুর হইতে ৭ মাইল পূর্ব্বদিকে বীরচন্দ্রপুর ও গর্ভবাস নামক স্থানদ্বয় বৈষ্ণবদিগের অতি প্রিয় তীর্থ। গর্ভবাসের প্রাচীন নাম একচক্রপুর বা একচাকা। এই গ্রামের সহিত পাণ্ডবগণের সংশ্রব ছিল বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। প্রবাদ অনুসারে এই স্থানে ভীম হিড়িম্ব রাক্ষসকে হত্যা করিয়াছিলেন এবং তাহার ভগ্নী ও ঘটোৎকচের মাতা হিড়িম্বাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। একচক্রপুরে নিত্যানন্দ প্রভুর জন্ম হইয়াছিল। তাঁহার পিতার নাম হাড়ো ওঝা ও মাতার নাম পদ্মাবতী। অতি অল্প বয়সেই তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হন এবং ভারতের প্রায় সমুদয় তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া নবদ্বীপে গিয়া শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সহিত মিলিত হন।

বৈষ্ণবজগতে তিনি বলরামের অবতাররূপে পূজিত। নিত্যানন্দের জন্মতিথি মাঘ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী উপলক্ষে গর্ভবাসে এবং দোল ও রাসযাত্রার সময় বীরচন্দ্রপুরে মহোৎসব হয়। মল্লারপুর হইতে বীরচন্দ্রপুর শীতকালে মোটরবাসযোগে এবং অন্যান্য সময় গো-যানে যাওয়া যায়। একচক্র-পুরের ৪ মাইল পশ্চিমে কাঁদড়া গ্রামে প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা জ্ঞানদাস ১৫৬০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। কাঁদড়ায় জ্ঞানদাসের প্রতিষ্ঠিত একটি মঠ আছে। পৌষ পূর্ণিমায় তথায় মহোৎসব ও তিন দিন ব্যাপী মেলা বসে।

রামপুর হাট—খানা জংশন হইতে ৬১ মাইল দূর। ইহা বীরভূম জেলার মহকুমা। এখানে সপ্তাহে দুই দিন খুব বড় হাট হয়। এই স্থানের তিন মাইল পশ্চিমে লালপাহাড়ী নামে একটি পাহাড় আছে।

রামপুর হাটের ৩ মাইল দূরে দ্বারকানদীর পূর্ব্ব তীরে চণ্ডীপুর বা তারাপুর গ্রামে তারাদেবীর মন্দির ও প্রাচীন যোগাশ্রম তারাপীঠ অবস্থিত। জনশ্রুতি, এই স্থানে সতীর চক্ষুর তারা পতিত হইয়াছিল। কথিত আছে, যে পুরাণ-প্রসিদ্ধ বশিষ্ঠ মুনি এই স্থানে তপস্যা করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। আধুনিক যুগের অন্যতম বিখ্যাত সাধক বামা ক্ষেপা তারাপীঠে অবস্থান করিতেন। তিনিও একজন সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন বলিয়া লোকের বিশ্বাস। তারাপীঠের মন্দিরটি নাটোরের মহারাণী ভবানী কর্ত্তৃক নিৰ্ম্মিত। প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে তারাপীঠে একটি মেলা হয়।

রামপুর হাট হইতে মোটরবাসযোগে সাঁওতাল পরগণা জেলার সদর শহর দুমকায় যাওয়া যায়। এই পথের দূরত্ব প্রায় ৪০ মাইল।

নলহাটি জংশন—খানা জংশন হইতে ৭০ মাইল দূর। ইহা বীরভূম জেলার একটি বিখ্যাত স্বাস্থ্যনিবাস ও সমৃদ্ধিশালী শহর। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম ও জলবায়ু পশ্চিমের মত সতেজ ও স্বাস্থ্যকর। নলহাটির নিকটবর্ত্তী একটি পাহাড়ের ঝরণার জল হজমী গুণের জন্য প্রসিদ্ধ। বহুদূর হইতে লোকে এখানে জল নিতে আসে। এই স্থানে কখনও ম্যালেরিয়া দেখা যায় নাই। অনেকে এখানে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য আসিয়া থাকেন। এই স্থানে সুলভে খাদ্যাদি ও বাড়ী ভাড়া পাওয়া যায়। শহরবাসের প্রায় সকল প্রকার সুখসুবিধাই এখানে মিলে। যাঁহারা বায়ু পরিবর্ত্তন ও তীর্থ দর্শন এক সঙ্গে করিতে চাহেন, অথচ অধিক দূরে যাইতে ইচ্ছুক নহেন, নলহাটি তাহাদের পক্ষে বিশেষ উপযুক্ত স্থান।

নলহাটি একটি পীঠস্থান। এখানে দেবীর ললাট পড়িয়াছিল, দেবীর নাম ললাটেশ্বরী, ভৈরব যোগীশ। শহরের একটি উচ্চ টিলার উপর ললাটেশ্বরী দেবীর মন্দির অবস্থিত। নলহাটি স্টেশনের নিকটে নলরাজার বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এই নলরাজা কে ছিলেন তাহা সঠিক জানা যায় নাই। নলহাটিতে উত্তম কাঁসার বাসন প্রস্তুত হয়। এই স্থান হইতে একটি শাখা লাইন মুর্শিদাবাদ জেলার আজিমগঞ্জ পর্য্যন্ত গিয়াছে।

মুরারই—খানা জংশন হইতে ৮০ মাইল দূর। স্টেশন হইতে তিন মাইল পূর্ব্বে কনকপুর গ্রামে অপরাজিতা নামে এক প্রাচীন পাষাণময়ী দেবীমূর্ত্তি বিরাজিত। মুরারই হইতে প্রায় ৯ মাইল পশ্চিমে বীরকিটি নামে একটি স্থান আছে। মুর্শিদাবাদ বড়নগরের রাজা উদয়নারায়ণ মুর্শিদকুলী খাঁর সহিত বিবাদের ফলে বড়নগর ত্যাগ করিয়া এই স্থানে আসিয়া বসতি করেন।

বীরকিটির গড় একটি উচচ টিলার উপর অবস্থিত ছিল। রাজা উদয়নারায়ণের সহিত রাজস্ব ব্যাপার লইয়া মুর্শিদকুলী খাঁর ঘোর বিবাদ উপস্থিত হয় এবং গ্রামের পশ্চিমদিকস্থ প্রান্তরে উভয়পক্ষের যুদ্ধ হয়। বীরকিটির দুই মাইল পূর্ব্বদিকে জগন্নাথপুর গড়ে রাজা উদয়নারায়ণের সেনাগণ শিবির সন্নিবেশ করে এবং এই যুদ্ধে বহু লোকক্ষয় হয়। এই যুদ্ধ "জগন্নাথপুরের যুদ্ধ" নামে খ্যাত। নবাবের সেনাপতি গোলাম মহম্মদ এই যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন কিন্তু সপুত্র উদয়নারায়ণ নবাব সৈন্যের হস্তে বন্দী হন। যে স্থানে যুদ্ধ হইয়াছিল উহা আজও মুণ্ডমালা বা "মুড়মুড়ের ডাঙ্গা" নামে পরিচিত। তথায় বন্দুকাদির টুকরা মধ্যে মধ্যে পাওয়া যায়। অপরাজিতাদেবীর প্রাচীন মন্দির রাজা উদয়নারায়ণ কর্ত্তৃক সংস্কৃত হয়।

রাজগাঁ—খানা জংশন হইতে ৮৭ মাইল দূর। এই স্থান হইতে চার মাইল পশ্চিমে বীরনগর গ্রামে রাজবাড়ী নামে একটি প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। প্রবাদ, উহা বীরসেন নামক রাজার প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ। নিকটেই সীতাপাহাড়ী নামে একটি ছোট পাহাড় আছে। কথিত আছে যে বনবাসকালে সীতাদেবী ও শ্রীরামচন্দ্র এই পাহাড়ের গুহায় কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন।

পাকুড়—খানা জংশন হইতে ৯৪ মাইল দূর। ইহা সাঁওতাল পরগণা জেলার একটি মহকুমা। স্থানটি অতি স্বাস্থ্যকর ও সমৃদ্ধিশালী। এখান হইতে রেল লাইনের জন্য পাথর সংগ্রহ করা হয়। রাজা নামে পরিচিত একঘর জমিদার এখানে বাস করেন। এই শহরে তাঁহাদের বহু কীর্ত্তিকলাপ দেখিতে পাওয়া যায়।

পাকুড়ের পর এই লাইন বারহাড়োয়া জংশন, তিনপাহাড় জংশন, সকড়িগলি জংশন, ভাগলপুর জংশন ও জামালপুর জংশন হইয়া প্রধান লাইনের কিউল জংশনে মিশিয়াছে। এই শাখার তিনপাহাড় জংশন হইতে ক্ষুদ্র একটি শাখা লাইন গঙ্গার তীরবর্ত্তী রাজমহলে পোছিয়াছে। **রাজমহল** এককালে বাংলার রাজধানী ছিল। ইহার পূর্ব্ব নাম ছিল "আক্ মহল"। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে ওড়িষ্যা বিজয় করিয়া প্রত্যাবর্ত্তনকালে মানসিংহ ১৫৯২ খৃষ্টাব্দে এই স্থানে বাংলার রাজধানী স্থাপন করেন। উত্তরকালে রাজধানী ঢাকায় লইয়া যাওয়া হয়। বর্ত্তমানে ইহা একটি নগণ্য পল্লী মাত্র। গ্রামের পশ্চিমদিকে প্রায় চার মাইল ব্যাপিয়া পুরাতন রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ জঙ্গলের দ্বারা আবৃত রহিয়াছে। জুম্মা মসজিদ, শাহ সুজা ও মীরকাসিমের প্রাসাদ, ফুলবাড়ী প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ রাজমহলের পূর্ব্ব গৌরবের স্মৃতি বহন করিতেছে। রাজমহল হইতে ৬ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে উধুয়ানালায় ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা সেপ্টেম্বর নবাব মীর কাসিমের সেনাবাহিনী ইংরেজদের নিকট সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়; ইহার পর হইতে ইংরেজদের আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। জঙ্গীপুর রোড স্টেশনও পূর্ব্বভারত রেলপথের মুর্শিদাবাদ স্টেশন দ্রষ্টব্য।
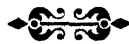
(ঙ) সীতারামপুর—ধানবাদ—গোমো জংশন (গ্রাণ্ড কর্ড লাইন)

কুলটি—সীতারামপুর হইতে ৩ মাইল দূর। ইহা খনি অঞ্চলের একটি প্রসিদ্ধ স্থান। এই স্থানে ও নিকটবর্ত্তী হীরাপুরে লৌহের কারখানা আছে।

বরাকর—সীতারামপুর জংশন হইতে ৫ মাইল দূর। ইহা বর্দ্ধমান জেলার শেষ স্টেশন। ইহা বরাকর নামক নদীর তীরে অবস্থিত। এই নদীর পরপার হইতে মানভূম জেলার আরম্ভ। এখানে নদীর উপর গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড ও রেল লাইনের দুইটি সুন্দর সেতু আছে। ইহা একটি বিখ্যাত ব্যবসায়ের স্থান। এখানকার জলহাওয়াও বেশ ভাল। এই স্থানে কতকগুলি প্রস্তর নির্ম্মিত সুন্দর পুরাতন মন্দির আছে।

বরাকর হইতে ৪ মাইল উত্তরে অবস্থিত হাদলা পাহাড় নামক স্থানে "কল্যাণেশ্বরী" নামে একটি প্রস্তর নির্ম্মিত সুন্দর প্রাচীন দেবী মন্দির আছে। প্রবাদ যে প্রায় ৪।৫ শত বৎসর পূর্ব্বে কল্যাণ সিংহ নামক জনৈক রাজা এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কল্যাণেশ্বরীর কোন প্রতিমুর্ত্তি নাই। একখানি প্রস্তরখণ্ডকে দেবীর প্রতিনিধিরূপে পূজা করা হয়। কথিত আছে একদিন এক ব্রাহ্মণ মন্দির পার্শ্বস্থ জলাশয় হইতে অলঙ্কার শোভিত দুইটি হস্ত উঠিতে দেখেন। তিনি রাজা কল্যাণ সিংহকে ইহা বলিলে রাজা আসিয়াও হস্ত দুটি দেখিতে পান। রাত্রে দেবী রাজাকে স্বপ্নে দেখা দিয়া এই প্রস্তর খানির পূজা করিতে নির্দ্দেশ দান করেন।

কুমারধুবি—সীতারামপুর হইতে ৭ মাইল দূর। ইহা মানভূম জেলার অন্তর্গত একটি বিখ্যাত শ্রমিক কেন্দ্র। এখানে অনেকগুলি কলকারখানা আছে।

ধানবাদ জংশন—সীতারামপুর হইতে ২৫ মাইল। ইহা মানভূম জেলার মহকুমা ও খনি অঞ্চলের একটি প্রসিদ্ধ শহর। এই শহরটি অতি সুন্দর ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

এই স্থান হইতে একটি শাখা লাইন কয়লার খনি অঞ্চলের ঝরিয়া হইয়া ৮ মাইল দূরবর্ত্তী পাথরডিহি পর্য্যন্ত গিয়াছে। আর একটি শাখা লাইন কাট্‌রাস্‌গড় হইয়া ৩২ মাইল দূরবর্ত্তী বামো পয্যন্ত গিয়াছে। কাট্‌রাস্‌গড়ের ৮ মাইল দক্ষিণে দামোদরের উভয় কূলে চেচগাঁগড় ও বেলোঙ্গা নামক গ্রামে বহু পুরাতন মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। মন্দিরগুলির সুন্দর কারুকার্য্যের পরিচয় এখনও পাওয়া যায়। এই স্থানদ্বয়ে হিন্দু বৌদ্ধ ও জৈন মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। বেলোঙ্গায় একটি প্রকাণ্ড নগ্ন জৈন মূর্ত্তি আছে।

গোমো জংশন—সীতারামপুর জংশন হইতে ৪৯ মাইল। ইহা একটি প্রসিদ্ধ জংশন স্টেশন। বাংলা নাগপুর রেলপথের একটি শাখা লাইন আদড়া হইতে বাহির হইয়া এই স্থানে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। ইহাও একটি বাণিজ্য প্রধান স্থান।

পরিশিষ্ট

বাংলা দেশ হইতে উত্তর ও পশ্চিম অঞ্চলে যাইতে হইলে পূর্ব্বভারত রেলপথ দিয়াই যাইতে হয়। গয়া, কাশী, বিন্ধ্যাচল, প্রয়াগ, মথুরা, অযোধ্যা, হরিদ্বার, প্রভৃতি প্রসিদ্ধ তীর্থ এবং দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, কানপুর, ফয়জাবাদ, পাটনা, সাসারাম প্রভৃতি বিখ্যাত ঐতিহাসিক নগরীগুলি এই রেলপথের উপর অবস্থিত। সুতরাং এই রেলপথে ভ্রমণ না করিলে উত্তর ভারত সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করিতে পারা যায় না।

বাংলা নাগপুর রেলপথে বাংলা দেশ

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের ২৩এ ফেব্রুয়ারি তারিখে লণ্ডন শহরে "বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে কোম্পানি" সংগঠিত হয়। ঐ বৎসরই কোম্পানি "নাগপুর ছত্রিশগড় স্টেট রেলওয়ে" নামক রেলপথের পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। ঐ রেলপথের মোট দৈর্ঘ্য ছিল মাত্র ৮০৩ মাইল। তারপর কোম্পানি ক্রমান্বয়ে বহু স্থানে নূতন লাইন নির্ম্মাণ করিয়া সমগ্র লাইনের "বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে" এই নামকরণ করেন। বর্ত্তমানে এই রেলপথের মোট দৈর্ঘ্য ৩৩৯৮ মাইল ও ইহার স্টেশন সংখ্যা ৫০৪ টি। এই বিস্তৃত রেলপথ বাংলা দেশ হইতে আরম্ভ করিয়া বিহার, ওড়িষ্যা, মাদ্রাজ ও মধ্যপ্রদেশের বহু অঞ্চলের মধ্য দিয়া প্রসারিত। এই রেলপথ দিয়া প্রতি বৎসর কোটি কোটি টাকার লৌহ, কয়লা ও কাঠ প্রভৃতির আমদানি ও রপ্তানি হয়। ১৯৩৬-৩৭ সালে এই রেলপথ দিয়া প্রায় দুই কোটি যাত্রী ও দেড় কোটি টন মাল যাতায়াত করিয়াছে।

বাংলা দেশের হাওড়া, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও বর্দ্ধমান এই চারিটি জেলার মধ্য দিয়া এই রেলপথ প্রসারিত। এই জেলা গুলির যে সকল প্রসিদ্ধ স্থানে এই রেলপথ দিয়া যাওয়া যায় তাহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে দেওয়া হইল। বিহার প্রদেশের অন্তগত মানভূম জেলা ও ধলভূম মহকুমা প্রভৃতি যে সকল অঞ্চল ভাষা ও সংস্কৃতির দিক্ দিয়া বাংলা দেশ হইতে অভিন্ন, অথবা যাহাদের সহিত বহু বাঙালীর সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ, তাহাদের বিবরণও ইহার অন্তর্ভুক্ত করা হইল।

(ক)—হাওড়া-খড়গপুর-দাঁতন

রামরাজাতলা—হাওড়া হইতে ৪ মাইল দূর। এখানে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসের রামনবমী তিথি হইতে শ্রাবণ মাসের শেষ রবিবার পর্য্যন্ত মহাসমারোহে রামরাজার পূজা হইয়া থাকে। রাম, সীতা, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন ও হনুমান প্রভৃতি সমন্বিত রামরাজার প্রতিমূর্ত্তি অতি বৃহৎ আকারে নির্ম্মিত হয়। এত বড় প্রতিমা সচরাচর দেখা যায় না। রামরাজাতলার মেলায় প্রত্যহ বহু যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। তবে দশহরা, অম্বুবাচী, স্নানযাত্রা ও রথযাত্রা উপলক্ষে যাত্রীর ভিড় কিছু অধিক হয়।

রামরাজাতলা ষ্টেশনের নিকটে অবস্থিত "শঙ্কর মঠ" একটি দ্রষ্টব্য বস্তু। একটি মনোরম উদ্যান মধ্যে এই মঠটি অবস্থিত। ইহার নাটমন্দিরের প্রাচীর গাত্রে বিষ্ণুর দশাবতার ও অন্যান্য পৌরাণিক চিত্রাবলী উৎকীর্ণ আছে। মঠে জগদগুরু শঙ্করাচার্য্য ও সাবিত্রী দেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসের শুক্লা পঞ্চমীর দিন শঙ্করাচার্য্যের জন্ম তিথির পূজা হয় এবং ঐ দিন রবিবার না হইলে পরবর্ত্তী রবিবারে মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। সাবিত্রী চতুর্দ্দশী তিথিতে সাবিত্রী দেবীকে দর্শন করিবার জন্য বহু মহিলার সমাগম হয়।

শঙ্কর মঠের সংলগ্ন একটি চতুষ্পাঠী আছে। তথায় বেদান্ত ও দর্শন শাস্ত্র পড়ান হয়।

রামরাজাতলার নিকটবর্ত্তী বাকসাড়া নামক পল্লীতে বৈশাখী পূর্ণিমার দিন হইতে শ্রাবণ মাসের শেষ রবিবার পর্য্যন্ত "নবনারীকুঞ্জর" নামে আর একটি বারোয়ারি অনুষ্ঠিত হয়। আটজন প্রধানা সখীসহ শ্রীরাধিকা একটি হস্তীর আকার ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে পৃষ্ঠে ধারণ করিয়াছিলেন,—ইহাই হইল নবনারীকুঞ্জরের পরিচয়। এই প্রতিমাটি একটি দেখিবার বস্তু। এখানেও বহু লোকের সমাগম হয়। শ্রাবণ মাসের শেষ রবিবারে মহাসমারোহে রামরাজা ও নবনারীকুঞ্জর প্রতিমাদ্বয় শোভাযাত্রাসহ গঙ্গায় বিসর্জ্জন দেওয়া হয়। এই শোভাযাত্রা দেখিবার জন্য রামরাজাতলায় অসংখ্য যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে।

সাঁতরাগাছি—হাওড়া হইতে ৫ মাইল দূর। ইহা একটি বর্দ্ধিষ্ণু পল্লী। এখানে বাংলা নাগপুর রেলপথের প্রধান ইয়ার্ড অবস্থিত। এখান হইতে একটি শাখা লাইন ৭ মাইল দূরবর্ত্তী হাওড়া শহরের দক্ষিণস্থ শালিমার পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই স্থান রঙের কারখানার জন্য বিখ্যাত। শালিমার ও খিদিরপুরের মধ্যে বি, এন, আর-এর খেয়া জাহাজে করিয়া মালগাড়ী পার করা হয়।

মৌড়িগ্রাম—হাওড়া হইতে ৭ মাইল দূর। ষ্টেশনের নিকটে একটি কাপড়ের কল আছে। ষ্টেশন হইতে মহীয়াড়ি বা মৌড়িগ্রাম প্রায় দেড় মাইল দূর। মৌড়িগ্রামের সরস্বতী নদী তীরস্থ শ্মশানেশ্বর শিবের মন্দির অতি প্রাচীন। স্থানীয় জমিদার কুণ্ডুবাবুদের গৃহদেবতা লক্ষ্মী-জনার্দ্দনের রাসযাত্রা উপলক্ষে এখানে বিশেষ ধুমধাম হয় ও সপ্তাহকালব্যাপী একটি মেলা বসে। এই মেলায় নানাস্থান হইতে বহুযাত্রীর সমাগম হয়।

মহীয়াড়ির নিকটবর্ত্তী প্রশস্ত নামক গ্রামে পরলোকগত বিখ্যাত ব্যায়ামবীর ভীম ভবানীর পৈতৃক নিবাস।

আন্দুল—হাওড়া হইতে ৮ মাইল দূর। আন্দুলের রাজবাড়ীর নাম অনেকের নিকট সুপরিচিত। রামলোচন রায় নামক এক ভদ্রলোক লর্ড ক্লাইভের দেওয়ান ছিলেন, তিনিই এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা। মুঘল রাজত্বকালের শেষ দিকে রামলোচনের জ্যেষ্ঠপুত্র দিল্লীর বাদশাহের নিকট হইতে "রাজা" উপাধি লাভ করেন। সেই সময় হইতে এই বংশ রাজবংশ বলিয়া পরিচিত। আন্দুলের বর্ত্তমান জমিদারগণ এই রাজবংশের দৌহিত্র।

আন্দুলের কালীকীর্ত্তন গান এক সময়ে ভক্ত সমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিল। সিদ্ধেশ্বরী দেবীর প্রাচীন মন্দির এখানকার একটি দ্রষ্টব্য বস্তু।

সুবিখ্যাত সাহিত্যসেবী ও সাংবাদিক রায় সাহেব বিহারীলাল সরকার আন্দুলের অধিবাসী ছিলেন। সরকার মহাশয় "শকুন্তলা তত্ত্ব" "বিদ্যাসাগর চরিত" ও "ইংরাজের জয়" প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা। তিনি বহুকাল "বঙ্গবাসী" সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক ছিলেন।

সাঁকরাইল—হাওড়া হইতে ১০ মাইল দূর। ইহা ভাগীরথী ও সরস্বতীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত একটি সমৃদ্ধ স্থান। এখানে উচচ ইংরেজী বিদ্যালয়, বালিকা বিদ্যালয়, মাদ্রাসা, চতুষ্পাঠী, গ্রন্থাগার, ক্লাব ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রভৃতি আছে। এখানে বিশালাক্ষী দেবীর একটি প্রাচীন মন্দির আছে। হেষ্টিংসের শাসনকালে এখানে মদনরায় নামক রাজা উপাধিধারী এক জমিদারের বাস ছিল। যে স্থানে তাঁহার বাসগৃহ ছিল, তথায় এখন "বেলভেডিয়ার" জুটমিল নামে একটি বড় পাটকল হইয়াছে।

উলুবেড়িয়া—হাওড়া হইতে ২০ মাইল দূর। ইহা হাওড়া জেলার একটি মহকুমা। এই স্থানটি গঙ্গার উপর অবস্থিত। এখানকার ইলিশ মাছ ও পান্তুয়া খুব বিখ্যাত। উলুবেড়িয়ার গঙ্গাতীরে অতি সুন্দর একটি কালীবাড়ী আছে। এখান হইতে "মেদিনীপুর কেনাল" নামক খাল ও "ওড়িষ্যা ট্রাঙ্ক রোড" নামক রাস্তা বাহির হইয়াছে।

বীরশিবপুর—হাওড়া হইতে ২৩ মাইল দূর। এখানকার মাঠে শিকারীরা পাখী শিকার করিতে আসেন। এখান হইতে প্রায় ৪ মাইল দূরে কাণসোণা গ্রামে পীর গোরাচাঁদের আস্তানা ও পুকুর আছে। রোগমুক্তি কামনায় হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকেই এই পুকুরে স্নান করিয়া থাকেন।

দেউলটি—হাওড়া জেলার শেষ স্টেশন দেউলটি, হাওড়া হইতে ৩২ মাইল দূর। এখানে অনেক ফুলের বাগান আছে; এখানকার গোলাপ খুব বিখ্যাত। রুগ্ন গবাদি পশুর শুশ্রূষার জন্য এখানে একটি গোশালা ও তৎসংলগ্ন গোচরভূমি আছে।

দেউলটিতে নামিয়া সামতাবেড় নামক একখানি ছোট গ্রামে যাইতে হয়। এই গ্রাম ছোট হইলেও বাংলা সাহিত্যে ইহা এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। বাংলার অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র সামতাবেড়ে একখানি মনোরম পল্লী ভবন নির্ম্মাণ করিয়া বহুকাল সেইখানেই অতিবাহিত করিয়াছিলেন। শরৎচন্দ্রের জীবদ্দশায় এই পল্লীখানি নবীন সাহিত্যিকদের তীর্থে পরিণত হইয়াছিল।

কোলাঘাট—হাওড়া হইতে ৩৫ মাইল দূর। এই স্থান হইতে মেদিনীপুর জেলার আরম্ভ। স্থানটি রূপনারায়ণ নদের তীরে অবস্থিত। এই স্থানে রূপনারায়ণ নদের উপর বাংলা নাগপুর রেলপথের এক প্রকাণ্ড সেতু আছে। বর্ষাকালে রূপনারায়ণের রূপ অতি সুন্দর হইয়া উঠে।

কোলাঘাট একটি বিখ্যাত বাণিজ্য কেন্দ্র।

পাঁশকুড়া—হাওড়া হইতে ৪৪ মাইল। ইহা মেদিনীপুর জেলার একটি প্রসিদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্র ও সমৃদ্ধস্থান। এখান হইতে আখের গুড়, বেগুন, মূলা ও কপি প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য কলিকাতা, টাটানগর ও খড়গপুর প্রভৃতি স্থানে রপ্তানি হইয়া থাকে। কেনাল বা কাটাখালের জল সরবরাহের জন্য এখানে একটি "এনিকট্" আছে। এখানে ডাক্‌বাংলা, দাতব্য চিকিৎসালয়, উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়, বালিকা বিদ্যালয় ও একটি বয়ন বিদ্যালয় আছে। স্টেশনের অনতিদূরে "জানুখণ্ডী" নামে একটি বৃহৎ দীঘি আছে।

পাঁশকুড়া হইতে দুই মাইল উত্তরে মহৎপুর নামক গ্রামে তারকেশ্বরের ন্যায় শ্মশানেশ্বর শিবের মন্দির ও তৎপার্শ্বে একটি পুষ্করিণী আছে। রোগ আরোগ্য কামনায় বহু ব্যক্তি এই মন্দিরে আসিয়া ধর্ণা দেয়। চড়কের সময় এইস্থানে একটি মেলা হয়।

পাঁশকুড়া হইতে ৪ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে রঘুনাথবাড়ী গ্রামে রঘুনাথজীউ বা রামচন্দ্রের একটি মন্দির আছে। প্রতি বৎসর বিজয়া-দশমীর দিন হইতে এখানে সপ্তাহব্যাপী একটি মেলা হয়। রঘুনাথজীর মন্দির প্রাঙ্গনে একটি ছোট কামান আছে। উহা কাশীজোড়ার ক্ষত্রিয়রাজগণের প্রাচীন কামান বলিয়া বিখ্যাত। রঘুনাথবাড়ী হইতে ৩ মাইল দূরে হরশঙ্কর গ্রামে এই রাজবংশের গড়ের চিহ্ন ও একটি বৃহৎ কামান দেখা যায়। রঘুনাথবাড়ীতে অতি সুন্দর ও মূল্যবান মছলন্দ বা মাদুর প্রস্তুত হয়।

পাঁশকুড়া স্টেশন হইতে এক মাইল দূরে প্রতাপপুর নামে একটি মুসলমানপ্রধান গ্রাম আছে। এখানকার হাটে প্রতি বৃহস্পতিবার অসংখ্য গরু, ছাগল, ভেড়া ও হাঁস প্রভৃতি বিক্রয় হয়। এখানে প্রচুর পরিমাণে তাঁতের কাপড় পাওয়া যায়।

তমলুক

পাঁশকুড়া হইতে মোটরযোগে মেদিনীপুর জেলার সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন স্থান তমলুকে যাইতে হয়। পাঁশকুড়া হইতে তমলুক ১৬ মাইল দূর। ইহা রূপনারায়ণ নদের পশ্চিম তটে অবস্থিত।

প্রাচীনকালে তমলুক বহু নামে পরিচিত ছিল, যথা, তাম্রলিপ্তি, তাম্রলিপ্ত, তমোলিপ্তি, দামলিপ্তি, বিষ্ণুগৃহ, বেলাকূল ইত্যাদি। চৈনিক পর্য্যটকগণ ইহাকে তেমোলিতি ও "তম্মোলিত্তি" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন পুরাকালে বাংলাদেশে দ্রাবিড় জাতির বিশেষ প্রাধান্য ছিল এবং তমলুক তাঁহাদেরই একটি প্রধান নগর ছিল। তামিল-জাতি যে বাংলাদেশ হইতে দক্ষিণদেশে গিয়াছিলেন এবং তৎকালীন বাংলার রাজধানী তমোলিত্তি বা তাম্রলিপ্ত হইতে তামিলজাতির নামকরণ হইয়াছে, অনেকেই পণ্ডিত কনকসভাই পিলের এই মত গ্রহণ করিয়াছেন। দ্রাবিড়, দামল বা তামল তামিল জাতির আবাসস্থল তাম্রলিপ্তির আদি নাম সম্ভবতঃ

দামলিপ্ত ছিল। দ্রাবিড় সভ্যতার প্রাধান্যে ঈর্ষান্বিত হইয়া আর্য্যগণ এই নগরের নাম "তমোলিপ্ত" বা অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত রাখেন বলিয়াও কেহ কেহ অনুমান করেন। পরে এইস্থানে আর্য্যসভ্যতার অভ্যুদয় হইলে তাঁহারা তমোলিপ্ত নামের ঘৃণাসূচক ব্যাখ্যারও পরিবর্ত্তন করেন। দ্রাবিড় বা দামল জাতিকে আর্য্যেরা ঘৃণাভরে অসুর বলিতেন। সম্ভবতঃ তাঁহাদের পরাজয়ের পর হইতেই তমোলিপ্ত "তাম্রলিপ্ত" বা "তাম্রলিপ্তি" নামে পরিচিত হয়। অসুরগণকে নিধনকালে কল্কিরূপধারী বিষ্ণুর দেহ হইতে ঘর্ম্ম নির্গত হইয়া এই স্থানে পতিত হওয়ায় ইহার পবিত্রতা সম্পাদিত হয়, এইরূপ একটি কাহিনীও আছে। এই জন্য আর্য্যগণ তমোলিপ্তের নাম দেন "বিষ্ণুগৃহ"।

মহাভারতে প্রাচীন তাম্রলিপ্ত রাজ্যের উল্লেখ আছে। অনেকের মতে এখানে মহাভারতোক্ত তাম্রধ্বজ রাজার রাজধানী ছিল। তাম্রধ্বজ পাণ্ডবগণের অশ্বমেধযজ্ঞের অশ্ব ধারণ করেন ও মহাবীর অর্জ্জুনের সহিত তাঁহার ঘোরতর যুদ্ধ হয়। তাঁহার বীরত্বে প্রীত হইয়া কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন তাঁহার সহিত সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হন। রাজা তাম্রধ্বজের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া কথিত কৃষ্ণার্জ্জুনের মূর্ত্তি এখনও তমলুকের রাজবাড়ীতে জিষ্ণু হরি নামে পূজিত হইতেছে। প্রায় ত্রিশ একর জমির উপর প্রাচীন রাজবাটীর ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান। কথিত আছে, রাজা তাম্রধ্বজ ও তাঁহার রাণী এক প্রকাণ্ড দীঘি খনন করাইয়া তাহার মধ্যে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করিবার সময় উভয়ে জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। ঐ দীঘিটি বর্ত্তমানে "খাটপুকুর" নামে পরিচিত।

জৈন কল্পসূত্র গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে খৃষ্টপূর্ব্ব অষ্টম শতাব্দীতে ত্রয়োবিংশ তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে পুণ্ড্র, রাঢ় ও তাম্রলিপ্তে চতুর্যাম ধর্ম্ম প্রচার করেন।

বৌদ্ধগ্রন্থের নানাস্থানেও তাম্রলিপ্তের নাম পাওয়া যায়। তৎকালে ইহা সমুদ্রতীরে অবস্থিত ছিল এবং তজ্জন্য ইহার অপর নাম ছিল বেলাকূল। তাম্রলিপ্ত বন্দরের খ্যাতি তখন সমগ্র জগতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। সে সময়ে এখানে জাহাজ নির্ম্মিত হইত। কথিত আছে, যে বৎসর বুদ্ধদেব মহাপরিনির্ব্বাণ লাভ করেন সেই বৎসর বাংলার রাজা সিংহবাহুর পুত্র বিজয়সিংহ তাম্রলিপ্তে নির্ম্মিত জাহাজ লইয়া সিংহলদ্বীপ জয় করেন। বিজয়সিংহের নাম হইতেই সিংহল নামের উৎপত্তি হয়।

প্রসিদ্ধ বৌদ্ধগ্রন্থ মহাবংশে উল্লিখিত আছে যে খৃষ্টপূর্ব্ব ৩০৭ অব্দে তাম্রলিপ্ত একটি প্রসিদ্ধ সামুদ্রিক বন্দর ছিল এবং ঐ স্থান হইতেই পবিত্র বোধিদ্রুম সিংহলে প্রেরিত হইয়াছিল। বৌদ্ধ ভারতের প্রধান সঙ্ঘারাম তৎকালে তাম্রলিপ্তে অবস্থিত ছিল।

সম্রাট অশোকের সময় তাম্রলিপ্ত মৌর্য্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়ার পর সম্রাট অশোক সাম্রাজ্যের নানাস্থানে ধর্ম্মানুশাসন ও ধর্ম্মরাজিকা প্রতিষ্ঠা করেন। অনুশাসনগুলি প্রস্তরস্তম্ভে খোদিত হইত। তাম্রলিপ্তনগরেও একটি অশোকস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। হর্ষবর্দ্ধনের রাজত্বকালে খৃষ্টীয় সপ্তম শতকে চৈনিক পর্য্যটক য়ুয়ান্ চোয়াঙ উহা দেখিয়াছিলেন।

প্রিয়দর্শী সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে যখন বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ পৃথিবীর দিকে দিকে বুদ্ধদেবের বাণী বহন করিয়া লইয়া যাইতেছিলেন, সেই সময়ে মহারাজ অশোকের পুত্র মহেন্দ্র সিংহলরাজ তিষ্যের আমন্ত্রণে খৃষ্টপূর্ব্ব ২৪৩ অব্দে ভিক্ষু ও ভিক্ষুনীসহ তাম্রলিপ্ত বন্দর হইতে সিংহলে যাত্রা করেন। তৎকালে ভারতবর্ষ হইতে সিংহল, চীন ও জাপান প্রভৃতি দেশে যাইবার জন্য তাম্রলিপ্ত প্রধান বন্দর ছিল।

পরবর্ত্তীকালে গুপ্তরাজগণ, বঙ্গরাজ শশাঙ্ক ও সম্রাট হর্ষবর্দ্ধন তাম্রলিপ্ত জয় করেন।

চৈনিক পর্য্যটকগণের লিখিত বিবরণ হইতে তাম্রলিপ্ত সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়। গুপ্ত সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে ইতিহাস বিশ্রুত চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়ান ভারত ভ্রমণে আগমন করেন এবং তাঁহার ভ্রমণকালের শেষ দুই বৎসর ৪১১-৪১২ খৃষ্টাব্দ তাম্রলিপ্ত নগরে অবস্থান করিয়া বহু বৌদ্ধগ্রন্থের প্রতিলিপি ও দেবমূর্ত্তির চিত্র গ্রহণ করেন। তিনি তাম্রলিপ্তে ২৪টি সঙ্ঘারাম ও বহু বৌদ্ধশ্রমণ দেখিয়াছিলেন। এই স্থান হইতেই তিনি সিংহলে গমন করেন।

য়ুয়ান্ চোয়াঙের কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। তিনিও তাম্রলিপ্তের বাণিজ্যসম্পদ দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে লিখিত আছে যে তিনি সমতট অর্থাৎ বর্ত্তমান ঢাকা হইতে পশ্চিমদিকে নয় শত "লি" অতিক্রম করিয়া তাম্রলিপ্তে উপস্থিত হন। তখন তাম্রলিপ্ত বঙ্গোপসাগরের উপকূলস্থ নিম্নভূমিতে অবস্থিত ছিল। রাজ্যের পরিধি ছিল ১৪০০ "লি" এবং রাজধানীর বিস্তার ১০ লি'র অধিক ছিল। তাম্রলিপ্তে তখন ১০টি বৌদ্ধ মঠ ছিল এবং এক হাজারের উপর বৌদ্ধ ভিক্ষু ছিলেন। নগরের এক প্রান্তে প্রায় একশত ফুট উচ্চ একটি অশোকস্তম্ভ ছিল। ইহা ছাড়া য়ুয়ান্ চোয়াঙ তাম্রলিপ্তে ৫০টি হিন্দু মন্দির দেখিয়াছিলেন। অধিবাসীরা পরিশ্রমী, উদ্যোগী, সাহসী ও সমৃদ্ধ ছিলেন। য়ুয়ান্ চোয়াঙ আরও লিখিয়াছেন যে ৬৩৫ খৃষ্টাব্দে তাম্রলিপ্ত সমুদ্রসলিলের দ্বারা প্লাবিত হইয়াছিল।

ইহার পর ৬৭৩ খৃষ্টাব্দে ই-চিং নামক আর একজন বৌদ্ধ পর্য্যটক সেঙ্ চউ নগর হইতে সমুদ্রপথে ভাগীরথীর সঙ্গমস্থলে তাম্রলিপ্ত নগরে আগমন করেন। তিনি সংস্কৃত শিক্ষার জন্য কয়েক বৎসর নালন্দার মহাবিহারে অবস্থান করিয়া পুনরায় তাম্রলিপ্ত হইতে জাহাজযোগে দক্ষিণদিকে গমন করেন। তিনি লিখিয়াছেন যে তৎকালে তাম্রলিপ্ত রাজ্য উত্তর-দক্ষিণে চারিশত যোজন ও পূর্ব্ব-পশ্চিমে তিনশত যোজনের অধিক ছিল। শ্রীনালন্দা ও "মহাবোধি" হইতে ইহার দূরত্ব প্রায় ৬০ যোজন। ই-চিং তাম্রলিপ্তে পাঁচ ছয়টি ধর্ম্মমন্দির দেখিয়াছিলেন। তিনি এই স্থানের অধিবাসিগণকে ধনী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

ই-চিংয়ের পর আরও কয়েকজন বৌদ্ধ চৈনিক পর্য্যটক তাম্রলিপ্ত বন্দর দিয়া ভারতে আগমন করিয়াছিলেন এবং তাহারাও তাম্রলিপ্তের কথা সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন।

চীন সম্রাটের আমন্ত্রণে আচার্য্য বোধিধর্ম্ম ৫২৬ খৃষ্টাব্দে তাম্রলিপ্ত হইয়া সমুদ্রপথে ক্যাণ্টন যাত্রা করেন। তাঁহার কাষায় বস্ত্র ও ভিক্ষা-ভাণ্ড জাপানের ইকরুণ মঠে বহুকাল সসম্মানে রক্ষিত ছিল। তিনি "প্রজ্ঞাপারমিতহৃদয়সূত্র" ও "উষ্ণীষবিজয়ধারিণী" নামক বঙ্গাক্ষরে লিখিত দুইখানি গ্রন্থ সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। জাপানের প্রসিদ্ধ হোরিউজি মঠ হইতে ঐ গ্রন্থ দুইখানি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

একাদশ শতাব্দীতে ওড়িষ্যারাজ চোল গঙ্গদেব মেদিনীপুর জয় করেন। সেই সময় হইতেই তাম্রলিপ্ত বন্দরের অধঃপতনের সূত্রপাত হয়। সমুদ্র ক্রমে ক্রমে এই স্থান হইতে বহুদূরে সরিয়া গিয়া এই প্রসিদ্ধ বন্দরকে বর্ত্তমানে একটি নগণ্য উপনগরে পরিণত করিয়াছে।

বর্ম্মার পেগু জেলার কল্যাণী গ্রামে যে শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা হইতে জানা যায় যে খৃষ্টীয় দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তাম্রলিপ্ত হইতে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ পেগুতে গিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন।

তমলুকের বর্গভীমাদেবীর মন্দির একটি প্রাচীন কীর্ত্তি। ইহার শিল্পনৈপুণ্য অতি অপূর্ব্ব। সেই জন্য সাধারণ লোকের ধারণা যে ইহা বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত। কবে এবং কাহার দ্বারা যে এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহা জানা যায় নাই। রূপনারায়ণ নদের তটে একটি উচ্চ ভূখণ্ডে উন্নত পাদ-পীঠের উপর এই মন্দিরটি অবস্থিত। এই মন্দিরের উন্নত চূড়া বহুদুর হইতে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অনেকে অনুমান করেন, সম্রাট অশোক তাম্রলিপ্তে যে স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন উত্তরকালে তাহার উপরই এই মন্দিরটি নির্ম্মিত হইয়াছে। মন্দিরটির বহির্ভাগের গঠনপ্রণালী বাংলার স্থাপত্যরীতি হইতে পৃথক। ভিতরের গঠনপ্রণালী বৌদ্ধ বিহারের সদৃশ ও বুদ্ধগয়ার মন্দিরের অনুরূপ। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব লুপ্ত হইলে কোন পরিত্যক্ত বৌদ্ধ বিহারই হিন্দুমন্দিরে পরিণত হয়। ৩০ ফুট উচ্চ বুনিয়াদের উপর মূল মন্দিরটি প্রায় ৬০ ফুট উচ্চ। অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে মনে হয় যে ছাদটি যেন একখণ্ড অতি বৃহৎ শ্বেতপ্রস্তরের চাপ হইতে কুঁদিয়া তৈয়ারী করা হইয়াছে। খাঁজ কাটিয়া প্রস্তর খোদাই করা হইয়াছে বলিয়াই ইহার শোভা হইয়াছে অতি অনুপম এবং কোথাও জোড় আছে বলিয়া ধরা যায় না। মূল মন্দিরটির সম্মুখে "যজ্ঞমন্দির" নামে আর একটি মন্দির আছে। এই দুইটি মন্দির "জগমোহন" নামে একটি খিলানের দ্বারা সংযুক্ত। যজ্ঞমন্দিরের সম্মুখে বলিদান ও গীতবাদ্যাদির জন্য "নাটমন্দির" আছে। উহার সম্মুখে তোরণ ও নহবৎখানা।

একখণ্ড প্রস্তরের সম্মুখভাগ কুঁদিয়া বর্গভীমা দেবীর মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছে। এই ধরণের নির্ম্মাণপ্রণালী বড় একটা দেখা যায় না। মূর্ত্তিটি উগ্রতারা মূর্ত্তির অনুরূপ। দেবীমূর্ত্তির বেদীর নিম্নে সোপানশ্রেণীর মধ্যে "ভূতিনাথ" ভৈরব অবস্থিত। বর্গভীমা দেবী বিশেষ জাগ্রত দেবতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। কথিত আছে বহুদেবমূর্ত্তি-ভগ্নকারী কালাপাহাড় ওড়িষ্যা বিজয় অভিযানের পথে এই দেবীকে দর্শন করিয়া বিশেষ মুগ্ধ হন এবং ফারসীতে একখানি দলিল লিখিয়া দিয়া যান। "বাদশাহী পাঞ্জা" নামে অভিহিত দলিলখানি আজিও বর্গভীমার পূজকগণের নিকট আছে। দুর্দ্দান্ত মহারাষ্ট্রীয় বর্গীগণ নিম্নবঙ্গের সর্ব্বত্র নিদারুণ অত্যাচার করিলেও এই দেবীর ভয়ে তমলুকে কোন প্রকার অত্যাচার করিতে সাহস করিত না। বরং এই দেবীকে তাহারা বহু অলঙ্কারে সাজাইয়া ষোড়শোপচারে পূজা দিত।

বর্গভীমাদেবী একান্নপীঠের অন্তর্গত না হইলেও অনেকে ইহাকে উপপীঠ মনে করেন এবং সেই জন্য এই মন্দিরের চতুর্দ্দিকস্থ একটি নির্দ্দিষ্ট অঞ্চলের মধ্যে তাঁহারা অপর কোন দেবী প্রতিমা গঠন করিয়া পূজা করেন না।

বর্গভীমা দেবীর প্রকাশ সম্বন্ধে তিনটি কিংবদন্তী আছে। প্রথম কিংবদন্তীর মতে সুপ্রসিদ্ধ ধনপতি সদাগর যখন সিংহলে বাণিজ্য-যাত্রা করেন তখন তাম্রলিপ্তে তিনি এক ব্যক্তির হস্তে একটি সুবর্ণ ভৃঙ্গার দেখিয়া সে উহা কোথায় পাইল তাহা জিজ্ঞাসা করেন। সে উত্তর দেয় যে নগরের প্রান্তবর্ত্তী অরণ্যে এক অদ্ভুত কুণ্ড আছে। উহার জলে পিতলের জিনিস ডুবাইলে তাহা সোণার হইয়া যায়। এই কথা শুনিয়া ধনপতি তাম্রলিপ্তের বাজারের সমস্ত পিতলের জিনিস কিনিয়া সেই

কুণ্ডে ডুবাইয়া সমুদয় পিতলকে স্বর্ণে পরিণত করেন। সিংহল পত্তনে সেই সোণা বিক্রয় করিয়া তিনি বহু অর্থ লাভ করেন। গৃহে ফিরিবার সময় ধনপতি সেই কুণ্ডে আসিয়া বর্গভীমাদেবীর প্রতিষ্ঠা ও মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন।

দ্বিতীয় প্রবাদ অনুসারে একজন ধীবর রমণী তাম্রলিপ্ত-রাজ তাম্রধ্বজের রাজসংসারে প্রত্যহ মাছের যোগান দিত। একদিন পূর্ব্বোক্ত অরণ্য পথে আসিবার সময় ধীবর রমণী উক্ত কুণ্ড হইতে কিছু জল লইয়া মৃত মৎস্যের উপর ছিটাইয়া দেয়। দেখিতে দেখিতে মৎস্যগুলি পুনর্জ্জীবন লাভ করে। এই সংবাদ তাম্রধ্বজের কর্ণগোচর হইলে তিনি ধীবর রমণীকে সঙ্গে লইয়া কুণ্ডটি দেখিতে যান। কিন্তু কুণ্ডের পরিবর্ত্তে সেখানে একটি বেদী ও তদুপরি এক প্রস্তরময়ী দেবী মূর্ত্তি দেখিতে পান। তাম্রধ্বজ তথায় একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেবীর যথাবিহিত পূজার ব্যবস্থা করেন।

তৃতীয় প্রবাদ অনুসারে কৈবর্ত্ত রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা কালু ভুঁইয়া বর্গভীমাদেবীর প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রাচীন কাল হইতেই তাম্রলিপ্ত হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয়েরই নিকট প্রসিদ্ধ স্থান। পুরাকালে ইহা হিন্দুগণের একটি বিখ্যাত তীর্থক্ষেত্র ছিল। ব্রহ্মপুরাণে বর্ণিত আছে যে দক্ষযজ্ঞে শিব দক্ষকে নিহত করিলে ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপে দক্ষের ছিন্ন মস্তক তাঁহার হস্তে আবদ্ধ হইয়া যায়। পাপমোচনের জন্য শিব বহু তীর্থে ভ্রমণ করেন, কিন্তু হস্ত হইতে কপাল বা মস্তক কিছুতেই মুক্ত হয় না। অতঃপর বিষ্ণুর নির্দ্দেশক্রমে তিনি তমলুকের একটি অজ্ঞাত তীর্থে আসিয়া স্নান করায় দক্ষ-শির তাঁহার হস্ত হইতে মুক্ত হয়। এই জন্য এই তীর্থটির নাম হয় "কপাল-মোচন"। কপালমোচন সরোবরের নাম ও মাহাত্ম্য বহু গ্রন্থে উল্লিখিত আছে। কালক্রমে এই সরোবরটি রূপনারায়ণ নদের কুক্ষিগত হইয়াছে। কিন্তু আজও প্রতি বৎসর বারুণী উপলক্ষে বহু নরনারী বর্গভীমাদেবীর মন্দিরের প্রান্তবাহী রূপনারায়ণে স্নান করিয়া কপাল-মোচন তীর্থ স্নানের পুণ্যকার্য্য সমাধা করেন।

তমলুকের খাট পুকুরের পশ্চিম তীরে অবস্থিত একখানি পাথরকে লোকে "নেতা ধোপানীর পাট" নামে অভিহিত করে। মনসার ভাসান গানে উল্লিখিত আছে যে নেতা ধোপানীর সহায়তায় বেহুলা মৃত পতি লখিন্দরের প্রাণ ফিরিয়া পাইয়াছিলেন। পৌষ সংক্রান্তির সময় এখানে একটি বৃহৎ মেলা হয়।

তমলুকে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর একটি মন্দির আছে। কথিত আছে যে গৌরাঙ্গ দেবের অন্যতম পার্ষদ বাসুদেব ঘোষ ঠাকুর এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

প্রাচীন তাম্রলিপ্ত নগরকে পটভূমি করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার "যুগলাঙ্গুরীয়" নামক উপন্যাস রচনা করেন।

তমলুকের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত এই স্থানে কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন।

তমলুক হইতে মোটরবাস যোগে নন্দকুমার নামক স্থান হইয়া মহিষাদলে যাইতে হয়। নন্দকুমান গ্রামে স্বনামখ্যাত মহারাজ নন্দকুমারের একটি বাটী ছিল। এখনও এই বাটীর ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান আছে।

মহিষাদল—মহিষাদলে রাজা উপাধিধারী একটি প্রাচীন জমিদার বংশের বাস। পরিখা-বেষ্টিত রাজবাটী দেখিতে অতি সুন্দর। রাজাদের সতের চূড়ার একটি বৃহৎ ও বিখ্যাত রথ আছে। প্রতি বৎসর রথযাত্রার সময় এখানে বহু লোকের সমাগম হয়। রাজবংশের প্রতিষ্ঠিত নবরত্ন মন্দির, রামচন্দ্রের মন্দির, গোপীনাথের মন্দির, সিংহবাহিনী দেবী এবং দধিবামন বিগ্রহ উল্লেখযোগ্য।

দোরো সুতাহাটা—মহিষাদল হইতে একটি মোটর রাস্তা দোরো সুতাহাটা পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই স্থানে নীল প্রস্তরে নির্ম্মিত মাধব, সাগর মাধব ও নীল মাধব নামক তিনটি অতি সুন্দর প্রাচীন বিগ্রহ আছে। অনেকে এই মূর্ত্তিগুলিকে বৌদ্ধ যুগের বলিয়া অনুমান করেন। দোরোতে রাজা যাদবরাম রায় নামে এক দানশীল জমিদার বাস করিতেন। তাঁহার পুত্রবধূ রাজা কুমার নারায়ণের পত্নী রাণী সুগন্ধা দেভোগ নামক স্থানে অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে একটি সুন্দর নবরত্ন মন্দির ও এক বৃহৎ দীর্ঘিকা প্রতিষ্ঠা করেন। ইহাও এই অঞ্চলের দ্রষ্টব্য বস্তু।

ময়না—তমলুক হইতে ময়না বা প্রাচীন ময়নাগড় নয় মাইল। নবম শতাব্দীতে ধর্ম্মপাল যখন গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত, সেই সময়ে ময়নাগড়ে কর্ণসেন নামে এক রাজা ছিলেন। বীরভূম জেলার অন্তর্গত অজয়গড়ের সামন্ত গোপ-রাজ সোম ঘোষের পুত্র ইছাই ঘোষ বিদ্রোহী হইয়া কর্ণসেনকে পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত করেন, যুদ্ধে কর্ণসেনের ছয় পুত্র নিহত হয় এবং সেই শোকে কর্ণসেনের পত্নী প্রাণত্যাগ করেন। ইছাই ঘোষ মহাশক্তি ও ভবানী দেবীর বরপুত্র বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহাকে ধ্বংস করিবার জন্য রাজা কর্ণসেন গৌড়েশ্বর ধর্ম্মপালের আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং তাঁহার শ্যালিকা ধর্ম্মউপাসিকা রঞ্জাবতীর পাণিগ্রহণ করেন। ধর্ম্মপালের মহিষী স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া কর্ণসেনের সহিত রঞ্জাবতীর বিবাহ দেন। ধর্ম্মঠাকুরের বরে রঞ্জাবতীর গর্ভে লাউসেন নামে কর্ণসেনের এক পুত্র হয়। ধর্ম্মের বরপুত্র মহাবীর লাউসেন ভবানীর বরপুত্র ইছাই ঘোষকে যুদ্ধে নিহত করিয়া পিতার হৃতরাজ্যের পুনরুদ্ধার করেন। লাউসেন কামরূপকামাখ্যা পর্য্যন্ত জয় করিয়াছিলেন। মাণিক গাঙ্গুলীর ও মহাকবি ঘনরাম চক্রবর্ত্তীর "ধর্ম্ম মঙ্গল" কাব্যে লাউসেনের বীরত্বের কাহিনী সবিস্তারে বর্ণিত আছে। ময়নাগড়ের রঙ্কিনী নাম্নী কালী ও লোকেশ্বর শিব এবং ময়নার সন্নিকটবর্ত্তী বৃন্দাবন চকের ধর্ম্মঠাকুর লাউসেন কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বলিয়া লোকের বিশ্বাস। ইছাই ঘোষের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ অজয়গড় বা অজয়ঢেকুর অজয়নদের তীরে আজও দেখা যায়।

ময়নাগড়ের প্রাচীন কীর্ত্তি আজও কিছু কিছু বর্ত্তমান আছে। ভিতরগড়ের ক্ষেত্রফল ৬২,৫০০ বর্গফুট, উহার চতুর্দ্দিকে পরিখার প্রত্যেকটির দৈর্ঘ্য ৭০০ ফুটেরও অধিক। বাহিরগড় বা দ্বিতীয় পরিখার প্রত্যেকটির দৈর্ঘ্য প্রায় ১,৪০০ ফুট। ভিতর ও বাহির উভয় গড়ের পরিখার বিস্তৃতি প্রায় ১৫০ ফুট। বর্গীদের উপদ্রবের সময় অনেকে নিরাপত্তার জন্য এই গড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। উভয় পরিখার মধ্যবর্ত্তী স্থান গভীর জঙ্গলে আবৃত। এই জঙ্গলের মধ্যে হরিণ ও ময়ূর দেখিতে পাওয়া যায়। জঙ্গলের মধ্যে কামান বসাইবার উচু ঢিপি এখনও বর্ত্তমান আছে।

ময়নার নিকটবর্ত্তী গোকুলনগরে সুন্দর সুন্দর নেটের মশারি প্রস্তুত হয়।

বালিচক্—হাওড়া হইতে ৫৭ মাইল দুর। ইহা একটি বাণিজ্য-প্রধান স্থান। এখানে অনেকগুলি চাউলের কল আছে। এখান হইতে দক্ষিণে সবঙ্গ ও উত্তরে লোয়াদা পর্য্যন্ত

মোটরবাস যাতায়াত করে। সবঙ্গ মাদুরের জন্য বিখ্যাত। লোয়াদা বাতাসা, মুগের জিলিপি ও গুড়ের জন্য প্রসিদ্ধ।

বালিচক্ হইতে ৩ মাইল দূরে কেদার নামক গ্রামে কেদারেশ্বর শিবের মন্দির আছে। ইনি "ভুড়ভুড়ি কেদার" বা চপলেশ্বর শিব নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ইহারই নামানুসারে এই পরগণার কেদারকুণ্ড নাম হইয়াছে। রাজা তোডরমল্লের রাজস্ব তালিকায় কেদারকুণ্ড পরগণার নাম দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং অনুমিত হয় যে তৎপূর্ব্ব হইতেই এখানে এই শিব প্রতিষ্ঠিত আছেন। রাজা যুগলকিশোর রায় নামক জনৈক প্রাচীন জমিদার এই শিবমন্দিরের নির্ম্মাতা বলিয়া কথিত। মন্দিরের পার্শ্ববর্ত্তী একটি কুণ্ড হইতে সর্ব্বদাই ভুড়ভুড় শব্দে বুদ্বুদ উঠে। এই জন্য শিবের নাম ভুড়ভুড়ি কেদার হইয়াছে। সম্ভবতঃ নিকটস্থ ক্ষীরাই নদীর সহিত এই কুণ্ডের কোনরূপ যোগ থাকার জন্য এইরূপ জল বুদ্বুদ উঠিয়া থাকে। পৌষ সংক্রান্তিতে এই কুণ্ডে স্নান করিলে সন্তান লাভ করা যায় এই বিশ্বাসে বহু নারী ঐ দিনে এখানে সমাবেত হন এবং তদুপলক্ষে এখানে সপ্তাহব্যাপী একটি মেলা বসে। বালিচক্ হইতে কেদার পর্য্যন্ত মোটরবাস পাওয়া যায়।

খড়গপুর জংশন—হাওড়া হইতে ৭২ মাইল। এখানে বাংলা নাগপুর রেলের গাড়ী তৈয়ারী ও মেরামতের বিরাট কারখানা অবস্থিত। রেলের কল্যাণে খড়গপুর একটি নগণ্য গণ্ডগ্রাম হইতে প্রশস্ত রাজবর্ত্ম শোভিত ও বিদ্যুৎ-আলোকোজ্জ্বল বিশাল শহরে পরিণত হইয়াছে। ইহা বাংলা নাগপুর রেলপথের একটি প্রধান জংশন। পূর্ব্বে এই স্থানে একটি বিস্তীর্ণ মরুভূমির মত তরুলতাহীন উচ্চ ভূখণ্ড ছিল; চারিদিকের সমতল ভূমি হইতে ইহা প্রায় ৪০ ফুট উচ্চ ছিল এবং লোকে ইহাকে "খড়গপুরের দমদমা" বলিত। ইহার উপর হইতে চতুর্দ্দিকে বহুদুর গ্রামগুলিকে নিম্নভূমি বলিয়া মনে হইত। খড়গপুরে মাটীর রঙের পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়। এখান হইতেই পাথুরে মাটী ও গৈরিক রঙ্ আরম্ভ হইয়াছে। এখানকার প্লাটফরম খুব দীর্ঘ; ইহা পৃথিবীর বৃহত্তম রেলওয়ে প্লাটফরমগুলির মধ্যে অন্যতম বলিয়া পরিগণিত।

স্টেশনের নিকটে ইন্দাগ্রামে খড়েগশ্বর নামে শিবের একটি পুরাতন মন্দির আছে। ইহা খড়গপুর থানার কলাইকুণ্ডা গ্রামের ধারেন্দার রাজা খড়গসিংহের নির্ম্মিত; মতান্তরে বিষ্ণুপুর রাজ খড়গমল্ল ইহার প্রতিষ্ঠাতা। মন্দিরটি একটি বিস্তৃত প্রান্তরের মধ্যে অবস্থিত। এই স্থানের নাম "হিড়িম্বডাঙ্গা"। প্রবাদ, বনবাসকালে পঞ্চ পাণ্ডব এই স্থানে আগমন করিলে হিড়িম্ব রাক্ষসের সহিত তাঁহাদের সংঘর্ষ হয় এবং ভীমের হস্তে হিড়িম্বের নিধন ঘটে। হিড়িম্বের ভগিনী হিড়িম্বা ভীমের রূপে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করে। হিড়িম্বের নাম হইতেই "হিড়িম্বডাঙ্গা" নাম। খড়গপুর স্টেশনের চারি মাইল পূর্ব্বদিকে চাঙ্গুয়াল গ্রামে প্রস্তরনির্ম্মিত প্রাসাদ, সেনানিবাস ও গড়ের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। এইগুলি এবং নিকটস্থ ঘোলাদীঘি গ্রামের "বীর সরোবর" প্রভৃতি বৃহৎ জলাশয় রাজা বীরসিংহ এবং তাঁহার বংশধরগণের কীর্ত্তি। ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ড নামক গ্রন্থপাঠে জানা যায় যে চতুর্দ্দশ শতকের প্রথম ভাগে দামোদর তীরে হেমসিংহ নামে এক ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন। তাহার ভ্রাতা বীরসিংহ তাম্রলিপ্ত, কর্ণদুগ ও বরদাভূমি জয় করেন। চাঙ্গুয়ালে তাঁহার রাজধানী ছিল।

কেশিয়াড়ী

খড়গপুর হইতে ১৬ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে কেশিয়াড়ী নামে একটি গ্রাম আছে। খড়গপুর হইতে এই স্থানে মোটরবাসে যাওয়া যায়। এককালে নানা বর্ণের তসরের কাপড়ের জন্য এই

স্থানের প্রসিদ্ধি ছিল। এখনও এই স্থানে রেশমের কারবার আছে। কেশিয়াড়ীর সর্ব্বমঙ্গলা মন্দির নিকটস্থ মঙ্গলমাড়ো নামক পল্লীতে অবস্থিত। এই মন্দিরটি একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য বস্তু। ইহার সিংহদ্বারের সম্মুখে একটি কৃষ্ণপ্রস্তর নির্ম্মিত মসৃণদেহ বৃষের মূর্ত্তি আছে। বৃষটির সম্মুখের দুইটি পা ভগ্ন। ইহা কালাপাহাড়ের অত্যাচারের চিহ্ন বলিয়া কথিত। মন্দিরের সোপানের দুই পার্শ্বে দুইটি ছয় হাত উচ্চ প্রস্তরনির্ম্মিত সিংহের মূর্ত্তি ও সম্মুখে বারটি খিলানযুক্ত "বারদুয়ারী" নামে একটি নাটমন্দির দৃষ্ট হয়। বারদুয়ারীর পরে জগমোহন মন্দির, এখানে যাবতীয় পূজাপাঠ হইয়া থাকে। এখানে কৃষ্ণপ্রস্তর নির্ম্মিত একটি গণেশমূর্ত্তি, খড়্গ ও ত্রিশূলধারী মহাকাল মূর্ত্তি ও ত্রিশূলহস্তা কালভৈরবীর মূর্ত্তি আছে। জগমোহনের ভিতর দিয়া মূলমন্দিরে যাইতে হয়। উচ্চ পাদপীঠের উপর প্রস্তর নির্ম্মিত সর্ব্বমঙ্গলা মূর্ত্তি অবস্থিত। দেবীর মুখমণ্ডল সিন্দুরলিপ্ত, অঙ্গে বহু স্বর্ণালঙ্কার, দক্ষিণপদ বেদীর নিম্নদেশস্থ সিংহের উপর এবং বামপদ স্বীয় দক্ষিণ উরুর উপর সংস্থাপিত। দেবীর উভয় পার্শ্বে জয়া ও বিজয়ার প্রস্তর মূর্ত্তি। বেদীর বামপার্শ্বে একটি ছোট মঞ্চের উপর সর্ব্বমঙ্গলা, জয়া ও বিজয়ার পিত্তল নির্ম্মিত ভোগমূর্ত্তি অবস্থিত। সর্ব্বমঙ্গলাদেবীর ভোগমূর্ত্তি বিজয়মঙ্গলা নামে অভিহিত। পর্ব্বোপলক্ষে এই মূর্ত্তিত্রয়কে জগমোহন মন্দিরে আনিয়া অর্চ্চনা করা হয়।

সর্ব্বমঙ্গলার মন্দিরে বৌদ্ধপ্রভাবের চিহ্ন যথেষ্ট পরিলক্ষিত হয়। কালভৈরবের মূর্ত্তিটির গঠন-প্রণালী বুদ্ধমূর্ত্তির অনুরূপ। অন্যান্য স্থানে পশুবলি যেরূপ দেবীর সম্মুখভাগে হইয়া থাকে, এখানে কিন্তু সেরূপ নহে। মূলমন্দিরের দক্ষিণদিকে একটি প্রাচীর বেষ্টিত স্থানে লোক চক্ষুর অগোচরে এখানে বলির কার্য্য সমাধা হয়। ইহাও বৌদ্ধপ্রভাবের লক্ষণ বলিয়া অনুমিত হয়।

বিজয়মঙ্গলা মূর্ত্তির পাদপীঠের ও জগমোহনের দেউলসংলগ্ন প্রস্তরলিপি হইতে জানা যায় যে ১৬০৪ খৃষ্টাব্দে (১৫২৯ শকাব্দে) জমিদার রঘুনাথ শর্ম্মার পুত্র চক্রধর ভূঞা দেবীমন্দির ও জগমোহনের প্রতিষ্ঠা করেন। কর্ম্মকার রঘুনাথ কামিলা বিজয়মঙ্গলা মূর্ত্তির ও রাজমিস্ত্রী বাসুরাম জগমোহন মন্দির নির্ম্মাণ করেন। বারদুয়ারীর প্রস্তরফলক হইতে জানা যায় যে ১৬১০ খৃষ্টাব্দে সুন্দর দাস নামক জনৈক রাজকর্ম্মচারী রাজমিস্ত্রি বনমালী দাসের দ্বারা উহা নির্ম্মাণ করান।

মুঘল শাসনকালে কেশিয়াড়ীতে একটি তহশীল কাছারি থাকায় বহু মুসলমান এখানে বাস করিতেন। তাঁহারা যে অংশে বাস করিতেন তাহা আজও "মোগলপাড়া" নামে পরিচিত। একটি প্রাচীন মসজিদের প্রস্তরফলক হইতে জানা যায় যে উহা সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল। নিকটস্থ "তল কেশিয়াড়ী" গ্রামে বাদশাহ শাহ্ আলমের আমলে নির্ম্মিত অপর একটি মসজিদ আছে।

কেশিয়াড়ির তিন মাইল দূরে কুরুমবেড়া দুর্গ নামে একটি প্রাচীন ভগ্ন দুর্গ আছে। দুর্গের প্রাঙ্গনে একই প্রাচীর বেষ্টনীর মধ্যে একটি মন্দির ও একটি মসজিদ জীর্ণ অবস্থায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

খড়্গপুর জংশন হইতে বাংলা নাগপুর রেলপথের প্রধান লাইন টাটানগর, চক্রধরপুর প্রভৃতি হইয়া নাগপুর গিয়াছে এবং একটি শাখা মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া অভিমুখে ও অপরটি কটক, ভুবনেশ্বর, পুরী ও মাদ্রাজের দিকে গিয়াছে।

শেষোক্ত শাখাপথে দাঁতন মেদিনীপুর জেলার তথা বাংলার শেষ স্টেশন; খড়্গপুর ও দাঁতনের মধ্যে নারায়ণগড় ও কাঁথি রোড উল্লেখযোগ্য স্টেশন।

নারায়ণগড়—খড়্গপুর হইতে নারায়ণগড় ১৪ মাইল দূর। হান্দোলগড় নামে এখানে একটি প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষ নারায়ণগড়ের প্রাচীন রাজবংশের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। এই দুর্গের পশ্চিম পার্শ্ব দিয়া কটক যাইবার রাস্তা গিয়াছে। শ্রীচৈতন্যদেব এই পথ দিয়া পুরী গিয়াছিলেন। এখানে ধলেশ্বর নামক এক শিবের মন্দির আছে। কথিত আছে যে শ্রীচৈতন্যদেব এই মন্দিরের প্রাঙ্গনে হরিনাম কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। তৎকালে এখানে কেশব সামন্ত নামে একজন ধনী ভূস্বামী বাস করিতেন। চৈতন্যদেবের মহিমা দর্শনে মুগ্ধ হইয়া কেশব তাঁহার ভক্ত হন।

পূর্ব্বকালে নারায়ণগড়ের চারিদিকে চারিটি দরজা ছিল। ইহার মধ্যে প্রধান দরজাটি পশ্চিম দিকে অবস্থিত পুরী যাইবার রাস্তার উপর অবস্থিত ছিল এবং উহার নাম ছিল "যম দুয়ার"। এই রাস্তার উভয় পার্শ্বে হিংস্র জন্তু পরিপূর্ণ গভীর অরণ্য ছিল। এই দরজাটি বন্ধ করিয়া দিলে ওড়িষ্যা যাইবার পথ বন্ধ থাকিত। কথিত আছে, ওড়িষ্যায় যাইতে হইলে এই দরজার নিকট নারায়ণগড়ের রাজার "ছাড় পত্র" লইয়া তবে যাইতে পারা যাইত। দ্বিতীয় দরজার নাম "সিদ্ধেশ্বর দরজা"। উহার নিকটে সিদ্ধেশ্বর নামে এক শিব ছিলেন। তৃতীয়টির নাম মৃন্ময় দরজা বা "মেটে দুয়ার"। উহার প্রাচীর এত বিস্তৃত ছিল যে তাহার উপর দিয়া তিনজন অশ্বারোহী পাশাপাশি যাইতে পারিত। চতুর্থ দরজাটির কোন চিহ্ন নাই। প্রবাদ উহা কেলেঘাই নদীর মধ্যে কোথাও অবস্থিত ছিল এবং এমন সুকৌশলে নির্ম্মিত হইয়াছিল যে প্রয়োজন হইলে উহা বন্ধ করিয়া নারায়ণগড়ের সমস্ত পথ জলপ্লাবিত করিয়া শত্রুর গতি প্রতিরোধ করা যাইত।

নারায়ণগড়ের প্রতিষ্ঠাতা গন্ধর্ব্ব পাল বিশেষ পরাক্রমশালী ছিলেন। তিনি ব্রহ্মাণী নামক এক দেবী মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করেন। পুরী যাত্রী মাত্রকেই প্রণামী দিয়া "ব্রহ্মাণী দেবীর ছাপ" নামক এক প্রকার মুদ্রা লইয়া পুরী প্রবেশ করিতে হইত। প্রবাদ ব্রহ্মাণী দেবীর প্রতিষ্ঠার দিন যে ঘৃত প্রদীপ জ্বালা হইয়াছিল, তাহা একাদিক্রমে ছয় শত বৎসর পর্য্যন্ত সমভাবে প্রজ্জ্বলিত ছিল। ১২৯০ খৃষ্টাব্দে এই রাজবংশের শেষ রাজা পৃথ্বীবল্লভের মৃত্যুর সাথে সাথে উহা হঠাৎ নিবিয়া যায়। এখনও এই স্থানে মাঘীপূর্ণিমার দিন একটি মেলা বসিয়া থাকে।

নিকটেই রাণীসাগর নামে প্রায় দুইশত বিঘা ব্যাপী একটি জলাশয় আছে। প্রবাদ, রাজা গন্ধর্ব্ব পালের মহিষী রাণী মধুমঞ্জরী রাত্রিশেষে স্বপ্ন দেখেন যে—কুলদেবতা ব্রহ্মাণী দেবী যেন তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া তাঁহার নিকট জল চাহিতেছেন। এই স্বপ্ন বৃত্তান্ত কুলগুরুর নিকট ব্যক্ত করিলে তাঁহার নির্দ্দেশ অনুযায়ী রাণী মধুমঞ্জরী এই বৃহৎ জলাশয় খনন করান।

সাহজাদা খুররম—উত্তরকালের সম্রাট শাহজাহান, পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া যখন সম্রাট সৈন্যের দ্বারা পরাজিত হইয়া মেদিনীপুরের মধ্য দিয়া দাক্ষিণাত্যে পলায়ন করেন, তখন নারায়ণগড়ের রাজা শ্যামবল্লভ এক রাত্রির মধ্যেই তাঁহার গমনের জন্য রাস্তা প্রস্তুত করিয়া দেন। এই উপকারের কথা স্মরণ করিয়া পরবর্ত্তী কালে সম্রাট শাহ্জাহান তাঁহাকে "মাড়ি সুলতান" বা "পথের রাজা" উপাধি প্রদান করেন। যে ফার্ম্মাণের দ্বারা এই উপাধি প্রদান করা হয় তাহার উপর রক্তচন্দনে সম্রাট শাহ্জাহানের পাঁচ আঙ্গুলের ছাপ ছিল।

নারায়ণগড়ের নিকটবর্ত্তী কসবা গ্রামে একটি প্রাচীন মসজিদ্ আছে। এই মসজিদের একটি শিলালেখন হইতে জানা যায় যে ১৬৫৩ খৃষ্টাব্দে সম্রাট শাহজাহানের দ্বিতীয় পুত্র বাংলার

তৎকালীন শাসন কর্ত্তা শাহসুজা কর্ত্তৃক উহা নির্ম্মিত হয়। এই মসজিদের উপর তিনটি গুম্বজ আছে। উহার মধ্যে একটির এখন ভগ্ন দশা।

কাঁথি রোড—স্টেশনের চলিত নাম বেলদা। এখানে একটি ধর্ম্মশালা আছে। স্টেশন হইতে মেদিনীপুর জেলার অন্যতম মহকুমা কাঁথির দূরত্ব মোটর বাস যোগে ৪০ মাইল। কাঁথি শহরে প্রভাত কুমার কলেজ নামে একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ, দুইটি উচচ ইংরেজী বিদ্যালয়, একটি সার্ভে স্কুল, একটি গুরু ট্রেণিং স্কুল, ব্রাহ্মসমাজ, হরিসভা ও রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম আছে। কাঁথি একটি স্বাস্থ্যকর স্থান। এখান হইতে সমুদ্র মাত্র ৫ মাইল দূর। সমুদ্রতীরে দীঘা ও জনপুট নামে দুইটি গ্রামে ডাক্‌বাংলা আছে। অনেকে সমুদ্র দর্শন ও হাওয়া পরিবর্ত্তনের জন্য তথায় যাইয়া থাকেন। পৌষ সংক্রান্তিতে সমুদ্রস্নানের জন্য জনপুটে বিস্তর যাত্রীর সমাগম হয়।

সমুদ্রতীরবর্ত্তী বীরকূল ও চাঁদপুর গ্রামও বেশ স্বাস্থ্যকর ও সুন্দর, ইংরেজ শাসনের প্রথম যুগে দার্জ্জিলিং, সিমলা প্রভৃতি পার্ব্বত্য নিবাস যখন অজ্ঞাত ছিল, তখন অনেক বিশিষ্ট রাজপুরুষ এই সকল স্থানে আসিয়া বিশ্রাম উপভোগ করিতেন। ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের গ্রীষ্মাবাস ছিল বীরকূল। তখনকার সরকারী কাগজ পত্রে বীরকূলের বহু উল্লেখ আছে।

কাঁথি শহর একটি বালিয়াড়ী বা উচচ বালুকা স্তূপের উপর অবস্থিত। এই বালিয়াড়ীটি পূর্ব্বে রশুলপুর নদীর মোহানা হইতে পশ্চিমে সুবর্ণরেখার মুখ পর্য্যন্ত প্রায় ২৬ মাইল দীর্ঘ। ইহার বিস্তৃতি স্থানভেদে এক মাইল হইতে আধ মাইলের মধ্যে। কাহারও কাহারও মতে বালিয়াড়ী বা বালির কাঁথ হইতে এই স্থানের নাম কাঁথি হইয়াছে। কাঁথি শহর হইতে ৯ মাইল উত্তর পূর্ব্বে অবস্থিত ফুলবাড়ী গ্রাম পরলোকগত জননায়ক দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল মহাশয়ের জন্মস্থান।

কাঁথি শহরের ৬ মাইল উত্তরে **বাহিরী** নামক একটি প্রাচীন গ্রামে বহু ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। এখানে ধনটিকরি, গোধনটিকরি, পালটিকরি ও শাপটিকরি নামে চারিটি মৃত্তিকার স্তূপ আছে। প্রবাদ, এইগুলি মহাভারতের বিরাট রাজার গোগৃহের ধ্বংসাবশেষ। অনেকের মতে এই স্থানে পূর্ব্বে একটি বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম ছিল এবং এই স্তূপ চতুষ্টয় বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ। এই গ্রামে এবং নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে পুষ্করিণী খননকালে বৌদ্ধ যুগের প্রস্তর মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

এখানে একটি প্রাচীন মঠ আছে। উহাতে এখন রামচন্দ্রের মূর্ত্তি পূজিত হয়। এই মঠের চতুর্দ্দিকের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অতি মনোরম।

এই গ্রামে ভীমসাগর, হেমসাগর ও লোহিত সাগর নামে তিনটি দীঘি আছে এবং তথায় "জাহাজ বাঁধা তেঁতুল গাছ" নামে একটি পুরাতন তেঁতুল গাছ আছে। এক সময় এই স্থান দিয়া একটি নদী বহিয়া যাইত। বড় বড় নৌকা বাঁধার চিহ্ন এই গাছে এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।

এগরা-হটনগর—কাঁথি শহর হইতে ১৭ মাইল উত্তর-পশ্চিমে এগরা থানার হটনগরে একটি প্রাচীন শিব মন্দির আছে। কথিত আছে ওড়িষ্যার স্বাধীন রাজা গজপতি মুকুন্দদেব এই শিবের প্রতিষ্ঠা করেন। শিবরাত্রির সময় এখানে বহু যাত্রীর সমাগম হয়। শিব মন্দিরের নিকটেই কৃষ্ণসাগর নামে একটি সুন্দর জলাশয় আছে। উহার পশ্চিম কোণে এখন যেখানে ডাকবাংলা রহিয়াছে ঐ স্থানে পূর্ব্বে কাঁথি মহকুমার দপ্তর ছিল। লোকে উহাকে "নেগুয়ার কাছারি" বলিত।

বঙ্কিমচন্দ্র যখন কাঁথি মহকুমার সদর-আলা তখন নেগুয়াতে কাছারি ছিল। পরে উহা উঠিয়া কাঁথি শহরে যায়।

কাঁথি মহকুমার অন্তর্গত **হিজলী** একটি বিখ্যাত স্থান। ইহা রসুলপুর নদীর তীরে অবস্থিত। কাথি হইতে এই স্থানের দূরত্ব ১৯ মাইল। ইহা একটি বিশেষ স্বাস্থ্যকর স্থান। এই স্থানটি দেখিতে একটি দ্বীপের মত ও ইহার সৌন্দর্য্য অতি মনোরম। হিজলীর অনতিদূরে রসুলপুর নদীর অপর পারে দরিয়াপুর ও দৌলতপুর নামক দুইটি গ্রাম আছে। গ্রাম দুইটির নৈসর্গিক শোভা অতি সুন্দর। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের কল্যাণে এই নগণ্য পল্লী দুইটি ও রসুলপুর নদী বঙ্গ সাহিত্যে অমরত্ব লাভ করিয়াছে। "কপাল কুণ্ডলার" পরিকল্পনা ক্ষেত্র বলিয়া দরিয়াপুরে একখানি প্রস্তর ফলক স্থাপিত হইয়াছে। প্রতি বৎসর বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু তিথি ২৬এ চৈত্র উপলক্ষে এখানে একটি সাহিত্য সভার অনুষ্ঠান হয় ও কয়েক দিনব্যাপী মেলা বসে। মেদিনীপুর জেলাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া হিজলীকে একটি স্বতন্ত্র জেলায় পরিণত করিবার কথাও এক সময়ে হইয়াছিল এবং জেলার সদরের উপযোগী কতকগুলি ভবনও নিৰ্ম্মিত হইয়াছিল। বৰ্ত্তমানে এই বাড়ীগুলি বন্দী-নিবাসরূপে ব্যবহৃত হইতেছে।

পূর্ব্বে হিজলী একটি প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। তমলুক বন্দরের পতনের পর হিজলী বন্দর বড় হইয়া উঠে। ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে লিখিত রালফ্ ফিচের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে তৎকালে সুমাত্রা, মালাক্কা প্রভৃতি দূরবর্ত্তী স্থান হইতে হিজলীতে বাণিজ্য পোত আসিত এবং এখান হইতে কাপড়, পশম, চিনি, লঙ্কা, চাউল প্রভৃতি লইয়া যাইত।

য়ুরোপীয় বণিকগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম পর্ত্তুগীজেরা এখানে আসেন এবং বাণিজ্যকুঠি ও গির্জ্জা নির্ম্মাণ করেন। তাঁহাদের পর আসেন ওলন্দাজ, ইংরেজ ও ফরাসীরা।

বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্ত্তী স্থানসমূহ হইতে মগ বোম্বেটেগণের অত্যাচার নিবারণের জন্য সম্রাট শাহ্‌জাহান নিম্ন বঙ্গের স্থানে স্থানে "ফৌজদারী" স্থাপন করেন। হিজলীতেও এইরূপ একটি ফৌজদারী স্থাপিত হইয়াছিল। হিজলীর ফৌজদার উপকূলভাগ পাহারা দিবার জন্য "সরবোলা" নামক এক শ্রেণীর রক্ষী নিযুক্ত করিয়া ছিলেন। কোম্পানির আমলের প্রথম ভাগেও হিজলীতে কতকগুলি "সরবোলা" ছিল। কিন্তু পরে তাহারা নিজেরাই লুণ্ঠন বৃত্তি অবলম্বন করায় "সরবোলার" কার্য্য বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

মুসলমান রাজত্বের পূর্ব্ব হইতেই নিম্নবঙ্গ বিশেষতঃ হিজলী লবণের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। সুলতান সুজার রাজস্ব বন্দোবস্তে নিমক মহালের উল্লেখ আছে। নবাবের অধীনে জমিদারগণই এই কারবার চালাইতেন। তৎকালে কাশ্মীরি, শিখ, মুলতানী ও ভাটিয়া প্রভৃতি ব্যবসায়ীরা এই অঞ্চল হইতে লবণ খরিদ করিত। সে সময়ে প্রধান লবণ ব্যবসায়ীরা "ফকর্-উল-তজজব" বা "মালিক-উল-তজজব" ব্যবসায়ীগণের গৌরব বা রাজা উপাধি পাইতেন।

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে বাংলার দেওয়ানী লাভের পর হিজলীর লবণের কারবার কোম্পানির একচেটিয়া অধিকারে আসে। পরে এই কারবার উঠাইয়া দেওয়া হয়।

১৫৪৪ খৃষ্টাব্দে লিখিত মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্যে উল্লেখ আছে যে শ্রীমন্ত সদাগরের নৌকা কলিকাতা ও বেতড় ছাড়িয়া কালীঘাটে যাইবার সময় "ডাহিনে ছাড়িয়া যায় হিজলীর পথ"।

সেকন্দর শা যখন গৌড়ের রাজা সে সময়ে হিজলীগড়ে হরিদাস নামে এই প্রবল পরাক্রান্ত হিন্দু রাজা ছিলেন। দিল্লীর সম্রাটের সহিত যুদ্ধকালে সেকন্দর শা ইহার সাহায্য প্রার্থনা করেন; কিন্তু ইনি সাহায্য করিতে সম্মত হন নাই। সে কারণ সেকন্দর হরিদাসের বিরুদ্ধে দক্ষ সেনানায়কের নেতৃত্বে পাঠান সৈন্য প্রেরণ করেন। বীর হরিদাস পাঠান সৈন্যকে পরাজিত ও বিপর্য্যস্ত করিয়া হিজলী হইতে তাড়াইয়া দেন।

মুসলমান যুগে হিজলী "মসনদ-ই-আলা" উপাধিধারী একটি নবাব বংশের রাজধানী ছিল। নবাববংশের প্রায় সকল কীর্ত্তিই সাগরগর্ভে বিলীন হইয়াছে। নিকটস্থ জঙ্গল মধ্যে হিজলীর পুরাতন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ এবং রসুলপুর নদীর মোহনায় অবস্থিত একটি জীর্ণ মসজিদ্ অতীত দিনের সাক্ষ্য দিতেছে; এই মসজিদটির তিনটি গম্বুজ আছে এবং ইহা বেশ উচচ। বঙ্গোপসাগর দিয়া কলিকাতা যাতায়াতের পথে ইহা বহুদূর হইতেই নজরে পড়ে। ইহার প্রাঙ্গনে হিজলী রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা তাজ খাঁ মসনদ-ই-আলা ও তাঁহার পরিবারস্থ কয়েকজনের কবর আছে। তাজ খাঁর পূর্ব্ব জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জ্ঞাত হওয়া যায় না। একটি প্রস্তরলিপি হইতে জানা যায় যে ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। এই বংশের ঈশা খাঁ মসনদ-ই-আলা বিশেষ খ্যাতিমান ছিলেন। তাঁহার বহু সৈন্য সামন্ত ছিল এবং তিনি বঙ্গের প্রসিদ্ধ দ্বাদশ ভৌমিক বা "বার ভুঁইয়ার" অন্যতম ছিলেন। যশোহর রাজ প্রতাপাদিত্য স্বীয় পিতৃব্য মহারাজ বসন্ত রায় ও তাঁহার পুত্রগণকে হত্যা করিলে বসন্তরায়ের কনিষ্ঠ পুত্র রাঘব রায় (কচুরায়) পিতৃবন্ধু ঈশা খাঁর আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই উপলক্ষে প্রতাপ হিজলী আক্রমণ করেন। কয়েকদিন বীর বিক্রমে যুদ্ধ করিবার পর ঈশা খাঁ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন। হিজলীর অপর পারে রসুলপুর নদীর যে স্থানে প্রতাপের রণতরী সমূহ ছিল, তাহা আজও "প্রতাপপুর ঘাট" নামে পরিচিত। ঈশা খাঁর মৃত্যুর পর হিজলী প্রথমে প্রতাপাদিত্যের ও পরে মুঘলদের অধিকারভুক্ত হয়। কেহ কেহ এই ঈশা খাঁকে সোণারগাঁএর ঈশা খাঁ হইতে অভিন্ন মনে করেন। আবার কাহারও কাহারও মতে ইঁহারা দুই জন স্বতন্ত্র ব্যক্তি।

১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে হিজলীতে ঈসট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির সৈন্যের সহিত নবাব সৈন্যের যুদ্ধ হয়। ইংরেজের হাত হইতে হিজলীর পুনরুদ্ধারের জন্যই এই যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। নবাবী ফৌজ প্রথমে দরিয়াপুর গ্রামে ছাউনি করে, পরে ২৮এ মে রসুলপুর নদী পার হইয়া হিজলীর দক্ষিণে এক অরণ্য মধ্যে সৈন্য সমাবেশ করে। কোম্পানির পক্ষে সৈন্য পরিচালনা করিয়াছিলেন সুবিখ্যাত জব চার্ণক। উভয় পক্ষের মধ্যে ছোট খাট যুদ্ধ চলিতে থাকে এবং তাহাতে প্রতিদিনই ইংরেজের সৈন্যক্ষয় হয়। ইতিমধ্যে ১লা জুন ইংলণ্ড হইতে কয়েকজন সৈনিক আসিয়া পৌছিল। জব চার্ণক তখন এক কৌশল অবলম্বন করিলেন। সুসজ্জিত গোরা সৈন্যগণ কুচকাওয়াজ করিয়া হিজলীর দুর্গে প্রবেশ করিবার পর তিনি এক গুপ্তপথে তাহাদিগকে পুনরায় জাহাজঘাটায় পাঠাইয়া দিলেন। তাহারা পুনশ্চ সুসজ্জিত হইয়া পুনঃ পুনঃ দুর্গ ও জাহাজঘাটায় যাতায়াত করিতে লাগিল। এই কৌশল বুঝিতে না পারিয়া নবাবী সৈন্য মনে করিল ইংলণ্ড হইতে না জানি কত সৈন্য আসিয়াছে। ভীত নবাব-সেনাপতি সন্ধির প্রস্তাব পাঠাইতেই চার্ণক সানন্দে তাহাতে স্বীকৃত হইলেন এবং ২০এ জুন তারিখে সন্ধিপত্র লিখিত হইবার পর তাঁহার দলবল লইয়া উলুবেড়িয়ায় চলিয়া গেলেন।

কাউখালি ও খাজুরী—হিজলীর প্রায় ১২ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে কাউখালি গ্রাম। ১৮১০ খৃষ্টাব্দে এখানকার প্রসিদ্ধ আলোক স্তম্ভ (লাইট-হাউস) নির্ম্মিত হয়। ভাগীরথীর তীরে ইহাই সর্ব্বপ্রথম আলোক স্তম্ভ।

কাউখালির ৪।৫ মাইল উত্তরে রসুলপুর নদীর পূর্ব্বতটে খাজুরীগ্রাম। অষ্টাদশ শতকের শেষ ও উনবিংশ শতকের প্রথমভাগে ইহা ভাগীরথীর উপর একটি প্রসিদ্ধ বন্দর ছিল। কলিকাতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ইহার উন্নতি হয়। তখনকার দিনে বড় বড় জাহাজ খাজুরীতে মাল খালাস ও মাল বোঝাই করিত এবং কলিকাতা পর্য্যন্ত স্লুপের সাহায্যে মাল আনা-নেওয়া করা হইত। তৎকালে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য বহু সম্ভ্রান্ত ইংরেজ ও বাঙালী খাজুরীতে যাইতেন। কলিকাতা হইতে খাজুরীর টেলিগ্রাফ লাইনই ভারতের সর্ব্বপ্রথম টেলিগ্রাফ লাইন। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে ভীষণ জল প্লাবনের ফলে খাজুরী বন্দর ধ্বংস হইয়া যায়। এখন মাত্র দুইটি বাড়ী ও ইংরেজদের একটি সমাধি ক্ষেত্র খাজুরীর অতীত গৌরবের স্মৃতি বহন করিতেছে। ইহার একটি বাড়ী এখন ডাক্‌বাংলা এবং অপরটি ডাকঘর রূপে ব্যবহৃত হইতেছে।

দাঁতন—খড়্গপুর জংশন হইতে দাঁতন ৩২ মাইল দূর। দাঁতনে একটি মুন্‌সেফী আদালত আছে। এখানে উত্তম জাঁতি প্রস্তুত হয়। প্রবাদ, ওড়িষ্যা যাইবার পথে শ্রীচৈতন্যদেব এখানে দাঁতন বা দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার করিয়াছিলেন বলিয়াই স্থানের নাম দাঁতন হইয়াছে। এই আখ্যানটির প্রমাণ স্বরূপ স্থানীয় একটি মন্দিরে প্রস্তরীভূত দন্তকাষ্ঠ রক্ষিত আছে। দাঁতনে জগন্নাথদেবের ও শ্যামলেশ্বর মহাদেবের প্রাচীন মন্দির আছে।

কেহ কেহ বলেন যে দাঁতনের প্রাচীন নাম দন্তপুর। "দাঠাবংশ" নামক বৌদ্ধগ্রন্থ হইতে জানা যায় যে ক্ষেম নামে বুদ্ধদেবের এক শিষ্য বুদ্ধের চিতা হইতে একটি দন্ত সংগ্রহ করিয়া উহা কলিঙ্গ রাজ ব্রহ্মদত্তকে প্রদান করেন। ব্রহ্মদত্ত একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দন্তটিকে তন্মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং স্থানটির নাম দেন দন্তপুর। ব্রহ্মদত্তবংশের শিবগুহ নামক জনৈক নৃপতি ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের উপর বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন, বৌদ্ধধর্ম্মের উপর তাঁহার অনুরাগ ছিল না। কিন্তু একবার দন্তপুরের দন্তোৎসব দেখিয়া তিনি বিশেষ মুগ্ধ হন ও বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন। রাজ্যবাসী ব্রাহ্মণগণ এই জন্য তাঁহার প্রতি রুষ্ট হইয়া তাঁহার শাস্তি-বিধানের জন্য পাটলিপুত্রের হিন্দু নরপতির সাহায্য প্রার্থনা করেন। পাটলিপুত্ররাজের সৈন্য শিবগুহকে বন্দী করিয়া তৎসহ বুদ্ধদন্তটিকেও পাটলিপুত্রে আনয়ন করে। এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই পাটলিপুত্রে বহু আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটায় পাটলিপুত্ররাজ ভীত হইয়া বুদ্ধদন্তসহ শিবগুহকে পুনরায় দন্তপুরে প্রেরণ করেন। পাটলিপুত্ররাজের মৃত্যুর পর পার্শ্ববর্ত্তী অপর এক রাজা দন্তপুর আক্রমণ করিয়া শিবগুহকে নিহত করেন। রাজকুমারী হেমমালা এবং রাজমাতা উজ্জয়িনীরাজকুমার ছদ্মবেশে বুদ্ধদন্তটি লইয়া তাম্রলিপ্তের পথে সিংহলে গমন করেন। সিংহলরাজ মেঘবাহন পরম ভক্তি সহকারে ধর্ম্মমন্দিরে দন্তটির প্রতিষ্ঠা করেন। এখনও সিংহলে এই বুদ্ধদন্ত নিত্য পূজিত হইতেছে। দেবপ্রিয় তিষ্যের রাজত্বকালে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে ফা-হিয়েন্ সিংহলে মহাসমারোহে বুদ্ধদন্ত প্রতিষ্ঠার বার্ষিক উৎসব দর্শন করিয়াছিলেন।

দন্তপুর নগরের অবস্থান সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বর্ত্তমান রাজমহেন্দ্রীকে প্রাচীন দন্তপুর বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, কাহারও মতে পুরী বা জগন্নাথধামই দন্তপুর এবং জগন্নাথের মন্দিরই প্রাচীন দন্তমন্দির। সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রমুখ মনীষীর মতে বর্ত্তমান দাঁতনই
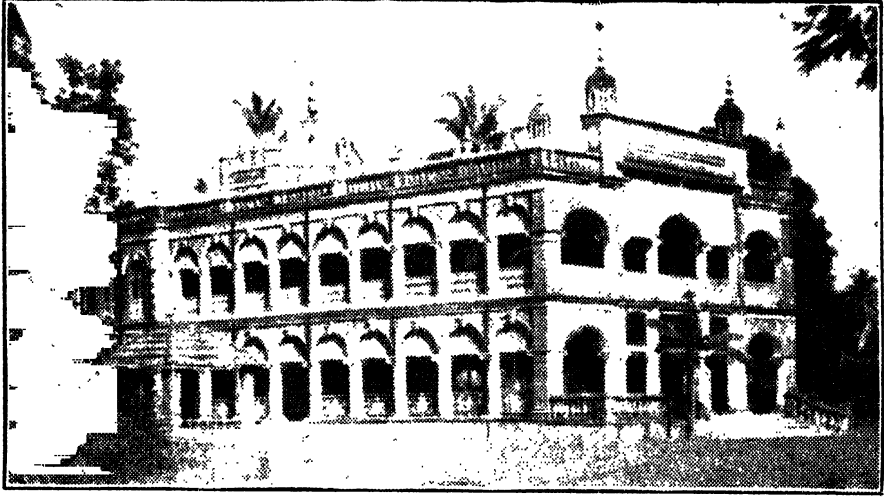
শঙ্কর মঠ, রামরাজাতলা (পৃষ্ঠা ১৩০)

শ্মশানেশ্বর মন্দির, মৌড়িগ্রাম (পৃষ্ঠা ১৩০)
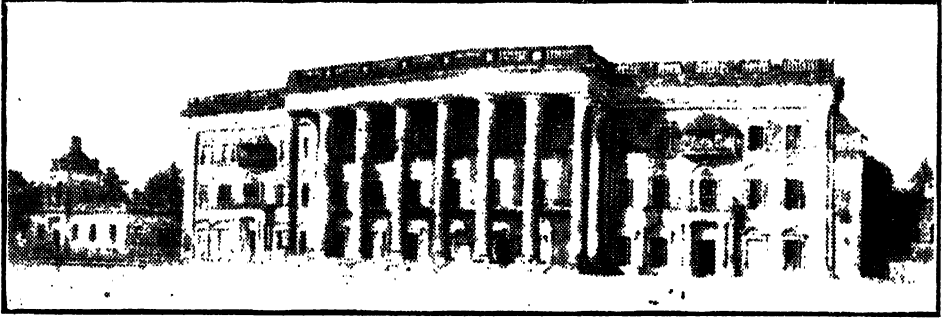
রাজবাড়ী, আন্দুল (পৃষ্ঠা ১৩১)
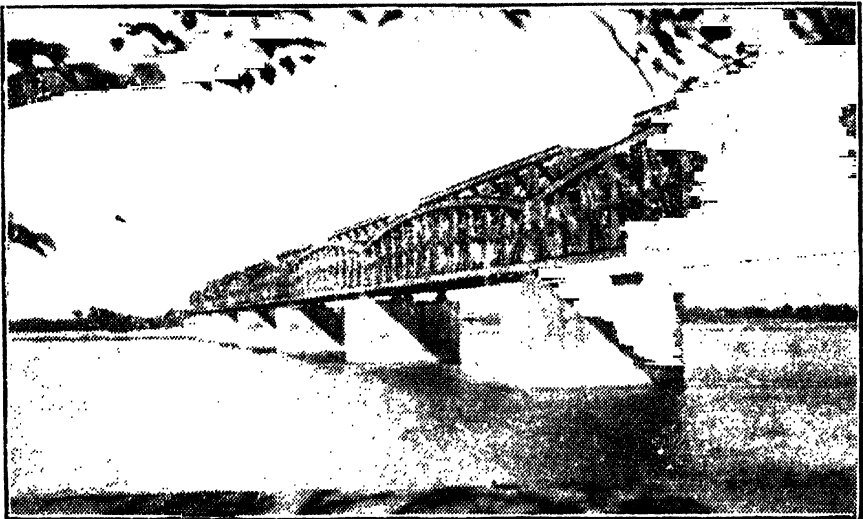
রূপনারায়ণ সেতু, কোলাঘাট (পৃষ্ঠা ১৩২)
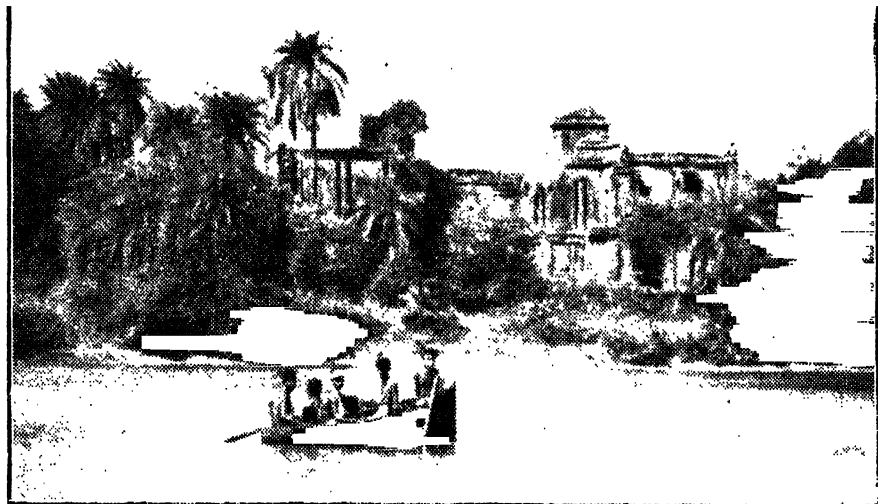
রাজবাড়ী ও খাটপুকুর, তমলুক (পৃষ্ঠা ১৩৬)
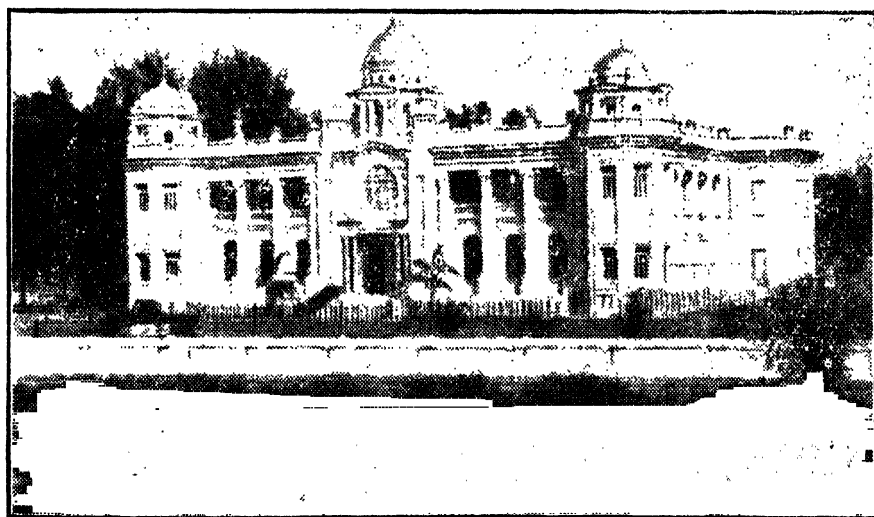
রাজবাটী, মহিষাদল (পৃষ্ঠা ১৩৭)
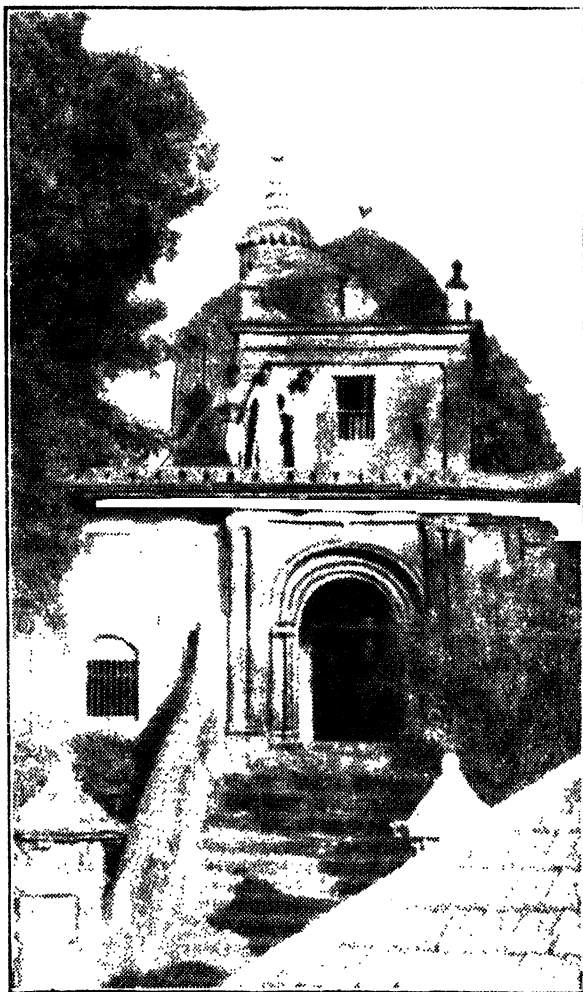
বর্গভীমার মন্দির, তমলুক (পৃষ্ঠা ১৩৫)
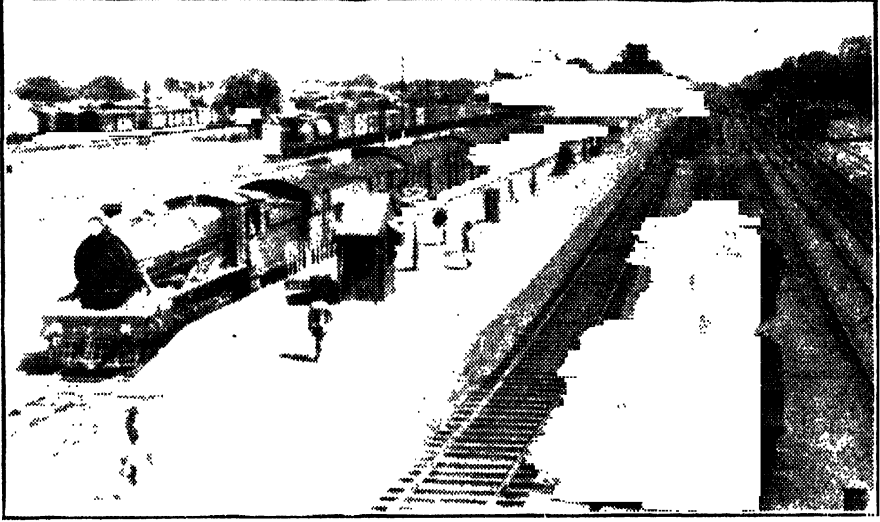
প্লাটফরম—খড়্গপুর (পৃষ্ঠা ১৩৮)
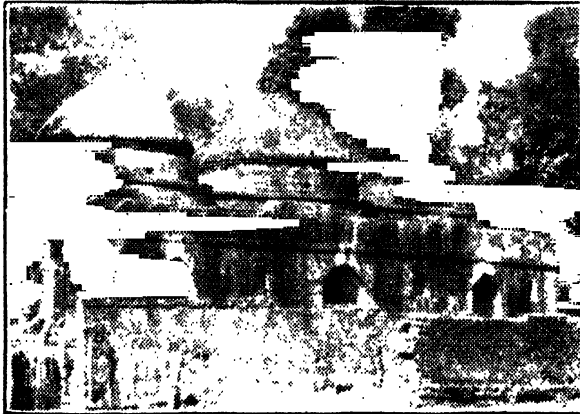
শাহসুজার মসজিদ, কসবা, নারায়ণগড় (পৃষ্ঠা ১৪১)
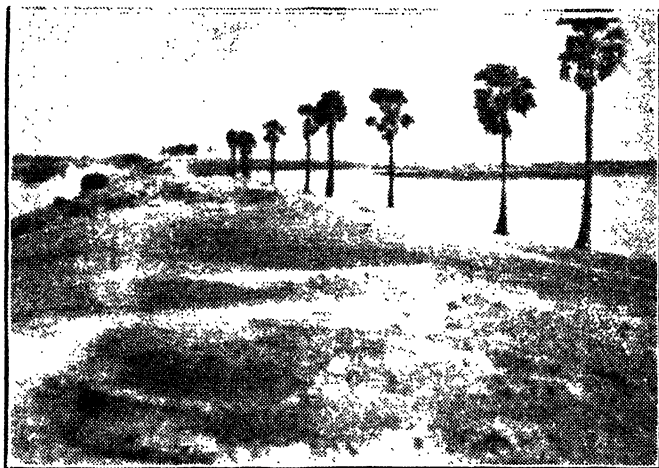
সমুদ্রতীর, কাঁথি (পৃষ্ঠা ১৪১)
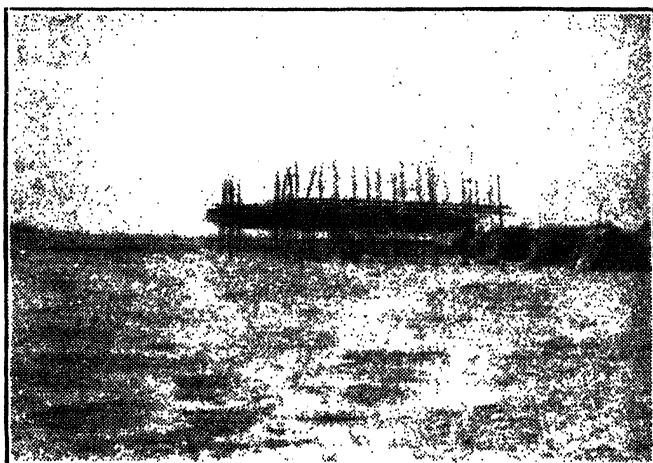
জনপুটের সমুদ্রতীর (পৃষ্ঠা ১৪১)

ডাকবাংলা, দরিয়াপুর (পৃষ্ঠা ১৪২)
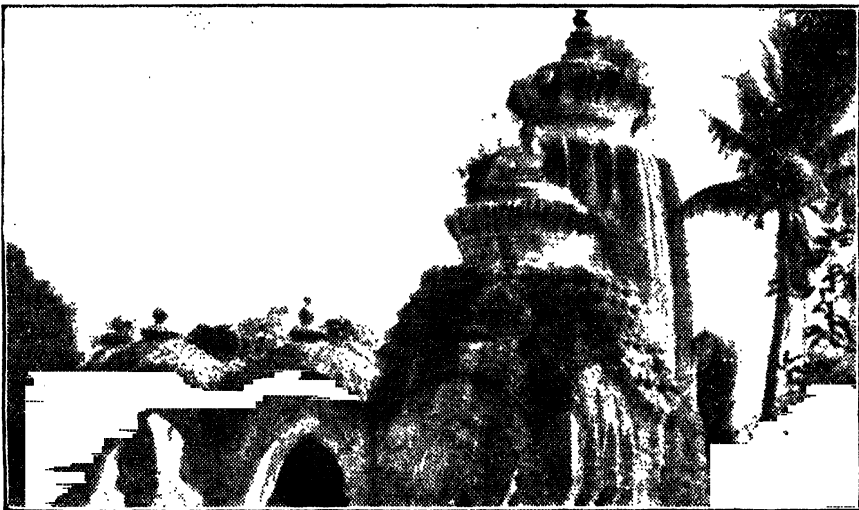
প্রাচীন শিবমন্দির, এগরা-হটনগর (পৃষ্ঠা ১৪১)

"কপাল কুণ্ডলার" পরিকল্পনা ক্ষেত্র (পৃষ্ঠা ১৪২)

শ্যামলেশ্বরের মন্দির, দাঁতন (পৃষ্ঠা ১৪৪)

প্রাচীন দন্তপুর। দাঠাবংশে স্পষ্ট উল্লিখিত আছে যে তাম্রলিপ্ত হইতেই বুদ্ধদন্ত সিংহলে প্রেরিত হয়। পুরীও তৎকালে একটি প্রধান বন্দর ছিল। সুতরাং পুরী বা রাজমহেন্দ্রী হইতে দন্তটি পুরীবন্দর দিয়াই প্রেরিত হইবার কথা। তাম্রলিপ্ত হইতে উহা প্রেরিত হওয়ায় অনেকে মনে করেন যে নিকটস্থ দাঁতনই প্রাচীন দন্তপুর। দাঁতন যে একটি বহু পুরাতন স্থান তাহা এখনও দেখিলে বুঝিতে পারা যায়।

দাঁতনের অনতিদূরে শরশঙ্ক নামে একটি সুবৃহৎ জলাশয় আছে। উহার দৈর্ঘ্য ৫,০০০ ফুট ও প্রস্থ ২,৫০০ ফুট। বাংলাদেশে এরূপ দীঘি অতি অল্পই আছে। জনশ্রুতি যে শশাঙ্কদেব নামক জনৈক নৃপতি পুরীগমন কালে বাংলা ও ওড়িষ্যার সীমান্তে এই দীঘি প্রতিষ্ঠা করেন। দাঁতনে "বিদ্যাধর" নামে পরিচিত ১,৬০০ ফুট দীর্ঘ অপর একটি দীঘি আছে। বিদ্যাধর নামক জনৈক রাজমন্ত্রীর দ্বারা ইহা খনিত হইয়াছিল বলিয়া খ্যাত। প্রবাদ, মাটীর নীচে দিয়া শরশঙ্ক ও বিদ্যাধর দীঘিকে সংযুক্ত করিয়া ৪ হাত উচ্চ ও ৩ হাত প্রশস্ত একটি প্রস্তর নির্ম্মিত সুড়ঙ্গ আছে।

মোগল্‌মারী—দাঁতন হইতে দুই মাইল উত্তরে মোগলমারী নামে একটি গ্রাম আছে। এখানে "শশিসেনার পাঠশালা" নামে পরিচিত একটি প্রাচীন ইষ্টক স্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রবাদ, এই স্থানে রাজা বিক্রম কেশরীর কন্যা শশিসেনা বা সখীসেনার সহিত অহিমাণিকের প্রথম সাক্ষাৎ হয় এবং প্রথম হইতেই উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হন। শশিসেনা ও অহিমাণিকের প্রণয়-কথা কবি ফকিররামের "সখিসোনা" কাব্যে বিবৃত হইয়াছে।

মোগলমারী গ্রামে ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দের ৩রা মার্চ্চ তারিখে তোড়রমল পরিচালিত মুঘল বাহিনীর সহিত ভীষণ যুদ্ধে সোলেমান কররানীর পুত্র দাউদ শাহ পরাজিত হন। এই যুদ্ধে জয়লাভ করিলেও মুঘল পক্ষের বহু সেনা নিহত হয়। সেই জন্য এই গ্রামের নাম হয় "মোগলমারী"।

(খ) খড়্গপুর—আদড়া

মেদিনীপুর—খড়্গপুর জংশন হইতে ৮ মাইল দূর। ইহা কংসাবতী বা কাঁসাই নদীর তীরে অবস্থিত। মেদিনীপুর শহরটি খুব প্রাচীন। রাজা প্রাণকরের পুত্র সুপ্রসিদ্ধ মেদিনীকোষ অভিধান প্রণেতা মেদিনীকর কর্ত্তৃক এই নগর প্রতিষ্ঠিত হয় বলিয়া জনশ্রুতি আছে, এবং সেই জন্যই ইহার নাম মেদিনীপুর। আইন-ই-আকবরীতে একটি সুবৃহৎ নগর বলিয়া মেদিনীপুরের উল্লেখ আছে।

এখানে একটি প্রাচীন প্রস্তর নির্ম্মিত দুর্গ আছে। কবে কাহার দ্বারা ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহা জানা যায় নাই। সম্ভবতঃ মেদিনীকর কর্ত্তৃক নগর স্থাপনের সময়েই ইহা নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে। মুঘলযুগে ইহা একটি প্রধান সেনা-নিবাস ছিল। নবাব আলিবর্দ্দী, নবাব সিরাজউদ্‌দৌলা, মীরজাফর, মীরকাসেম প্রভৃতি এই দুর্গে বাস করিয়া গিয়াছেন। কিছুকালের জন্য ইহা মহারাষ্ট্রীয়গণের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। বর্গীর হাঙ্গামায় মেদিনীপুর বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। ঈস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলেও ইহা সেনা-নিবাস রূপে ব্যবহৃত হইত। অতঃপর কিছুদিন ইহা জেলখানায় পরিণত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে ইহা পরিত্যক্ত এবং পুরাতন জেলখানা নামে পরিচিত।

মেদিনীপুর শহরের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি সুন্দর। রেল স্টেশনের পশ্চিম-দক্ষিণাংশে "গোপ" নামে একটি ক্ষুদ্র পাহাড় আছে। জনশ্রুতি, এই স্থানে মহাভারতোক্ত বিরাট রাজার দক্ষিণ গো-গৃহ ছিল। দেখিলে মনে হয় গোপগিরি পূর্ব্বে একটি দুর্গ ছিল এবং তদুপযোগী করিয়া পাহাড়টিকে কাটিয়া লওয়া হইয়াছিল। আইন-ই-আকবরীতে মেদিনীপুরে দুইটি দুর্গের উল্লেখ আছে। একটির কথা বলা হইয়াছে। অনেকে অনুমান করেন দ্বিতীয় দুর্গটি এই গোপ-গিরি। এখন এই পাহাড়ের উপর মেদিনীপুর জেলার প্রসিদ্ধ জমিদার নাড়াজোলের রাজভবন অবস্থিত।

মেদিনীপুরের প্রান্তবাহিনী কাঁসাই নদীর উপর প্রায় অর্দ্ধ মাইল দীর্ঘ একটি সেতু আছে। এই সেতুর নিকট হজরত পীর লোহানির সমাধি অবস্থিত। পীর সাহেবের অলৌকিক ক্ষমতা সম্বন্ধে বহু কাহিনী প্রচলিত আছে। হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই ইনি শ্রদ্ধার পাত্র। সমাধির নিকটেই একটি পরিত্যক্ত প্রাচীন মন্দির আছে। কথিত আছে, ইহা রঙ্কিনী দেবীর মন্দির এবং পূর্ব্বে নাকি পালা করিয়া গ্রামবাসিগণকে এই দেবীর নিকট প্রত্যহ একটি নরবলি দিতে হইত। একদিন একটি অসহায়া বিধবার একমাত্র পুত্রের পালা উপস্থিত হওয়ায় বিধবার করুণ ক্রন্দনে দয়ার্দ্র হইয়া পীরসাহেব বিধবার পুত্রের পরিবর্ত্তে স্বয়ং দেবীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। দেবীর সহিত তাঁহার ভীষণ যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে দেবী পরাজিত হইয়া মন্দিরের চূড়া ভাঙ্গিয়া দিয়া পশ্চিমদিকে এক গভীর জঙ্গলের মধ্যে পলায়ন করেন এবং এক রজকের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেন। উত্তরকালে এই রজক নাকি দেবীর অনুগ্রহে ধলভূমের রাজা হইয়াছিলেন।

মেদিনীপুর শহরে মুসলমানগণের আরও একটি পবিত্র স্থান আছে। উহা সুবিখ্যাত পীর হজরত মুরসেদ আলি শাহসাহেবের দরগাহ্ এবং খানকা শরীফ নামে পরিচিত। এখানে প্রতি বৎসর শাহ্ সাহেবের উর্স্ বা মৃত্যুতিথি উপলক্ষে বাংলার বিভিন্ন স্থান হইতে বহু মুসলমান যাত্রীর সমাগম হয়।

হিন্দু দেবদেবীর মধ্যে ওড়িয়া রাজাদের প্রতিষ্ঠিত জগন্নাথ মন্দির, বর্গীদের সময়ের শীতলা মন্দির, হনুমানজীর মন্দির, বিবিগঞ্জের দুর্গা মন্দির, কর্ণেলগোলার রাম মন্দির, শিববাজারের দ্বাদশ শিবালয় ও রাসমঞ্চ এবং হবিবপুর ও নূতন বাজারের কালী মন্দির সমধিক প্রসিদ্ধ।

মেদিনীপুরের জজ-আদালতের নিকটে ভূতপূর্ব্ব কলেক্টর জন পিয়ার্স সাহেবের সমাধি আছে। সমাধি স্তম্ভে ইংরেজী ও বাঙলায় লিখিত দুইখানি প্রস্তরফলক আছে। ইংরেজের সমাধিগাত্রে বাঙলা ভাষায় লেখা প্রস্তরফলক বোধ হয় আর কোথাও নাই। প্রস্তরফলকখানির প্রতিলিপি নিম্নে দেওয়া হইল:—

"শ্রীরাম মেস্ত্র জন পিয়ার্শ সাহেব জেলা মেদিনীপুর বারো বৎসর কেলটার কাজ করিয়া সন ১৭৮৮ ইংরেজি ২০ মেই সন ১১০৫ বাঙ্গলা ১১ই জৈষ্ঠ্য কাল হইয়াছে—তাহার কবরে এই কিত্তি করিয়া দেওয়া গেল।"

মেদিনীপুরে একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজ, দুইটি উচচ ইংরেজী বিদ্যালয়, একটি উচচ ইংরেজী বালিকা বিদ্যালয় ও একটি বয়ন বিদ্যালয় আছে। শহরের গেড়েরী সম্প্রদায় সুন্দর কম্বল প্রস্তুত করে। ইহারা চার পাঁচ পুরুষ পূর্ব্বে উত্তর পশ্চিমাঞ্চল হইতে আসিয়া এখানে বসবাস করিতেছে এবং নিজেরাই মেষ পালন করে।

ইতিহাস বিশ্রুত সিপাহী বিদ্রোহের সময় ৺ রাজনারায়ণ বসু মহাশয় মেদিনীপুর জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তৎকালীন মেদিনীপুরের অবস্থা তিনি তাঁহার আত্মচরিতে সুন্দর রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। উহা হইতে কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

'সিপাহী বিদ্রোহের ভারতব্যাপী তরঙ্গ মেদিনীপুর পর্য্যন্ত পৌছে। ১৮৫৭ সালের ১০ই মে বিদ্রোহী সিপাহীরা মিরাট নগর ত্যাগ করিয়া দিল্লী গমন করে। সিপাহীদিগের গুপ্ত ষড়যন্ত্র এত বিস্তৃত ছিল যে ১০ই মের অব্যবহিত পরেই একজন তেওয়ারী ব্রাহ্মণ মেদিনীপুরস্থ রাজপুত জাতীয় সিপাহী পল্টনকে বিগড়াইবার চেষ্টা করে। ....উক্ত তেওয়ারী ব্রাহ্মণকে মেদিনীপুর স্কুলের সম্মুখে কেল্লার মাঠে ইংরাজেরা ফাঁসী দেন। ....তখনকার যে সকল কাগজে বিশেষতঃ Phoenix কাগজে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের বিদ্রোহের যে বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইত তাহা আমরা কি পর্য্যন্ত উৎসাহের সহিত পাঠ করিতাম তাহা বলিতে পারি না। বাঙ্গালীদের অপেক্ষা সাহেবেরা আরও অধিক ভীত হইয়াছিলেন। একদিন সাহেবেরা ক্যাণ্টনমেণ্টে গিয়া সিপাহীদিগকে ডাকিয়া একটা থালের উপর ধান দূর্ব্বা রাখিয়া প্রত্যেক সিপাহীকে তাহা ছুঁইয়া শপথ করিতে বলিলেন যে, সে বিদ্রোহী হইবে না। প্রত্যেক সিপাহী সেইরূপ করিল। কিন্তু সাহেবদের তাহাতে বিশ্বাস হইল না।

আমরা স্কুলে কাজ করিবার সময় প্যাণ্টুলেনের ভিতর ধুতী পরিয়া কাজ করিতাম। যখন সিপাহী আসিবে প্যাণ্টুলুন ও চাপকান ছাড়িয়া ধুতি ও চাদর বাহির করিয়া পরিব স্থির করিয়াছিলাম। সিপাহীদিগের প্যাণ্টুলেনের উপর বিশেষ রাগ ছিল। ....একদিন জন্মাষ্টমীর পর্ব্বোপলক্ষে সিপাহীরা হাতীর উপর চড়িয়া নিশান উড়াইয়া বাজনা বাজাইয়া আওয়াজ করিতে করিতে সহরের দিকে আসিতেছিল। আমরা মনে করিলাম, সিপাহীরা সহর আক্রমণ করিতে আসিতেছে। স্কুলে হুলস্থূল পড়িয়া গেল, বালকেরা টেবিল ও বেঞ্চের নীচে লুকাইতে লাগিল। ....আমরাও প্যাণ্টুলুন চাপকান পরিত্যাগ করিয়া ধুতি বাহির করিতেছিলাম এমন সময় আমরা শুনিলাম যে, সিপাহীরা জন্মাষ্টমীর পর্ব্বোপলক্ষে এইরূপ ধুমধাম করিতেছে। ইহা শুনিয়া আমরা প্রকৃতিস্থ হইলাম। ....সংবাদপত্রে এইরপ মিথ্যা জনরব লিখিত হইয়াছিল যে Shekwattee

Battalion মেদিনীপুরে বিদ্রোহ করিয়া বর্দ্ধমানের দিকে চলিয়া গিয়াছে। যাহা হউক সৌভাগ্য ক্রমে বিদ্রোহ হয় নাই। পরিশেষে এই পল্টন স্থানান্তরিত হওয়াতে উদ্বেগের সকল কারণ চুকিয়া গেল। মেদিনীপুরে যে বিদ্রোহ হয় নাই তাহার প্রধান কারণ কর্ণেল সাহেবের রাজপুত উপপত্নী। তাহার কথা সিপাহীরা বড় মান্য করিত। বিদ্রোহের প্রস্তাব হইলে সে সিপাহীদিগকে তাহা করিতে নিবারণ করিত।"

মেদিনীপুর শহরের অন্তর্গত নরমপুরে একটি অসমাপ্ত মস্‌জিদ্‌ আছে। কথিত আছে শাহজাদা খুরম (সম্রাট শাহজাহান) দাক্ষিণাত্য হইতে ফিরিবার পথে যে দিন মেদিনীপুরে অবস্থান করিয়াছিলেন সে দিন ঈদ্‌ পর্ব্ব থাকায় তাঁহার নমাজের জন্য একদিনেই এই মসজিদ্‌টি নির্ম্মিত হয়। সময়ের অল্পতার জন্য ইহার নির্ম্মাণ সম্পূর্ণ হইতে পারে নাই। খুরম ইহাতেই নমাজ পড়িয়াছিলেন। এই ঘটনার স্মারকরূপে মসজিদ্‌টিকে অসমাপ্ত অবস্থায়ই রাখা হইয়াছে।

জয়ানন্দের চৈতন্য মঙ্গলে বর্ণিত আছে যে শ্রীচৈতন্যদেব ওড়িষ্যা যাইবার সময় মেদিনীপুরের পথে গমন করিয়াছিলেন।

কর্ণগড়—মেদিনীপুর হইতে ৬ মাইল উত্তরে শালবনি থানায় অবস্থিত কর্ণগড় একটি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ স্থান। এখানে সিংহ উপাধিধারী এক রাজবংশের রাজধানী ছিল। এই বংশীয় রাজা মহাবীর সিংহের নির্ম্মিত একটি দুর্গের ভগ্নাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। এই দুর্গের মধ্যে একটি সরোবর ও তন্মধ্যস্থ একটি প্রস্তর নির্ম্মিত প্রাসাদ এখানকার দ্রষ্টব্য বস্তু। প্রবাদ, কর্ণগড়ে দাতাকর্ণের বাটী ও ভোজরাজার রাজধানী ছিল। কেহ কেহ অনুমান করেন যে উৎকলাধিপতি কর্ণকেশরী এখানে একটি নগর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কবি সন্ধ্যাকর নন্দী প্রণীত "রামচরিতম্‌" নামক সংস্কৃত কাব্যে কর্ণকেশরীর উল্লেখ আছে। বিখ্যাত "শিবায়ন" প্রণেতা রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য বরদা ঘাটালের রাজা শোভাসিংহের অত্যাচারে স্বীয় জন্মভূমি যদুপুর গ্রাম ত্যাগ করিয়া কর্ণগড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই গড়টি প্রায় দুই মাইলব্যাপী ছিল এবং সদর ও অন্দর দুই মহালে বিভক্ত ছিল। গড়ের তিন দিকে জঙ্গল এবং পূর্ব্বদিকে কৃষিক্ষেত্র। জঙ্গল হইতে একটি নদী বাহির হইয়া গড়ের দুইদিক দিয়া প্রবাহিত হইয়া পুনরায় একত্র হইয়াছে। ইহাতে গড়ের একটি স্বাভাবিক পরিখার সৃষ্টি হইয়াছে।

গড়ের দক্ষিণদিকে অনাদিলিঙ্গ দণ্ডেশ্বর শিব ও মহামায়ার মন্দির অবস্থিত। প্রস্তরনির্ম্মিত এই মন্দির দুইটি অতি দৃঢ় ও ইহার নির্ম্মাণকৌশলও অতি সুন্দর। মহামায়ার মন্দিরে যে পঞ্চমুণ্ডী যোগাসন আছে, প্রবাদ যে তথায় রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য ও কর্ণগড়ের রাজা যশোবন্ত সিংহ সিদ্ধ হইয়াছিলেন। এই মন্দিরের তোরণ-দ্বারে "যোগী ঘোপা" বা যোগমণ্ডপ নামে যে ত্রিতল পাথরের মন্দির আছে তাহাও দেখিবার মত বস্তু।

মেদিনীপুর হইতে এক মাইল উত্তরে রাণীগঞ্জ রাস্তার নিকট আবাসগড়ের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। কর্ণগড়ের পঞ্চম রাজা রামসিংহ সপ্তদশ শতকের শেষ ভাগে ইহা নির্ম্মাণ করেন। কর্ণগড়ের শেষ রাণী শিরোমণি ও নাড়াজোলের রাজা মোহনলাল খাঁ ইহার বহু উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। গড়ের ভিতরে প্রকাণ্ড দীঘির তীরে নবচূড়া সমন্বিত একটি পুরাতন মন্দির আছে। এই গড়ে দশভুজা, জয়দুর্গা, রাধাশ্যাম, শ্যামসুন্দর ও রাজরাজেশ্বরী প্রভৃতি অপরাপর বিগ্রহও আছেন।

বর্গীর উপদ্রবের ন্যায় চুয়াড় উপদ্রবও মেদিনীপুর জেলাকে বিশেষ বিপর্য্যস্ত করে। চুয়াড়গণ জেলার জঙ্গল মহালের অধিবাসী বন্যজাতি। শিকার, দস্যুবৃত্তি ও জমিদারদের অধীনে পাইক বা সৈনিকের কার্য্য করাই তাহাদের পেশা ছিল। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুর ইংরেজের অধিকারে আসিলে জমিদারগণকে বশে আনিবার চেষ্টা চলিতে থাকে। ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে কোম্পানি জঙ্গল মহালের দুর্গগুলি ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করিতে মনস্থ করেন। সৈন্য সংগ্রহে কোম্পানির কিছু বিলম্ব ঘটে, কিন্তু ইতিমধ্যে এই কথা প্রচারিত হওয়ায় ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে ২০০ মাইল ব্যাপী জঙ্গল মহালে ঘোর বিদ্রোহ ঘোষিত হয়। লেফ্‌টেন্যাণ্ট ফার্গুসন সাহেবকে এই বিদ্রোহ দমন করিতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। চুয়াড়গণের বিষাক্ত শরে ও ব্যাধিতে অনেক ইংরেজ সৈন্যের প্রাণহানি হয়। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে চুয়াড়গণ পুনরায় বিদ্রোহী হয়। মেদিনীপুর শহরের নিকটবর্ত্তী আবাসগড় ও কর্ণগড়কে কেন্দ্র করিয়া তাহারা নানাস্থানে আক্রমণ চালাইতে থাকে। এই বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য কোম্পানি কর্ণগড়ের রাণী শিরোমণিকে বন্দিনী করেন। চুয়াড়দিগের সমুদয় আড্ডা ভাঙ্গিয়া দিয়া এই বিদ্রোহ দমন করা হয়। জায়গীর জমি কোম্পানি কর্ত্তৃক বাজেয়াপ্ত হইবার ফলেই চুয়াড়েরা বিদ্রোহী হইয়াছিল।

গোদাপিয়াশাল—খড়্গপুর হইতে ১৩ মাইল। এখানে কুমারগড় নামক একটি দুর্গের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। উহা চাঙ্গুয়ালরাজ বীরসিংহের বংশধর রাজা কুমারসিংহ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। এই বংশীয় রাজা জামদার সিংহ নির্ম্মিত জামদারগড়ের ভগ্নাবশেষ গোদাপিয়াশালের নিকটে অবস্থিত। এই স্থানেই মেদিনীপুর জমিদারী কোম্পানি তাঁহাদের গোদাপিয়াশাল কুঠি নির্ম্মাণ করেন।

চন্দ্রকোণা রোড—খড়্গপুর জংশন হইতে ৩০ মাইল দূর। স্টেশন হইতে চন্দ্রকোণা শহর মোটরবাসযোগে ২১ মাইল। ইহা ঘাটাল মহকুমার অন্তর্গত। প্রবাদ যে বহুকাল পূর্ব্বে এখানে চন্দ্রকেতু নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহারই নামানুসারে চন্দ্রকোণা নাম হইয়াছে। রাজবাটীর ধ্বংসাবশেষ এখনও চন্দ্রকোণার প্রাচীনত্বের পরিচয় প্রদান করে।

কথিত আছে, এককালে চন্দ্রকোণা নগরে বাহান্নটি বাজার ছিল। ১৬৭০ খৃষ্টাব্দে অঙ্কিত ভ্যালেণ্টাইনের মানচিত্রে চন্দ্রকোণাকে (Sjandercona) শিলাবতী নদীর তীরে একটি সমৃদ্ধ নগর বলিয়া দেখান হইয়াছে।

চন্দ্রকোণার দক্ষিণে প্রাচীন হিন্দুরাজগণের দ্বাদশদ্বারী বা "বার দুয়ারী" নামক গড়ের ভগ্নাবশেষের নিকটেই রাজবংশের প্রতিষ্ঠিত মল্লেশ্বর ও উজ্জনাথ শিব আজিও বিদ্যমান। কথিত আছে, কালাপাহাড়ের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য পূজারিগণ মল্লেশ্বরকে প্রস্তর দিয়া মুড়িয়া ফেলেন ও উজ্জনাথকে লইয়া এক বটবৃক্ষ মূলে স্থাপন করেন। কালাপাহাড় শূন্য মন্দির ধ্বংস করিয়া চলিয়া যান। মল্লেশ্বরের বর্ত্তমান সুন্দর মন্দিরটি বর্দ্ধমানের মহারাজা কীর্ত্তিচন্দ্রের দ্বারা নির্ম্মিত। মল্লেশ্বর আজিও প্রস্তরাবৃত আছেন। ইঁহার মন্দিরের নিকটে উন্মুক্ত আকাশতলে এক বটবৃক্ষের মূল আশ্রয় করিয়া উজ্জনাথ মহাদেব বিদ্যমান। যতবারই ইঁহার জন্য মন্দির নির্ম্মাণ করা হইয়াছে ততবারই তাহা বজ্রপাত, ভূমিকম্প প্রভৃতি দৈবদুর্ঘটনার দ্বারা ধ্বংস হইয়া গিয়াছে।

চন্দ্রকোণার লালজীউ, রঘুনাথজীউ ও কামেশ্বর মহাদেবও বিশেষ প্রসিদ্ধ। দশহরা ও রথযাত্রা এবং রঘুনাথজীউর পুষ্যা উৎসব উপলক্ষে চন্দ্রকোণায় বিস্তর জনসমাগম হয়।

চন্দ্রকোণায় রাজমাতা লক্ষ্মণাবতীর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত "রাজার মার পুকর" নামে একটি বৃহৎ জলাশয় আছে। "রাজার মার কালীও" বিশেষ প্রসিদ্ধ।

চন্দ্রকোণায় বড়, মধ্যম ও ছোট অস্থল নামে তিনটি মঠে রামচন্দ্রের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। পশ্চিম ভারতীয় তিন জন বৈষ্ণব মোহান্ত এই আখড়া তিনটির পরিচালক। এখানে নানকপন্থীদেরও একটি মঠ আছে।

লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহের পূর্ব্বপুরুষগণ চন্দ্রকোণার অধিবাসী ছিলেন। পরে তাঁহারা বীরভূম জেলার রাইপুর গ্রামে উঠিয়া যান।

চন্দ্রকোণার কাঁসা ও পিতলের বাসন প্রসিদ্ধ।

চন্দ্রকোণার চার পাঁচ মাইল দক্ষিণ পূর্ব্বে আক্‌রা গ্রামে "ছোট দীঘি" নামে একটি অতি বৃহৎ দীঘি আছে। একপার হইতে ইহার অপর পার দৃষ্ট হয় না। ইহা কাহার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত তাহা জানা যায় নাই। এখানে "বড় দীঘি" নামে অপর একটি বৃহত্তর দীঘি ছিল। উহা ভরাট হইয়া এখন ধান্যক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে।

চন্দ্রকোণা রোড হইতে মোটরবাসযোগে মেদিনীপুর জেলার অন্যতম মহকুমা ঘাটালে যাওয়া যায়। ঘাটাল রূপনারায়ণ নদের উভয় তীরে অবস্থিত একটি প্রসিদ্ধ বন্দর। এখানকার দধি, ঘৃত ও মাটির হাঁড়ি খুব বিখ্যাত।

ক্ষীরপাই—ক্ষীরপাই ঘাটাল মহকুমার একটি বড় গ্রাম। পূর্ব্বে ইহা একটি মহকুমার সদর ছিল। এক সময়ে এখানে ফরাসী, ওলন্দাজ, পর্ত্তুগীজ ও ইংরেজ কোম্পানির কুঠি ছিল। নিকটবর্ত্তী কাশীগঞ্জ গ্রামে ঈস্ট্‌ ইণ্ডিয়া কোম্পানির একটি বৃহৎ কুঠি ছিল। উহার নিকটেই বেড়াবেড়া পল্লীতে য়ুরোপীয়গণের ছয়টি সমাধিস্তম্ভ আছে। সেকালে য়ুরোপীয় বণিক বা কর্ম্মচারীদের সহিত এদেশের লোকেদের বিশেষ মেলামেশা ও সখ্য ছিল। সেই প্রাচীন বন্ধুত্বের কথা স্মরণ করিয়া আজও এই পল্লীর অধিবাসীরা কোন শুভকার্য্য বা পর্ব্ব উপলক্ষে এই বিদেশীয়গণের জীর্ণ সমাধির সম্মুখে দীপ দান করিয়া থাকেন। এই ব্যাপারটি ক্ষুদ্র হইলেও ইহা মানুষের সহিত মানুষের মিলনের পরিচায়ক হিসাবে বিশেষ প্রণিধানের যোগ্য।

১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে "সন্ন্যাসী হাঙ্গামার" সময় একদল সন্ন্যাসী ক্ষীরপাই গ্রামে প্রবেশ করিয়া উৎপাত করিতে থাকে। মেদিনীপুরের রেসিডেণ্ট্‌ সাহেব তাঁহাদের মধ্যে অনেককে হত ও আহত করিয়া এই উৎপাত দমন করেন।

দয়ার সাগর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্মপল্লী বীরসিংহ গ্রাম ক্ষীরপাই গ্রামের নিকটবর্ত্তী।

গড়বেতা—খড়গপুর জংশন হইতে ৩৭ মাইল দূর। ইহা একটি স্বাস্থ্যকর স্থান। গ্রামের মধ্যে রায়কোটা নামে একটি প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। এই দুর্গটির উত্তরে লাল দরজা, পূর্ব্বে রাউতা দরজা, দক্ষিণে পেশা দরজা ও পশ্চিমে হনুমান দরজা নামে চারিটি দরজা ছিল। আজিও স্থানীয় লোকে উহাদের ধ্বংসাবশেষ দেখাইয়া থাকে। এই দুর্গটি বগড়ীর চৌহানদিগের

গড় বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই গড়ের উত্তরদ্বারের সম্মুখে সাতটি পুষ্করিণীর মধ্যস্থলে প্রাচীন আমলের প্রস্তরনির্ম্মিত সাতটি মন্দির আছে। ইহাও চৌহানদিগের কীর্ত্তি বলিয়া খ্যাত। এখানকার সর্ব্বমঙ্গলা দেবী, কামেশ্বর মহাদেব ও রাধাবল্লভজীর মন্দির প্রসিদ্ধ। ইহাদের মধ্যে আবার সর্ব্বমঙ্গলাই সমধিক খ্যাত। কবে এবং কাহার দ্বারা এই মন্দিরটি স্থাপিত হইয়াছিল তাহা জানা যায় নাই। প্রবাদ, বগড়ীর প্রথম রাজা গজপতি সিংহ ইহার প্রতিষ্ঠাতা, আবার কাহারও মতে উজ্জয়িনীরাজ বিক্রমাদিত্যের সমসাময়িক কোন সিদ্ধপুরুষ অরণ্যমধ্যে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। সর্ব্বমঙ্গলা দেবীর মাহাত্ম্যের কথা শুনিয়া বিক্রমাদিত্য নাকি গড়বেতায় আগমন করিয়া এই স্থানে শবসাধনা করিয়াছিলেন। তাঁহার সাধনায় তুষ্ট হইয়া দেবী তাল ও বেতাল নামে স্বীয় অনুচরদ্বয়কে বিক্রমাদিত্যের আদেশ অনুসারে চলিবার জন্য নিযুক্ত করেন। মহারাজ বিক্রমাদিত্য এই আদেশ সত্য কি না তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য তৎক্ষণাৎ মন্দিরদ্বার পূর্ব্বদিক হইতে উত্তরদিকে পরিবর্ত্তন করিবার আদেশ করেন। এই আদেশ সঙ্গে সঙ্গেই পালিত হয়। তদবধি এই মন্দিরটি উত্তরদ্বারী। এই মন্দিরের গঠনপ্রণালী সাধারণ মন্দির হইতে বিভিন্ন। মন্দিরদ্বার হইতে একটি প্রশস্ত অথচ অন্ধকার সুড়ঙ্গপথে যাইয়া পাষাণময়ী দেবীপ্রতিমার সম্মুখে উপস্থিত হইতে হয়। দেবীর পার্শ্বে সর্ব্বক্ষণই একটি দীপ জ্বালাইয়া রাখা হয়। প্রবাদ, দেবীর পার্শ্বে যে পঞ্চমুণ্ডী আসন আছে তাহার উপর বসিয়া রাজা গজপতি ও বিক্রমাদিত্য প্রভৃতি সিদ্ধ হইয়াছিলেন। গড়বেতায় একটি মুনসেফী আদালত আছে।

বগড়ী রোড—খড়গপুর হইতে ৪০ মাইল। স্টেশন হইতে বগড়ী-কৃষ্ণনগর গ্রাম আড়াই মাইল। অনেকের মতে বগডিহি বা বক রাক্ষসের বাসস্থান হইতে "বগড়ী" শব্দের উৎপত্তি। প্রবাদ, পুরাকালে এই স্থানে নাকি মহাভারতোক্ত বক রাক্ষসের রাজ্য ছিল। জতুগৃহ দাহের পর পাণ্ডবেরা বিদুরের পরামর্শ মত নৌকায় গঙ্গাপার হইয়া দক্ষিণদিকে অরণ্য সমাবৃত এই স্থানে উপনীত হন। বক রাক্ষস প্রত্যহ একটি করিয়া মানুষ ভক্ষণ করিত। ভীমের হস্তে বক রাক্ষসের নিধন ঘটে।

বগড়ী-কৃষ্ণনগর একটি প্রাচীন গ্রাম। এখানে কৃষ্ণরায়জীর একটি সুন্দর পাষাণ নির্ম্মিত বিগ্রহ ও মন্দির আছে। দোলযাত্রার সময় এখানে একটি বড় মেলা হয় ও তাহাতে বাংলার নানাস্থান হইতে বহু নরনারীর সমাগম হয়। প্রবাদ, বগড়ীর প্রথম রাজা গজপতি সিংহের মন্ত্রী রাজ্যধর রায় এই মন্দির নির্ম্মাণ করেন। পরে বগড়ীর রাজা রঘুনাথ সিংহ কৃষ্ণমূর্ত্তির পার্শ্বে রাধিকা বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া মন্দিরটি সম্পূর্ণ করেন। বগড়ীর নিকটে ভিকনগর ও গনগণির মাঠ নামক দুইটি স্থান আছে। প্রবাদ, পাণ্ডবেরা ভিক্‌নগর হইতে ভিক্ষা করিয়া দৈনিক আহার্য্য সংগ্রহ করিতেন। শিলাবতী নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত গনগণির মাঠে ভীম কর্ত্তৃক বক রাক্ষস নিহত হইয়াছিল বলিয়া স্থানীয় লোকের বিশ্বাস। এই মাঠের উপর কতকগুলি প্রস্তরীভূত বৃক্ষকাণ্ডকে লোকে বক রাক্ষসের অস্থি বলিয়া দেখাইয়া থাকে। বগড়ী-কৃষ্ণনগরের নিকটবর্ত্তী মহাভারতোক্ত একচক্রপুর বা একারিয়া গ্রামে সপুত্র কুন্তীদেবী যে স্থানে বাস করিয়াছিলেন লোকে আজিও তাহা নির্দ্দেশ করিয়া থাকে।

জঙ্গলমহালের চুয়াড়দিগের দমনের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ইহার অব্যবহিত পরে ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে নাএক নামে বন্যজাতি মেদিনীপুর জেলার উত্তরাংশে বিদ্রোহী হয়। নাএকরা প্রায় চুয়াড়দিগেরই মত। তাহারা ধর্ম্মে হিন্দু ছিল এবং গো-ব্রাহ্মণের উপর তাহাদের অত্যন্ত ভক্তি ছিল; বগড়ীর রাজবংশ কর্ত্তৃক প্রদত্ত জায়গীর তাহারা পুরুষানুক্রমে ভোগদখল করিত এবং প্রয়োজন হইলে

রাজ সরকারে সৈনিক বা পাইকের কাজ করিত। ঈস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানি বগড়ীর রাজা ছত্রসিংহকে রাজ্যচ্যুত করিবার সঙ্গে সঙ্গে নাএকদিগের জায়গীর বাজেয়াপ্ত করেন। নাএকগণ ইহাতে বিশেষ ক্ষুব্ধ হইয়া অচলসিংহ নামক একজন সাহসী পুরুষের নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তাহারা গভীর অরণ্য আশ্রয় করিয়া নিকটবর্ত্তী অঞ্চলসমূহে একমাত্র ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর সকলের উপর ভীষণ অত্যাচার করিতে সুরু করে। ইহাই "বগড়ীর নাএক হাঙ্গামা" নামে পরিচিত। নাএকগণের উপদ্রবে মেদিনীপুর ও হুগলী জেলার বহুস্থান বিপন্ন হইয়া উঠে। পূর্ব্বোক্ত গনগণির মাঠে তাহাদের সহিত বহুদিন ধরিয়া ব্রিটিশ সৈন্যের খণ্ডযুদ্ধ হইয়াছিল। প্রথম প্রথম ব্রিটিশ সৈন্য এই অরণ্যচারী জাতির সহিত যুদ্ধে ততটা সুবিধা করিতে পারে নাই, পরে বহু কামান একত্রে দাগিয়া তাহারা নাএকদিগের সমস্ত আডডা ধবংস করে। এই যুদ্ধে বহু নাএক সৈন্য প্রাণত্যাগ করে ও অনেকে বন্দী হয়। নায়ক অচল সিংহ কিন্তু পলাইয়া চলিয়া যায়। পরে অচল সিংহ আর একদল নাএকসৈন্য লইয়া বর্গীদের দলে যোগ দেয় ও ব্রিটিশ অধিকৃত স্থানসমূহে ভীষণ অত্যাচার করিতে থাকে। প্রথমদিকে ব্রিটিশ সৈন্যগণ ইহার কোনই প্রতীকার করিতে পারে নাই। অবশেষে বগড়ীর রাজ্যচ্যুত রাজা ছত্রসিংহের সাহায্যে অচলসিংহ ধৃত হয়। অচলসিংহের পরেও নাএকগণ আরও কিছুদিন ধরিয়া ইংরেজদিগের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল। অবশেষে ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে তাহারা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও বিধ্বস্ত হয়। এই সময়ে প্রায় ২০০ নাএক যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হয় ও ১৭ জন দলপতিকে প্রকাশ্যস্থানে ফাঁসি দেওয়া হয়।

বিষ্ণুপুর—খড়গপুর জংশন হইতে ৫৩ মাইল দূর। ইহা বাঁকুড়া জেলার মহকুমা ও প্রাচীন মল্লভূম রাজ্যের রাজধানী। রঘুনাথ বা আদিমল্ল মল্লভূমরাজ্য ও মল্লরাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, বর্দ্ধমান ও সাঁওতাল পরগণা জেলার কতকাংশ এবং ছোট নাগপুরের অধিত্যকা ভূমির কতকাংশ লইয়া মল্লভূম রাজ্য গঠিত হইয়াছিল। প্রবাদ, সপ্তম শতাব্দীতে তীর্থকামী কোন ক্ষত্রিয় রাজার মহিষী বৃন্দাবন হইতে শ্রীক্ষেত্রের পথে একটি পুত্র সন্তান প্রসব করার পর মৃত্যুমখে পতিত হন। পুত্রটি স্থানীয় কোন গৃহস্থ কর্ত্তৃক লালিত পালিত হয়। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বালকের দেহে ক্ষত্রোচিত বলবীর্য্যের বিকাশ ঘটিতে থাকে এবং সে মল্লক্রীড়ায় অপরাজেয় হইয়া উঠে। এই বালকই উত্তরকালে আদিমল্ল বা রঘুনাথ নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। রঘুনাথ স্বীয় পরাক্রমবলে বহু সামন্ত রাজা ও সর্দ্দারকে পরাস্ত করিয়া এক বিস্তীর্ণ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। এই রাজ্যই মল্লভূম নামে খ্যাত। ৬৯৫ খৃষ্টাব্দ হইতে মল্লাব্দ গণনা করা হয়। মল্লভূমের প্রথম রাজধানী ছিল প্রদ্যুম্নপুরে। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে রঘুনাথ মল্লের উনবিংশ বংশধর জগৎমল্ল বিষ্ণুপুরের রাজধানী স্থানান্তরিত করেন।

বহু শতাব্দী ধরিয়া মল্লরাজগণ বাংলার পশ্চিম সীমান্তে রাজত্ব করিয়াছিলেন। মুসলমান যুগেও বহুকাল ধরিয়া বিস্তৃত ভূখণ্ডে বিষ্ণুপুরের রাজারা অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। জগৎমল্লের পর রামমল্লের সময়ে সেনাবাহিনীর রণনৈপুণ্যের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। শিবসিংহ মল্লের রাজত্বকালে বিষ্ণুপুরে ললিত কলার বিশেষতঃ সঙ্গীত সাধনার বিকাশ ঘটে। ধারীমল্লের পুত্র বীর হাম্বীরের সময়ে মল্লভূমরাজ্য উন্নতির চরমশিখরে আরোহণ করে। তিনি সেনাবাহিনীর ও দুর্গের পুনর্গঠন করেন এবং তাঁহারই সময়ে মল্লভূমে বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিস্তৃতি ঘটে। ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে বাংলার নবাব সোলেমান কররানীর পুত্র দায়ুদ খাঁ বিষ্ণুপুর আক্রমণ করেন, কিন্তু বীর হাম্বীরের হস্তে তাঁহার পরাজয় ঘটে। দুর্গের পূর্ব্বদ্বারে মৃত নবাব সৈন্যের এত শবদেহ জমিয়াছিল যে উহা "মুণ্ডমালাঘাট" নামে আখ্যাত হয়।

মল্লভূমে বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রচার সম্বন্ধে একটি সুন্দর কাহিনী প্রচলিত আছে। শ্রীনিবাস আচার্য্য, শ্যামানন্দ ও নরোত্তম ঠাকুর প্রভৃতি বৈষ্ণব মহান্তগণ বৃন্দবন হইতে গোস্বামিগণের গ্রন্থসমূহ পেটিকার মধ্যে করিয়া গো-শকটে মল্লভূমরাজ্যের মধ্য দিয়া গৌড়ে লইয়া আসিতেছিলেন। রাজ জ্যোতিষীর গণনামত পেটিকাগুলির মধ্যে ধনরত্ন আছে মনে করিয়া বীর হাম্বীর তাঁহার লোকজন দিয়া উহা লুণ্ঠন করিয়া আনান। পুঁথিগুলির উদ্ধারের আশায় শ্রীনিবাস আচার্য্য রাজসভায় গিয়া উপস্থিত হন। তাঁহার সৌম্যমূর্ত্তি দর্শন এবং ভগবদ্ভক্তি ও অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া রাজা বীর হাম্বীর তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। বীর হাম্বীরের বৈষ্ণব ধর্ম্মগ্রহণ মল্লভূমের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়। অনেকেই বোধ হয় জানেন, কলিকাতার বাগবাজারে যে মদনমোহন ঠাকুর আছেন, তিনি বিষ্ণুপুর রাজবংশের কুলদেবতা। মল্লরাজ চৈতন্যসিংহ ইংরেজ আদালতে মোকদ্দমার খরচ সংগ্রহের জন্য এই বিগ্রহটিকে বাগবাজার নিবাসী প্রসিদ্ধ ধনী গোকুলমিত্রের নিকট বন্ধক রাখেন। বিষ্ণুপুররাজ গোপাল সিংহ নিয়ম করিয়াছিলেন যে তাঁহার রাজ্যবাসী প্রত্যেককেই প্রত্যহ নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক হরিনাম জপ করিতে হইবে, ইহা যে না করিবে সে শাস্তি পাইবে। এই কার্য্যকে লোকে " গোপাল সিংহের বেগার " আখ্যা দিয়াছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে মাহারাট্টা বা বর্গীর উপর্য্যুপরি আক্রমণে ও গৃহবিবাদের ফলে মল্লরাজ্যের পতন হয়। ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে মল্লভূম বর্দ্ধমানের মহারাজার নিকট বিক্রীত হয়।

বিষ্ণুপুরে বহু প্রাচীন কীর্ত্তি আছে। উহাদের মধ্যে প্রাচীন দুর্গের গড়খাই, পাথর দরজা ও বীর দরজা নামক প্রস্তর নির্ম্মিত দুর্গদ্বার, প্রসিদ্ধ "দলমর্দ্দন" বা "দলমাদল" কামান, মল্লেশ্বর, মদনগোপাল, মদনমোহন, কালাচাঁদ, শ্যামরায় ও রাধাশ্যামের মন্দির, জোড়বাংলা, রাসমঞ্চ, পঞ্চরত্ন মন্দির; লালবাঁধ, কৃষ্ণবাঁধ, যমুনাবাঁধ, শ্যামবাঁধ ও কালিন্দীবাঁধ, প্রভৃতি নামধেয় বাঁধ বা প্রকাণ্ড জলাশয় প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বিষ্ণুপুরের মন্দিরগুলি প্রাচীন বাংলার স্থাপত্য শিল্পের অপূর্ব্ব নিদর্শন। বস্তুতঃ বিষ্ণুপুর প্রাচীন বঙ্গের সংস্কৃতি ও সভ্যতার একটি প্রধান কেন্দ্র।

বিষ্ণুপুরের সুবিখ্যাত দলমাদল কামানটির দৈর্ঘ ১২ ফুট ৫।। ইঞ্চি ও পরিধি ১১।। ইঞ্চি। গঠনে ইহা বিজাপুরের সুপ্রসিদ্ধ কামান "মালিক-ই-ময়দান" এর অনুরূপ। ইহা এরূপ লৌহের দ্বারা প্রস্তুত যে আজ পর্য্যন্ত ইহার কোথাও একটু মরিচা ধরে নাই। ইহাতে স্বতঃই দিল্লীর প্রসিদ্ধ প্রাচীন ও মরিচাবিহীন লৌহস্তম্ভের কথা মনে হয়। বর্ত্তমানে এই কামানটি সরকারের রক্ষিত কীর্ত্তির অন্তর্গত। ইহার গায়ে ফার্সিতে একটি লিপি খোদিত আছে, তাহা হইতে জানা যায় যে এই কামানটি প্রস্তুত করিতে একলক্ষ পচিশ হাজার টাকা লাগিয়াছিল। প্রবাদ যে মাহারাট্টা সর্দ্দার ভাস্কর পণ্ডিত ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে বিষ্ণুপুর আক্রমণ করিলে রাজধানী রক্ষা করিবার জন্য স্বয়ং মদনমোহন দেব দলমাদল কামান দাগিয়া শত্রুসৈন্যকে দূরীভূত করিয়াছিলেন।

মদনমোহন ও জোড়বাংলা মন্দিরের গাত্রে ইষ্টকের উপর যে সকল দৃশ্যাবলী উৎকীর্ণ আছে তাহা শিল্পসম্পদে বিশেষ সমৃদ্ধ। জোড়বাংলার গাত্রে একটি সুন্দর নৌ-যুদ্ধের চিত্র আছে। উহা যবদ্বীপের প্রসিদ্ধ বোরোবুদুর মন্দির গাত্রের চিত্রাবলীর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

লালবাঁধ পুষ্করিণী সম্বন্ধে জনশ্রুতি এই যে, রাজা দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহ বরদার বিদ্রোহী রাজা শোভা সিংহকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া লুণ্ঠিত সামগ্রীর সহিত লালবাঈ নামে একটি অতি সুন্দরী মুসলমান রমণীকে লইয়া আসেন। লালবাঈএর সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া রাজা তাহার জন্য একটি স্বতন্ত্র মহাল

নির্ম্মাণ করাইয়া দেন এবং একটি বৃহৎ পুষ্করিণী খনন করাইয়া তাহার নামানুসারে "লালবাঁধ" নাম রাখেন। লালবাঈএর অনুরোধে রাজা ইসলাম ধর্ম্মগ্রহণ করিতে মনস্থ করিলে প্রধানা মহিষী তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইয়া মন্ত্রী গোপাল সিংহ প্রভৃতির সহায়তায় তাঁহাকে হত্যা করান। লালবাঈকে লালবাঁধে ডুবাইয়া মারা হয়। অতঃপর প্রধানা মহিষী রাজার চিতায় আরোহণ করিয়া "সতী" হন। সেই জন্য লোকে তাঁহাকে "পতিঘাতিনী সতী" নামে অভিহিত করে। লালবাঈ রাজ্যশুদ্ধ লোক সমেত রাজাকে যে স্থানে মুসলমানী খানা খাওয়াইবার আয়োজন করিয়াছিলেন উহা আজিও "ভোজনতলা" নামে পরিচিত।

প্রাচীন কাল হইতেই বিষ্ণুপুর সঙ্গীত চর্চ্চার জন্য বিখ্যাত। "বিষ্ণুপুরী পদ্ধতি" নামক গানের ঢঙ্ ভারতের সর্ব্বত্র সম্মানিত। সঙ্গীতাচার্য্য যদুভট্ট ও রাধিকা প্রসাদ গোস্বামী বিষ্ণুপুরের অধিবাসী ছিলেন।

বিষ্ণুপুরের শাঁখার জিনিস, তুলসীর মালা, রেশমের শাড়ী, পাট ও তসরের কাপড়, পিতল কাঁসার বাসন এবং তামাক বিশেষ প্রসিদ্ধ।

বিষ্ণুপুরের প্রায় ১২ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত ময়নাপুর নামক গ্রামে রাঢ়ে ধর্ম্মপূজার প্রবর্ত্তক রমাই পণ্ডিত "যাত্রাসিদ্ধি রায়" নামে এক ধর্ম্মঠাকুর প্রতিষ্ঠা করেন। ময়নাপুরের প্রায় ৭ মাইল উত্তরে দ্বারকেশ্বর নদের ধারে চাঁপাতলা নামে যে ঘাট দৃষ্ট হয় উহা ধর্ম্মমঙ্গল গ্রন্থগুলিতে উল্লিখিত মহামুনি দুর্ব্বাসা, নারদ, কপিল প্রভৃতির তপস্যার স্থান এবং গুপ্তবারাণসী বলিয়া বর্ণিত "চাপায়ের ঘাট"। রাজা রঘুনাথ মল্লের রাজত্বকালে কবি রমাই পণ্ডিত ধর্ম্ম পূজার মাহাত্ম্যসূচক প্রসিদ্ধ কাব্য "শূন্যপুরাণ" রচনা করেন।

বাঁকুড়া—খড়গপুর জংশন হইতে ৭২ মাইল। জেলার সদর শহর বাঁকুড়ার উত্তরে গন্ধেশ্বরী নদী ও দক্ষিণে দ্বারকেশ্বর নদ প্রবাহিত। বাঁকুড়া পূর্ব্বে মল্লভূম রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। মল্লরাজগণের পতনের পর ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ইহা স্বতন্ত্র জেলা হইয়াছে। বাঁকুড়া শহরটি অপেক্ষাকৃত উচচ ভূখণ্ডের উপর অবস্থিত ও স্বাস্থ্যকর। এখানে খৃষ্টান মিশনারীগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজ, একটি মেডিকেল স্কুল ও একটি উচচ ইংরেজী বালিকা বিদ্যালয় আছে। অল্পবয়স্ক কয়েদীগণের চরিত্র সংশোধনরে জন্য এখানে একটি "বরস্টল জেল" আছে। এখান হইতে পিতলের বাসন, সুতা ও তসরের বস্ত্র, শাঁখার গহনা, হরিতকী ও বহেড়া প্রভৃতি নানা স্থানে রপ্তানি হয়। বাঁকুড়ার এক্তেশ্বর শিব বা মণিমহাদেবের মন্দির একটি দ্রষ্টব্য বস্তু।

বাঁকুড়া হইতে "বাঁকুড়া দামোদর নদ রেলপথ" নামক একটি ছোট মাপের (ন্যারো গেজ) রেলপথে এই জেলার ও বর্দ্ধমান জেলার কয়েকটি স্থানে যাওয়া যায়। এখান হইতে অনেকগুলি বাস সার্ভিসও আছে।

সোনামুখী—বঁকুড়া দামোদর নদ রেলপথে বাঁকুড়া হইতে ২৬ মাইল দূরে সোনামুখী একটি প্রসিদ্ধ স্থান। এখানে গালা প্রস্তুত হয় এবং এখানকার তসর কাপড়, লৌহনির্ম্মিত দ্রব্যাদি ও মাটির জিনিস বিশেষ প্রসিদ্ধ। বাংলাদেশের আদি কথক গদাধর চক্রবর্ত্তী, বিখ্যাত বৈষ্ণবসাধক মনোহর দাস ও ঠাকুর হরনাথ সোনামুখীর অধিবাসী ছিলেন। ঠাকুর হরনাথের পুরা নাম হরনাথ

বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথম জীবনে ইনি কাশ্মীর রাজ্যের ধর্ম্মার্থ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ছিলেন, উত্তরকালে ধর্ম্মচর্চা করিয়া বিশেষ বিখ্যাত হন। বাংলাদেশে হরনাথ ঠাকুরের অনুরক্ত বহু শিক্ষিত ব্যক্তি আছেন।

ইন্দাস—বাঁকুড়া হইতে ৪২ মাইল পূর্ব্বে "বাঁকুড়া দামোদর নদ" রেলপথের উপর অবস্থিত ইন্দাস একটি প্রাচীন স্থান। মল্লরাজগণের সময়ে ইহা ইন্দ্রহাস রাজ্য নামে পরিচিত ছিল। এই গ্রাম খ্যাতনামা তান্ত্রিক গৌরী পণ্ডিতের জন্মভূমি। ইন্দাসের নিকটবর্ত্তী শ্রীপুর গ্রাম ধাত্রীবিদ্যা বিশারদ খ্যাতনামা চিকিৎসক স্যর কেদারনাথ দাস মহাশয়ের পৈতৃক বাসস্থান।

বাঁকুড়া জেলার পাত্রসায়ের থানার অন্তর্গত রামপুর গ্রাম বিখ্যাত "শুভঙ্করী" নামক গণিত পুস্তক প্রণেতা শুভঙ্কর দাসের জন্মস্থান। এই গ্রামে "শুভঙ্করের দাঁড়া" নামে একটি প্রাচীন রাস্তার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়।

বাঁকুড়া হইতে মোটরবাসযোগে ২৩ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত খাতড়া নামক বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামে যাওয়া যায়। এই স্থানটি অতি স্বাস্থ্যকর। এখানে একটি মুনসেফী আদালত ও গালা তৈয়ারী করিবার দুইটি কারখানা আছে। খাতড়ার নিকটে "মশক পাহাড়" নামে একটি পাহাড় আছে।

বাঁকুড়া জেলার উত্তর সীমার শেষগ্রাম মেঝিয়া বাঁকুড়া হইতে মোটরবাস যোগে যাওয়া যায়। ইহা দামোদর নদের দক্ষিণতীরে অবস্থিত। এখানে প্রচুর পরিমাণে গালা প্রস্তুত হয়। ইহার নিকটবর্ত্তী কালিকাপুর, হরিশচন্দ্রপুর ও বাঁশকুণ্ডি প্রভৃতি গ্রামে কয়লার খনি আছে। মেঝিয়ার অনতিদূরস্থ ভুলুই নামক গ্রামে প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্বে কবি জগৎরাম ও রামপ্রসাদ রায় জন্মগ্রহণ করেন। রামপ্রসাদ জগৎরাম রায়ের পুত্র। ইঁহারা পিতাপুত্রে মিলিয়া "অদ্ভুত অষ্টকাণ্ড রামায়ণ" নামে পরিচিত এক রামায়ণ রচনা করেন। এই রামায়ণে সীতা কর্ত্তৃক সহস্রস্কন্ধ রাবণ বধের বৃত্তান্ত আছে। রামপ্রসাদ রায় "দুর্গা পঞ্চরাত্র" ও "কৃষ্ণলীলামৃত" নামে অপর দুই খানি গ্রন্থও রচনা করেন।

ছাতনা—বাঁকুড়া হইতে ৮ মাইল এবং খড়্গপুর জংশন হইতে ৮০ মাইল দূর। এখানে বাশুলী দেবীর একটি অতি প্রাচীন মন্দির আছে। কোন কোন পণ্ডিতের মতে ইহা সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন কবি চণ্ডীদাসের জন্মস্থান। তবে অধিকাংশের মতে বীরভূম জেলার নানুর গ্রাম চণ্ডীদাসের জন্মভূমি। অনেকের অনুমান যে একাধিক প্রাচীন কবির চণ্ডীদাস নাম ছিল, ছাতনা তাঁহাদের মধ্যে কাহারও জন্মস্থান হইতে পারে।

ছাতনার প্রাচীন নাম ছত্রিনা। এক সময় ইহা একটি রাজবংশের রাজধানী ছিল। ইহার প্রাচীনত্বের চিহ্ন এখনও কিছু কিছু বর্ত্তমান আছে।

ছাতনা হইতে ৬ মাইল উত্তরে শুশুনিয়া পাহাড় অবস্থিত। এই পাহাড়ে চন্দ্রবর্ম্মার একখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে উহা প্রায় দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বে খোদিত। কাহারও কাহারও মতে দিল্লীর প্রসিদ্ধ মরিচা-হীন লৌহের জয়স্তম্ভ এই চন্দ্ররাজা কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

শুশুনিয়া গ্রামে পিতল ও কাঁসার বাসন প্রস্তুত হয় এবং পাহাড়ের প্রস্তরখণ্ড হইতে শিল, নোড়া, টালি, চাকি, মাইল স্টোন প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া নানা স্থানে চালান যায়।

ছাতনা স্টেশন হইতে শুশুনিয়া মোটরবাসে যাওয়া যায়।

ঝাঁটিপাহাড়ী—বাঁকুড়া হইতে ১৪ এবং খড়গপুর জংশন হইতে ৮৬ মাইল দূর। ইহা মানভূম জেলার অন্তর্গত। এখানে ঘুটিং চূণ প্রস্তুত করিবার একটি বৃহৎ কারখানা আছে।

আদড়া জংশন—খড়গপুর জংশন হইতে ১০৫ মাইল দূর। ইহা মানভূম জেলার একটি প্রসিদ্ধ স্থান ও বাংলা নাগপুর রেলপথের একটি বড় জংশন। এখান হইতে দুইটি শাখা লাইন একদিকে আসানসোল জংশন এবং অপর দিকে গোমো জংশন স্টেশনে গিয়া ঈস্ট্ ইণ্ডিয়ান্ রেল পথের সহিত মিলিত হইয়াছে। অন্য একটি শাখা লাইন বাংলা নাগপুর রেলপথের নাগপুরগামী প্রধান লাইনের সিনি জংশন হইতে পুরুলিয়া হইয়া এখানে আসিয়া মিশিয়াছে। আদড়ায় বাংলা নাগপুর রেলপথের ট্রাফিক বিভাগের একটি সদর অফিস অবস্থিত। এখানে বহু রেল কর্ম্মচারীর বাস এই রেলওয়ে উপনিবেশটিতে উচচ ইংরেজী বিদ্যালয়, প্রমোদাগার, উদ্যান, ক্রীড়াক্ষেত্র ও পাঠাগার প্রভৃতি আছে। আদড়ার গির্জাটি দেখিতে অতি সুন্দর।

আদড়া হইতে সাড়ে তিন মাইল উত্তরে অবস্থিত রঘুনাথপুর মানভূম জেলার একটি প্রসিদ্ধ স্থান। এখানে মিউনিসিপ্যালিটি ও মুনসেফী আদালত আছে। এখানকার তসরের কাপড় অতি সুন্দর।
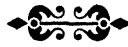
(গ) খড়্গপুর-সিনি—চক্রধরপুর

ঝাড়গ্রাম—খড়্গপুর জংশন হইতে ১৪ মাইল দূর। ইহা মেদিনীপুর জেলার অন্যতম মহকুমা। রেল লাইন খুলিবার পূর্ব্বে এই অঞ্চল জঙ্গলাকীর্ণ ছিল এবং এখানে পাইক ও চুয়াড় প্রভৃতি দস্যুবৃত্তিধারী জাতি বাস করিত।

রেলের কল্যাণে ঝাড়গ্রাম একটি সমৃদ্ধ শহরে পরিণত হইয়াছে। এই স্থানে প্রাচীন মল্লভূম রাজ্যের বহু রাজবংশধরের বাস। ঝাড়গ্রামের গড়ের মধ্যে রাজবংশের অধিষ্ঠাত্রী সাবিত্রী দেবীর মন্দির আছে, ইহা একটি প্রাচীন কীর্ত্তি। এখানে কোন প্রতিমা নাই, সিন্দুর রঞ্জিত একখানি বৃহৎ খড়্গ ও একটি পেটিকার উপর নিত্য অর্চ্চনা হয়। কথিত আছে এই পেটিকার মধ্যে এক গুচ্ছ কেশ আছে, উহা মন্দিরাধিষ্ঠাত্রী সাবিত্রী দেবীর কেশ বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই সাবিত্রী দেবী নাকি ছিলেন মানবী। প্রবাদ, জনক-জননীর সহিত ওড়িষ্যা গমন পথে ঝাড়গ্রামের নিকট তৎকালীন জনৈক দস্যু কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হইয়া বাল্যকাল হইতে ইনি দস্যু সর্দ্দারের গৃহে লালিত পালিত হন। তিনি নিজেকে "সবিতার দাসী সাবিত্রী" নামে পরিচয় দিতেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে তাঁহার অপরূপ রূপলাবণ্য দর্শনে আকৃষ্ট হইয়া দস্যু সর্দ্দারের পুত্র তাঁহাকে বলপূর্ব্বক আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু দৈবপ্রেরিত খড়্গের সাহায্যে তিনি আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হন। সরোবর মধ্যস্থ একটি মন্দিরে তাঁহার বাসস্থান ছিল। ঝাড়গ্রামের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা দস্যুগণের হস্ত হইতে ঝাড়গ্রাম অধিকার করিয়া লন। এই নবীন রাজাও সাবিত্রী দেবীর সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিতে অভিলাষী হন। তাঁহার নির্ব্বন্ধাতিশয়ে সাবিত্রী দেবী এই প্রস্তাবে সম্মত হন। কিন্তু বিবাহের দিন অপরাহ্নে তিনি সমস্ত অলঙ্কার ত্যাগ করিয়া একাকিনী অদূরবর্ত্তী শালবনের দিকে চলিলেন। রাজা এই সংবাদ পাইবামাত্র অতি ব্যস্ততার সহিত তাঁহার অনুসরণ করিলেন। রাজানুসৃতা সাবিত্রী দেবী শালবন পার হইয়া এক বালুকা প্রান্তরে পৌঁছিলে রাজা শশব্যস্তে তাঁহার দীর্ঘ কেশ গুচ্ছ ধরিয়া ফেলিলেন। অকস্মাৎ চতুর্দ্দিক হইতে বালুকারাশি আসিয়া সাবিত্রী দেবীকে ঢাকিয়া ফেলিল। রাজাও বালুকারাশির মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া যাইতেছেন দেখিয়া অনুচরেরা বলপূর্ব্বক তাঁহাকে সরাইয়া আনিল। সাবিত্রী দেবীর একগুচ্ছ কেশ রাজার হস্তে রহিয়া গেল। অতঃপর স্বপ্নাদেশ পাইয়া রাজা সাবিত্রী দেবীর কেশ গুচ্ছ ও খড়্গ মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করিয়া নিত্য পূজার ব্যবস্থা করিলেন। ঝাড়গ্রাম গড়ের দুই মাইল দূরে রাধানগর গ্রামে ঝাড়গ্রামের অন্যতম রাজা বিক্রমজিৎ মল্ল উগাল দেব বাহাদুরের নির্ম্মিত মেল বাঁধ ও কেরেন্দার বাঁধ নামে দুইটি বৃহৎ পুষ্করিণী আছে।

স্বাস্থ্যপ্রদ স্থান বলিয়া ঝাড়গ্রামের বিশেষ খ্যাতি আছে। এখানকার পানীয় জল অতি সুস্বাদু এবং শালবনের হাওয়া ভগ্নস্বাস্থ্যের পুনর্গঠনে বিশেষ সহায়তা করে। ঝাড়গ্রামের প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী সুন্দর ও মনোরম।

গিধনি—খড়্গপুর জংশন হইতে ২৪ মাইল দূর। ইহাও একটি বিশেষ স্বাস্থ্যকর স্থান। গিধনি মেদিনীপুর জেলা তথা বাংলার শেষ রেলওয়ে স্টেশন। কলিকাতার অনেক ধনী ব্যক্তি এখানে বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এখানে একটি ডাক্‌বাংলা আছে। স্থানীয় অধিবাসিগণের মধ্যে সাঁওতালের সংখ্যাই অধিক।

চাকুলিয়া—খড়গপুর জংশন হইতে ৩৪ মাইল দূর। এই স্থান হইতে সিংহভূম জেলার আরম্ভ। ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে ক্যাপেটন মর্গ্যান্ নামে জনৈক ইংরেজ সেনাপতি চাকুলিয়ার তদানীন্তন সর্দ্দারকে পরাস্ত করিয়া ধলভূম পরগণার এই অংশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। এখানে একটি পুরাতন ঘাটোয়ালী দুর্গ ও নীলকুঠির ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। চাকুলিয়া হইতে ৬ মাইল পূর্ব্বে বেন্দ নামক গ্রামে সরস্বতী পূজার সময় সপ্তাহকাল স্থায়ী একটি মেলা হয়।

ধলভূমগড়—খড়গপুর জংশন হইতে ৫৩ মাইল দূর। ইহা সিংহভূম জেলার একটি মহকুমা। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ধলভূম মেদিনীপুর জেলার জঙ্গল মহালের অধীন ছিল। জঙ্গল-মহাল উঠিয়া যাওয়ার পর ইহা সিংহভূম জেলার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ধলভূমগড়ে একটি প্রাচীন রাজবংশের বাস, এই বংশের উপাধি ধবলদেব। ধলভূম বা ধবলভূম পূর্ব্বে একটি স্বাধীন রাজ্য ছিল। ধলভূমের রাজবংশ রাজপুত বলিয়া পরিচিত। কথিত আছে রঙ্কিনী দেবীর বরে জনৈক রজক (ধল) এই পরগণার অধীশ্বর হইয়া এক ব্রাহ্মণ কুমারীকে বিবাহ করে। এই ধল বা রজকের বংশধরগণের আখ্যা হয় ধবলদেব। স্বাধীন ধলভূম রাজ্যের অধীনে কয়েকটি সামন্তরাজ্য ছিল। উহাদের মধ্যে সেরাইকেলা ও খারসোয়ানের নাম উল্লেখ যোগ্য। বর্ত্তমানে এই দুইটি রাজ্য ওড়িষ্যা প্রদেশের অন্তর্গত।

ধলভূম পরগণার অধিবাসিগণের মধ্যে ভূমিজ, কোল, মুণ্ডা প্রভৃতি প্রধান। ভূমিজগণ বিশেষ প্রতিপত্তিশালী। ইঁহাদের মধ্যে "ঘাটওয়াল" উপাধিধারী এক শ্রেণীর জমিদার বা জায়গীরদার আছেন। এই উপাধি ও জায়গীর প্রথা স্বাধীন ধলভূম রাজগণ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। ঘাটওয়ালগণ লোকলস্কর ও পাইক রাখিয়া রাজ্যের সীমান্ত রক্ষা করিতেন। বর্ত্তমানযুগেও সিংহভূম জেলায় ঘাটওয়ালগণের বিশেষ প্রাধান্য আছে। এই মহকুমার অধিকাংশ অধিবাসী বাংলাভাষা ভাষী।

১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে ধলভূমের রাজা ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। কিন্তু যুদ্ধে তাঁহার পরাজয় ঘটে। অতঃপর ব্রিটিশ সরকার তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র জগন্নাথ সিংহ ধবলদেবকে রাজপদে অভিষিক্ত করেন। ধলভূমের বর্ত্তমান রাজবংশ এই জগন্নাথ সিংহের উত্তরাধিকারী।

ঘাটশিলা—খড়গপুর হইতে ৬১ মাইল দূরে পার্ব্বত্য নির্ঝরিণী সুবর্ণরেখার তীরে অবস্থিত ঘাটশিলার নাম স্বাস্থ্যকামী মাত্রেরই নিকট সুপরিচিত। এখানকার জলহাওয়া স্বাস্থ্যকর বলিয়া বহু সম্পন্ন বাঙালী ভদ্রলোক এখানে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন এবং প্রত্যেক ছুটির সময় এখানে আসিয়া অবসর যাপন ও স্বাস্থ্য সঞ্চয় করিয়া থাকেন।

পূর্ব্বকালে ঘাটশিলাতে ধলভূম রাজ্যের রাজধানী ছিল। ঘাটশিলায় রঙ্কিনী দেবীর মন্দির বিদ্যমান। পূর্ব্বে এই দেবীর সম্মুখে নরবলি হইত। প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে রঙ্কিনীদেবীর মন্দির চত্বরে বিন্দু-উৎসব নামে একটি উৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। বহু দূরদেশাগত সাঁওতালগণই এই উৎসবের হোতা। একটি মহিষকে তীর বিদ্ধ করিয়া হত্যা করাই এই উৎসবের প্রধান অঙ্গ।

ঘাটশিলার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি সুন্দর। নীল পর্ব্বতমালা পরিবেষ্টিত গ্রামের প্রান্ত দিয়া প্রবাহিতা সুবর্ণরেখার সৌন্দর্য্যে মন মুগ্ধ হয়।

ঘাটশিলা হইতে তিনমাইল দূরে মৌ-ভাণ্ডারে একটি তামার খনি ও কারখানা আছে।

ঘাটশিলার নিকটবর্ত্তী পঞ্চপাণ্ডব নামক স্থানে পঞ্চপাণ্ডবের প্রস্তর নির্ম্মিত মূর্ত্তি বলিয়া কথিত পাঁচটি মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

গালুড়ি—খড়্গপুর জংশন হইতে ৬৭ মাইল। ইহাও একটি স্বাস্থ্যকর স্থান। চতুর্দ্দিকে পাহাড় ও শালবন থাকায় ইহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যও অতি মনোরম। গালুড়ি হইতে তিন মাইল দূরে রাখা নামক স্থানে তামার খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। গালুড়ির পর "রাখা মাইনস্" নামে একটি রেলস্টেশন আছে।

টাটানগর—খড়্গপুর জংশন হইতে ৮৪ মাইল দূর। ইহা ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্প কেন্দ্র। পৃথিবীর যে কোন স্থান হইতে যে কেহ ভারত ভ্রমণে আসেন তিনি টাটানগরের বিরাট কারখানাটি না দেখিয়া যান না। এখানে প্রচুর পরিমাণে লৌহ, ইস্পাত, টিন ও লোহার কড়ি প্রভৃতি প্রস্তুত হয় এবং এই সকল দ্রব্যের জন্য ভারতবর্ষকে আর পূর্ব্বের ন্যায় ততটা পর দেশের মুখাপেক্ষী হইতে হয় না। পরলোকগত জমসেদজী টাটার নামানুসারে এই স্থানের নাম হইলেও, বাঙালীর সহিত ইহার সম্বন্ধ যে কত ঘনিষ্ঠ তাহা বোধ হয় অনেকেই জানেন না। বাঙালী ভূতত্ত্ববিদ স্বর্গীয় প্রমথনাথ বসু মহাশয় নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে লৌহখনি আবিষ্কার করেন এবং প্রধানতঃ তাঁহারই পরামর্শে বোম্বাইএর ধনিকগণ বিপুল ধনভাণ্ডার লইয়া এক অজ্ঞাত, অখ্যাত ও উপেক্ষিত গণ্ডগ্রাম সকচীতে উপস্থিত হন। সকচী পরে কালীমাটি নাম ধারণ করে এবং কালীমাটি আজ ভুবনবিখ্যাত টাটানগর। বর্ত্তমানে টাটানগরের মত সমৃদ্ধ শ্রমিক কেন্দ্র ভারতে আর একটিও নাই।

টাটানগর হইতে বাংলা নাগপুর রেলপথের একটি শাখা ৫৫ মাইল দূরবর্ত্তী বাদাম পাহাড় পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই লাইন দিয়াই টাটার কারখানার জন্য অধিকাংশ লৌহপ্রস্তর আনীত হয়। টাটানগরের পরবর্ত্তী স্টেশন গোমারিয়া হইতে অপর একটি শাখা লাইন ৮৯ মাইল দূরবর্ত্তী বরকাকানা পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই শাখা পথের মুড়ী জংশনে নামিয়া ছোট মাপের গাড়ীতে রাঁচী যাইতে হয়।

সিনি জংসন—খড়্গপুর জংশন হইতে ১০০ মাইল দূর। ইহা সেরাইকেলা রাজ্যের অন্তর্গত। এখান হইতে বাংলা নাগপুর রেলপথের প্রধান লাইন রাজখরসোয়ান ও চক্রধরপুর হইয়া নাগপুর অভিমুখে গিয়াছে এবং একটি শাখা লাইন মানভূম জেলার সদর শহর পুরুলিয়া হইয়া বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত ঈস্ট্ ইণ্ডিয়ান রেলপথের আসানসোল স্টেশনের সহিত মিলিত হইয়াছে।

খরসোয়ান—প্রাচীন ধলভূম রাজ্যের অধীন একটি সামন্ত রাজ্য ছিল। ইহা বর্ত্তমানে উড়িষ্যা প্রদেশের অন্তর্গত একটি ছোট দেশীয় রাজ্য। এখানে অনেক প্রাচীন কীর্ত্তি আছে। রাজ-খরসোয়ন হইতে বাংলা নাগপুর রেলপথের একটি শাখা ৬৫ মাইল দূরবর্ত্তী গুয়া পর্য্যন্ত গিয়াছে। গুয়ায় ম্যাঙ্গানিজের খনি আছে। এই শাখাপথে চাঁইবাসা উল্লেখযোগ্য স্টেশন। ইহা সিংহভূম জেলার সদর শহর। শহরটি রোরো নামক একটি পার্ব্বত্য নদীর তীরে অবস্থিত ও চারিদিকে অনুচ্চ পাহাড়ের দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই স্থানটি বিশেষ স্বাস্থ্যকর ও ইহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যও নয়নানন্দকর। শহরের মধ্যে মধুবাঁধ, শিববাঁধ, রাণীবাঁধ নামে পরিচিত কয়েকটি সুন্দর জলাশয় আছে।

সিংহভূম জেলায় হো, মুণ্ডা, কোল, সাঁওতাল প্রভৃতি বহু আদিম জাতির বাস। এই জেলা বনজ ও খনিজসম্পদে পরিপূর্ণ। লৌহ, তাম্র ও অভ্র এখানকার প্রধান খনিজ পদার্থ। এই জেলায় বহু পরিমাণে রেশম ও লাক্ষা উৎপন্ন হয়।

(ঘ) সিনি-পুরুলিয়া—আসানসোল

চাণ্ডিল—সিনি জংশন হইতে ১৭ মাইল দূর। ইহা মানভূম জেলার সদর মহকুমার অন্তর্গত একটি থানা ও বাণিজ্য-প্রধান স্থান।

এই থানার অন্তর্গত সুবর্ণরেখা নদীর তীরে অবস্থিত দলমি একটি বিধ্বস্তপ্রায় প্রাচীন নগরী। এখানে "ছাতাপুকুর" নামে একটি প্রকাণ্ড বাঁধ বা দীঘি আছে। কথিত আছে যে মহারাজ বিক্রমাদিত্য এখানে স্নান করিতে আসিতেন। দলমিতে অনেকগুলি পুরাতন গড় ও মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। দলমির উত্তর-পশ্চিমে সাফারণ নামে একটি প্রাচীন স্থান আছে। ইহার সন্নিকটেও অনেক প্রাচীন কীর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন ঐতিহাসিক অনুমান করেন যে এখানে কর্ণসুবর্ণরাজ শশাঙ্কের রাজধানী ছিল।

দলমি নামে একটি রেল স্টেশনও আছে। সেখানে নামিয়া দলমিতে যাওয়া যায়।

বরাহভূম—সিনি জংশন হইতে ৩১ মাইল দূর। বরাহভূম অতি প্রাচীন স্থান। ভবিষ্য পুরাণে ইহার নামোল্লেখ দেখা যায়। পুরাকালে এখানে একটি রাজ্য ছিল। এই রাজ্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কাহিনীটি প্রচলিত আছে।

লায়া উপাধিধারী এক ব্যক্তি দলমা পাহাড়ের একটি নির্জ্জন স্থানে এক বৃহৎ অজগরের উপর উপবিষ্ট হইয়া কালীর উপাসনা করিত। একদিন সে গিয়া দেখিতে পাইল যে অজগরটি স্বস্থানে নাই এবং নিকটেই দুইটি শূকর ক্রীড়া করিতেছে। ক্রোধে তরবারি হস্তে লইয়া লায়া বরাহ-মিথুনকে তাড়া করিল। শূকরটি ছুটিয়া পলাইল কিন্তু শূকরীটি গর্ভিনী থাকায় দ্রুত পলায়ন করিতে সমর্থ হইল না। লায়া তরবারির এক আঘাতে উহার দেহ দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিল। তখন শূকরীর উদর হইতে দুইটি দিব্যকান্তি মানবশিশু বাহির হইল। ব্যাপার দেখিয়া লায়া বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িল। কিন্তু তখনই দৈববাণী হইল যে এই শিশু দুইটি দেবপুত্র, লায়া যেন তাহাদিগকে গৃহে লইয়া গিয়া পুত্রবৎ পালন করে। লায়ার নিজের সন্তান ছিল না, সুতরাং শিশু দুইটিকে সে পরম আদরে লালন-পালন করিতে লাগিল। বয়োবৃদ্ধির সহিত শিশুদ্বয়ের রূপ-লাবণ্য ও শৌর্য্য-বীর্য্য বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তাহাদিগকে দেখিয়া লোকে সন্দেহ করিত যে ইহারা কখনই লায়ার পুত্র নহে, নিশ্চয়ই কোন রাজার পুত্র। একদিন কিশোরবয়স্ক ভ্রাতৃদ্বয় পালক পিতার অজ্ঞাতে গৃহত্যাগ করিল এবং মহারাজ বিক্রমাদিত্যের রাজধানীতে গিয়া আত্ম-পরিচয় দিল যে তাহারা দেবকুমার, মহারাজ বিক্রমাদিত্য তাহাদিগকে কোন রাজ্য শাসনের ভার অর্পণ করুন। তাহাদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য বিক্রমাদিত্য একটি তোরণের নিম্নদেশে তীক্ষ্ণধার অসি-ফলক ঝুলাইয়া তাহার নিম্ন দিয়া তাহাদিগকে পূর্ণবেগে অশ্বারোহণে যাইতে আদেশ করিলেন। জ্যেষ্ঠ কুমার অশ্বচালনা করিয়া তোরণের নিম্নদেশে উপস্থিত হইলে অসিফলকে তাহার মস্তক দ্বিখণ্ডিত হইয়া ভূমিতে লুটাইয়া পড়িল। কিন্তু কনিষ্ঠকুমার তাহা দেখিয়াও কিছুমাত্র ভীত না হইয়া পূর্ণবেগে অশ্বচালনা করিয়া তোরণের দিকে অগ্রসর হইলেন। মহারাজ বিক্রমাদিত্য ইঙ্গিতে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিয়া বলিলেন যে তাঁহারা দুই ভাই যে দেবকুমার সে বিষয়ে তাঁহার আর অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। তিনি কনিষ্ঠকুমারকে তুঙ্গভূম ও সামন্তভূমের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগের আধিপত্য প্রদান করিলেন। এই ভূভাগই বরাহভূম নামে প্রসিদ্ধ। কুমারদ্বয় দেবঅংশরূপী বরাহ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন বলিয়া রাজ্যের নাম রাখিলেন বরাহভূম। এই রাজবংশের উত্তরাধিকারিগণ এখনও বর্ত্তমান আছেন। বরাহভূম স্টেশন হইতে ১২ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে অবস্থিত বরাবাজার নামক গ্রামে তাঁহারা বাস করেন। বরাবাজারে অনেকগুলি গালার কারখানা আছে।
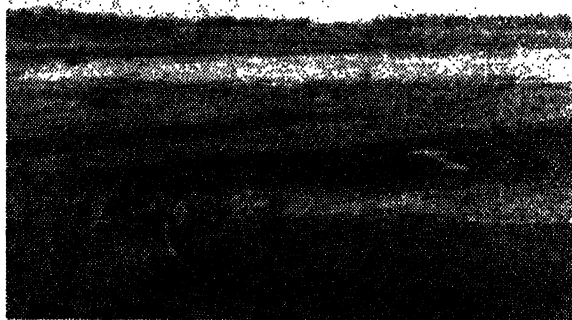
শরশঙ্কদীঘি, দাঁতন (পৃষ্ঠা ১৪৫)
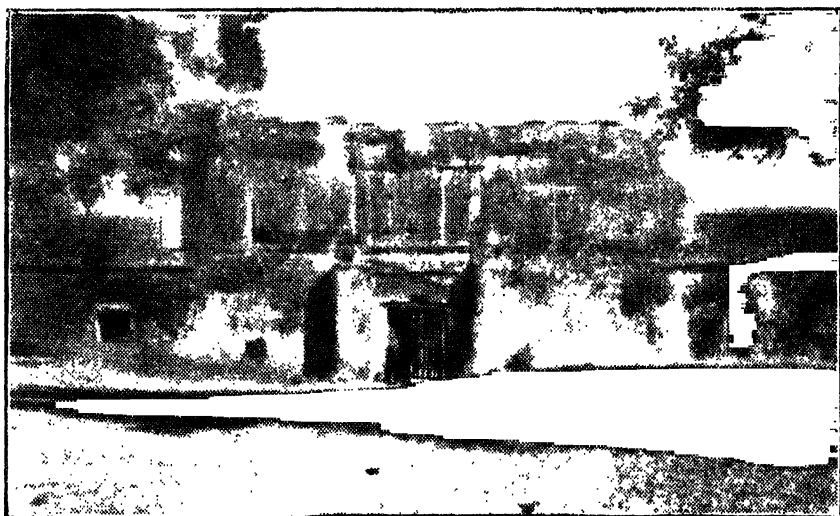
প্রাচীন দুর্গ, মেদিনীপুর (পৃষ্ঠা ১৪৬)
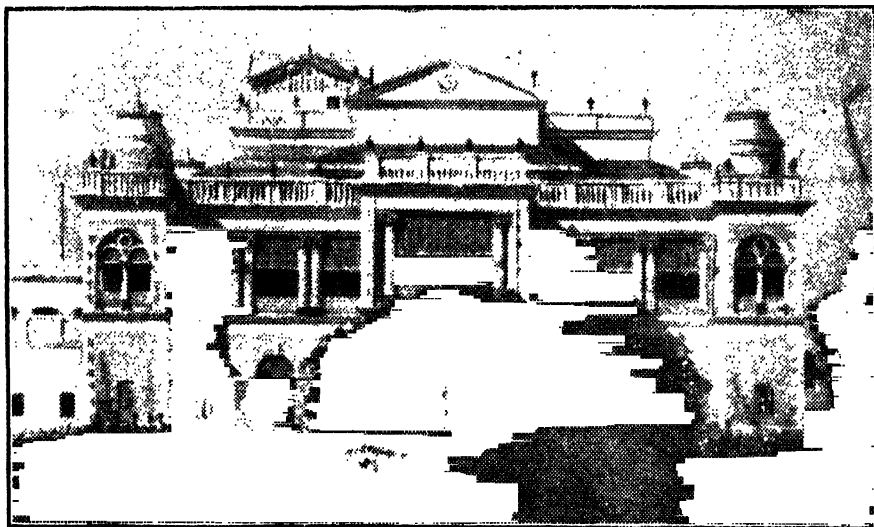
নাড়াজোল রাজভবন, মেদিনীপুর (পৃষ্ঠা ১৪৬)
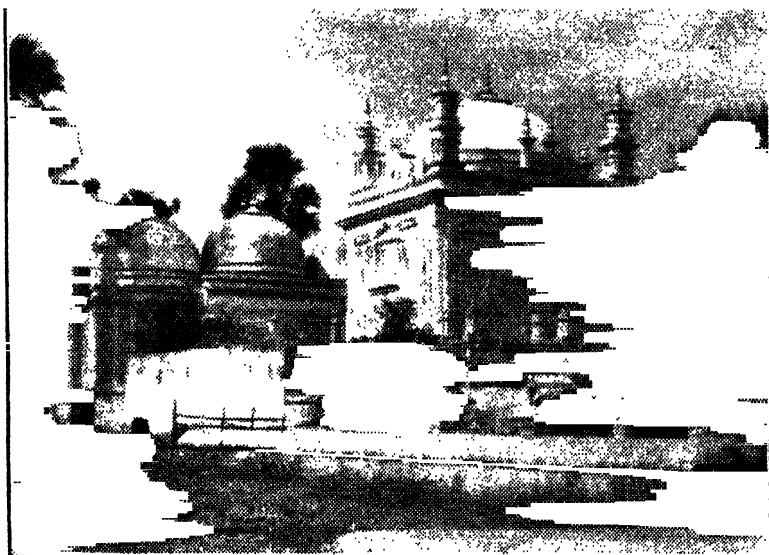
খানকা শরীফ, মেদিনীপর (পৃষ্ঠা ১৪৬)
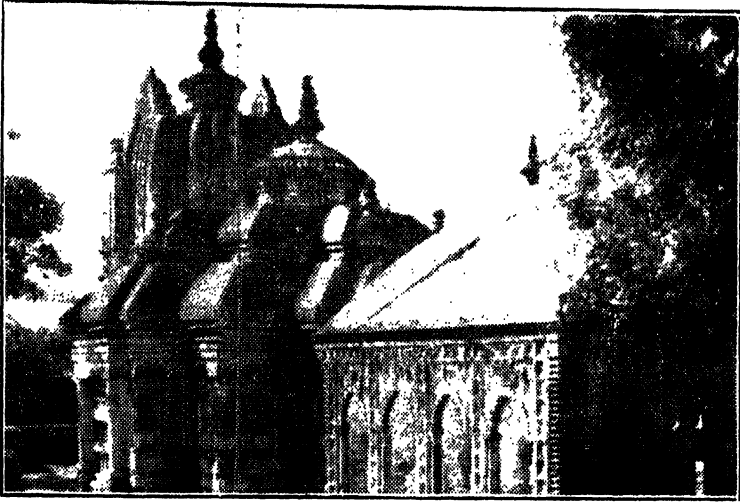
সর্ব্বমঙ্গলা মন্দির, গড়বেতা (পৃষ্ঠা ১৫১)
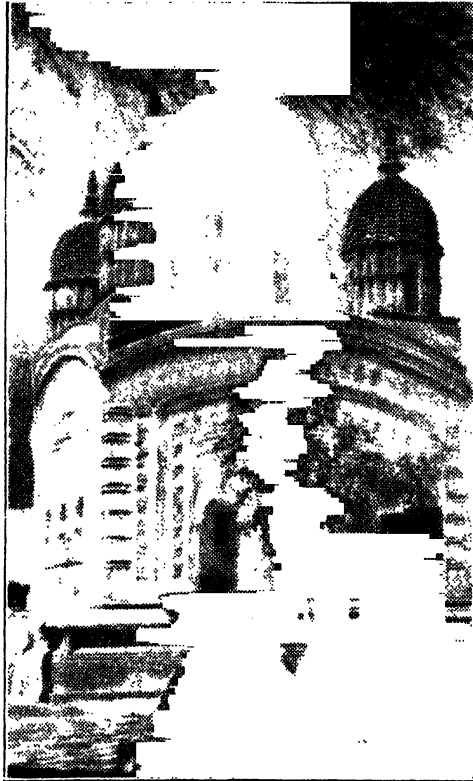
কৃষ্ণরায়ের মন্দির, বগড়ী-কৃষ্ণনগর (পৃষ্ঠা ১৫১)
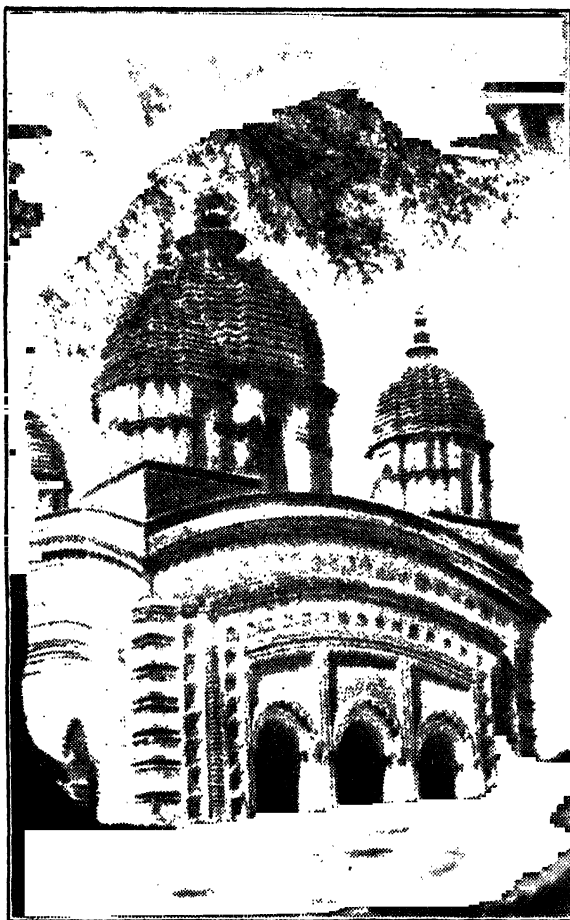
কৃষ্ণরায় মন্দিরের অপর দৃশ্য, বগড়ী-কৃষ্ণনগর (পৃষ্ঠা ১৫১)
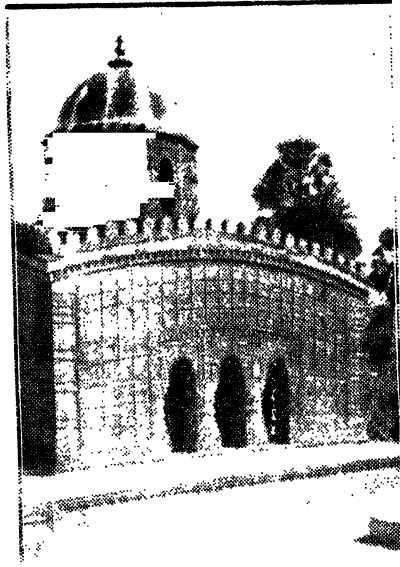
মদনমোহন-মন্দির, বিষ্ণুপুর (পৃষ্ঠা ১৫৩)
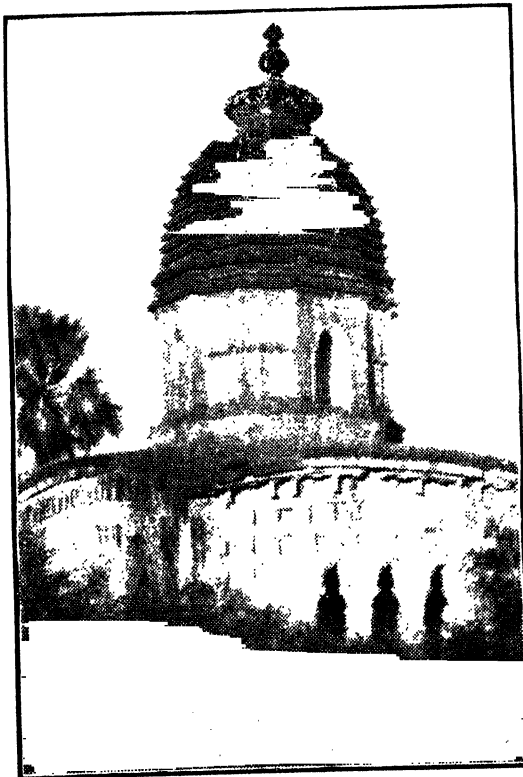
কালাচাঁদের মন্দির, বিষ্ণুপুর (পৃষ্ঠা ১৫৩)
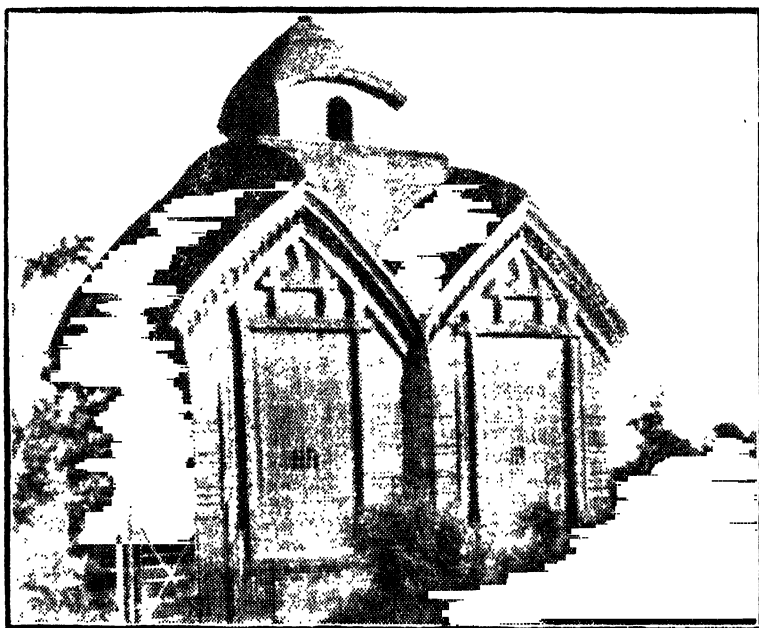
জোড়-বাংলা মন্দির, বিষ্ণুপুর (পৃষ্ঠা ১৫৩)
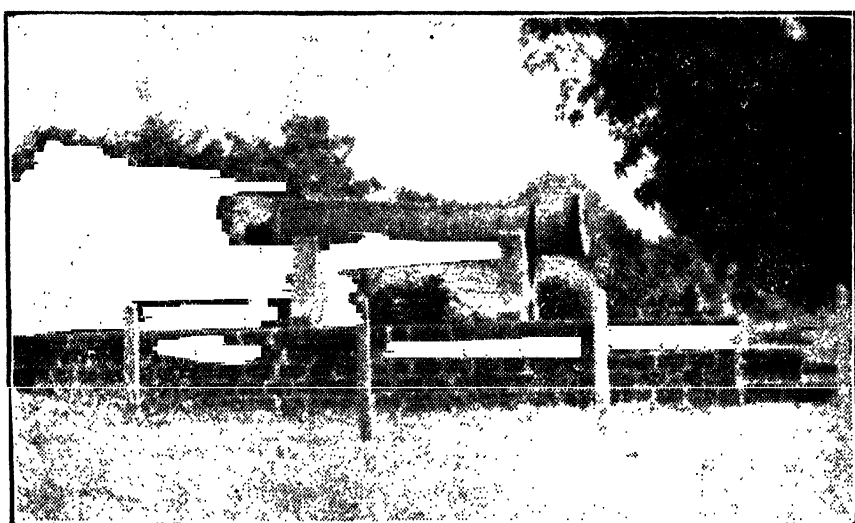
দলমাদল কামান, বিষ্ণুপুর (পৃষ্ঠা ১৫৩)
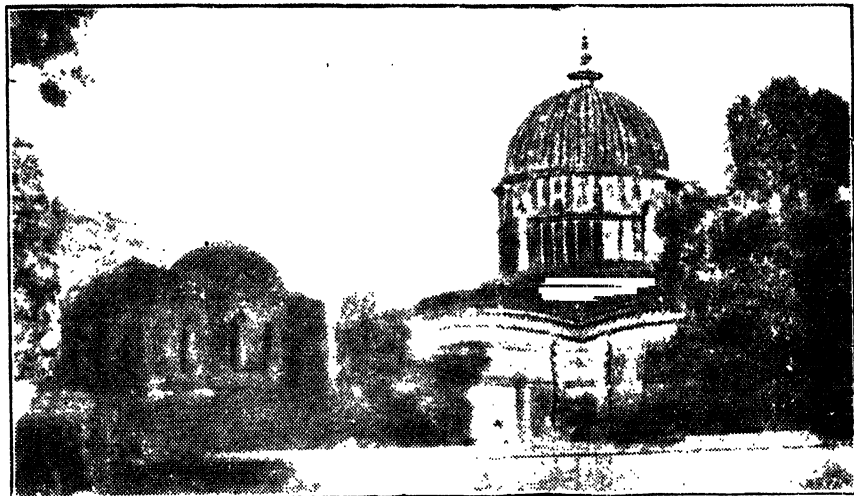
রাধাশ্যামের মন্দির, বিষ্ণুপুর (পৃষ্ঠা ১৫৩)
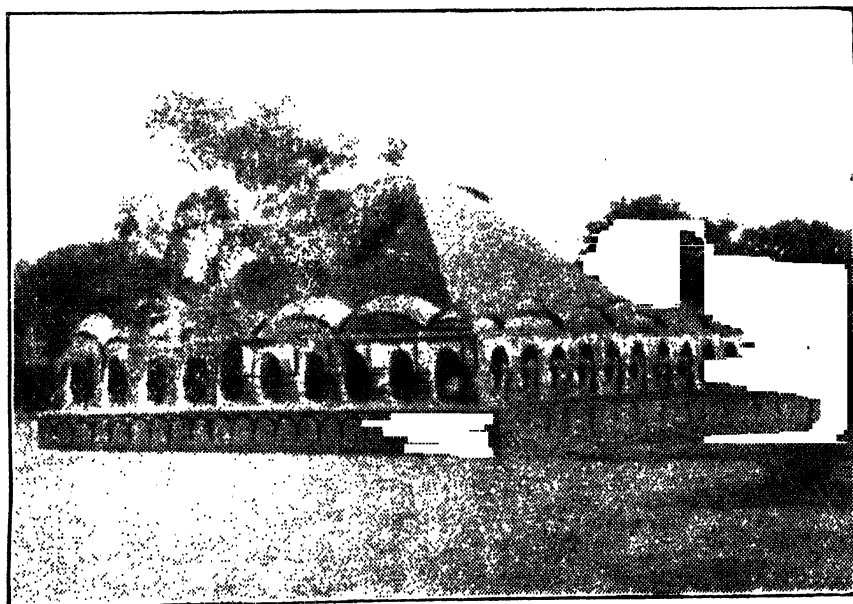
রাসমঞ্চ, বিষ্ণুপুর (পৃষ্ঠা ১৫৩)

মদন গোপালের মন্দির, বিষ্ণুপুর (পৃষ্ঠা ১৫৩)

মণিমহাদেবের মন্দির, বাঁকুড়া (পৃষ্ঠা ১৫৪)
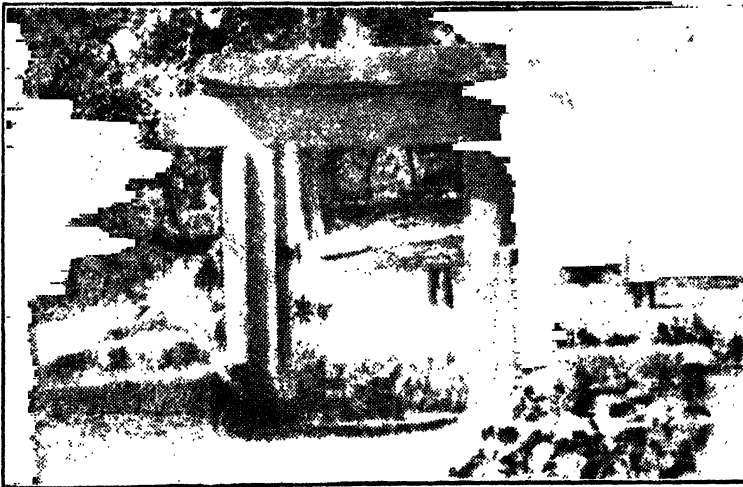
বাশুলীর প্রাচীন মন্দির, ছাতনা (পৃষ্ঠা ১৫৫)
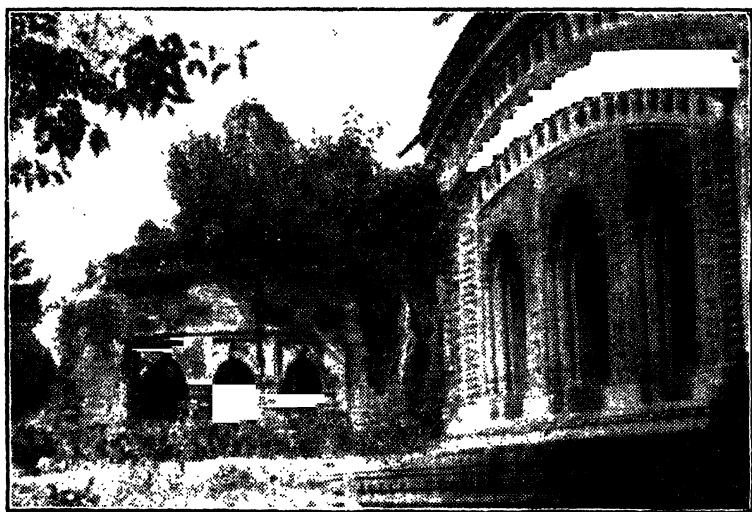
বাশুলীর দ্বিতীয় মন্দির, ছাতনা (পৃষ্ঠা ১৫৫)
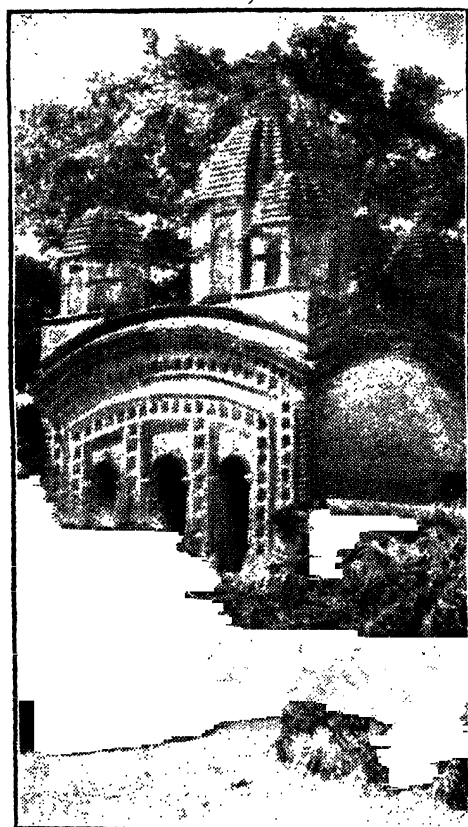
বাশুলীর বর্ত্তমান মন্দির, ছাতনা (পৃষ্ঠা ১৫৫)
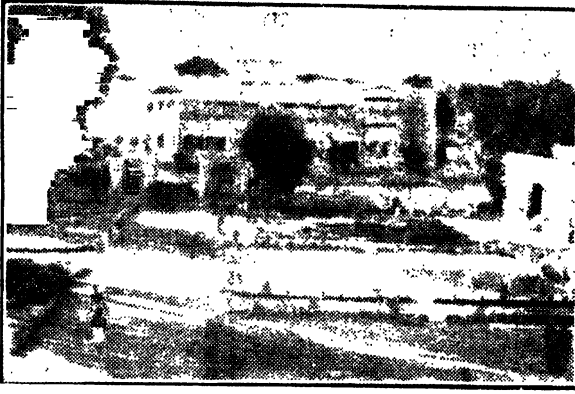
রাজপ্রাসাদ, ঝাড়গ্রাম (পৃষ্ঠা ১৫৭)
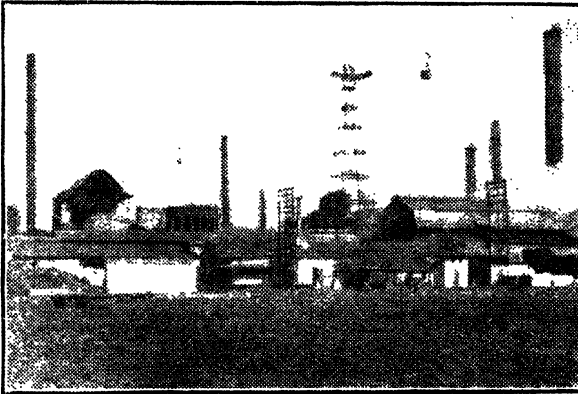
তামার কারখানা, মৌভাণ্ডার (পৃষ্ঠা ১৫৯
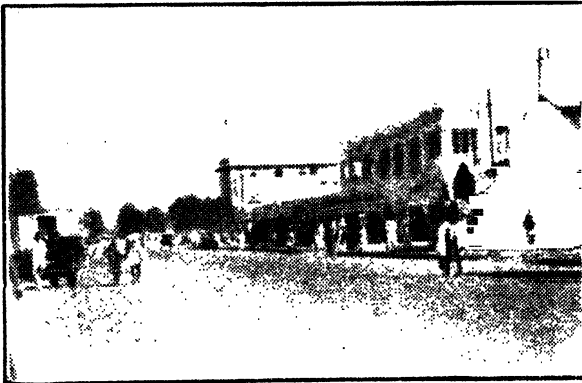
টাটানগরের বাজারের একটি দৃশ্য (পৃষ্ঠা ১৫৯)
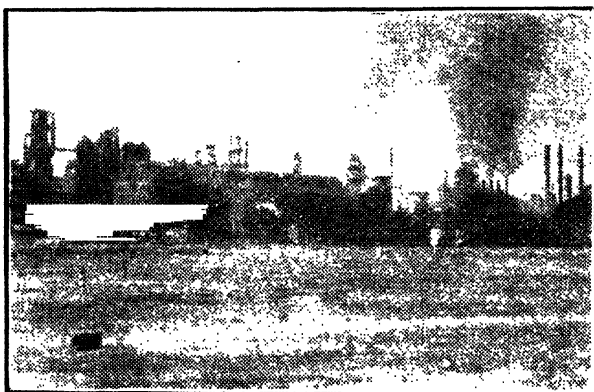
টাটার কারখানার একটি দৃশ্য (পৃষ্ঠা ১৫৯)

টাটানগরের নিকটবর্তী একটি পাহাড়ের দৃশ্য (পৃষ্ঠা ১৫৯

কুষ্ঠাশ্রম, পুরলিয়া (পৃষ্ঠা ১৬১)

১৮৬২ খৃষ্টাব্দে বরাহভূমের রাজা গঙ্গানারায়ণের সহিত ইংরেজ সরকারের সংঘর্ষ উপস্থিত হয় এবং মানভূমের তদানীন্তন ডেপুটি কমিশনার ক্যাসেল সাহেব গঙ্গানারায়ণের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বাঁকুড়ায় গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইহার পর গঙ্গানারায়ণ বিশেষ শক্তিশালী হইয়া উঠেন কিন্তু ইংরেজ সেনাধ্যক্ষ ডেণ্টের হস্তে তাঁহার পরাজয় ঘটে। এই ঘটনার পর বরাহভূম রাজ্য ইংরেজের খাস শাসনাধীনে আসে।

পুরুলিয়া—সিনি জংশন হইতে ৫০ মাইল দূর। ইহা মানভূম জেলার সদর শহর। এই শহর হইতে ৩ মাইল দূরে একটি কুষ্ঠাশ্রম আছে। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে মিশনারীগণ কর্ত্তৃক ইহা স্থাপিত হয়। প্রায় ৬০০ বিঘা জমির উপর এই আশ্রমটি অবস্থিত। ইহা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ কুষ্ঠাশ্রম।

সাহেববাঁধ নামক জলাশয় পুরুলিয়া শহরের অপর একটি দ্রষ্টব্য বস্তু। ১৫০ বিঘা জমি জুড়িয়া এই বৃহৎ বাঁধটি অবস্থিত। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে কয়েদী মজুরগণের দ্বারা ইহা খনন করান হয়।

পুরুলিয়া হইতে তিন মাইল দক্ষিণ পূর্ব্বে অবস্থিত ছোট বলরামপুর নামক গ্রামে জৈন তীর্থঙ্করদিগের স্তূপ ও হিন্দু মন্দির সমূহের ধবংসাবশেষ দৃষ্ট হয়।

পুরুলিয়া হইতে এই জেলার রঘুনাথপুর থানার অন্তর্গত চেলিয়ামা নামক স্থান পর্য্যন্ত মোটরবাস সার্ভিস আছে। চেলিয়ামা হইতে সাত মাইল উত্তর পূর্ব্বে অবস্থিত তেলকুপি (তৈলকম্প) মানভূম জেলার মধ্যে একটি অতি প্রাচীন স্থান; ইহা পঞ্চকোটের শেখর রাজবংশের রাজধানী ছিল। এই গ্রামে মন্দিরাদি বহু পুরাকীর্ত্তি আছে। পৌষ ও চৈত্রমাসে এখানে খালুই-চণ্ডী ও বারুণী উৎসব উপলক্ষে মেলা হয়।

মানভূম জেলা খনিজ সম্পদে বিশেষ সমৃদ্ধ। কয়লা, স্বর্ণ, অভ্র, গৈরিক বা গিরিমাটি, প্রস্তর, ফায়ার ক্লে, কেয়লিন ও গ্রাফাইট্ এই জেলায় প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

এখানকার আদিম অধিবাসিগণের মধ্যে কোড়া, মুণ্ডা, উরাও, ভুঁইয়া ও খেড়িয়ার নাম উল্লেখযোগ্য এই জেলার শতকরা ৭২ জন লোক বাংলা ভাষা ব্যবহার করে।

পুরুলিয়া হইতে বাংলা নাগপুর রেলপথের একটি ছোট মাপের (ন্যারো গেজ) লাইন মুড়ী জংশন হইয়া প্রসিদ্ধ পার্ব্বত্য স্বাস্থ্য-নিবাস রাঁচী শহর দিয়া ৮৩ মাইল দূরবর্ত্তী ছোট নাগপুরের অন্তর্গত লোহারডাগা পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই শাখাপথে গড়-জয়পুর ও ঝালদা মানভূম জেলার অন্তর্গত উল্লেখযোগ্য ষ্টেশন। গড়-জয়পুর পুরুলিয়া হইতে ৯ মাইল দূর। এই স্থান হইতে চার মাইল দক্ষিণে অবস্থিত বোড়াম গ্রামে তিনটি প্রাচীন জৈন মন্দিরের ধবংসাবশেষ আছে। মন্দির তিনটির গঠন প্রণালী বুদ্ধগয়ার বিখ্যাত বৌদ্ধ মন্দিরের অনুরূপ। পুরুলিয়া হইতে ঝালদার দূরত্ব ১৩ মাইল। ইহা একটি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। এখানে মিউনিসিপ্যালিটি, থানা, হাসপাতাল, স্কুল, ডাকঘর ও ডাকবাংলা প্রভৃতি আছে। এখানকার লৌহনির্ম্মিত দ্রব্যাদি বিশেষ প্রসিদ্ধ।

মধুকুণ্ডা—আদড়া জংশন হইতে আসানসোলের দিকে ১৭ মাইল দূর। এই স্থানে নামিয়া বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত বেহারীনাথ পাহাড়ে যাইতে হয়। মধুকুণ্ডা ষ্টেশন হইতে বেহারীনাথ পাহাড় প্রায় ৬ মাইল দূর। যাইবার জন্য মোটরবাস পাওয়া যায়। বাঁকুড়া জেলার মধ্যে বেহারীনাথ পাহাড়ই সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ। ইহার উচ্চতা ১৪৭১ ফুট। এই পাহাড়ে বেহারীনাথ শিবের মন্দির আছে। তথায় শিবরাত্রি ও চড়কের সময় বিশেষ সমারোহ হয়।

মধুকুণ্ডা মানভূম জেলার শেষ স্টেশন। ইহার পার্শ্ব দিয়া দামোদর নদ প্রবাহিত। দামোদরের অপর পার হইতে বর্দ্ধমান জেলার আরম্ভ।

উপসংহার

একদিকে মধ্যপ্রদেশ, অপরদিকে দক্ষিণভারত,—বাংলা নাগপুর রেলপথ ভারতের এই দুইটি অংশকে বাংলাদেশের সহিত সংযুক্ত করিয়াছে। মধ্যপ্রদেশে নাগপুর, রায়পুর, বিলাসপুর, জববলপুর প্রভৃতি নগর, আর দক্ষিণভারতের তীর্থক্ষেত্র সমূহ,—বাংলা নাগপুর রেলপথ বাংলাদেশের সঙ্গে ইহাদের যোগসূত্র স্থাপন করিয়াছে। মাদ্রাজ, মহিষুর, মাদুরা, শ্রীরঙ্গম, সেতুবন্ধ রামেশ্বর প্রভৃতি স্থানে যাইতে হইলে এই রেলপথ দিয়াই যাইতে হয়। বাংলা নাগপুর রেলপথের নিজের লাইনেও তীর্থস্থানের অভাব নাই। মহাতীর্থ পুরুষোত্তমদেবের স্থান পুরীধামের কথা সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। বৈতরণী, ভুবনেশ্বর, খণ্ডগিরি, উদয়গিরি, সাক্ষীগোপাল সবই এই পথের উপর। বাংলা নাগপুর রেলপথে বহু নদনদী, পর্ব্বতমালা ও গভীর অরণ্যানী থাকায় ইহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থানগুলির প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী অতি রমণীয়। পুরীর সমুদ্রের মহান্ ও গম্ভীররূপ, ওয়ালটেয়ারের প্রান্তবাহী নীলজলধির লহরলীলা ও পার্ব্বত্যনিবাস রাঁচীর অনবদ্য সৌন্দর্য্য সকলকেই মুগ্ধ করে।

আসাম বাংলা রেলপথে বাংলাদেশ

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথের ঢাকা বিভাগে যখন গাড়ীর চলাচল আরম্ভ হইল, তখন সরকার চিন্তা করিতে লাগিলেন যে কি উপায়ে আসাম ও পূর্ব্ববঙ্গকে রেলপথের দ্বারা সংযুক্ত করিতে পারা যায়। এ বিষয়ে অনেকদিন ধরিয়া নানাপ্রকার জল্পনা কল্পনা চলিতে থাকে। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে মণিপুর বিদ্রোহের পর সরকার " আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানি " নামক একটি কোম্পানির সহিত চুক্তি করেন যে উক্ত কোম্পানি আংশিকভাবে সরকারী অর্থসাহায্যে মোট ৭৪০ মাইল রেলপথ খুলিবেন।

আসামের পাৰ্ব্বত্য অঞ্চলে রেলপথ খুলিতে কোম্পানিকে বহু অর্থব্যয় ও কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছিল। অনেক জায়গায় পর্ব্বত মধ্যে সুড়ঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া রেলের লাইন পাতিতে হইয়াছিল। বদরপুর—লাম্‌ডিং বিভাগে রেলের লাইন নির্ম্মাণ করিতে কোম্পানির ১১ বৎসর সময় লাগিয়াছিল। এই শাখা লাইন পাৰ্ব্বত্য প্রকৃতির মনোরম সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ। ইহার দুই দিকের অরণ্যে হস্তী, ব্যাঘ্র ও ভল্লুক দেখিতে পাওয়া যায়।

১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ১৬ই ফেব্রুয়ারি তারিখে বড়লাট লর্ড কর্জন চট্টগ্রাম শহরে আসাম বাংলা রেলপথের উদ্বোধন উৎসব সম্পন্ন করেন। ইহার পর কোম্পানি আরও অনেকগুলি শাখা লাইন খুলিয়া রেলপথকে বাংলা ও আসামের বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিয়াছেন। এই সকল শাখার মধ্যে আখাউড়া-আশুগঞ্জ, ভৈরববাজার-টঙ্গী, কুলাউড়া-শ্রীহট্ট, ময়মনসিংহ-ভৈরববাজার ও চাপারমুখ-শিলঘাট প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

আশুগঞ্জ ও ভৈরববাজারের মধ্যে পূর্ব্বে খেয়া স্টীমারযোগে যাত্রী ও মালগাড়ী পারাপার করা হইত। সম্প্রতি ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে ৫৬ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে আশুগঞ্জ ও ভৈরববাজারের মধ্যে মেঘনা নদীর উপর এক বিশাল সেতু নিৰ্ম্মিত হইয়াছে। বর্ত্তমান ভারত সম্রাটের নামানুসারে এই সেতুর নাম রাখা হইয়াছে " ষষ্ঠ জর্জ সেতু "। ইহার দৈর্ঘ্য ২৯৪৭ ফুট। ইহা ভারতের অন্যতম প্রধান রেলওয়ে সেতু। এখন রেলগাড়ী চট্টগ্রাম হইতে একেবারে সরাসরি পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথের জগন্নাথগঞ্জ ও নারায়ণগঞ্জ পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছাইতেছে। ইহাতে চট্টগ্রাম হইতে কলিকাতা, ময়মনসিংহ ও ঢাকা যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

বর্ত্তমানে আসাম বাংলা রেলপথের স্টেশন সংখ্যা ৩১৫টি ও মোট দৈর্ঘ্য ১৩০৬ মাইল। এই রেলপথের সমগ্র লাইনই মিটার গেজ বা মাঝারি মাপের। ইহা বাংলা ও আসাম প্রদেশের ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট, কাছাড়, শিবসাগর, নওগাঁ, লখিমপুর ও কামরূপ এই একাদশটি জেলার মধ্য দিয়া প্রসারিত।

আসাম বাংলা রেলপথ দিয়া বাংলাদেশের যে সকল প্রসিদ্ধ স্থানে যাওয়া যায় নিম্নে তাহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইল। যদিও শ্রীহট্ট ও কাছাড় জেলা অধুনা আসাম প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত, ভাষা ও সংস্কৃতির দিক দিয়া উহারা বাংলাদেশ হইতে অভিন্ন। সুতরাং এই দুই জেলার প্রসিদ্ধ স্থানগুলির পরিচয়ও লিপিবদ্ধ করা হইল।

(ক) ময়মনসিংহ-আখাউড়া-টঙ্গী-ভৈরববাজার বিভাগ

গৌরীপুর—ময়মনসিংহ জংশন হইতে ২২ মাইল দূর। গৌরীপুরে একটি প্রাচীন জমিদার বংশের বাস।

এখান হইতে আসাম বাংলা রেলপথের একটি শাখা ৩৩ মাইল দূরবর্ত্তী মোহনগঞ্জ পর্য্যন্ত গিয়াছে। মোহনগঞ্জ একটি বাণিজ্য-প্রধান স্থান। ইহা ময়মনসিংহ জেলার পূর্ব্ব সীমান্তে অবস্থিত। এই স্থান হইতে কয়েক মাইল দূরে কয়েকটি প্রকাণ্ড বিল আছে। উহাদিগকে "হাওর" বলে। "হাওর" কথাটি "সাগর" শব্দের অপভ্রংশ। বর্ষাকালে এই সকল বিল যখন জলপ্লাবিত হইয়া যায় তখন উহাদিগকে দেখিতে ঠিক সমুদ্রের মত দেখায়।

মোহনগঞ্জ শাখা লাইনে শ্যামগঞ্জ জংশন ও নেত্রকোণা উল্লেখযোগ্য স্টেশন। শ্যামগঞ্জ হইতে অপর একটি শাখা লাইন ১৩ মাইল দূরবর্ত্তী জড়িয়াঝঞ্ঝাইল নামক প্রসিদ্ধ কারবারের স্থান পর্য্যন্ত গিয়াছে।

নেত্রকোণা ময়মনসিংহ জেলার অন্যতম মহকুমা। ইহা মগরা নামক একটি পার্ব্বত্য নদীর তীরে অবস্থিত। এই নদীটির দৃশ্য অতি সুন্দর। বল্লাল সেন যখন বিক্রমপুরে অধিষ্ঠিত, সেই সময়ে নেত্রকোণার নিকটস্থ ময়মনসিংহ জেলার পূর্ব্বভাগে অবস্থিত সুসঙ্গ, খালিয়াজুরী ও মদনপুরে গারো ও হাজংদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে বৈশ্য গারো যখন সুসঙ্গ পাহাড় মুল্লুকের রাজা, সেই সময় সোমেশ্বর পাঠক নামক একজন পরাক্রান্ত ব্যক্তি কান্যকুব্জ হইতে আগমন করেন বলিয়া কথিত। তিনি বহু অনুচরের সাহায্যে বৈশ্য গারোকে পরাজিত করিয়া সুসঙ্গ রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন।

খালিয়াজুরী রাজ্য পরে লম্বোদর নামক একজন ক্ষত্রিয় সন্ন্যাসীর শাসনাধীন হয়। ইঁহার বংশীয়েরা সম্রাট জাহাঙ্গীরের নিকট হইতে "পাঞ্জা ফারমান" পাইয়া ভাটি প্রদেশের শাসনকর্ত্তা হইয়াছিলেন।

বোকাইনগর—ময়মনসিংহ জংশন হইতে ১৬ মাইল। সুসঙ্গ, খালিয়াজুরী ও মদনপুরের ন্যায় এখানেও হাজংদের একটি ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল।

ঈশ্বরগঞ্জ—ময়মনসিংহ জংশন হইতে ২৮ মাইল দূর। ইহা একটি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম ও ব্যবসায়-প্রধান স্থান। এখানে একটি মুন্সেফী আদালত আছে।

আঠারবাড়ী—ময়মনসিংহ জংশন হইতে ৩৬ মাইল দূর। এখানে একটি প্রাচীন জমিদার বংশের বাস। স্টেশন হইতে জমিদার বাড়ী প্রায় অর্দ্ধ মাইল। উহার সংলগ্ন একটি চিড়িয়াখানায় হরিণ, ভল্লুক, ময়ূর, সারস প্রভৃতি পশুপক্ষী রক্ষিত আছে। এখানকার রাধাগোবিন্দজী ও জগদ্ধাত্রী দেবীর মন্দির ও বিগ্রহ বিশেষ দ্রষ্টব্য বস্তু। নিকটবর্ত্তী "রায়ের বাজার" ও "খালবোলা" বাজার নামক দুইটি বাজার হইতে প্রতি বৎসর বহু টাকার পাট চালান যায়।

কুকী বালক-বালিকা (পৃষ্ঠা ১৬৭)
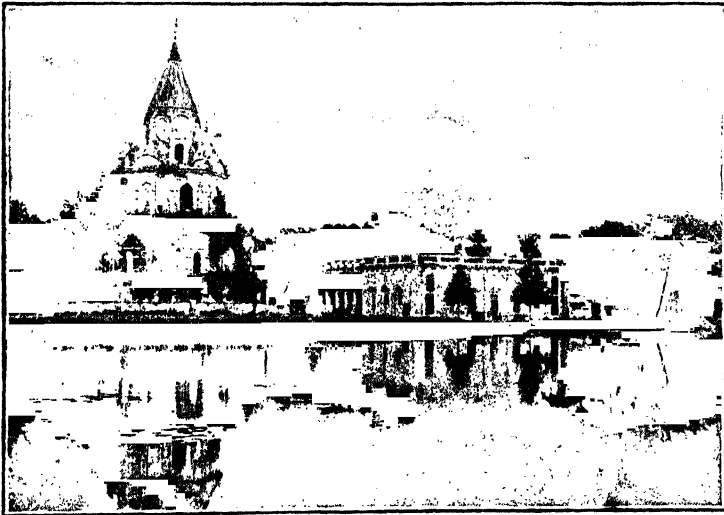
জগন্নাথ মন্দির, কুমিল্লা (পৃষ্ঠা ১৬৮)
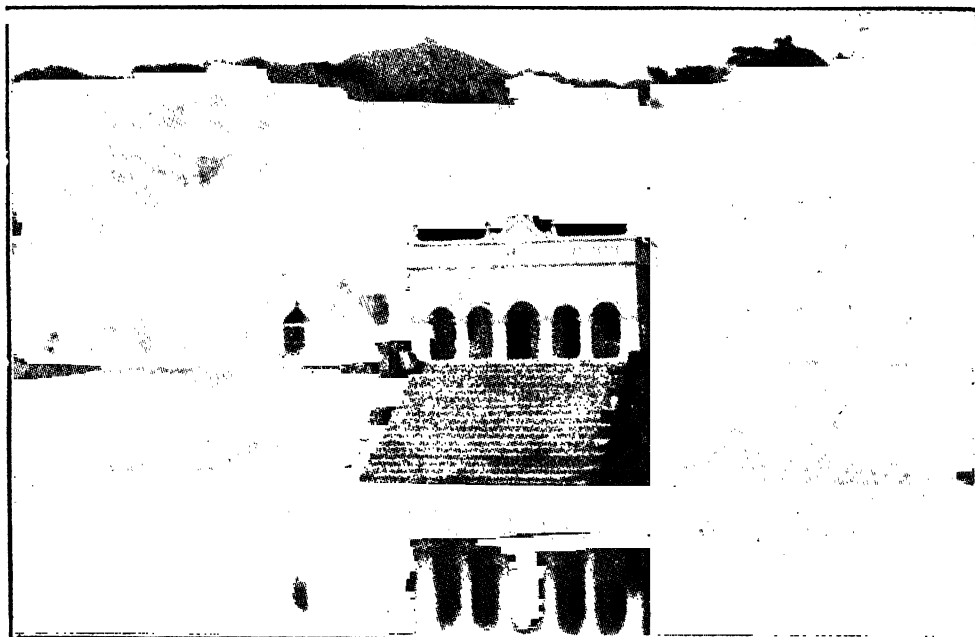
ব্যাস সরোবর (পৃষ্ঠা ১৭১
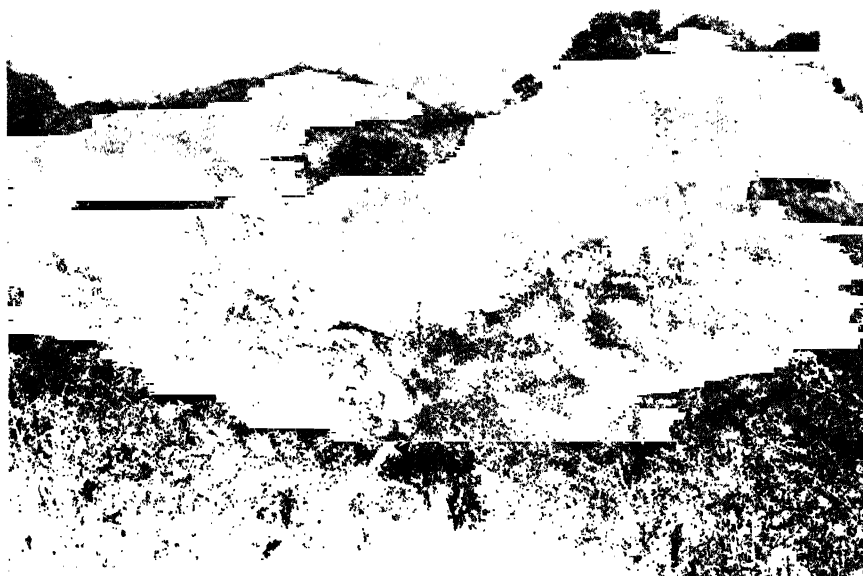
চন্দ্রনাথের পথের দৃশ্য (পৃষ্ঠা ১৭১)

নীলগঞ্জ—ময়মনসিংহ জংশন হইতে ৩৬ মাইল। প্রাচীন কবি দ্বিজবংশী ভট্টাচার্য্যের জন্মস্থান পাতীপাতুয়ারী গ্রাম স্টেশন হইতে মাত্র আধ মাইল দূর। দ্বিজবংশীকৃত সুবৃহৎ পদ্মাপুরাণ আজও পূর্ব্ব ময়মনসিংহে সামাজিক অনুষ্ঠানে গীত হয়। তিনি একজন সুগায়কও ছিলেন, এবং দলবল লইয়া তাঁহার করুণ সুললিত মনসার ভাসান বা বেহুলার গান গাহিয়া বেড়াইয়া লোকশিক্ষার সাহায্য করিতেন। কথিত আছে, একবার তিনি এক ভীষণ নরঘাতক দস্যুর কবলে পড়িলে দস্যু তাঁহার গান শুনিয়া নিজবৃত্তি ত্যাগ করিয়া তাঁহার চরণে লুটাইয়া পড়ে। আজও বহু লোক তাঁহার পদ্মাপুরাণ গাহিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করেন এবং সারা গ্রন্থখানি তাঁহাদের কণ্ঠস্থ হইয়া আছে। "রামায়ণ" কেনারামের উপাখ্যান, মসূয়া প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িত্রী ময়মনসিংহের প্রসিদ্ধ মহিলা কবি চন্দ্রাবতী কবি দ্বিজবংশীর কন্যা।

কিশোরগঞ্জ—ময়মনসিংহ জংশন হইতে ৫২ মাইল দূর। ইহা ময়মনসিংহ জেলার অন্যতম মহকুমা। বল্লালসেন যখন বিক্রমপুর ও পশ্চিম বঙ্গে প্রতিষ্ঠিত, সেই সময়ে কিশোরগঞ্জের নিকট জঙ্গলবাড়ীতে হাজংদের একটি ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল।

ভৈরববাজার জংশন—ময়মনসিংহ জংশন হইতে ৮৩ মাইল দূর। ইহা মেঘনা নদীর তীরে অবস্থিত ও ময়মনসিংহ জেলার একটি বিখ্যাত বন্দর। এখানে বহু মহাজনের গদি, আড়ত ও ব্যাঙ্ক আছে।

এখান হইতে একটি শাখা লাইন ৪১ মাইল দূরবর্ত্তী ঢাকা শহরের নিকটস্থ পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথের টঙ্গী স্টেশন পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই শাখার জিনারদি স্টেশন বস্ত্রশিল্পের জন্য বিখ্যাত।

দৌলতকান্দী—টঙ্গী জংশন হইতে কিঞ্চিদধিক ৩৭ মাইল দূর। স্টেশন হইতে ২ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে রায়পুরা থানার অধীন অশ্রফপুর গ্রাম। এই গ্রামে রাজা দেবখড়্গের ত্রয়োদশ রাজ্যাব্দে উৎকীর্ণ দুইখানি তাম্রশাসন, পিতল ও অষ্টধাতু নির্ম্মিত ৪০টি চৈত্য আবিষ্কৃত হইয়াছিল। চৈত্যগুলির চারিদিকে বুদ্ধমূর্ত্তি উৎকীর্ণ, একটি চৈত্য কলিকাতার যাদুঘরে রক্ষিত আছে। তাম্রশাসন দুইটির বিশেষ ঐতিহাসিক মূল্য আছে, কারণ উহা হইতে বঙ্গের খড়্গ বংশীয় রাজাদের কথা জানিতে পারা যায়। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা খড়্গোদ্যম তাঁহার পুত্র জাতখড়্গ, পৌত্র দেবখড়্গ ও প্রপৌত্র রাজা রাজভট্টের নাম উল্লিখিত আছে। অনুমিত হয়, পালবংশীয় রাজা দেবপালদেবের রাজত্বের শেষভাগে খড়্গোদ্যম এই রাজ্য স্থাপন করেন। তাম্রশাসন হইতে আরও জানা যায় যে রাজা দেবখড়্গের সময়ে অশ্রফপুরের নিকটে "বুদ্ধ-মণ্ডা" ও "বিহার-বিহারিকা-চতুষ্টয়" প্রতিষ্ঠিত ছিল।

দৌলতকান্দী ও ভৈরববাজার জংশন এই স্টেশনদ্বয়ের মধ্যে রেলপথ পুরাতন ব্রহ্মপুত্র পার হইয়াছে।

আশুগঞ্জ—ময়মনসিংহ জংশন হইতে ৯৬ মাইল দূর। এই স্থান হইতে ত্রিপুরা জেলার আরম্ভ। ইহা একটি প্রসিদ্ধ বাণিজ্য কেন্দ্র। সুবিখ্যাত মেঘনা সেতু আশুগঞ্জ ও ভৈরব বাজারের মধ্যে অবস্থিত।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া—ময়মনসিংহ জংশন হইতে ১০৬ মাইল দূর ও ত্রিপুরা জেলার অন্যতম মহকমা। ইহা তিতাস নামক নদীর তীরে অবস্থিত এবং একটি প্রসিদ্ধ কারবারের স্থান।

(খ) আখাউড়া—চট্টগ্রাম—নাজিরহাট ঘাট—দোহাজারী

আখাউড়া জংশন—ময়মনসিংহ জংশন হইতে ১১৬ মাইল দূর। এখানে আসাম বাংলা রেলপথের প্রধান লাইন দক্ষিণে চট্টগ্রামের দিকে এবং উত্তরে বদরপুর-শিলচর অভিমুখে গিয়াছে; ময়মনসিংহ ও টঙ্গী হইতে একটি শাখা লাইন এখানে আসিয়া মিশিয়াছে।

আগরতলা—আখাউড়া জংশন স্টেশন হইতে ৬ মাইল দূরে পাৰ্ব্বত্য ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলা মোটরবাস বা ঘোড়ার গাড়ী যোগে যাইতে হয়।

আগরতলা আধুনিক প্রথায় নির্ম্মিত একটি সুন্দর শহর। প্রশস্ত রাজবর্ত্ম, সুদৃশ্য উদ্যান, নির্ম্মল জলপূর্ণ সরোবর ও মনোরম প্রাসাদাবলী ইহার শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। রাজপ্রাসাদ উজ্জয়ন্ত দূর হইতে ছবির ন্যায় সুন্দর দেখায়। দর্শনার্থীর সুবিধার জন্য মহারাজার একটি অতিথিশালা আছে।

এই রাজ্যের অধিকাংশ স্থান পাহাড় ও জঙ্গলে আবৃত। জঙ্গলগুলি ব্যাঘ্র, হরিণ, মহিষ ও হস্তীতে পূর্ণ। রাজ্যের খনিজ সম্পদও প্রচুর।

ত্রিপুরা রাজগণের মধ্যে অনেকেই বঙ্গসাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। রাজ্যের সরকারী কার্য্যাদি বংলা ভাষায় সম্পাদিত হয়। ত্রিপুরা রাজবংশকে কেন্দ্র করিয়া রবীন্দ্রনাথ একাধিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ত্রিপুরার বর্ত্তমান মহারাজার নাম হিজ্ হাইনেস্ বিষম সমর-বিজয়ী মহামহোদয় পঞ্চশ্রীযুক্ত মহারাজা স্যর বীর-বিক্রম কিশোর দেব বর্ম্মন মাণিক্য বাহাদুর কে, সি, এস, আই।

ত্রিপুরার রাজবংশ অতি প্রাচীন। বর্ত্তমান ভারতের রাজবংশগুলির মধ্যে ত্রিপুর রাজবংশকে প্রাচীনতম বলিয়া দাবী করা হয়। শুধু ভারতে নহে, চীন দেশ ভিন্ন পৃথিবীর কোথাও এরূপ সুদীর্ঘকাল এক রাজবংশ রাজত্ব করেন না। ইঁহারা চন্দ্র বংশীয় ক্ষত্রিয়। এই বংশের আদিপুরুষ বলিয়া কথিত যযাতি পুত্র দ্রুহ্য হইতে ১৮৪ পুরুষের নাম পাওয়া যায়। ইঁহাদের বিজয়-বাহিনী এককালে আরাকানী, মগ ও নিকটস্থ পাৰ্ব্বত্য জাতিগুলিকে বশে আনিয়াছিল। "রাজমালা" নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে ত্রিপুর নৃপতিগণের কীর্ত্তি কাহিনী সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার প্রথমাংশ প্রবাদ ও কিংবদন্তীমূলক হইলেও পরবর্ত্তী অংশে বংশানুক্রমিক ইতিহাস পাওয়া যায়। কহ্লণের প্রসিদ্ধ রাজতরঙ্গিণীর সহিত এই পুস্তকের তুলনা চলে। ইহা তিনভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে আদিমকাল হইতে ১৪৫৮ খৃষ্টাব্দ, দ্বিতীয় ভাগে ১৪৫৮ হইতে ১৬৬০ খৃষ্টাব্দ ও তৃতীয় ভাগে ১৬৬৩ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর কিছুপর পর্য্যন্ত সময়ের বিবরণ আছে। পূর্ব্বে রাজমালা ত্রিপুর ভাষাতে লিখিত ছিল। ১৪৫৮ খৃষ্টাব্দে মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্যের আদেশে ইহা সুভাষা অর্থাৎ বাংলায় রচিত হয়।

এই বংশের ত্রিপুররাজের মৃত্যুর পর তৎপত্নী রাণী হীরার গর্ভে শিবাংশে ত্রিলোচন রাজার জন্ম হয় বলিয়া কথিত। ইহার পাৰ্ব্বত্য নাম ছিল "সুরারাই" এবং ইনি পরম শৈব ছিলেন। ইনি ত্রিপুররাজের পুত্র বলিয়া যেমন চন্দ্রবংশীয় চিহ্ন নিশান ও চন্দ্রধবজ ব্যবহার করিতেন, সেইরূপ শিবাংশে জন্ম বলিয়া ত্রিশূল চিহ্নিত ধবজও ব্যবহার করিতেন। তদবধি ত্রিপুরার রাজবংশের ধ্বজে চন্দ্র ও ত্রিশূল উভয় চিহ্নই ব্যবহৃত হইতেছে। কথিত আছে, ত্রিলোচন পাণ্ডবদের সমসাময়িক এবং নিমন্ত্রিত হইয়া যুধিষ্ঠিরের রাজসভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।

১২৪০ খৃষ্টাব্দে দ্রুহ্য হইতে ১৩৩ স্থানীয় রাজা ছেংথোম্পার সময়ে গৌড়েশ্বরের বীর সেনাপতি হীরাবন্ত খাঁ বহু সৈন্য লইয়া ত্রিপুর রাজ্য আক্রমণ করেন। রাজা ভীত হইয়া সন্ধির জন্য ব্যগ্র হইলে রাণী ত্রিপুরাসুন্দরী ভীত স্বামীকে ভৎর্সনা করিয়া হস্তিপৃষ্ঠে চড়িয়া স্বয়ং সৈন্যদলের নেতৃত্ব করেন। রাজাও তখন বাধ্য হইয়া রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। রাণীর সাহস ও উৎসাহ দেখিয়া ত্রিপুর সৈন্য প্রচণ্ড বেগে গৌড়সৈন্যদলকে আক্রমণ করিয়া ছত্রভঙ্গ করিয়া দিল। কথিত আছে, এই যুদ্ধে এক লক্ষ সৈন্য প্রাণ হারাইয়াছিল। রাজা দেখিয়াছিলেন একটি মুণ্ডহীন কবন্ধ এক দণ্ড আকাশে নাচিয়া ভূতলে লুণ্ঠিত হইল। একলক্ষ সৈন্যের মৃত্যু হইলে যুদ্ধক্ষেত্রে নাকি কবন্ধ দৃষ্টিগোচর হয়। যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ছেংথোম্পা হতাহত সৈন্যে সমাকীর্ণ যুদ্ধক্ষেত্রে বসিবার এক তিলও স্থান পাইলেন না ; তাঁহার জামাতা যুদ্ধে নিহত একটি প্রকাণ্ড হাতীর দন্ত দুইটি কাটিয়া শ্বশুরের জন্য আসন করিয়া দিলেন। জামাতার বল দেখিয়া রাজা ভীত হইলেন এবং তাঁহাকে সেনাপতির পদে অধিষ্ঠিত করিলেন। তখন হইতে ত্রিপুরার রাজ জামাতারা সেনাপতির পদ পাইয়া আসিতেছেন।

মহারাজ রত্নফার সময় হইতে ত্রিপুরার রাজারা গৌড়েশ্বর সুলতান সামসুদ্দিন প্রদত্ত মাণিক্য উপাধি গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন। রত্নফা বাংলা হইতে ১০,০০০ ঘর বাঙালী লইয়া গিয়া নিজরাজ্যে বসতি করান। তদবধি বাংলার সংস্কৃতি ত্রিপুরায় প্রবেশ করে।

ত্রিপুর রাজবংশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন ধন্যমাণিক্য (১৪৬৩—১৫১৬ খৃষ্টাব্দ)। ইঁহার স্ত্রী ছিলেন ইতিহাসপ্রসিদ্ধ রাণী কমলা দেবী এবং সেনাপতি ছিলেন চয়চাগ। পূর্ব্বে পার্ব্বত্য ত্রিপুরায় সহস্র সহস্র বাঙালীকে বলি দেওয়া হইত। ধন্যমাণিক্য এই বলি বন্ধ করেন। তিনি অনেক দীঘি, মন্দির ও মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনি বীর ও রাজনীতিবিদ ছিলেন এবং সেনাপতি মহাবীর চয়চাগের সাহায্যে বহু রাজ্য জয় করিয়া ত্রিপুর রাজ্যকে সাম্রাজ্যে পরিণত করেন। কথিত আছে, ত্রিহুত দেশ হইতে ওস্তাদ আনাইয়া তিনি রাজ্যে নৃত্যগীত শিখাইবার ব্যবস্থা করেন। শিক্ষাবিস্তারের জন্য তিনি বাংলাভাষাকে উৎকর্ষ দিয়াছিলেন। রাণী কমলা দেবী তাঁহার যোগ্যা সহধর্ম্মিণী ছিলেন এবং তাঁহার সম্বন্ধে বহু পল্লীগীতি ত্রিপুরার সর্ব্বত্র প্রচলিত আছে।

ধন্যমাণিক্য তাঁহার সৈন্যদলে জাতিভেদের বৈষম্য দূর করিবার জন্য একটি বৃহৎ ভোজের আয়োজন করেন এবং সৈন্যেরা পঙ্ক্তি ভোজনে বসিলে তাঁহার আদেশ অনুসারে এক তথাকথিত নীচ জাতীয় কুকী-সরদার সৈন্যদের গুণিবার ছল করিয়া একটি কাঠি দিয়া সকলের মস্তক স্পর্শ করে। রাজভয়ে কেহ প্রতিবাদ করিতে সাহসী হয় নাই। এই সকল সৈন্য "কাঠি ছোঁয়া" নামে পরিচিত হইয়াছিল।

এই বংশের বিজয় মাণিক্যও (১৫২৯—১৫৭০ খৃষ্টাব্দ) প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন। তিনি চট্টগ্রাম, সুবর্ণগ্রাম প্রভৃতি জয় করেন। এই অভিযানের সময় তিনি ব্রহ্মপুত্রের উপর এক পুল বাঁধিয়াছিলেন এবং তাঁহার সাথে ৫০,০০০ লোকের এক বহর ছিল। কৈলাগড়ে "বিজয়-নন্দিনী" নামক একটি বৃহৎ খাল কাটাইয়াছিলেন এবং কৈলাগড় হইতে শ্রীহট্ট পর্য্যন্ত একটি রাজপথ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, "উহা ত্রিপুরার জাঙ্গাল" নামে অভিহিত।

মহারাজ অমরমাণিক্যের (১৫৯৭—১৬১১ খৃষ্টাব্দ) প্রধান কীর্ত্তি প্রসিদ্ধ দীঘি "অমর-সাগর"। এই দীঘি খননের জন্য ভাওয়ালের রাজা, বন-ভাওয়ালের জমিদার, সরাইলের ঈশা খাঁ ও ভুলুয়ার

রাজা প্রত্যেকে ১,০০০ জন; শ্রীপুরপতি চাঁদ রায়, বাকলার বসু ও সলে গোয়ালপাড়ার গাজি প্রত্যেকে ৭০০ জন এবং অষ্টগ্রামের ও বানিয়াচঙ্গের জমিদার প্রত্যেকে ৫০০ জন করিয়া লোক পাঠাইয়াছিলেন। ইহা হইতে ত্রিপুর রাজের পদমর্য্যাদা সহজেই অনুমিত হয়। শ্রীহট্টের পাঠান রাজা ফতে খাঁ সাহায্য না করায় অমর মাণিক্য পুত্র রাজ্যধরের পরিচালনায় একটি বিপুল সেনা-বাহিনী ফতেখাঁর বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। এই অভিযানে ইতিহাস প্রসিদ্ধ ঈশা খাঁও তাঁহাকে সাহায্য করেন। ফতে খাঁ বন্দী হইয়া ত্রিপুরায় আনীত হইয়াছিলেন। পরে অমর মাণিক্য বহু সৈন্য দ্বারা সাহায্য করাতে ঈশা খাঁ মুঘলদিগের বিরুদ্ধে জয়ী হইয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন ঈশা খাঁর "মছলন্দী" বা "মসনদ-ই-আলি" উপাধি ত্রিপুর রাজ অমর মাণিক্য কর্ত্তৃক প্রদত্ত।

মহারাজ ২য় ধর্ম্মমাণিক্য (১৭১৪—১৭৩২ খৃষ্টাব্দে) মহাভারতের বঙ্গানুবাদ করাইয়াছিলেন।

লক্ষ্মণ মাণিক্যের (১৭৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত) রাজত্বকালে সমসের গাজী নামক একজন সাধারণ ব্যক্তি অতি পরাক্রমশালী ছিলেন, কার্য্যতঃ তিনিই প্রকৃত রাজা ছিলেন। মহারাজা কৃষ্ণ মাণিক্যকে পরাজিত করিয়া সমসের ত্রিপুর রাজ্য জয় করিয়াছিলেন, কিন্তু রাজ্যের পার্ব্বত্য জাতি সমূহ ত্রিপুর রাজবংশ ব্যতীত অপর কাহারও আনুগত্য স্বীকার করিতে রাজী না হওয়ায় সমসের লক্ষ্মণ মাণিক্যকে সিংহাসনে বসান। সমসেরের রাজ্য শাসন প্রশংসনীয় ছিল। তিনি বাজারে প্রত্যেক জিনিষের মূল্য বাঁধিয়া দিয়াছিলেন, তাহার ব্যতিক্রম হইতে পারিত না। তিনি মুসলমান হইয়াও অনেক ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মোত্তর দিয়াছিলেন।

পার্ব্বত্য ত্রিপুরার বয়ন শিল্প অতি প্রাচীন। রাজপরিবার ও ঠাকুর সাহেবদিগের গৃহে ব্যবহৃত এখানকার রিয়া বস্ত্রে সুতা দিয়া লতাপাতা, ফুল, দেবদেবী প্রভৃতির মূর্ত্তি সুন্দরভাবে চিত্রিত হয়। উহা রাজা রাজসূর্য্যের মহিষী জয়ন্ত-রাজকুমারীর উদ্ভাবনা বলিয়া কথিত। ত্রিপুরার স্বর্ণখচিত গজদন্তের পাটিরও প্রসিদ্ধি আছে।

কমলাসাগর—আখাউড়া জংশন হইতে ৭ মাইল দূর। স্টেশনের নিকটে একটি অনুচ্চ পর্ব্বত শৃঙ্গের উপর কস্‌বা কালীবাড়ী নামক একটি প্রাচীন দেবস্থান আছে। বৈশাখ মাসের অমাবস্যা তিথিতে এখানে মহামেলা ও বহু জন সমাগম হয়।

কমলাসাগর নামক একটি প্রকাণ্ড দীঘির নাম হইতেই স্থানটির নাম কমলাসাগর হইয়াছে। এই দীঘির জল অতি নির্ম্মল।

কুমিল্লা—আখাউড়া জংশন হইতে ২৯ মাইল দূর। ইহা ত্রিপুরা জেলার প্রধান শহর। শহরটি গোমতী নদীর তীরে অবস্থিত এবং একটি স্বাস্থ্যকর স্থান।

কুমিল্লার জগন্নাথ মন্দির একটি দ্রষ্টব্য বস্তু। ইহার নিকটস্থ সপ্তরত্ন মন্দিরও বিশেষ প্রসিদ্ধ। কুমিল্লার রথযাত্রা মেলায় বিস্তর জন সমাগম হয়। ইহা প্রায় ৩৫০ বৎসর ধরিয়া অনুষ্ঠিত হইতেছে। ত্রিপুরেশ্বর মহারাজা অমর মাণিক্য বাহাদুর জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার বিগ্রহ স্থাপন করেন। রথের সময় ত্রিপুরা মহারাজের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি প্রথমে রথের রজ্জু স্পর্শ করেন।

কুমিল্লায় ভিক্টোরিয়া কলেজ নামক একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজ, একটি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় ও শহরের নিকটবর্ত্তী ময়নামতী পাহাড়ে একটি সার্ভে বা জরিপ শিক্ষার স্কুল আছে।

কুমিল্লা শীতলপাটি, হুঁকা এবং বাঁশ ও বেতের জন্য প্রসিদ্ধ।

ময়নামতীর তাঁতের "চারখানা" কাপড়েরও যথেষ্ট খ্যাতি আছে।

কুমিল্লা হইতে ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্গত ৫১ মহাপীঠের অন্যতম ত্রিপুরাসুন্দরীর পীঠে যাইতে হয়। এখানে সতীর দক্ষিণ চরণ পতিত হইয়াছিল। ত্রিপুরাসুন্দরীর ভৈরবের নাম ত্রিপুরেশ। কুমিল্লা হইতে ২৮ মাইল দূরবর্ত্তী রাধাকিশোরপুর নামক গ্রামে উদয়পুরে এই মহাপীঠ অবস্থিত। কুমিল্লা হইতে এই স্থানে মোটর বাস যোগে যাইতে হয়। (সীতাকুণ্ড দ্রষ্টব্য)—প্রতিবৎসর পৌষ মাসে ও শিবচতুর্দ্দশীর সময় এই স্থানে বিরাট মেলা বসে। যাত্রিগণের সুবিধার জন্য ত্রিপুরারাজ বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছেন।

লালমাই—আখাউড়া জংশন হইতে ৩৬ মাইল দূর। স্টেশনের নিকটেই লালমাই পাহাড় অবস্থিত। এই পাহাড় উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ১০।১১ মাইল বিস্তৃত।

লাক্সাম জংশন—আখাউড়া হইতে ৪৪ মাইল দূর। ইহা আসাম বাংলা রেলপথের একটি বড় জংশন। এখান হইতে চাঁদপুর ও নোয়াখালি এই দুইটি শাখা লাইন বাহির হইয়াছে।

চাঁদপুর শাখার উপর লাক্সাম জংশন হইতে ১২ মাইল দূরে মেহার কালীবাড়ী। স্টেশনের নিকটেই সিদ্ধসাধক সর্ব্বানন্দ ঠাকুরের সাধনপীঠ মেহারের কালীবাড়ী অবস্থিত। এই স্থানটি নির্জ্জন ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের আধার। এখানে "সর্ব্বানন্দ মঠ" নামে একটি মঠ আছে। প্রতি বৎসর পৌষ মাষের সংক্রান্তিতে এখানে একটি মেলা হয়।

প্রবাদ, যে ঠাকুর সর্ব্বানন্দ তাদৃশ শিক্ষিত ছিলেন না। কিন্তু বাল্যকাল হইতে দেবীর প্রতি তাঁহার অচলা ভক্তি ছিল। বিশ্বস্ত ভৃত্য পূর্ণানন্দের সহায়তায় তিনি তান্ত্রিক সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়া দেবীকে প্রত্যক্ষ দর্শন করেন। একবার অমাবস্যা তিথিকে তিনি ভুল করিয়া পূর্ণিমা বলিয়াছিলেন। ইহাতে সমস্ত লোকে তাঁহাকে উপহাস করে। কিন্তু সিদ্ধ সাধক সর্ব্বানন্দ বলেন যে সে দিন নিশ্চয়ই পূর্ণিমা এবং সন্ধ্যাকালে নিশ্চয়ই চন্দ্রোদয় হইবে। ভক্তের মান রক্ষা করিবার জন্য দেবী কালিকা সন্ধ্যার সময় পূর্ব্বাকাশে স্বীয় কঙ্কণ-শোভিত হস্ত উত্তোলন করেন এবং উহার জ্যোতিতে সর্ব্বত্র চন্দ্রকিরণের ন্যায় জ্যোৎস্নার বিকাশ হয়।

সর্ব্বানন্দের অলৌকিক ক্ষমতা সম্বন্ধে এই প্রকার বহু কাহিনী প্রচলিত আছে।

চাঁদপুর শাখা লাইনে লাক্সাম হইতে ১৮ মাইল দূরে ত্রিপুরা জেলার অন্যতম বাণিজ্য কেন্দ্র হাজিগঞ্জ স্টেশন অবস্থিত। চাউল ও সুপারির কারবারের জন্য এই স্থানটি প্রসিদ্ধ।

চাঁদপুরের দূরত্ব লাক্সাম হইতে ৩২ মাইল। ইহা ত্রিপুরা জেলার অন্যতম মহকুমা। শহরটি মেঘনা নদীর তীরে অবস্থিত এবং বাণিজ্যের জন্য বিখ্যাত।

এখানে স্টীমার স্টেশনের সহিত রেলওয়ের সংযোগ আছে।

চাঁদপুর বন্দর হইতে বহু টাকার পাট, সুপারি ও লঙ্কা চালান যায়।

নোয়াখালি শাখার উপর লাক্সাম জংশন হইতে ১৫ মাইল দূরে **সোনাইমুড়ি** ও ২২ মাইল দূরে **চৌমুহানি** স্টেশন অবস্থিত। এই স্টেশনদ্বয় নোয়াখালি জেলার বাণিজ্য প্রধান স্থান। চৌমুহানি সুপারির ব্যবসায়ের জন্য প্রসিদ্ধ।

নোয়াখালি শহর লাকসাম হইতে ৩১ মাইল দূর। ইহার অপর নাম সুধারাম। প্রসিদ্ধি আছে যে ইহা সুধারাম মজুমদার নামক জনৈক জমিদার কর্ত্তৃক স্থাপিত।

নোয়াখালি শহর মেঘনা নদীর উত্তর তীরে অবস্থিত। সম্প্রতি মেঘনা নদীর প্রবল ভাঙ্গনের জন্য সরকারী আফিস, আদালত প্রভৃতি নোয়াখালির পূর্ব্ববর্ত্তী স্টেশন মাইজদি নামক গ্রামে স্থানান্তরিত হইয়াছে।

নোয়াখালির প্রাচীন নাম ভুলুয়া। এই স্থানের প্রথম রাজা বিশ্বম্ভর শূর মিথিলা হইতে আগত। কথিত আছে ১২০২ খৃষ্টাব্দে তিনি ভুলুয়া রাজ্য স্থাপিত করেন। বিশ্বম্ভর হইতে ৭ম পুরুষ অধস্তন লক্ষ্মণমাণিক্যের বীরত্বের বিশেষ খ্যাতি আছে। তাঁহার যুদ্ধকালীন বর্ম্মের ওজন নাকি এক মণ ছিল। তিনি সুকবি ও পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার "বিখ্যাত-বিজয়" মধ্যযুগের একখানি প্রসিদ্ধ সংস্কৃত নাটক। এই বংশের একটি বিশাল কামান বাবুপুর গ্রামে আজও দৃষ্ট হয়।

ফেনী—লাক্‌সাম জংশন হইতে চট্টগ্রামের পথে ২৫ মাইল দূরে অবস্থিত। ইহা নোয়াখালি জেলার মহকুমা। এখানে একটি কলেজ আছে।

এখান হইতে আসাম বাংলা রেলপথের এক শাখা ১৭ মাইল দূরবর্ত্তী বিলোনিয়া পর্য্যন্ত গিয়াছে। বিলোনিয়া ত্রিপুরা রাজ্যের অন্যতম মহকুমা।

কুণ্ডের হাট—লাক্‌সাম হইতে ৪৮ মাইল। স্টেশন হইতে পার্ব্বত্যপথে দেড় মাইল দূরে চম্পকেশ্বর নামে বিরাট শিবলিঙ্গ অবস্থিত।

বাড়বৈয়াঢালা—লাক্‌সাম হইতে ৫৪ মাইল দূরে সীতাকুণ্ডের অব্যবহিত পূর্ব্বে এই স্টেশন অবস্থিত। এখানে নামিয়া প্রায় দুই মাইল পূর্ব্বদিকে লবণাক্ষতীর্থে যাইতে হয়। লবণাক্ষ একটি ছোট কুণ্ড। ইহার আয়তন ৪ × ৪ × ৩ হাত। ইহার জল লবণাক্ত ও ঈষৎ উষ্ণ। লবণাক্ষ কুণ্ডের নিকটেই উত্তর-পশ্চিম কোণে বিস্তৃত পর্ব্বত গাত্রে অগ্নিশিখা দিনরাত্র জ্বলিতেছে। ইহা গুরুধুনী নামে পরিচিত।

লবণাক্ষ হইতে প্রায় এক মাইল দূরে পর্ব্বতের উপর সহস্রধারা নামক ৩০০ ফুট উচ্চ একটি মনোহর জলপ্রপাত আছে। ইহাও একটি পুণ্যতীর্থ। যাত্রিগণ প্রপাতের নীচে দাঁড়াইয়া স্নান করিয়া থাকেন এবং অনেকে জলের বেগ বৃদ্ধি পাইবে এই বিশ্বাসে উলুধ্বনি বা শিবনাম উচ্চারণ করেন। লবণাক্ষ কুণ্ড হইতে সহস্রধারার পথে সূর্য্যকুণ্ড ও ব্রহ্মকুণ্ড নামে আরও দুইটি কুণ্ড আছে।

সীতাকুণ্ড—লাকসাম ও চট্টগ্রাম জংশন হইতে যথাক্রমে ৫৮ ও ২৩ মাইল দূর। স্টেশন হইতে এক মাইল দূরে সুবিখ্যাত শৈব মহাপীঠ **চন্দ্রনাথ** পাহাড়; ইহা উচ্চতায় ১,১৫৫ ফুট। পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চ চূড়ায় চন্দ্রনাথ মহাদেবের মন্দির এবং ঠিক পাশের চূড়ায় বিরূপাক্ষ মহাদেবের মন্দির বহুদুর হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। শুধু বাংলার নহে, চন্দ্রনাথ সমগ্র ভারতের মধ্যে একটি প্রসিদ্ধ তীর্থ। শাস্ত্রানুসারে কলিযুগে চন্দ্রশেখরই মহাদেবের আবাসভূমি। "কলৌ বসামি চন্দ্রশেখরে।" পূর্ব্বে চন্দ্রনাথ পাহাড়ে উঠিবার রাস্তা বড়ই দুর্গম ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে পর্ব্বত গাত্রে বহু স্থানে সোপান নির্ম্মিত হইয়াছে এবং সেই জন্য চন্দ্রনাথ মহাদেব দর্শন সহজ হইয়াছে। পাহাড়ের পাদদেশ বা সমতল ভূমি হইতে শিখর পর্য্যন্ত প্রায় ৭০০ সোপান আছে।

চন্দ্রনাথ মন্দিরে উঠিবার পথে অনেকগুলি তীর্থ আছে। যথাক্রমে তাহাদের বিবরণ পর পর দেওয়া গেল। স্টেশন হইতে বাজারের পথ ধরিয়া পাহাড়ের দিকে যাইতে প্রথমে পড়িবে ব্যাসকুণ্ড বা ব্যাস সরোবর। কথিত আছে, মৎস্যগন্ধার পুত্র মহামুনি ব্যাসদেব তপস্যা করিবার জন্য বারাণসীধামে গমন করিলে মহর্ষি ভৃগু প্রভৃতি তাঁহাকে নীচকুল সম্ভূত বলিয়া অপমান করেন। অপমানে ও দুঃখে ব্যাসদেব তখন একটি নূতন কাশী সৃষ্টি করিবার সঙ্কল্প করিয়া কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। শিব প্রীত হইলেন। কলিযুগে শিব ভারতের অগ্নিকোণে স্থিত চট্টলে চন্দ্রশেখর ক্ষেত্রে অবস্থান করিবেন এই আশ্বাস পাইয়া শিবেরই উপদেশ মত এই স্থানে আসিয়া ব্যাসদেব নূতন কাশী প্রতিষ্ঠা করেন। তপোবলে তিনি অন্যান্য তীর্থগুলিকে চন্দ্রনাথে লইয়া আসিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সাড়ে তিন কোটি দেবতা আসিয়া এই স্থানে অধিষ্ঠিত হইলেন। চন্দ্রনাথ সর্ব্বতীর্থসার মহাতীর্থে পরিণত হইলে ব্যাসদেবের স্নান তর্পণের জন্য শিব ত্রিশূল নিক্ষেপ করিয়া ব্যাস-কুণ্ডটি সৃষ্টি করেন। পরে নৈমিষারণ্য হইতে সূত নামে কোনও ঋষি চন্দ্রনাথ তীর্থে আসিয়া ব্যাসকুণ্ডটি খনন করাইয়া বর্ত্তমান সরোবরে পরিণত করেন। ব্যাসকুণ্ডের পশ্চিম তীরে মন্দির মধ্যে ব্যাসেশ্বর শিব, ভৈরব, ব্যাসদেব ও চণ্ডিকা দেবীর মূর্ত্তি আছে। এই মন্দিরের পাশেই বটুক বৃক্ষ বা অক্ষয় বট দ্বাপর যুগ হইতে দণ্ডায়মান বলিয়া লোকের বিশ্বাস।

ব্যাস সরোবর ছাড়িয়া কিছু অগ্রসর হইয়া ৭০টি সিঁড়ি অতিক্রম করিলে বামদিকে হনুমান মন্দির পড়িবে।

হনুমান মন্দিরের সম্মুখ হইতে চন্দ্রনাথের রাস্তা ছাড়িয়া নীচে ৪৫টি সিঁড়ি অবতরণ করিলে সীতাকুণ্ড পাওয়া যাইবে। কথিত আছে, বনবাস কালে শ্রীরামচন্দ্র যখন এখানে আগমন করেন তখন মহর্ষি ভার্গব সীতাদেবীর স্নানের জন্য এই কুণ্ডের সৃষ্টি করেন। কুণ্ডের পার্শ্বস্থ মন্দিরে সীতাদেবীর মূর্ত্তি আছে। সীতাদেবীর মন্দিরের পশ্চাতেই পর্ব্বতগাত্র ভেদ করিয়া মাঝে মাঝে অগ্নিশিখা জ্বলিতে দেখা যায়। ইহা জ্যোতির্ম্ময় নামে খ্যাত। সীতাকুণ্ডের পার্শ্বেই রাম ও লক্ষ্মণকুণ্ড এবং মন্মথ নদ অবস্থিত।

সীতাকুণ্ড প্রভৃতি দেখিয়া চন্দ্রনাথের রাস্তায় পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া কিছুদূর গিয়া ৬১টি সিঁড়ি অতিক্রম করিলে ভবানীদেবীর মন্দির পড়িবে। ইহা একটি পীঠস্থান। বিষ্ণুচক্র-খণ্ডিত সতীদেহের দক্ষিণ বাহু এইখানে পড়িয়াছিল। "চট্টলে দক্ষ বাহুর্ম্মে ভৈরবশ্চন্দ্রশেখরঃ।" এই মন্দিরে ভবানী বা কালী ও দশভুজার মূর্ত্তি আছে।

ভবানীমন্দির হইতে ৪৯টি সোপান আরোহণ করিলে স্বয়ম্ভূনাথ মহাদেবের মন্দির। স্বয়ম্ভূনাথের অপর নাম ক্রমদীশ্বর। মন্দিরের উত্তরদিকে নবভৈরব এবং মন্দিরদ্বারে দ্বারপাল ভৈরব অবস্থিত। স্বয়ম্ভূনাথের ভিতর হইতে সর্ব্বদা জল বাহির হইতেছে। মন্দির মধ্যে রামসীতা ও অন্নপূর্ণার মূর্ত্তি রক্ষিত আছে। যাত্রীরা স্বয়ম্ভূনাথ দর্শন করিয়া বাহিরে আসিয়া সাক্ষীশিব দর্শন করেন।

স্বয়ম্ভূনাথের প্রকাশ সম্বন্ধে প্রবাদ আছে, যে চন্দ্রনাথ পাহাড়ের নিকটে শম্ভূ নামে এক রজক বাস করিতেন। তাঁহার একটি কপিলা গাভী গ্রামে প্রচুর আহার পাওয়া সত্ত্বেও প্রতিদিন পাহাড়ের দিকে কোথায় পলাইয়া যাইত এবং রাত্রে গৃহে ফিরিয়া আসিত। একদিন রজক গাভীর পিছনে পিছনে যাইয়া দেখিলেন যে উহা পাহাড়ে উঠিয়া একস্থানে স্থির হইয়া দাঁড়াইল এবং উহার স্তন হইতে

দুধ ঝরিয়া স্থানটি ধৌত হইল। রজক বিস্মিত হইয়া ফিরিয়া আসিলেন এবং সেই রাত্রেই স্বপ্ন দেখিলেন যে শিব যেন তাঁহাকে বলিতেছেন, যে প্রস্তরে গাভীর দুধ ঝরিতেছিল উহাতে তিনি অবস্থান করিতেছেন এবং উহার নাম স্বয়ম্ভূনাথ। পরদিন হইতে তিনি স্বয়ম্ভূনাথের পূজার ব্যবস্থা করেন। কথিত আছে স্বয়ম্ভূনাথের মাহাত্ম্যের কথা শুনিয়া ত্রিপুরেশ্বর ইঁহাকে স্বীয় রাজধানীতে লইয়া যাইবার ইচ্ছায় স্বয়ম্ভূনাথের চারিদিকে খনন করাইয়া বিফল হন; যতই খনন করা যায় কিছুতেই আর শেষ হয় না। হস্তীর দ্বারা উঠাইবার চেষ্টা করিয়াও কোন ফল হয় নাই। রাত্রিকালে স্বপ্নাদেশ হয়, তিনি যেন স্বয়ম্ভূনাথকে রাজধানীতে লইয়া যাইবার আশা ত্যাগ করেন এবং তাঁহার পূজার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া নিকটস্থ মহামায়া মূর্ত্তিকে লইয়া যান। রাত্রিকালে মহামায়াকে লইয়া যাইয়া যেখানে রাত্রি প্রভাত হয় সেই স্থানেই যেন তাঁহাকে স্থাপন করেন। ত্রিপুরেশ্বর তখন স্বয়ম্ভূনাথের মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া পূজার জন্য বহু সম্পত্তি দান করেন এবং আদ্যাশক্তি মহামায়াকে লইয়া পার্ব্বত্য পথে রাজধানীর দিকে যাত্রা করেন। রাজধানী হইতে বহুদূরে যেখানে প্রভাত হইল, সেইখানে দেবীকে স্থাপন করিয়া মন্দির প্রতিষ্ঠা ও পূজার ব্যবস্থা করিলেন। ত্রিপুরা রাজ্যের নামানুসারে মহারাজ দেবীর নাম রাখিলেন ত্রিপুরেশ্বরী বা ত্রিপুরাসুন্দরী এবং এই স্থানে সূর্য্য উদয় হওয়ায় জায়গাটির নাম রাখিলেন উদয়পুর। উদয়পুর একটি পীঠস্থান, সতীর দক্ষিণ চরণ এখানে পতিত হইয়াছিল। (কুমিল্লা দ্রষ্টব্য)।

স্বয়ম্ভূনাথ মন্দির হইতে চন্দ্রনাথের পথ ধরিয়া দু' তিন শ ফুট যাইয়া বাম দিকে ৮০টি সোপান অবতরণ করিয়া গয়াকুণ্ড বা পদগয়ায় যাইতে হয়। যাঁহারা পিণ্ডদানাদি না করেন তাঁহারা এখানে না গিয়া অগ্রসর হইতে পারেন। কিছুদূর গিয়া ১৫৭ টি সোপান অতিক্রম করিয়া দুইটি রাস্তার সঙ্গম স্থলে আসিতে হইবে। এখানে দক্ষিণ দিকে একটি ক্ষুদ্র সেতু পার হইয়া সোজা চন্দ্রনাথ শিখরে উঠিবার ৫৪৯ টি সোপান পড়িবে, এই পথটি সমস্তটাই অত্যন্ত খাড়াই এবং পথে উনকোটি শিব, বিরূপাক্ষ প্রভৃতি পড়িবে না। নামিবার পক্ষে এই পথ সুবিধার। সুতরাং এই পথে না উঠিয়া বাম দিকে ৮টি সিঁড়ি পার হইয়া উত্তর মুখে উনকোটি শিব ও বিরূপাক্ষ হইয়া চন্দ্রনাথ শিখরে পৌঁছাইয়া প্রথমোক্ত পথ দিয়া নামিয়া আসাই বাঞ্ছনীয়।

উনকোটি শিবের পথ ধরিয়া কিছু দূর যাইলেই দক্ষিণদিকের পর্ব্বতটি ঠিক যেন একটি গোলাকার বৃহৎ ছত্রের আকার ধারণ করে, এই জন্য ইহাকে ছত্রশিলা বলে। ছত্রশিলার পরেই রাস্তার বামদিকে একটি বিশাল প্রাচীন বৃক্ষের পাদদেশ প্রকাণ্ড কোটরের আকার ধারণ অরিয়াছে। প্রবাদ পূর্ব্বকালে মহর্ষি কপিল এই কোটরে তপস্যা করিতেন এই জন্য ইহা কপিলাশ্রম নামে অভিহিত। কপিলাশ্রম হইতে কিছুদূর যাইলে পথ একটি ছোট পর্ব্বত গুহায় শেষ হইয়া গিয়াছে। এই গুহার মধ্যে শিবলিঙ্গাকৃতি অসংখ্য প্রস্তরখণ্ড পর্ব্বতগাত্রে ও গুহার ছাদে সংলগ্ন আছে; অভ্যন্তর হইতে অবিরত জল নিঃসৃত হইয়া এইগুলিকে ধৌত করিতেছে। ইহাই উনকোটি শিব নামে খ্যাত।

উনকোটি শিব দেখিয়া কিছুদূর ফিরিয়া আসিয়া বামদিকে বিরূপাক্ষ মহাদেবের মন্দিরের পথ। পথটি দুর্গম, তবে আজকাল পথের নানা স্থানে সিঁড়ি ও রেলিং নির্ম্মিত হওয়ায় পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক সুগম হইয়াছে।

বিরূপাক্ষ হইতে চন্দ্রনাথ মহাদেবের মন্দির বেশী দূর নয়, পথও সহজ। পুরাতন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ ছাড়াইয়াই বর্ত্তমান মন্দির। সমতলভূমি হইতে পাহাড়ে উঠিতে নানা স্থান হইতে এবং

উনকোটি শিবের পথে (পৃষ্ঠা ১৭২)
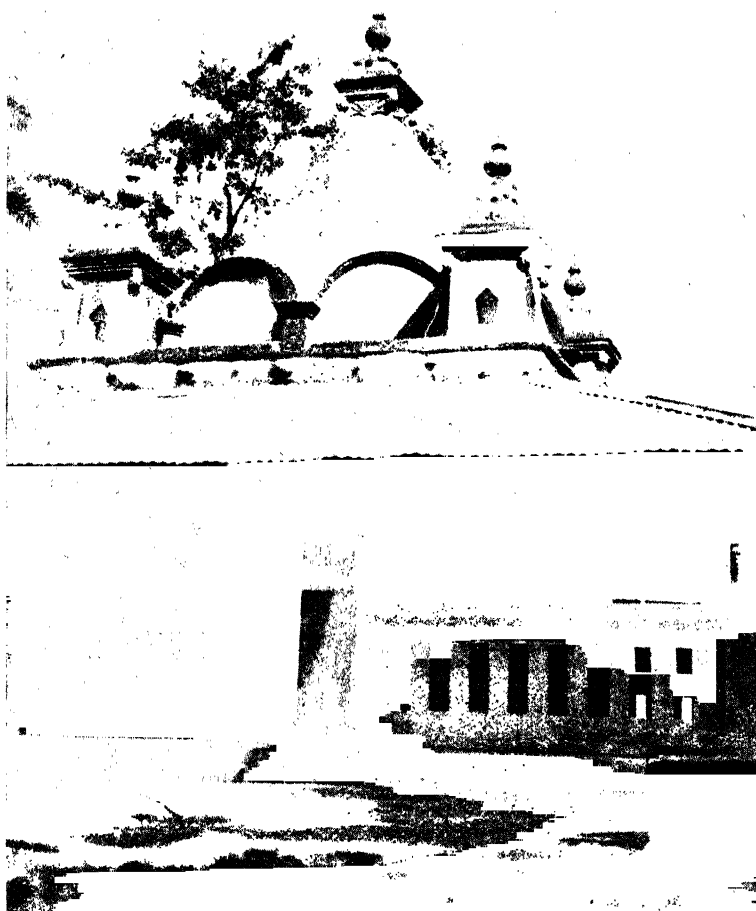
চন্দ্রনাথের মন্দির (পৃষ্ঠা ১৭৩)

বিরূপাক্ষ ও চন্দ্রনাথ মন্দির হইতে দিগন্ত বিস্তৃত সমুদ্রের দৃশ্য উদার ও মনোরম। বিশেষ করিয়া চন্দ্রনাথ মন্দির হইতে যে দৃশ্য চোখে পড়ে তাহার তুলনা বাংলাদেশে নাই। এক দিকে ৪ মাইল দূরের বঙ্গোপসাগর ও সন্দ্বীপ দ্বীপটি ও অপর দিকে তরুরাজি শোভিত পর্ব্বতমালার গম্ভীর রূপটি অতি অপূর্ব্ব ও মহান্। পর্ব্বত ও সমুদ্রের এই সম্মিলিত রূপ সকলকেই মুগ্ধ করিবে।

বিরূপাক্ষ হইতে চন্দ্রনাথ শিখরের পথ হইতে পাতালপুরী তীর্থে যাওয়া যায়, পথ ছাড়িয়া প্রায় দুই তিন মাইল পার্ব্বত্য পথ ও সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়। এখানে বৃষেশ্বর শিব, গোপেশ্বর শিব, পঞ্চানন শিব, রুদ্রেশ্বর শিব, পাতাল কালী, হরগৌরী, দ্বাদশ শালগ্রাম, পাতাল গঙ্গা, মন্দাকিনী প্রভৃতি অনেক দেবদেবী আছেন। সকল তীর্থযাত্রী পাতালপুরী দর্শন করেন না।

শিবরাত্রির সময়ে চন্দ্রনাথে মহামেলা হয়। তখন বাংলা তথা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে এখানে প্রায় লক্ষাধিক যাত্রীর সমাগম হয়।

অন্যান্য তীর্থের ন্যায় চন্দ্রনাথেও বহু পাণ্ডা আছেন; সীতাকুণ্ড স্টেশনের নিকটেই অনেকের বাড়ী।

চন্দ্রনাথ পাহাড় বৌদ্ধগণের নিকটেও বিশেষ পবিত্র। প্রবাদ বুদ্ধদেবের অঙ্গুলির অস্থি এই পর্ব্বতের শিখরে সমাহিত আছে। চন্দ্রনাথ মন্দিরের পিছন দিকে একটি প্রস্তরখণ্ডে বুদ্ধদেবের পদচিহ্ন অঙ্কিত আছে বলিয়া দেখানো হয়। অনেকে অনুমান করেন পূর্ব্বে এই স্থানে একটি বৌদ্ধ মন্দির ছিল। চৈত্রসংক্রান্তিতে চন্দ্রনাথে বৌদ্ধগণের একটি মেলা হয়।

বুদ্ধকূপ নামে একটি কুণ্ডের মধ্যে মৃত আত্মীয় স্বজনের অস্থি নিক্ষেপ করিবার জন্য বৌদ্ধগণ এখানে আগমন করিয়া থাকেন।

বাড়বাকুণ্ড—সীতাকুণ্ডের পরের স্টেশন। ইহা লাকসাম জংশন হইতে ৬১ মাইল দূর। স্টেশন হইতে প্রায় দেড় মাইল পূর্ব্বদিকে বাড়বানল পাহাড় অবস্থিত। এখানে শিব, কালী, ভৈরব ও ব্রহ্মাকে দর্শন করিতে হয়। এখানকার বাড়বাকুণ্ড নামক কুণ্ডের জলের উপর সতত একটি অগ্নিশিখা ক্রীড়া করিতেছে দেখা যায়। উহা মহাদেবের তৃতীয় নেত্র বা জ্যোতির্ম্ময় নামে বিখ্যাত। বাড়বাকুণ্ডের জল উষ্ণ। নিকটেই বাসিকুণ্ড নামে একটি কুণ্ড আছে। বাড়বাকুণ্ডের বাড়তি জল উপচাইয়া গিয়া এই কুণ্ডে সঞ্চিত হয়। ইহার জল শীতল। বাড়বাকুণ্ডের আয়তন ৪×৪×৩ হাত। ইহা অতলস্পর্শী এবং ইহার তলদেশ লোহার পাত দিয়া বাঁধানো।

শিবরাত্রির সময় বহু যাত্রী বাড়বানল দর্শন করিয়া থাকেন।

কুমিরা—লাকসাম হইতে ৬৬ মাইল। স্টেশন হইতে পার্ব্বত্য পথে এক মাইল দূরে কুমারীকুণ্ড অবস্থিত। ইহা চারি হস্ত পরিমিত একটি ক্ষুদ্র কুণ্ড এবং বাড়বাকুণ্ডের ন্যায় অতলস্পর্শী। ইহার উপরও মাঝে মাঝে অগ্নি খেলিয়া যায়, বাড়বের অগ্নির ন্যায় উহা অবিশ্রান্ত নয়। নিকটে কুমারী দেবী অবস্থিতা।

কুমিরার সম্মুখেই বঙ্গোপসাগর ও সন্দ্বীপ দ্বীপ। পর্ত্তুগীজদের অত্যাচারের সময় বহুলোক এই স্থান হইতে পলাইয়া যায়। এই গ্রামের প্রধান জমিদার "নানক সাহাজী" ও তাঁহার বংশীয়েরা গুরু নানকের বংশ সম্ভূত বলিয়া দাবী করিয়া থাকেন।

কৈবল্যধাম—লাক্‌সাম জংশন ও চট্টগ্রাম হইতে যথাক্রমে ৭৪ ও ৪ মাইল। এখানে একটি ছোট পাহাড়ের উপর " কৈবল্যধাম " নামে একটি আশ্রম ও কৈবল্যনাথ নামক মহাদেব আছেন। দুর্গাপূজার সময় এখানে বহু যাত্রীর সমাগম হয়। আশ্রম ও মন্দির ট্রেন হইতে দেখা যায়। চট্টগ্রাম ও পাহাড়তলী হইতে মোটর বা ঘোড়ার গাড়ীতেও যাওয়া চলে। পাহাড়তলী স্টেশন হইতে উত্তর-পূর্ব্ব দিকে মাত্র দেড় মাইল পথ।

পাহাড়তলী—লাকসাম জংশন হইতে ৭৮ মাইল দূরে চট্টগ্রাম শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত। এখানে আসাম-বাংলা রেলপথের গাড়ী তৈয়ারী ও মেরামতের কারখানা আছে। এখানকার পাহাড়ে ঘেরা লেক্ বা হ্রদ একটি বেড়াইবার জায়গা। এই হ্রদটি পানীয় জল সরবরাহের জন্য ব্যবহৃত হয়।

স্টেশনের নিকটে ভেলুয়ার দীঘির সহিত একটি পুরাতন কাহিনী জড়িত। দিল্লীতে দাসবংশীয় নৃপতিদের রাজত্বকালে পশ্চিমদেশ হইতে আমীর সওদাগর নামে একজন বণিক তাঁহার সুন্দরী স্ত্রী ভেলুয়াকে লইয়া বঙ্গদেশে আগমন করেন এবং কর্ম্মসূত্রে চট্টগ্রামে তাঁহার সমব্যবসায়ী স্থানীয় ভোলা সওদাগরের সংস্পর্শে আসেন। ভোলা ভেলুয়ার রূপ দর্শনে মুগ্ধ হয় এবং এক দিন ভেলুয়া যখন নদীতে স্নান করিতেছিলেন সেই সময়ে তাঁহাকে হরণ করে। আমীর সওদাগর বাংলার নবাবের সাহায্যে অনেক দিন এবং অনেক চেষ্টা করিয়া বাহুযুদ্ধে ভোলাকে নিহত করিয়া পত্নীর উদ্ধার করেন। এই ঘটনার স্মৃতিকল্পে ও পত্নীর সম্মানের জন্য নিহত ভোলার বাস্তুভিটায় একটি প্রকাণ্ড দীঘি কাটাইয়াছিলেন। তখনকার গ্রাম্য কবিরা ভেলুয়া রহরণ বৃত্তান্ত লইয়া সুন্দর কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।

চট্টগ্রাম—লাক্‌সাম জংশন হইতে ৮১ মাইল। বিভাগ ও জেলার প্রধান শহর চট্টগ্রাম কর্ণফুলী নদীর তীরে অবস্থিত। কর্ণফুলী নদী পার্ব্বত্য অঞ্চল হইতে নির্গত হইয়া ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করিতে করিতে পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম জেলার মধ্য দিয়া আসিয়া চট্টগ্রাম শহরের নিকটেই বঙ্গোপসাগরে মিলিত হইয়াছে। বৎসরের সকল সময়েই এই নদী দিয়া সমুদ্রগামী জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরে যাতায়াত করিতে পারে। বাংলাদেশে কলিকাতার পর চট্টগ্রামই একমাত্র সামুদ্রিক বন্দর। ইহা একটি আদর্শ ও স্বাভাবিক বন্দর এবং ইহার জল-বাণিজ্য বিশেষ সমৃদ্ধ। চট্টগ্রামের জেটিসমূহ আসাম-বাংলা রেলপথ কর্ত্তৃক বহুব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছে।

চট্টগ্রাম একটি প্রাচীন স্থান। পুরাণ ও তন্ত্রশাস্ত্রে ইহা চট্টল নামে অভিহিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন চট্টভট্ট জাতি চট্টলের প্রাচীন অধিবাসী, সেই জন্য ইহার নাম চট্টল বা চট্টগ্রাম হয়। কেহ বা বলেন সপ্তগ্রাম অঞ্চল হইতে বহুলোক এই স্থানে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন বলিয়া তাঁহারা এই স্থানের নাম সপ্তগ্রাম রাখেন। পরে এই নাম বিকৃত হইয়া চপ্টগ্রাম ও তাহা হইতে চট্টগ্রাম হয়। স্থানীয় বাঙালী বৌদ্ধগণের অনেকে বলেন যে পূর্ব্বে এই অঞ্চলে বহু চৈত্য বা বৌদ্ধ মঠ ছিল বলিয়া ইহার নাম চৈত্যগ্রাম হয়। চৈত্যগ্রাম পরে চট্টগ্রামে রূপান্তরিত হয়। আরাকানী ও মগেরা ইহাকে চাটিগা বলিত। আরাকানী ইতিহাসে ইহাকে চাইতিগাঁও বা যুদ্ধলব্ধ গ্রাম এই আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। সেইরূপ আরাকানের অপর নাম ছিল চাইতে-গ্রাও বা যুদ্ধলব্ধ নগরী। অনেকে অনুমান করেন, এই চাইতিগাঁও হইতেই চাটিগাঁ হইয়াছে। খৃষ্টীয় নবম-দশম শতাব্দীতে এ অঞ্চল বৌদ্ধজগতে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল এবং সুদূর তিব্বত হইতেও কতিপয় বৌদ্ধ পণ্ডিত শিক্ষালাভার্থ এখানে আসিয়াছিলেন বলিয়া জানা গিয়াছে। সে দেশেও ইহার নাম

চাটিগাঁ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী ইবন বতুতা ইহাকে আর্‌বী অক্ষরে "ছ্‌তের কাত্তন" লিখিয়াছেন।

এইরূপ গল্পও প্রচলিত আছে যে প্রসিদ্ধ পীর বদর সাহেব এখানে আসিয়া রাজার নিকট হইতে এক চাটি (অর্থাৎ প্রদীপে যতটুকু স্থান আলোকিত হয়) ততটুকু স্থান প্রার্থনা করিয়া লইয়া একটি পাহাড়ের উপর তাঁহার প্রদীপ স্থাপন করেন। যতদূর প্রদীপের আলো পড়িয়াছিল তাহারই নাম চাটি-গাঁ হয়। এখনও শহরের মধ্যে "চেরাগী পাহাড়ে" প্রদীপের স্থান নির্দ্দেশ করা হয়। এই চাটিগাঁ ক্রমে চাটিগ্রাম ও চট্টগ্রামে পরিণত হয় বলিয়া কথিত। এই গল্পের সামান্য প্রকার ভেদ এইরূপ, যে পূর্ব্বে এই অঞ্চল দৈত্য ও পরীদিগের দ্বারা উৎপীড়িত ছিল; মুসলমানগণ গৌড় জয় করিলে বার জন আউলিয়া বা সিদ্ধ ফকির এখানে আসিয়া একটি পাহাড়ের উপর প্রদীপ জ্বালিয়া দৈত্য ও পরীদের দমন করেন। প্রদীপ বা চাটির প্রভাবে এই স্থান লোকের বাসোপযোগী হইয়াছিল বলিয়া ইহার নাম হয় চাটিগাঁ।

বৈষ্ণব সাহিত্যে চট্টগ্রামের নাম চাটিগ্রাম। বৌদ্ধ শ্রমণগণ ইহাকে বলিতেন রমাবতী। ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রাম জয় করিয়া মুসলমানগণ ইহার নাম রাখেন ইস্‌লামাবাদ। ফকির দরবেশের নিকট ইহা "বার আউলিয়ার দেশ" নামে পরিচিত ছিল। পর্ত্তুগীজগণ ইহার নাম রাখিয়াছিলেন "পোর্টোগ্রাণ্ডো" বা বড় বন্দর; তাঁহারা সপ্তগ্রামকে বলিতেন "পোর্টোপিকুইনো" বা ক্ষুদ্র বন্দর।

মুসলমান বিজয়ের পূর্ব্বে চট্টগ্রাম বহুবার হিন্দু ত্রিপুরারাজ ও বৌদ্ধ আরাকানরাজের শাসনাধীন ছিল। উনবিংশ শতাব্দীতেও আরাকানের বৌদ্ধ রাজা মুসলমানদের নিকট হইতে ইহা জয় করেন। কথিত আছে তিনি বলিয়াছিলেন "চিৎ-ত-গং" অথাৎ যুদ্ধ করা অন্যায়। আরাকানি ও মগেরা বলেন এই উক্তি হইতেই চট্টগ্রাম শহরের নাম হইয়াছে চিটাগং।

চট্টগ্রাম শহরের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি সুন্দর। শহরের মধ্যে নানাস্থানে উচ্চ টিলা ও পাহাড় থাকায় ইহার সৌন্দর্য্য বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। সরকারী আফিস আদালত, য়ুরোপীয় ক্লাব, আসাম বাংলা রেলপথের প্রধান কার্য্যালয় ও বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাস-ভবন এইরূপ উচ্চ পাহাড়ের উপর অবস্থিত। এই সকল পাহাড় হইতে জাহাজ, স্টীমার ও সাম্পান নৌকা পরিপূর্ণ কর্ণফুলী নদী ও অনতিদূরবর্ত্তী সমুদ্রের দৃশ্য অতি সুন্দর দেখায়। বিশেষতঃ জ্যোৎস্না রাত্রিতে ইহার সৌন্দর্য্য হইয়া উঠে অতি মনোরম।

শহরের একটি অনুচ্চ পাহাড়ের উপর চট্টগ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী চট্টেশ্বরী কালীর মন্দির অবস্থিত।

শহরের মধ্যে "পীর বদরউদ্দীন সাহেবের দরগাহ্" অবস্থিত। সুপ্রসিদ্ধ হজরৎ শাহজলাল কর্ত্তৃক শ্রীহট্ট বিজয়ের পর তাঁহার দ্বারা আদিষ্ট হইয়া সেনাপতি নাসিরউদ্দীন পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্য তরফ জয় করেন। তাহার সহিত যে চারজন আউলিয়া বিজিত ভূমিতে ধর্ম্মপ্রচারার্থ গিয়াছিলেন তাঁহারা তরফ জয়ের পর নিকটস্থ নানাস্থানে গিয়া ধর্ম্মপ্রচার করেন। ইঁহাদেরই অন্যতম পীর বদরউদ্দীন চট্টগ্রামে প্রতিষ্ঠিত হন। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকে এই দরগাহে "শিরণি" দিয়া থাকেন। মাঝিরা নৌকা ছাড়িবার সময় "বদর, বদর" উচ্চারণ করিয়া এই পীরের জয়ধ্বনি করে।

চট্টগ্রামের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী পরলোকগত রায় সাহেব প্রসন্নকুমার সেন মহাশয় বহু অর্থব্যয়ে শহরের মধ্যে একটি সপ্ততল বিশিষ্ট নবগ্রহ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। এখানে নবগ্রহের প্রস্তর নির্ম্মিত মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। এই মন্দিরের উপর হইতে শহর ও কর্ণফুলী নদীর দৃশ্য অতি সুন্দর।

শহরের অন্দরকিল্লা পল্লীতে অবস্থিত "জামে মস্‌জিদ" অপর একটি দ্রষ্টব্য বস্তু। লালদীঘি নামক একটি সরোবরের উত্তর তীরে একটি পাহাড়ের উপর ইহা অবস্থিত। ১০৭৮ হিজিরায় নবাব শায়েস্তা খাঁর পুত্র নবাব খাঞ্জা উমেদ খাঁ কর্ত্তৃক ইহা নির্ম্মিত হয়। এই মস্‌জিদটি দেখিতে একটি দুর্গ বা কেল্লার মত বলিয়া এই স্থানের নাম হইয়াছে অন্দর কিল্লা।

চট্টগ্রামের শহরতলীতে একটি পাহাড়ের সানুদেশে সুবিখ্যাত পীর সুলতান বায়েজিদ্ বস্তানী সাহেবের দরগাহ অবস্থিত। এই দরগাহ ও হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায় কর্ত্তৃক সম্মানিত। এখানকার মস্‌জিদের সম্মুখস্থ পুষ্করিণীর মধ্যে বহু কচ্ছপ দেখিতে পাওয়া যায়। উহারা নির্ভয়ে দর্শকগণের হস্ত হইতে খাদ্যাদি গ্রহণ করে।

চট্টগ্রাম শহরের অপরাপর দ্রষ্টব্যের মধ্যে চট্টগ্রাম কলেজ, মাদ্রাসা, মেডিক্যাল স্কুল, বৌদ্ধবিহার ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের চট্টল শাখার নাম উল্লেখযোগ্য।

চৈতন্যদেবের সমসাময়িক মুকুন্দ দত্ত, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রমখ বহু বৈষ্ণব ভক্তের চট্টগ্রাম জেলায় জন্ম হইয়াছিল। আধুনিক যুগে চট্টগ্রাম সুপ্রসিদ্ধ কবি নবীনচন্দ্র সেন, জীবেন্দ্র কুমার দত্ত ও শশাঙ্কমোহন সেন এবং স্বর্গীয় জননায়ক দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের জন্মভূমি বলিয়া বাঙালীর নিকট সুপরিচিত।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের সময় ৩৪ সংখ্যক পদাতিক সৈন্যের তৃতীয় ও চতুর্থ দল চট্টগ্রামে সীমান্ত রক্ষায় নিযুক্ত ছিল। এই সিপাহীদলকে অবিশ্বাস করিবার কোনও কারণ কর্ত্তৃপক্ষ পান নাই। বস্তুতঃ ১৩ই জুন তারিখের রিপোর্টে বিভাগীয় কমিশনার চ্যাপম্যান সাহেব লিখিয়াছিলেন যে যদিও দিল্লীতে বিদ্রোহের জন্য সাধারণের মনে অত্যন্ত ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল, তখনও পর্য্যন্ত চট্টগ্রামের সিপাহীরা অবিশ্বাসের কোনও কার্য্য করে নাই। বরং তাহারা দিল্লী যাইয়া বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে ব্যগ্র ছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট হেন্‌ডার্‌সন সাহেবের ১৯এ জুন তারিখের রিপোর্টে দেখা যায় যে যদিও তাঁহার মতে বিদ্রোহের ভয় অমূলক, তথাপি নাগরিকেরা বিশেষতঃ পর্ত্তুগীজেরা অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িয়াছিল এবং অনেকেই ভয়ে সমুদ্রে জাহাজে যাইয়া অবস্থান করিতেছিল। অবশেষে ১৮ই নবেম্বর রাত্রি ১১টার সময়ে সত্যই সিপাহীরা বিদ্রোহী হইয়া কারাবাসীদের মুক্তি দিয়া রাজকোষ লুণ্ঠন করিয়া নির্ব্বিঘ্নে গোলাগুলিসহ উত্তরদিকে পার্ব্বত্য ত্রিপুরা অঞ্চলে চলিয়া যায়। বিভাগীয় কমিশনারের রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে তাহারা কোথাও কোনরূপ অত্যাচার করে নাই এবং অরক্ষিত অবস্থায় স্থানীয় লোকের দ্রব্যাদিও অপহৃত হয় নাই। কারামুক্ত কয়েদী ও স্ত্রী পুত্রসহ তাহারা সংখ্যায় প্রায় পাঁচ শত ছিল। তাহাদিগকে ধরিবার জন্য ৩৫৪ জন গোরা সৈন্য ৩রা ডিসেম্বর ঢাকায় পৌঁছিয়া ত্রিপুরা অভিমুখে যাত্রা করে। কিন্তু সিপাহীরা জঙ্গলে আশ্রয় লওয়ায় তাহারা ঢাকায় ফিরিয়া আসে। সিপাহীদের ধরিবার জন্য ৫ পাউণ্ড করিয়া পুরস্কার ঘোষিত হয়। যাহারা ধরা পড়িয়াছিল চট্টগ্রামে তাহাদের ফাঁসী দেওয়া হয়।
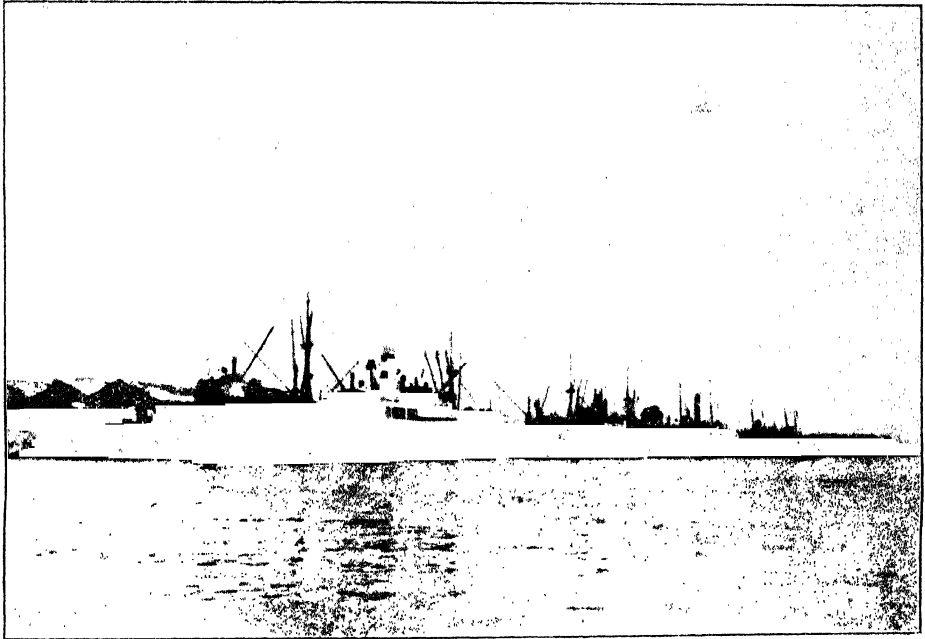
চট্টগ্রাম বন্দর (পৃষ্ঠা ১৭৪)
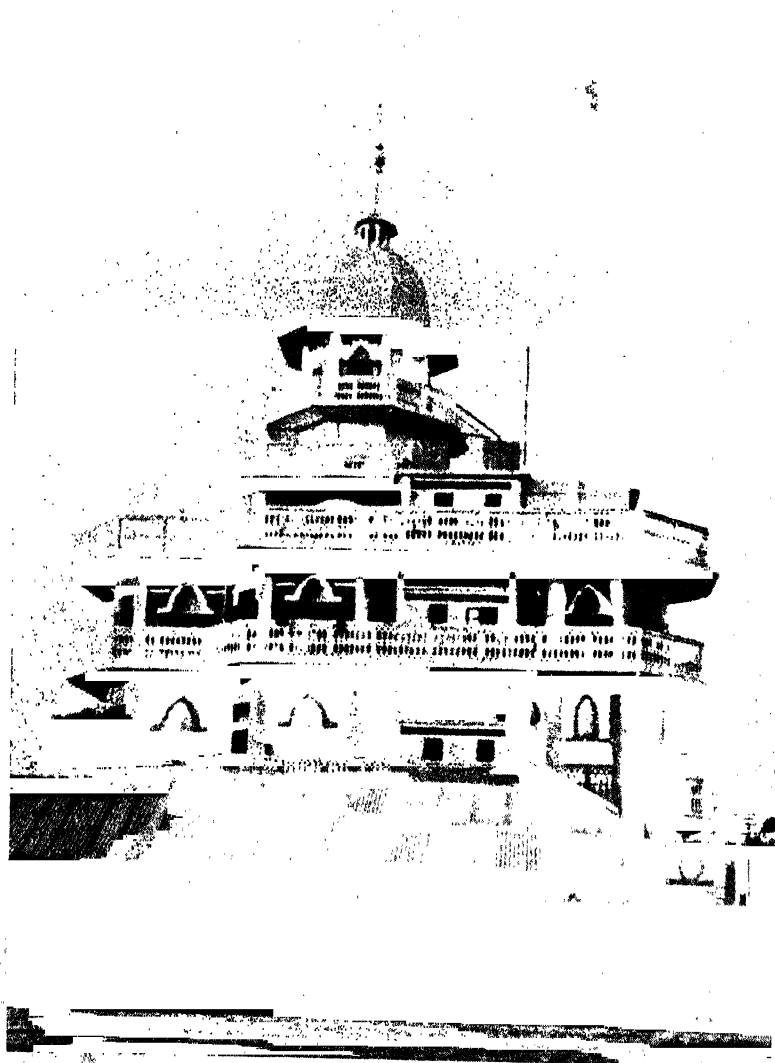
নবগ্রহ মন্দির, চট্টগ্রাম (পৃষ্ঠা ১৭৬)

আদিনাথের মন্দির (পৃষ্ঠা ১৭৭)
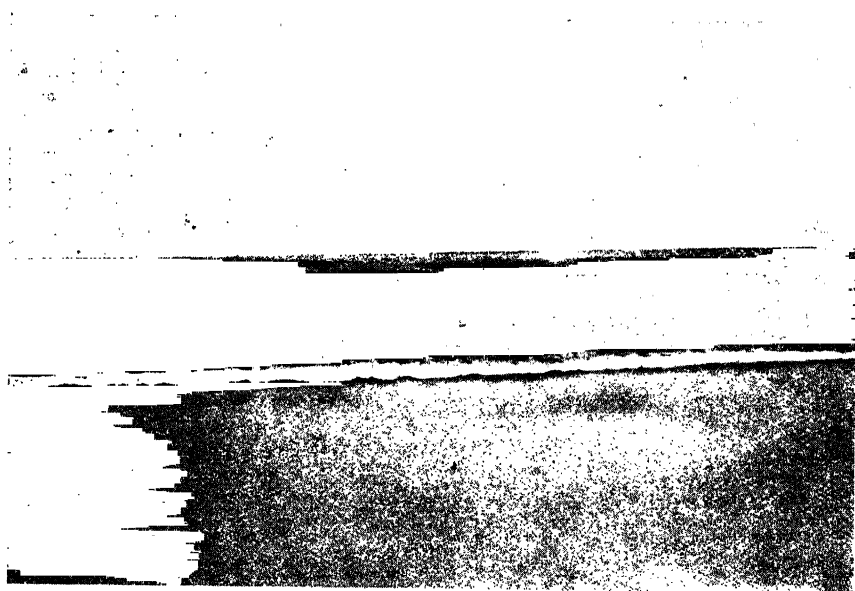
সমুদ্রতট, কাক্সবাজার (পৃষ্ঠা ১৭৮)
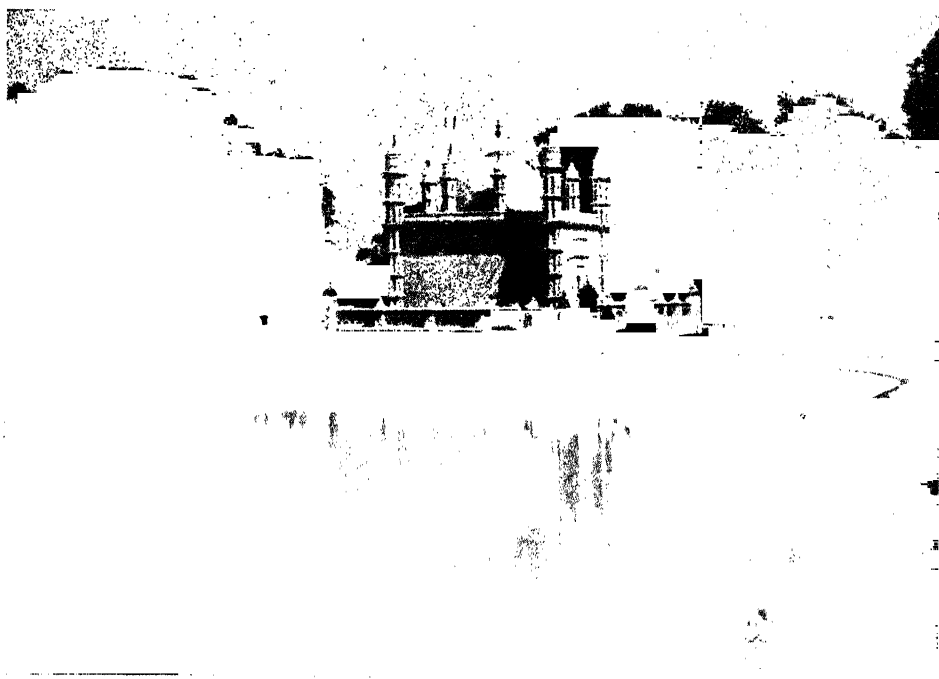
মির্জাখীল মসজিদ্ (পৃষ্ঠা ১৭৯)

আদিনাথ—চট্টগ্রাম হইতে স্টীমারযোগে সুপ্রসিদ্ধ তীর্থ আদিনাথ যাইতে হয়। ইহা মহিষখালি বা মহেশখালি নদী ও বঙ্গোপসাগরের মোহানার কাছেই মহিষাখালি বা মহেশখাল নামক দ্বীপে মৈনাক পর্ব্বতের উপর অবস্থিত। সমতল ভূমি হইতে ৬৯টি সোপান অতিক্রম করিয়া মৈনাকের শীর্ষদেশে আদিনাথ শিবের মন্দিরে পৌঁছিতে হয়।

চট্টগ্রাম হইতে আদিনাথের দূরত্ব ৭৫ মাইল, স্টীমারে করিয়া যাইতে প্রায় ৭।৮ ঘণ্টা সময় লাগে। কর্ণফুলী নদী বাহিয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িয়া বামদিকে গজিরার বাতিঘর ছাড়িয়া বাহির সমুদ্রে কিছুক্ষণ যাইবার পর কুতুবদিয়া দ্বীপের নিকট সমুদ্র ফেলিয়া স্টীমার নদী ও খাল দিয়া অগ্রসর হয়। কুতুবদিয়া মাতামুড়ী নামক নদীর মোহানায় অবস্থিত। এই দ্বীপের বাতিঘর বহুক্ষণ ধরিয়া দেখা যায়। স্টীমার ক্রমে মহিষখালি নদীতে গিয়া পড়ে এবং বঙ্গোপসাগরের সহিত এই নদীর সঙ্গমের কিছু আগেই মহিষখালি দ্বীপে আদিনাথের মন্দিরের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলে সাম্পান যোগে কূলে যাইতে হয়; নৌকায় মাত্র ১০।১৫ মিনিট সময় লাগে।

শিবরাত্রির পরই বহু লোক চন্দ্রনাথ হইয়া আদিনাথ মহাদেবের দর্শনে আসেন। এই সময়ে এখানে ৮ দিন ধরিয়া মেলা বসে। এই মেলা প্রায় ১৫০ বৎসর ধরিয়া চলিতেছে।

এই তীর্থে আদিনাথ মহাদেব ও অষ্টভুজা দুর্গা মন্দির মধ্যে বিরাজ করিতেছেন। পাহাড়, নদী ও সম্মুখে সমুদ্র পারিপার্শ্বিক দৃশ্যকে সত্যই মনোরম করিয়াছে; এই স্বাভাবিক আবেষ্টনীর মধ্যে প্রাত্যহিক সন্ধ্যারতির শঙ্খ-ঘণ্টাধ্বনি তীর্থযাত্রীর মনে অপূর্ব্ব আনন্দ দান করে।

আদিনাথ রাবণের কাঁধে চড়িয়া তাঁহার বাসাবাটী মৈনাকে আসিয়াছিলেন বলিয়া কথিত। তিনি বহুকাল গুপ্ত অবস্থায় ছিলেন। কিংবদন্তী প্রায় ২০০ বৎসর হইল স্থানীয় কোনও মুসলমান কৃষক কাঠ কাটিবার জন্য জঙ্গলে গিয়া একটি বেলগাছে উঠিতে গেলে একটি জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ গাছ হইতে মাটিতে পড়িয়া যায়। তিনি নিকটে গিয়া দেখিলেন ইহা একটি সুন্দর পাথরের টুকরা। অস্ত্র শান্ দিবার জন্য তিনি ইহা কুড়াইয়া বাড়ী লইয়া যান এবং দুই পায়ে কাঁটা ফুটিয়াছিল বলিয়া পাথরটি দিয়া দুই পা ঘর্ষণ করেন। রাত্রে তিনি ও তাঁহার স্ত্রী নানারূপ ভীষণ স্বপ্ন দেখিয়া ভীত হন। পরের দিন তাঁহাদের একমাত্র পুত্র বিসূচিকা রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কৃষক ভীত হইয়া মহিষখালির জমিদার প্রভাবতী ঠাকুরাণীর নিকটে গিয়া সমস্ত ঘটনা বিবৃত করেন। তিনি কৃষকের নিকট হইতে আদিনাথকে লইয়া আসিয়া মন্দিরে প্রতিষ্ঠা ও পূজার ব্যবস্থা করেন।

মহিষখালি দ্বীপে বহু মগ বাস করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ব্রহ্ম ও আরাকান রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধের ফলে ব্রহ্মরাজভীত বহু আরাকানবাসী চট্টগ্রাম জেলার প্রান্তদেশে স্থানে স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করেন। মহেশখালির মগেরা তাঁহাদেরই সন্তানসন্ততি। ইঁহারা নিজ ভাষা ভিন্ন বাংলাও জানেন। আদিনাথ মন্দিরের নিকটেই একটি সুন্দর ছোট বৌদ্ধ মন্দির এবং আধ মাইল দূরে ইহাদের পূজাস্থান চেরাংঘর দেখিবার জিনিস। চেরাংঘরের তিন চারিটি মন্দিরে বহু সুন্দর ও বৃহৎ বৃহৎ শ্বেত পাথর ও পিতল ইত্যাদির বুদ্ধমূর্ত্তির পূজা হয়। বাংলাদেশে অন্য কোথাও এরূপ সুন্দর বৃহৎ মূর্ত্তি নাই।

কাক্সবাজার—চট্টগ্রাম হইতে জলপথে আদিনাথের ঠিক পরের স্টীমার স্টেশন কাকসবাজার (Cox's Bazar)। এই স্থান আদিনাথের সামান্য দক্ষিণে মহিষখালি নদীর অপর

পারে ঠিক বঙ্গোপসাগরের মোহানার উপর অবস্থিত। স্টীমার হইতে সামপানে নামিয়া তিন মাইল পথ একটি বৃহৎ খাল দিয়া কাক্‌সবাজারে যাইতে হয়। কাক্‌সবাজারের উত্তরে এই খাল এবং পশ্চিমে সমুদ্র। যাঁহারা জলপথে যাইতে অনভ্যস্ত তাঁহারা কেহ কেহ সমুদ্রের ঢেউ খাইয়া সামপানে কাক্‌সবাজার যাইতে ভয় পাইতে পারেন—বিশেষতঃ শীতকালের পর যখন স্বভাবতই বাতাসের জন্য সমুদ্রে ঢেউ বেশী থাকে।

শিবরাত্রির পর আদিনাথ দর্শন করিয়া কেহ কেহ জাহাজের জন্য অপেক্ষা না করিয়া নৌকাযোগেই মহিষখালি নদী পার হইয়া কাক্‌সবাজার যাইয়া থাকেন; ইহাতে প্রায় দুই ঘণ্টা আড়াই ঘণ্টা সময় লাগে। এই পথেও মাঝ নদীতে বেশ ঢেউ লাগে, সুতরাং অনভ্যস্তের পক্ষে স্টীমারে যাওয়াই বিধেয়।

কাক্‌সবাজার চট্টগ্রাম জেলার অন্যতম মহকুমা; এবং চট্টগ্রাম শহর হইতে দক্ষিণে স্থল পথে মাত্র ৪৯ মাইল দূর; কিন্তু রাস্তা নাই। শহরটির দৃশ্য বড়ই সুন্দর, বিশেষতঃ ইহার বিস্তৃত সমুদ্রতটটি অতি মনোরম।

এখানে সামুদ্রিক মৎস্যের বড় কারবার আছে এবং এখানকার প্রস্তুত লুঙ্গি কাপড়ের বিশেষ চাহিদা আছে।

মহিষখালির ন্যায় কাক্‌সবাজারেও ব্রহ্ম-আরাকাণ যুদ্ধের পর হইতে বহু মগ আসিয়া বাস করিতেছেন। ব্রহ্ম অভিযানের প্রধান নেতা কাক্‌স্ সাহেবের নাম হইতে এই শহরের নামকরণ হইয়াছে।

সন্দ্বীপ—চট্টগ্রাম হইতে জাহাজযোগে বঙ্গোপসাগরের মোহানায় অবস্থিত সন্দ্বীপে যাওয়া যায়। সন্দ্বীপ নোয়াখালি জেলার অন্তর্গত। এখানে একটি মুন্সেফী আদালত আছে। পাঠান আমলের শেষভাগে সন্দ্বীপ আরাকানী, মগ ও পর্ত্তুগীজ জলদস্যু বা বোম্বেটেগণের একটি আড্ডা হইয়া উঠে। এই স্থানকে কেন্দ্র করিয়া জলদস্যুগণ বঙ্গোপসাগরের উপকূলভাগে নানা প্রকার অত্যাচার করিত। ষোড়শ শতাব্দীতে সিবাস্টিয়ান গঞ্জলিশ নামক জনৈক পর্ত্তুগীজ্ সর্দ্দার সন্দ্বীপ অধিকার করিয়া সেখানে কিছুকাল রাজত্ব করিয়াছিল। পরে পর্ত্তুগীজগণ মুঘলদিগের হস্তে পরাজিত হয়।

পূর্ব্বকালে সন্দ্বীপ জাহাজ নির্ম্মাণের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। কথিত আছে যে আলেক্‌জান্দ্রিয়ার সুলতান এখান হইতেই তাঁহার জাহাজগুলি নির্ম্মাণ করাইয়া লইতেন। সে যুগে সন্দ্বীপে বিস্তৃত লবণের কারখানা ছিল। সন্দ্বীপ একটি স্বাস্থ্যকর স্থান।

রাঙামাটি—চট্টগ্রাম জেলার পূর্ব্বে পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম নামক একটি স্বতন্ত্র জেলা আছে। এ জেলার অধিবাসিগণের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী চাক্‌মা ও মগ এবং হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী টিপ্‌রা জাতিই অধিক। এ জেলায় রাস্তার বড়ই অভাব। এখানকার ভূমি পাহাড়পর্ব্বত ও বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ। ইহার জঙ্গলে তুন, জারুল, চাপলাইস্ ও গর্জন প্রভৃতি মূল্যবান গাছ এবং বাঁশ ও বেত প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। অরণ্যমধ্যে হস্তী, ব্যাঘ্র, গণ্ডার ও মহিষ প্রভৃতি বাস করে। উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে কাপাস ও তুলা প্রধান।

এই জেলার প্রধান শহরের নাম রঙ্গমতী বা রাঙামাটি। শহরটি কর্ণফুলী নদীর তীরে অবস্থিত এবং জলপথে চট্টগ্রাম হইতে ৬৫ মাইল দূর। স্টীমলঞ্চে একদিনে এবং নৌকাযোগে দুইদিনে যাওয়া যায়। পথটি বড়ই রমণীয়। ভ্রমণকারীদিগের অবস্থানের জন্য রাঙামাটিতে একটি সুসজ্জিত সার্কিট হাউস আছে।

রাঙামাটি শহরে চাক্‌মা জাতীয় জনৈক রাজার প্রাসাদ অবস্থিত।

নূতনপাড়া—চট্টগ্রাম জংশন হইতে আসাম বাংলা রেলপথের এক শাখা লাইন ২৩ মাইল দূরবর্ত্তী নাজরিহাট ঘাট পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই লাইনে নূতনপাড়া স্টেশন চট্টগ্রামের শহরতলিতে অবস্থিত। এই স্টেশনের অৰ্দ্ধ-মাইল পশ্চিমে পীর সুলতান বায়েজিদ বোস্তানী সাহেবের দরগাহ অবস্থিত ; ইহার কথা আগে বলা হইয়াছে।

নাজিরহাট ঘাট—চট্টগ্রাম নাজিরহাট ঘাট শাখা লাইনের শেষ স্টেশন। ইহার নিকটেই মাইজভাণ্ডার গ্রামে প্রসিদ্ধ পীর হজরত মৌলানা সৈয়দ গোলাম রহমান শাহ সাহেব জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার আধ্যাত্মিক ক্ষমতার কথা সুদূর আফগানিস্থান, ইরান্ ও আরব পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছিল এবং বহুলোক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। মাত্র কয়েক বৎসর হইল তিনি পরলোকে গিয়াছেন। তাঁহার পবিত্র সমাধি দেখিতে প্রত্যহ অসংখ্য লোক আসিয়া থাকেন।

ধলঘাট—চট্টগ্রাম জংশন হইতে অপর একটি শাখা লাইন ২৯ মাইল দূরবর্ত্তী দোহাজারী পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই লাইনের মাঝপথে ধলঘাট স্টেশন। ধলঘাট হইতে প্রায় ৫ মাইল দূরে করলডেঙ্গা পাহাড়ে মেধস্ আশ্রম অবস্থিত। কিংবদন্তী, প্রসিদ্ধ ধৰ্ম্মগ্রন্থ চণ্ডীর বক্তা মেধস্ মুনি এই এই স্থানে দেহত্যাগ করেন। প্রতি বৎসর দুর্গা পূজার সময় মেধস্ মুনির স্মরণার্থে একটি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে বহুলোক যোগদান করেন। মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ও এই স্থানে বাস করিতেন বলিয়া কথিত।

দোহাজারি—চট্টগ্রাম-দোহাজারি শাখা লাইনের শেষ স্টেশন। এখান হইতে দুর্গম পর্ব্বত ও গভীর অরণ্য ভেদ করিয়া আকিয়াবের মধ্য দিয়া ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত রেলপথ বিস্তারের একটি পরিকল্পনা আছে। দোহাজারি স্টেশনের নিকটে অবস্থিত মির্জারখীল গ্রামে হজরত জাহাঙ্গীর শাহ্ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি গভীর জ্ঞান ও ধৰ্ম্মপরায়ণতার জন্য দেশ বিদেশের মুসলমান সমাজের বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছিলেন। প্রতিবৎসর ১৭ই জেলহজ্জ তারিখে তাঁহার মৃত্যু উপলক্ষে মির্জারখীল গ্রামে সপ্তাহব্যাপী উৎসব হয় এবং জাতি-ধৰ্ম্মনির্বিবশেষে বহুলোক ইহাতে যোগদান করেন।
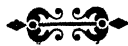
(গ) আখাউড়া-বদরপুর-শিলচর

ইটাখোলা—আখাউড়া জংশন হইতে ২৩ মাইল। ইহা শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত। **স্টেশন** হইতে ৫।৬ মাইল পশ্চিমে বেজোড়াগ্রাম। ইহার সহিত একটি করুণ ঘটনার স্মৃতি জড়িত। পূর্ব্বে শ্রীহট্ট জেলার দক্ষিণ পশ্চিম অংশে **তরফ** নামে একটি বিস্তৃত রাজ্য ছিল। শায়েস্তাগঞ্জ, হবিগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চল এই রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। তরফের মুসলমান রাজা মেকায়েলের দ্বিতীয় পুত্র সৈয়দ আব্বাস দিল্লীতে গিয়া বীরত্ব ও অন্যান্য গুণাবলীর জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করেন এবং এক ওমরাহ কন্যাকে বিবাহ করিয়া সম্রাটের নিকট হইতে শ্রীহট্টে প্রচুর ভূসম্পত্তি লাভ করিয়া দেশে প্রত্যাগমন করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা ঈর্ষান্বিত হইয়া বাড়ী পৌছিবার পূর্ব্বে পথিমধ্যে তাঁহাকে সহসা আক্রমণ করিয়া হত্যা করেন। তাঁহার স্ত্রী মর্ম্মাহত হইয়া ঐ স্থান হইতেই দিল্লীতে ফিরিয়া যান। এই ঘটনায় স্বামী হইতে স্ত্রী চিরকালের জন্য বিযুক্ত হইয়া পড়েন বলিয়া স্থানটি আজও বেজোড়া নামে পরিচিত।

তরফের শেষ হিন্দু রাজার নাম আচক নারায়ণ; প্রবাদ তিনি হঠাৎ রাজ্যলাভ করেন বলিয়া আচক বা আচম্বিত নামে পরিচিত হন। আচক নারায়ণ ত্রিপুরেশ্বরের করদ রাজা ছিলেন। রাজপুর নামক স্থানে তাঁহার রাজধানী ছিল। তাঁহার বিষয়ে নানা গল্প ও কাহিনী প্রচলিত আছে। কথিত আছে, তিনি বৈষ্ণব ছিলেন এবং প্রত্যহ দ্রুতগামী অশ্বে চড়িয়া রাজধানী হইতে বহু দূরে পবিত্র বরচক্র বা বরাক নদে স্নান করিতে যাইতেন। যে ঘাটে তিনি স্নান করিতেন তাহা আজও স্নানঘাট নামে অভিহিত। জনশ্রুতি যে পৌরাণিক কালের রাজা ভগদত্ত শাসনকার্য্য উপলক্ষে শ্রীহট্টে আসিলে এই ঘাটে স্নান করিতেন। আচক নারায়ণ স্নান করিয়া ফিরিয়া রাজধানী হইতে তিনক্রোশ দূরে স্থিত কীর্ত্তনীয়া টিলা নামক একটি নির্জ্জন টিলায় পূজা করিতেন। রাজবাটীতে কুলদেবতার ভোগ আরম্ভ হইলে একটি প্রকাণ্ড ঢাক বাজাইলে মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় তাহার উচ্চধ্বনি কীর্ত্তনীয়া টিলা হইতে শুনিতে পাইতেন। তখন তিনি প্রাসাদে ফিরিয়া মধ্যাহ্ন ভোজন করিতেন। আচক নারায়ণ শ্রীহট্টের প্রসিদ্ধ রাজা গৌড়গোবিন্দের সমসাময়িক ছিলেন। প্রসিদ্ধ পীর শাহজলালের নেতৃত্বে মুসলমানগণ শ্রীহট্ট জয় করিলে পর তাঁহারই আদেশে সেনাপতি নসিরউদ্দীন চারজন আউলিয়ার সহযোগিতায় তরফ আক্রমণ করেন। আচক নারায়ণ রাজা গৌড়গোবিন্দের পরাজয়ের খবর পাইয়া এবং তাঁহার অশিক্ষিত সৈন্যগণ সুশিক্ষিত মুসলমান সৈন্যবাহিনীর সহিত যুদ্ধে পারিবে না এবং কেবল লোকক্ষয় হইবে, এই ভাবিয়া রাজধানী ত্যাগ করিলেন এবং পরিজনসহ ত্রিপুরেশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ত্রিপুরায় অবস্থান করা নিরাপদ নহে ভাবিয়া পরে তিনি মথুরা তীর্থে গমন করেন এবং তথায় তাঁহার মৃত্যু হয়। নসিরুদ্দিন তরফের শাসনভার প্রাপ্ত হন। তরফ নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে কথিত আছে যে এই রাজ্য মুসলমানগণ কর্ত্তৃক আক্রমণের সময় দ্বাদশ আউলিয়ার অন্যতম শাহবাজী অঙ্গুলি নির্দ্দেশে আচক নারায়ণের অশ্বের প্রতি নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন "ইস্ তরফ যাও"। তদবধি এই অঞ্চলের নাম তরফ হইয়াছে। নসিরুদ্দিনের প্রপৌত্র সৈয়দ শাহ ইসরাইল বিদ্যাবত্তার জন্য মুলক-উল-উলামা উপাধি পাইয়াছিলেন এবং ইরাণী ভাষায় তিনি "মদানেল ফাওয়ায়েদ" নামক গ্রন্থ রচনা করেন (১৫২৩ খৃষ্টাব্দে)। তরফরাজগণ দিল্লীর অধীন হইলেও ত্রিপুর রাজগণের দ্বারা প্রভাবান্বিত ছিলেন। তরফরাজ সৈয়দ মুসার সহিত আরাকান রাজ্যের বিশেষ হৃদ্যতা ছিল। আরাকান মন্ত্রী মাগন ঠাকুরের উৎসাহে বঙ্গীয় কবি আলাওল

মুরারিচাঁদ কলেজ, শ্রীহট্ট (পৃষ্ঠা ১৮৭)

একটি নাগা পরিবার (পৃষ্ঠা ১৯২)

সাহেব ১৬২৭ খৃষ্টাব্দে পদ্মাবতী কাব্য রচনা করেন। সৈয়দ মুসার অনুরোধে এই কবি "সায়ফল মুলুক" ও "বদিউজজমাল" নামক ইরাণী গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করেন। অনুবাদ কার্য্য মাগনঠাকুরের মৃত্যুর পর সমাপ্ত হয়।

শাহাজীবাজার—আখাউড়া জংশন হইতে ৩০ মাইল দূর। ইহা শ্রীহট্ট জেলার প্রাচীন তরফ রাজ্যের অন্তর্গত। স্টেশনের নিকটেই ফতেপুর নামক গ্রামে রঘুনন্দন পাহাড়ের উপর বিখ্যাত ফকির ও দ্বাদশ আউলিয়ার অন্যতম শাহ ফতে গাজীর দরগাহ ও কবর অবস্থিত। স্থানটি মুসলমানগণের নিকট বিশেষ পবিত্র। প্রতি বৎসর অগ্রহায়ণ মাসের শেষদিনে গাজীর স্মরণার্থ এখানে একটি মেলা হয়। রঘুনন্দন পাহাড়টি উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ১৮ মাইল দীর্ঘ এবং ইহার সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ উচ্চতায় ৭০০ ফুট্।

শায়েস্তাগঞ্জ জংশন—আখাউড়া জংশন হইতে ৪৬ মাইল দূর। কেহ কেহ বলেন যে প্রাচীন তরফ রাজ্যের প্রসিদ্ধ সৈয়দ বংশীয় হামিদ রাজার পুত্র সৈয়দ শায়েস্তা মিয়া এই স্থানে একটি বাজার বসাইয়া স্বীয় নামানুসারে উহার শায়েস্তাগঞ্জ নাম রাখেন। মতান্তরে, বাংলার নবাব শায়েস্তা খাঁ এই গঞ্জের প্রতিষ্ঠাতা। শায়েস্তা খাঁ মগ ও পর্ত্তুগীজ জলদস্যুগণের অত্যাচার দমন করিয়াছিলেন।

স্টেশনের নিকটেই দাউদ নগরের দরগাহ অবস্থিত। এই দরগাহের প্রাচীন জলাশয়ে বহু গজাল মাছ্ ভাসিতে দেখা যায়। ইহা প্রসিদ্ধ দ্বাদশ আউলিয়ার অন্যতম সৈয়দ শাহ সয়েফ্ মিল্লত উদ্-দীনের প্রপৌত্র প্রসিদ্ধ শাহ দাউদ সাহেবের দরগাহ। দাউদ সাহেবের বাসস্থান বলিয়া এই স্থানের নাম হয় দাউদনগর।

শায়েস্তাগঞ্জের নিকটে খোয়াই নদীর তীরস্থ বৃহদাকৃতি "তুঙ্গেশ্বর" মহাদেব সুপ্রসিদ্ধ। কথিত আছে, এখানে সতীর নয়টি অঙ্গুরীয়ক পতিত হইয়াছিল; সেই জন্য এই স্থান নবরত্ন উপপীঠ নামে পরিচিত। তুঙ্গেশ্বর মহাদেবের কোন মন্দির নাই। প্রবাদ একবার মন্দির নির্ম্মাণের আয়োজন হইলে পূজারী স্বপ্ন দেখেন যে মহাদেব যেন তাঁহাকে বলিতেছেন যে তিনি মন্দিরে থাকিতে ভালবাসেন না। জনশ্রুতি, যে প্রায় আটশত বৎসর পূর্ব্বে শম্ভুনাথ বাচস্পতি স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া এই শিবের প্রকাশ করেন। ইহার সম্বন্ধেও কপিলা গাভীর দুগ্ধদানের উপাখ্যান প্রচলিত আছে। লোকের বিশ্বাস এই শিব ক্রমশঃ বাড়িতেছেন; আটশত বৎসরে ইনি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ হইতে প্রায় তিন হাত উচ্চ ও পাঁচ হাত পরিধিতে পরিণত হইয়াছেন। কালাপাহাড় তুঙ্গেশ্বরের দক্ষিণদিক নাকি ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন; শিবের ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে বলিয়া সেই ভগ্নস্থান নাকি ক্রমে ক্রমে পূর্ণ হইয়া আসিতেছে।

শায়েস্তাগঞ্জ জংশন হইতে একটি শাখা লাইন উত্তর-পশ্চিমদিকে আট মাইল দূরবর্ত্তী হবিগঞ্জ বাজার পর্য্যন্ত গিয়াছে। অপর একটি শাখা লাইন দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে ১৭ মাইল দূরবর্ত্তী **বালাবাজার** পর্য্যন্ত গিয়াছে।

নরপতি—শায়েস্তাগঞ্জ জংশন হইতে দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে প্রায় ৩ মাইল। তরফ রাজবংশের ইস্রাইল মুলক্-উল-উলেমার কথা আগে বলা হইয়াছে। ইহার পুত্র শাহ ইলিয়াস কুদ্দস বিশিষ্ট পণ্ডিত ও সাধক ছিলেন। কোয়াই নদীর তীরে নির্জ্জনে তিনি সাধনা করিতেন। কিংবদন্তী

রাত্রিকালে একবার চন্দ্রকিরণের মত উজ্জ্বল জ্যোতি আকাশ হইতে তাঁহার কুটিরে প্রবেশ করে। তখন হইতে তিনি "কুতুব-উল-আউলিয়া" নামে পরিচিত হন এবং তাঁহার বাসস্থানের নাম হয় "চন্দ্রচুরি"। মৃত্যুর পর তাঁহাকে নরপতির নিকটবর্ত্তী মুড়ারবন্দ নামক স্থানে খোয়াই নদীর তীরে সমাহিত করা হয়। এই স্থান "কুতুবের দরগাহ" বা "মুড়ারবন্দের দরগাহ" নামে অভিহিত। দরগাহটি দৈর্ঘ্যে সিকি মাইল। এই স্থানে আরও বহু পীর প্রভৃতির শতাধিক কবর আছে। বহু দূর হইতে মুসলমান ভক্তগণ এই দরগাহে জিয়ারত করিতে আসেন।

কুতব-উল-আউলিয়ার প্রপৌত্র গদাহাসনও একজন প্রসিদ্ধ সাধক ছিলেন। [পৈল দ্রষ্টব্য]।

হবিগঞ্জ বাজার—হবিগঞ্জ শ্রীহট্ট জেলার অন্যতম মহকুমা ও একটি বাণিজ্য প্রধান স্থান। এখানে একটি কলেজ আছে। এই স্থানও প্রাচীন তরফ রাজ্যের অন্তর্গত।

পৈল—হবিগঞ্জ স্টেশনের নিকটস্থ পৈল গ্রামের পীর বাদশাহের প্রাচীরবেষ্টিত দরগাহ সুপ্রসিদ্ধ। তরফের মুসলমান রাজবংশের প্রসিদ্ধ সাধক কুতুব-উল-আউলিয়া সাহেবের প্রপৌত্র সৈয়দ নুরিও একজন উচচ শ্রেণীর সাধক ছিলেন। তিনি পৈতৃক বাসস্থান নরপতি ছাড়িয়া পৈলে আসিয়া বাস করেন এবং দিল্লী হইতে নিজ নামে "নুরুল হাসান নগর" পরগণা খারিজ করিয়া লইয়াছিলেন। কথিত আছে, কুতুব-উল-আউলিয়ার পবিত্র সমাধির পার্শ্বে কাহার শব সমাহিত হইবে ইহা লইয়া সৈয়দ শাহ নুরির সহিত তাঁহার পিতৃব্যপুত্র বিখ্যাত সাধক গদাহাসনের বিবাদ ঘটে এবং মীমাংসার জন্য উভয়ে দিল্লী গমন করেন। দিল্লীশ্বরের বিচারে শাহ নুরিরই জয় হয় এবং তাঁহার মৃত্যুর পর নরপতির নিকটবর্ত্তী কুতুব-উল-আউলিয়ার কবরের পার্শ্বে তাঁহাকে সমাহিত করা হয়। সৈয়দ শাহ নুরির বংশের পীর বাদশাহ একজন উচচস্তরের সাধক ছিলেন। তিনি ইরাণী ভাষায় "গঞ্জতরাজ" নামক তত্ত্ববিষয়ক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। পৈলে তাঁহার দরগাহ মুসলমান সমাজে বিশেষ সম্মানিত। লোকের বিশ্বাস যে অনাবৃষ্টির সময়ে পীর বাদশাহের কবরের উপর তাঁহার বংশজ কেহ যদি ১০১ কলসী জল ঢালেন তাহা হইলে বৃষ্টি হইবে।

পৈলের সৈয়দগণ বিদ্যানুরাগের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। পীর বাদশাহের অতিবৃদ্ধ প্রপৌত্র ইরাণ ভাষায় স্বপ্নফল সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই বংশের অনেকে দিল্লীর বাদশাহাজাদা-দিগের শিক্ষকতা করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত। দিল্লী হইতে আগত শাহ আমন উদ্দীন নামক জনৈক বিদ্বান্ ব্যক্তি এই বংশে বিবাহ করেন। তাঁহার বংশজ রেহান উদ্দীন ইরাণী ভাষায় সুন্দর কবিতা রচনা করিতেন, ইহার কবিতা শুনিয়া দিল্লীর সম্রাট্ ইহাকে "বুলবুল বাঙ্গালা" উপাধিতে ভূষিত করেন।

বিথঙ্গল—হবিগঞ্জ মহকুমায় স্থিত বিথঙ্গল গ্রামে শ্রীহট্ট জেলার বৃহত্তম বৈষ্ণব আখড়া অবস্থিত। এই আখড়ায় ইহার প্রতিষ্ঠাতা রামকৃষ্ণ গোসাইএর সমাধি আছে, কোনও মূর্ত্তি নাই। ইনি জগন্মোহিনী নামক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের লোক। এই সম্প্রদায়ের লোকেরা গৃহত্যাগী বৈরাগী এবং গুরুকে সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম জ্ঞানে পূজা করিয়া থাকেন। এক কালে ইহারা তুলসীপত্র বা গোময় ব্যবহার করিতেন না; এই কারণে বৃন্দাবনে নানারূপ আপত্তি উঠে। এখন ইহারা বৈষ্ণবদিগের সাধারণ রীতি অনেক মানিয়া থাকেন। এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা জগন্মোহনের সমাধি হবিগঞ্জের নিকটবর্ত্তী মস্থুলিয়া গ্রামে অবস্থিত। মস্থুলিয়ার আখড়া হইতে বিথঙ্গলের আখড়া অনেক বড়। এই আখড়ার বহু ভূসম্পত্তি আছে।

হবিগঞ্জ হইতে বিথঙ্গল প্রায় ১২ মাইল। শ্রীহট্ট হইতে স্টীমারযোগেও যাওয়া যায়।

বাণিয়াচঙ্গ—হবিগঞ্জ হইতে জলসুখা পর্য্যন্ত যে রাস্তা গিয়াছে উহার উপর হবিগঞ্জ হইতে প্রায় ১৬ মাইল দুরে বাণিয়াচঙ্গ অবস্থিত। ইহার পরিমাণ প্রায় ৮ বর্গ মাইল এবং লোকসংখ্যা প্রায় ৩০,০০০। ইহাকে ভারতের বৃহত্তম গ্রাম বলিয়া দাবী করা হয়। বস্তুতঃ ইহা একটি নগরের সমান। ইহার চারিদিক পরিখা ও মাটির পাচীল দিয়া ঘেরা এবং দূর হইতে ইহাকে একটি প্রকাণ্ড পাহাড়ের মত মনে হয়।

বাণিয়াচঙ্গের প্রতিষ্ঠাতা কেশব মিশ্র কান্যকুব্জ হইতে বাণিজ্য সূত্রে এ অঞ্চলে আগমন করেন বলিয়া কথিত। জনশ্রুতি যে একটি পাষাণময়ী কালীমূর্ত্তি লইয়া নৌকায় সাগর সমান হাওরে চলিতে চলিতে দেবীর দৈনিক পূজার জন্য শুষ্ক ভূমি না পাইয়া চিন্তিত হইয়া পড়েন; এমন সময়ে সন্ধ্যার পূর্ব্বে একটি ভূমি দেখিতে পাইয়া তথায় দেবীর সিংহাসন স্থাপন করিয়া সে দিনের পূজা সমাপন করেন। কিন্তু তথা হইতে কালীমূর্ত্তিকে কিছুতেই উঠাইতে না পারায়, দেবীর ইচ্ছা মনে করিয়া তিনি ঐ স্থানেই বাস করিতে আরম্ভ করেন। কেশবের কর্ম্মচারী একজন বণিক জাতীয় বা বাণিয়া থাকায় এবং চঙ্গ জাতীয় মাঝি এই দুইটি মিলিয়া স্থানটির নাম বাণিয়াচঙ্গ হইয়াছে বলিয়া কথিত। কেহ বা বলেন যে এই স্থানটি বাণিয়া বা ব্যবসায়ীর পক্ষে চঙ্গ অর্থাৎ সুন্দর এই ভাবিয়া বণিক কেশব মিশ্র এই স্থানটির নামকরণ করেন বাণিয়াচঙ্গ। কেশব মিশ্র কান্যকুব্জ হইতে অনেক লোক আনাইয়া এই স্থানে বাস করিতে দেন এবং ক্রমে নিজ আধিপত্য বিস্তার করিয়া এই স্থানের রাজা হইয়া বসেন। কেশব মিশ্রের বংশের পদ্মনাভ রাজ্য অনেক বাড়াইয়াছিলেন। বাণিয়াচঙ্গের প্রকাণ্ড পুষ্করিণী সাগরদীঘি তিনিই খনন করাইয়াছিলেন। তিনি প্রজাদিগের জন্য এক হাজার দীঘি খনন করাইয়াছিলেন; এই জন্য তিনি খাঁ উপাধিতে ভূষিত হন এবং মুক্ত হস্তে দানের জন্য তিনি আজও কর্ণ খাঁ নামে পরিচিত।

পদ্মনাভের একাদশ পুত্রের মধ্যে কনিষ্ঠ শক্তিমান গোবিন্দ খাঁ সিংহাসনে আরোহণ করেন।

বাণিয়াচঙ্গ রাজ্যের উত্তরে শ্রীহট্টের উত্তর-পশ্চিম অংশে প্রাচীন কালে লাউড় নামে রাজ্য অবস্থিত ছিল। লাউড় রাজবংশ লোপ পাইলে প্রজাগণ খাসিয়াদিগের আক্রমণে অতিষ্ঠ হইয়া বাণিয়াচঙ্গ অধিপতি গোবিন্দ খাঁর সাহায্য প্রার্থনা করেন। গোবিন্দ খাঁ লাউড় অধিকার করিয়া উহার রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করেন। খাসিয়ারা পাহাড়ে পলাইয়া যায়। গোবিন্দ খাঁ লাউড় রাজ্য ভোগ করিতে থাকিলে তাঁহার সহিত প্রতিবেশী ক্ষুদ্র রাজ্য জগন্নাথপুরের রাজা জয়সিংহের বিবাদ বাধে। জগন্নাথপুর হবিগঞ্জের প্রায় ২০ মাইল উত্তরে। জগন্নাথপুর ও লাউড় রাজ-বংশীয়দের মধ্যে কোন বিভাগ ছিল না। সুতরাং লাউড় রাজ্য হইতে বঞ্চিত হইয়া জয়সিংহ অত্যন্ত রুষ্ট হইলেন এবং দিল্লী গিয়া সম্রাটের নিকট আবেদন করিলেন। সম্রাট সমস্ত শুনিয়া দূত পাঠাইয়া গোবিন্দ খাঁকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। কথিত আছে গোবিন্দ খাঁ এই আজ্ঞা শুনিলেন না এবং দূত ক্রুদ্ধ গোবিন্দ খাঁর পদাঘাতে প্রাণত্যাগ করে। তখন তাঁহাকে ধরিবার জন্য দিল্লী হইতে সৈন্য আসিল। এই সময়ে গোবিন্দ খাঁ বাণিয়াচঙ্গের চতুর্দ্দিকে মৃৎপ্রাচীর তুলিয়া নগর রক্ষার ব্যবস্থা করেন। সম্রাট-সেনাপতি গোবিন্দ খাঁকে পরাজিত করিতে না পারিয়া মণিকারের ছদ্মবেশে নিকটস্থ আজমীরগঞ্জে উপস্থিত হইলেন এবং কৌশলে গোবিন্দ খাঁকে মণি দেখাইবার ছলনায় নিজ নৌকায় লইয়া আসিয়া তাঁহাকে আবদ্ধ করিয়া দিল্লী লইয়া যান। গোবিন্দ খাঁর প্রাণদণ্ডের আদেশ

হয়। এই সময় ন্যায় বিচার প্রার্থী জয়সিংহও নজরবন্দী অবস্থায় দিল্লীতে ছিলেন এবং তিনি তাঁহার অপর নাম গোবিন্দ সিংহ নামে লাউড়ের রাজা বলিয়া পরিচিত ছিলেন। ভুলক্রমে গোবিন্দ খাঁর স্থলে গোবিন্দ সিংহ বা জয়সিংহ নির্দ্দিষ্ট দিনে ঘাতকের হস্তে প্রাণ হারাইলেন। এই ভুল ধরা পড়িলে, ইহাতে ঈশ্বরের ইচ্ছা আছে মনে করিয়া সম্রাট গোবিন্দ খাঁর প্রাণদণ্ডের আদেশ রহিত করিলেন। গোবিন্দ খাঁ মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া হবিব খাঁ নাম লইয়া নিজ রাজ্যে ফিরিয়া আসিলেন। কথিত আছে বাণিয়াচঙ্গের ব্রাহ্মণ রাজবংশ এই সময় হইতেই মুসলমান হন। তাঁহার স্ত্রী মর্ম্মাহত হইয়া রাজবাটী ছাড়িয়া অন্য একটি বাড়ীতে বাস করিতে লাগিলেন। সেই বাড়ীর সম্মুখের দীঘি "ঠাকুরাণীর দীঘি" নামে আজও পরিচিত। ধর্ম্মান্তর গ্রহণের পর রাণীর মনঃকষ্ট লাঘবের জন্য রাজা অধিকাংশ সময়ে বাণিয়াচঙ্গ হইতে দূরে লাউড়েই বাস করিতেন।

লাউড়ের জঙ্গলে বহু প্রকোষ্ঠ সহ একটি বৃহৎ দুর্গের ধ্বংসাবশেষ আছে। ইহা বানিয়াচঙ্গের "হাবিলি" নামে পরিচিত। উত্তর দিকে খাসিয়া আক্রমণ নিবারণের জন্য গোবিন্দ খাঁ বা হবিব খাঁর পৌত্র আনওয়ার খাঁ ইহা নির্ম্মাণ করেন। ইহাতে প্রায় ৫০০ সৈন্য থাকিতে পারিত। আনওয়ার খাঁ মুর্শিদকুলি খাঁর নিকট হইতে দেওয়ান উপাধি পান। তখন হইতে বানিয়াচঙ্গের অধিপতিরা দেওয়ান উপাধিতে পরিচিত।

এই বংশের দেওয়ান উমেদরাজার সময়ে লাউড় রাজ্য তাঁহাদের হস্তচ্যুত হয়। উমেদরাজা অত্যন্ত দানশীল ও জনহিতৈষী ছিলেন ; এখনও পর্য্যন্ত এ অঞ্চলের কৃষকেরা বিপদে আপদে দেওয়ান উমেদ রাজার "দোহাই" দিয়া থাকে। দেওয়ান উমেদ রাজার পুত্র দেওয়ান আলমরাজা সরল প্রকৃতি এবং অমিতব্যয়ী ছিলেন। তাঁহার বিষয়ে নানারূপ গল্প শুনা যায়। এখনও বোকা এবং অপব্যয়ী লোককে এ অঞ্চলে "আলম বেটপা" আখ্যা দেওয়া হয়।

বাণিয়াচঙ্গের মকরন্দ রায় ও নরনারায়ণ ভট্ট ব্রজবুলিতে সুন্দর সুন্দর কবিতা লিখিতেন। এখনও স্থানীয় লোকে এই সকল কবিতা আগ্রহের সহিত শোনে।

সাতগাঁও—আখাউড়া জংশন হইতে ৫০ মাইল দূর। স্টেশনের উত্তরেই সাতগাঁও ও বিষগাঁয়ের পাহাড়ে অনেক চা বাগান আছে। এই স্টেশন হইতে প্রায় তিন মাইল দক্ষিণে নির্ম্মাই দীঘি নামে একটি সরোবর ও নির্ম্মাই শিব বা বাণেশ্বর শিব নামক একটি শিবমন্দির আছে। এখানে বারুণী, শিবরাত্রি ও অশোকাষ্টমীর সময় মহামেলা হয়।

নির্ম্মাই ও হির্ম্মাই নামক দুইজন রূপবতী ত্রিপুর রাজকুমারী পিতার নির্ব্বাচিত পাত্রকে বিবাহ করিতে অস্বীকৃত হওয়ায় রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত হন। কথিত আছে, খৃষ্টাব্দের পঞ্চম শতকে তাঁহারা দুই ভগিনী শ্রীহট্ট জেলার বলিশিরা পর্ব্বতে আসিয়া বাস করেন ও এই শিবমন্দির ও সরোবর প্রতিষ্ঠা করেন। স্থানটি অতি সুরম্য। বারুণী ও অশোকাষ্টমীতে বহুলোক শিব দর্শনে আসেন। বলিশিরা বা বড়শীজোড়া পাহাড় উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ২২ মাইল ও প্রস্থে ৪ মাইল। ইহার শৃঙ্গের নাম চূড়ামণি টিলা এবং উহা ৭০০ ফুট উচ্চ। এই পাহাড়েও অনেক চা বাগান আছে।

শ্রীমঙ্গল—আখাউড়া জংশন হইতে ৫৫ মাইল দূর। ইহা একটি প্রসিদ্ধ কারবারের স্থান। এখানে বহু মহাজনের আড়ত ও ব্যাঙ্ক আছে।

এখানে নামিয়া শ্রীহট্ট জেলার অন্যতম মহকুমা মৌলবীবাজার যাইতে হয়। স্টেশনে মোটর ও ঘোড়ার গাড়ী পাওয়া যায়। শ্রীমঙ্গল স্টেশন হইতে মৌলবীবাজার ১৪ মাইল পথ। মৌলবীবাজার শহর মনু নামক নদীর তীরে অবস্থিত।

মৌলবীবাজারের নিকটে ষাঁড়ের গজ বা লংলার পাহাড় নামে একটি পাহাড় এবং হাইল হাওর নামে একটি প্রকাণ্ড হ্রদ আছে। পাহাড়ের আকৃতি বৃষের ককুদের মত বলিয়া "ষাঁড়ের গজ" নাম হইয়াছে। ইহা উচ্চতায় ১১০০ ফুট।

ভানুগাছ—আখাউড়া জংশন হইতে ৬২ মাইল। পূর্ব্বে ইহার নিকটবর্ত্তী অঞ্চল ইটা নামক একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। পশ্চিমদেশ হইতে আগত নিধিপতি নামক এক ব্যক্তি এই রাজ্যের স্থাপয়িতা বলিয়া কথিত। নিধিপতি "ভূমিউড়া-এও-লাতলি" গ্রামে তাঁহার রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার "সপ্তপার দীঘি" এখনও তথায় বর্ত্তমান। কিংবদন্তী নিধিপতি পশ্চিমের ইটোয়া বা ইটা হইতে আসিয়াছিলেন বলিয়া রাজ্যের নাম ইটা রাখেন। এই বংশে শুভরাজ খাঁ ইরাণী ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং দীঘি খনন প্রভৃতি নানা লোকহিতকর কাজ করিয়াছিলেন বলিয়া দিল্লীর সম্রাটের নিকট হইতে খাঁ উপাধি লাভ করেন। তিনি ভানুগাছ হইতে প্রায় ১২ মাইল উত্তরে বর্ত্তমান পাচগাঁওএর দক্ষিণে ও এওলাতলির পূর্ব্বদিকে একটি প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন। সেই স্থান এখনও রাজখলা বলিয়া পরিচিত এবং তথায় শুভরাজ খা বা সুরাজ খাঁর দীঘি নামে খ্যাত তাঁহার প্রতিষ্ঠিত দীঘি এখনও বর্ত্তমান। শুভরাজ খাঁর পুত্র ভানুনারায়ণ বল বিক্রমে প্রসিদ্ধ ছিলেন। ত্রিপুরা রাজ্যের অধীন সামন্তরাজা চন্দ্রসিংহ বিদ্রোহী হইলে ভানুনারায়ণ তাঁহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া বন্দী অবস্থায় ত্রিপুরাধিপতির নিকট অর্পণ করেন। মহারাজা সন্তুষ্ট হইয়া ভানুনারায়ণকে রাজা উপাধিতে ভুষিত করেন এবং চন্দ্রসিংহের অধিকৃত ভূমির কিছু অংশ তাঁহাকে অর্পণ করেন। এই ভূমিখণ্ড তাঁহারই নামানুসারে ভানুকচ্ছ বা ভানুকাছ ও অধুনা ভানুগাছ নামে পরিচিত হয়। প্রকৃতপক্ষে ভানুনারায়ণই ইটার প্রথম রাজা। তিনি এওলাতলি ও পাঁচগাঁওএর ৪।৫ মাইল দক্ষিণে রাজনগর নামে নূতন রাজধানী স্থাপন করেন।

ভানুনারায়ণের পুত্র রাজা সুবিদনারায়ণ প্রভাব প্রতিপত্তিশালী শাসক ছিলেন। রাজনগরে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত "সাগর দীঘির" মত বড় দীঘি শ্রীহট্ট জেলায় বেশী নাই। সুবিদনারায়ণের প্রথমা কন্যা রত্নাবতী খঞ্জা ছিলেন। তাঁহার সহিত প্রসিদ্ধ পণ্ডিত গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর জ্যেষ্ঠ পুত্র রঘুপতির বিবাহ হয়। এই বিবাহে রঘুপতির মাতার অমত থাকায় তিনি কনিষ্ঠ পুত্র বালক রঘুনাথকে লইয়া নবদ্বীপ চলিয়া যান। অনেকে বলিয়া থাকেন এই রঘুনাথই নবদ্বীপের বিখ্যাত পণ্ডিত রঘুনাথ শিরোমণি। রাজা সুবিদনারায়ণের সহিত শ্রীহট্টের দেওয়ান আনন্দ নারায়ণের মনোমালিন্য ঘটে এবং তাঁহার প্ররোচনায় দিল্লীশ্বরের আজ্ঞায় খোয়াজ ওস্মান রাজনগর আক্রমণ করেন। শত্রুপক্ষ রাজবাটি অবরোধ করে। ভীষণ যুদ্ধে সুবিদনারায়ণ বীরের ন্যায় নিহত হন। রাণী কমলাসুন্দরী সহমরণে যান এবং কনিষ্ঠা রাজকুমারী ভানুমতী বিষপান করিয়া মৃত্যুকে বরণ করেন। রাজপুত্রগণ ধৃত হইয়া দিল্লীতে প্রেরিত হন। তথায় তাঁহারা ইস্লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং খাঁ উপাধি প্রাপ্ত হন। তাঁহারা ইটায় প্রত্যাগমন করিয়া পিতৃ সম্পত্তির বহু অংশ ফিরাইয়া পান।

টিলাগাঁও—আখাউড়া জংশন হইতে ৭২ মাইল দূর। টিলাগাঁও হইতে প্রায় ১০ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে শ্রীহট্ট জেলার সীমানার বাহিরে পার্ব্বত্য ত্রিপুরা রাজ্যে **উনকোটি তীর্থ**

অবস্থিত। এই স্থানে অসংখ্য দেবমূর্ত্তি পড়িয়া আছে। উনকোটি পাহাড়ের চূড়ায় কতকগুলি পাথরের মূর্ত্তি এবং পাহাড়ের পশ্চিম গায়ে কতকগুলি খোদাই করা মূর্ত্তি বর্ত্তমান। পর্ব্বত গাত্র ধসিয়া পড়ায় অনেক মূর্ত্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। খোদাই করা মূর্ত্তিগুলির মধ্যে একটি সুবৃহৎ মহাদেবের মূর্ত্তি দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। মূর্ত্তিটি এত বড় যে ইহার কান দুটি কপাটের ন্যায় এবং কানের কুণ্ডল দুখানি ঢালের ন্যায়। গোঁফের এক দিক ভগ্ন এবং অপর দিক প্রায় দেড় হাত পরিমিত হইবে। মূর্ত্তির হাতে ত্রিশূল ও সম্মুখে দুটি প্রকাণ্ড বৃষ বর্ত্তমান। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই তীর্থ কালাপাহাড়ের হাতে লাঞ্ছিত হয় বলিয়া কথিত। এখন আর এই তীর্থে কোনও পূজার ব্যবস্থা নাই। কিন্তু এককালে ইহা একটি প্রসিদ্ধ তীর্থ ছিল। রাজমালা পাঠে জানা যায় ত্রিপুররাজ বিজয়মাণিক্য উনকোটি দর্শনে গিয়াছিলেন। ইহা ত্রিপুর রাজবংশের কীর্ত্তি।

কৈলাসহর—উনকোটি তীর্থ হইতে ৬ মাইল পশ্চিমে। ইহা পার্ব্বত্য ত্রিপুরার এক ক্ষুদ্র শহর। কাতলের দীঘি নামক একটি দীঘি ঘিরিয়া এই শহরটি অবস্থিত। বর্ত্তমান কৈলা সহরের ৪ মাইল উত্তরে ত্রিপুর রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী কৈলাসগড় অবস্থিত ছিল; এই স্থান এখন জঙ্গলাবৃত। ভগ্ন রাজবাড়ীর দক্ষিণদিক দিয়া প্রাচীন রাজসড়ক হাকালুকি হাওর পর্য্যন্ত গিয়াছে। নিকটস্থ একটি পুষ্করিণী আজও "রাজার দীঘি" নামে খ্যাত। রাজসড়কের পূর্ব্বদিকে দুইটি মাটির স্তূপের চিহ্ন "কামান দাগার জান" নামে পরিচিত। কাতলদীঘি সম্বন্ধে গল্প আছে যে কাতল ও কাকচান্দ দুই ভাই একবার কার্য্য ব্যপদেশে বিদেশে গিয়াছিলেন। কাতলের প্রচুর নগদ টাকা ছিল আর কাকচান্দের ছিল গোলা ভরা ধান। দুই ভাই যখন বিদেশে তখন দেশে ভীষণ অন্নাভাব ও দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। কাতলের স্ত্রীর হাতে নগদ টাকা থাকিলেও ধান ও চাউলের অভাবে তাঁহাকে উপবাসী থাকিতে হয়। কাকচান্দের স্ত্রীর নিকট সাহায্য চাহিয়া তিনি বিফল ও তিরস্কৃত হইলেন। শেষে উপবাস ও অনশনে তাঁহার মৃত্যু হয়। কাতল ঘরে ফিরিয়া সমস্ত শুনিলেন এবং দুঃখে কাতর হইয়া সমস্ত নগদ টাকা সমেত এই দীঘিতে ডুবিয়া মৃত্যু বরণ করিলেন। কিছুকাল পরে কাকচান্দ ফিরিয়া সমস্ত কথাই শুনিলেন এবং তাঁহার গোলাভরা ধান থাকিতে এইরূপ ঘটনা ঘটায় ক্ষুব্ধ হইয়া গোলা ভাঙ্গিয়া সমস্ত ধান দীঘির জলে ফেলিয়া দিলেন এবং নিজে উহার জলে ডুবিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

কুলাউড়া জংশন—আখাউড়া জংশন হইতে ৮০ মাইল দূর। কুলাউড়া শ্রীহট্ট জেলার একটি বাণিজ্য কেন্দ্র। এখান হইতে একটি শাখা লাইন ভট্টপাঠক ও ফেঞ্চুগঞ্জ হইয়া ৩০ মাইল দূরবর্ত্তী সিলেট বাজার বা শ্রীহট্ট পর্য্যন্ত গিয়াছে।

ভট্টপাঠক—কুলাউড়া জংশন হইতে ৯ মাইল। ইহার চলিত নাম ভাটেরা। এখানকার হোমের টিলায় আট ফুট নীচে মাটি হইতে বহু প্রাচীন কালের রাজা কেশব দেব ও তৎপুত্র ঈশান দেবের দুইখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাতে একটি রাজবংশের ও পাঁচজন রাজার গুণকীর্ত্তি লিখিত আছে।

ভাটেরার প্রায় ৩ মাইল পূর্ব্বে হাকালুকি নামক সুবৃহৎ হাওর অবস্থিত।

ফেঞ্চুগঞ্জ—কুলাউড়া জংশন হইতে ১৬ মাইল দূর। ইহা কুশিয়ারা নামক নদীর তীরে অবস্থিত। ইহা একটি প্রসিদ্ধ কারবারের স্থান।

সিলেট বাজার—কুলাউড়া জংশন হইতে ৩০ মাইল। সিলেট বা শ্রীহট্ট শহরটি সুরমা নদীর তীরে অবস্থিত। ইহা একটি বিখ্যাত বাণিজ্যকেন্দ্র। এখানে মুরারিচাঁদ কলেজ নামক একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজ, চারটি হাই স্কুল, একটি সংস্কৃত কলেজ, একটি বড় মাদ্রাসা, একটি মেডিক্যাল স্কুল ও দুইটি বালিকা বিদ্যালয় আছে। শ্রীহট্ট অতি পুরাতন স্থান। প্রাচীন তন্ত্রগ্রন্থাদিতে ইহার উল্লেখ আছে।

শ্রীহট্ট জেলায় প্রাচীনকালে তিনটি প্রধান খণ্ডরাজ্য ছিল, যথা—

১ গৌড়, বাংলার প্রসিদ্ধ গৌড়ের নামানুসারে এই রাজ্যটি শ্রীহট্ট শহরকে ঘিরিয়া বহুদূর অবধি বিস্তৃত ছিল এবং গৌড়ের রাজাই ছিলেন সর্ব্বপ্রধান।

২ লাউড়, গৌড়ের পশ্চিমে এবং শ্রীহট্ট জেলার উত্তর-পশ্চিমাংশ ব্যাপিয়া।

৩ জয়ন্তীয়া ; শ্রীহট্ট জেলার উত্তর-পূর্ব্বাংশ ব্যাপিয়া ; ইহা ছাড়া পার্ব্বত্য জয়ন্তীয়াও এই রাজ্যের অন্তর্গত ছিল।

এই তিনটি ছাড়া পূর্ব্বে উল্লিখিত তরফ ও ইটা নামক দুইটি ক্ষুদ্র রাজ্য এবং শ্রীহট্ট জেলার পূর্ব্বভাগে অবস্থিত অপর একটি ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতাপগড় মুসলমান আমলে গৌড়ের অংশ বলিয়া পরিগণিত হইত।

খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে শ্রীহট্টে গৌড়-গোবিন্দ নামে এক রাজা ছিলেন। কাহারও কাহারও মতে শ্রীহট্টের গৌড় রাজ্যের রাজাদের সাধারণ উপাধি "গোবিন্দ" ছিল। যাহা হউক কিংবদন্তী অনুসারে গৌড়-গোবিন্দ সমুদ্রের সন্তান। বর্ত্তমান শ্রীহট্ট শহরের গড়দুয়ার পল্লীতে গৌড়-গোবিন্দের দুর্গ ছিল বলিয়া কথিত এবং তথায় রাজবাটীর ভগ্নাবশেষের কিছু কিছু চিহ্ন এখনও বিদ্যমান আছে। শহরের অন্তর্গত "মনারায়ের টিলা" ও "টিলাগড়েও" গৌড়-গোবিন্দের গড় ছিল বলিয়া কথিত।

রাজা গৌড়-গোবিন্দের সময়ে "চক্রদত্ত" গ্রন্থপ্রণেতা, সুশ্রুতের টীকাকার প্রসিদ্ধ চিকিৎসক চক্রপাণি দত্ত শ্রীহট্টে আসিয়াছিলেন বলিয়া কথিত। রাজা গৌড়-গোবিন্দের উদরে কঠিন পীড়া হইলে যখন স্থানীয় চিকিৎসকগণ কোনই উপশম করিতে সক্ষম হইলেন না, তখন তিনি চক্রপাণি দত্তকে আনিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। জরাগ্রস্ত চিকিৎসক সেই বয়সে গঙ্গাকূল ছাড়িয়া গঙ্গাহীন শ্রীহট্টে আসিতে রাজী হইলেন না। রাণী তখন তাঁহার সমস্ত অলঙ্কার খুলিয়া একটি বাক্সে বন্ধ করিয়া বৃদ্ধ বৈদ্যের নিকট পাঠাইয়া নিবেদন জ্ঞাপন করিলেন যে কবিরাজ মহাশয় যখন আসিলেন না, মহারাজের আরোগ্যের তখন কোনই আশা নাই। এ অলঙ্কারে তাঁহার প্রয়োজন নাই, তিনি তাহা আর পরিবেন না এবং তিনি রাজার অনুগামী হইবেন বলিয়া কৃতসঙ্কল্প। এই বার্ত্তা শুনিয়া দয়াপরবশ হইয়া চক্রপাণি দত্ত পুত্রগণসহ শ্রীহট্টে আসিলেন। তাঁহার চিকিৎসায় রাজা আরোগ্য লাভ করিলে পর জ্যেষ্ঠ পুত্র সহ তিনি পুনরায় গঙ্গাতীরে স্বীয় স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। অপর দুই পুত্র মহীপতি ও মুকুন্দ শ্রীহট্টে রহিয়া গেলেন। রাজা তাঁহাদিগকে বহু ভূসম্পত্তি দিয়া সম্মান করিলেন।

গৌড়-গোবিন্দ প্রসিদ্ধ বীর ছিলেন। তাঁহার নানারূপ অসাধারণ ক্ষমতা ছিল, যথা, শুধু শব্দ শুনিয়া দূর হইতে লক্ষ্যভেদ করিতে পারিতেন। এই সকল কারণে তাঁহার যাদুবিদ্যায় পারদর্শী বলিয়া প্রসিদ্ধি ছিল।

কথিত আছে, গৌড়-গোবিন্দের রাজত্বকালে শ্রীহট্টের বুলটিকর নিবাসী বুরহানউদ্দীন নামক এক ব্যক্তি পুত্রজন্মোপলক্ষে গোহত্যা করেন; দুর্ভাগ্যক্রমে একটি চিল একখণ্ড মাংস রাজগৃহে নিক্ষেপ করে। রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া বুরহান উদ্দীনের হাত কাটিয়া দেন ও তাঁহার শিশুপুত্রকে নিহত করেন। এই সময়ে তরফেও গোবধের জন্য নুর উদ্দীন নামক এক ব্যক্তি নিহত হন বলিয়া কথিত। বুরহান উদ্দীন প্রতিশোধের জন্য সুবর্ণগ্রামের রাজা প্রতাপশালী শামস্ উদ্দীন ইলিয়াস খাজের শরণ লইলেন; তিনি এক দল সৈন্য গৌড়-গোবিন্দের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। এই সৈন্যদল পরাজিত হইয়া পলায়ন করে। তখন বুরহান উদ্দীন ও নুর উদ্দীনের ভ্রাতা দিল্লী গিয়া তোগলক বংশীয় সম্রাট আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহের নিকট সমস্ত ঘটনা নিবেদন করিলেন। সম্রাট নিজ ভাগিনেয় সিকন্দর শাহ গাজীর অধীনে একদল সৈন্য গৌড়-গোবিন্দের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। বর্ষাগমে শ্রীহট্টে পৌছাইলে এই সৈন্যদল পীড়িত হইয়া পড়ে। তাহারা ভয় পাইয়া মনে করে ইহা গৌড়-গোবিন্দের যাদুবিদ্যার কাজ। সিকন্দর আর একদল সৈন্য আনিলে তাহারাও গৌড়-গোবিন্দের যাদুবিদ্যার প্রভাব শুনিয়া ভীত হইয়া পড়িল। সম্রাট্ ভাগিনেয় তখন শ্রীহট্ট জয়ের আশা ত্যাগ করিলেন। বুরহান উদ্দীন বিষন্ন মনে দেশ ত্যাগ করিয়া মদিনা যাইবার পথে দিল্লীতে উপস্থিত হইলে প্রসিদ্ধ দরবেশ হজরত শাহজলালের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। বুরহান উদ্দীনের মুখে সমস্ত ঘটনা শুনিয়া হজরত শাহজলাল ইহার প্রতীকারকল্পে বুরহান উদ্দীনের সহিত নিজ দলবল লইয়া শ্রীহট্টের দিকে যাত্রা করিলেন। ইতিমধ্যে সম্রাট সিকন্দর সাহের পরাজয়ের কথা শুনিয়া বোগদাদ হইতে আগত নসীরুদ্দীন নামক একজন পীরকে সিপাই সালার বা সেনাপতি নিযুক্ত করিয়া এক সহস্র অশ্বারোহী ও তিন সহস্র পদাতিক সৈন্যসহ শ্রীহট্টে প্রেরণ করিলেন। পথিমধ্যে এলাহাবাদে উভয়দলের সাক্ষাৎ হইল, পরাজিত সিকন্দার গাজীও এইখানে তাঁহাদের সঙ্গে মিলিলেন। পীর নসীরউদ্দীন সিপাই সালার ও সিকন্দর গাজী হজরত শাহজলালের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। সম্মিলিত দল ব্রহ্মপুত্র তীরে পৌছাইলে তাঁহারা যাহাতে পার হইতে না পারেন সেই জন্য গৌড়-গোবিন্দ নৌকা চলাচল বন্ধ করিয়া দিলেন। কথিত আছে শাহজলালের অলৌকিক ক্ষমতা বলে দলের সকলে নমাজ পড়িবার জন্য ব্যবহৃত নিজ নিজ চর্ম্মাসন জলে ভাসাইয়া তাহা ধরিয়া ব্রহ্মপুত্র পার হইলেন। গৌড়-গোবিন্দ জানিতে পারিলেন না, কেমন করিয়া তাঁহারা পার হইলেন। হবিগঞ্জের নিকটবর্ত্তী দিনাজপুর পরগণায় অবস্থিত চৌকি নামক স্থানে শত্রুপক্ষকে বাধা দিবার জন্য গৌড়-গোবিন্দ অগ্নিবাণ প্রয়োগ প্রভৃতি কৌশল অবলম্বন করেন। কিন্তু ইহাতে বিফল হইয়া তিনি বরাক নদীর খেয়া বন্ধ করিয়া দিলেন কিন্তু শাহজলালের প্রভাবে পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহার দল অনায়াসে নদী পার হইতে সক্ষম হন; এই উপায়ে তাঁহারা সুরমা নদীও পার হইলেন। অনায়াসেই শ্রীহট্ট বিজিত হইল এবং গৌড়-গোবিন্দ পলায়ন করিলেন। ইনিই শ্রীহট্টের শেষ হিন্দু রাজা। শাহজলাল সম্রাট-ভাগিনেয় সিকন্দর গাজীর উপর শ্রীহট্টের শাসন ভার অর্পণ করিলেন।

হজরত মহম্মদ যে বংশে জন্মগ্রহণ করেন, শাহজলাল সেই কুরেশী বংশীয় এবং হজরত মহম্মদ হইতে গুরু পরম্পরায় অষ্টাদশ স্থানীয়। "এমন" তাঁহার জন্মভূমি। শৈশবে মাতাপিতা হারাইয়া তিনি তাঁহার মাতুল সাধক সৈয়দ আহম্মদ কবীরের নিকট মক্কাতে অবস্থান করিতেন। বয়োপ্রাপ্তি হইলে মাতুলের নিকট তিনি ধর্ম্মসাধনার দীক্ষা গ্রহণ করেন। কথিত আছে একদিন একটি হরিণ ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া ভীত হইয়া কবীরের কুটিরে আসিয়া উপস্থিত হয়। শাহজলাল চপেটাঘাতে ব্যাঘ্রকে তাড়াইয়া হরিণকে আশ্রয় দিলেন। ইহা দেখিয়া তাঁহার মাতুল

ডামচেরার নিকটবর্ত্তী একটি পার্ব্বত্যনদীর দৃশ্য (পৃষ্ঠা ১৯২)

হাফ্‌লং হ্রদ (পৃষ্ঠা ১৯৩)
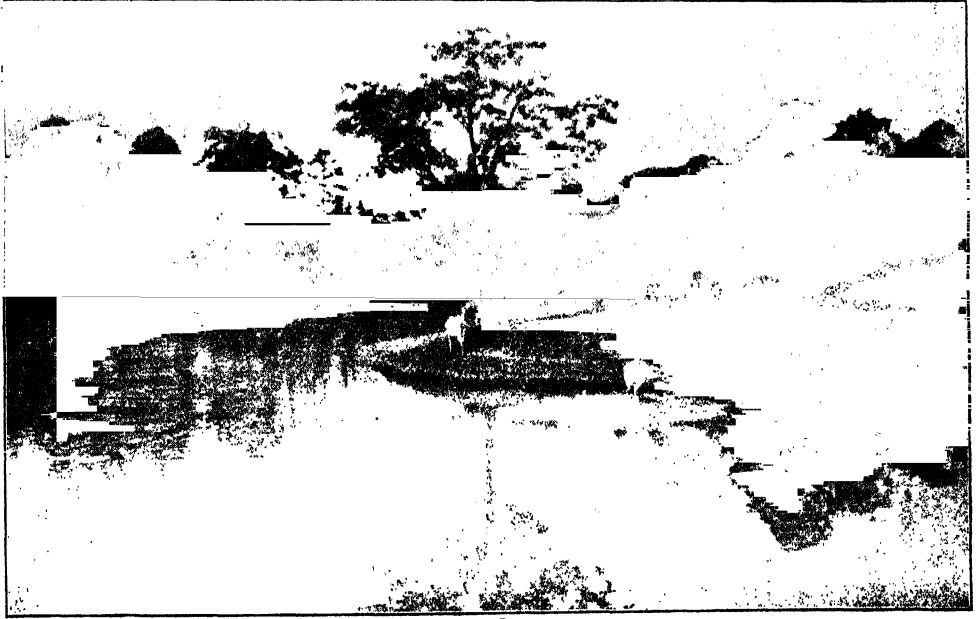
বুঝিলেন যে তাঁহার ভাগিনেয় আধ্যাত্মিক শক্তিতে তাঁহারই সমান হইয়াছেন। তখন ধর্ম্ম প্রচারার্থ তাঁহাকে হিন্দুস্থানের দিকে প্রেরণ করিলেন এবং প্রস্থানের সময়ে নিজ সাধনার স্থান হইতে এক মুঠা মাটি শাহজলালের হাতে দিয়া বলিয়া দিলেন যে ইহা যত্নে রাখিবে এবং যাহাতে ইহার বর্ণ, গন্ধ ও স্বাদ বিকৃত না হয় সেই দিকে লক্ষ্য রাখিবে এবং যে স্থানে ঠিক এইরূপ মাটি পাওয়া যাইবে সেইখানে ইহা ছড়াইয়া দিয়া বাস করিবে। শাহজলাল এই মাটি যত্নের সহিত লইয়া বার জন শিষ্যসহ হিন্দুস্থান অভিমুখে যাত্রা করিলেন। একজন শিষ্যের কাজ হইল পথে যাইতে যাইতে নানাস্থানের মাটি আস্বাদ করিয়া পরীক্ষা করা। এই ব্যক্তির নাম হইল চাস্‌নি পীর। শাহজলাল প্রথমে জন্মস্থান এমন-এ যাইলেন। কথিত আছে এমনের রাজা তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য বিষ মিশ্রিত শরবৎ পান করিতে দেন। শাহজলাল রাজার মতলব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন "ফকিরের পক্ষে ইহা অমৃত কিন্তু দাতার পক্ষে বিষ।" এই বলিয়া শরবৎ পান করিলেন। এদিকে রাজা হঠাৎ প্রাণত্যাগ করিলেন। রাজপুত্র শেখ আলি বৈরাগ্য গ্রহণ করিয়া শাহজলালের সঙ্গ লইলেন। পথে শিষ্য সংখ্যা বাড়িতেই লাগিল। শ্রীহট্ট শহরে যখন পৌঁছিলেন তখন তাঁহার শিষ্য সংখ্যা ৩৬০ জন হইয়াছিল। প্রধানতঃ ইহাদের সাহায্যে শ্রীহট্ট বিজিত হইয়াছিল বলিয়া শ্রীহট্ট "তিন শ ষাট আউলিয়ার মুলুক" বলিয়া পরিচিত।

শ্রীহট্টের মাটি পরীক্ষা করিয়া চাস্‌নিপীর দেখিলেন ইহা বর্ণে, স্বাদে ও গন্ধে পীর আহম্মদ কবীর প্রদত্ত মাটির সমতুল্য। শাহজলালকে ইহা জানাইলে তিনি বুঝিলেন এই স্থানই তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র। শাহজলাল একটি নির্জ্জন ও মনোরম স্থানে মসজিদ নির্ম্মাণ করাইয়া ধর্ম্মসাধনে মনোনিবেশ করিলেন। নিকটস্থ নানাস্থানে তাহার সঙ্গী পীরগণকে পাঠাইয়া মুসলমান ধর্ম্মপ্রচার করিতে লাগিলেন। শ্রীহট্টে ৩০ বৎসর বাসের পর বাষট্টি বৎসর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করেন। তাঁহার মসজিদের পাশেই দেহ সমাহিত করা হয়। শাহজলালের দরগাহ হিন্দু ও মুসলমান সকলেরই মান্য এবং ইহার জন্যই শ্রীহট্ট শহর একটি প্রধান মুসলমান তীর্থে পরিণত হইয়াছে। সরকার এই দরগার জন্য মাসিক একশত টাকা ব্যয়ভার বহন করেন।

শাহজলালের দরগাহে কতকগুলি প্রস্তর লিপি আছে। ইহার বৃহৎ মসজিদটি সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল। শাহজলাল কর্ত্তৃক আনীত একটি উট পাখীর ডিম, তাঁহার "জুলফিকার" নামক তলোয়ার, কাষ্ঠপাদুকা, নমাজের মোসল্লা বা চর্ম্মাসন বহু যত্নে দরগাহে রক্ষিত হইয়াছে। দরগাহে একটি বৃহৎ তাঁমার ডেগ আছে, উহাতে ১০।১২ মণ চাউলের অন্ন পাক করা যায়; ইহার গাত্রে যে ইরাণী কবিতা লিখিত আছে তাহাতে ১১১৫ হিজরী ১৭০৭ খৃষ্টাব্দ খোদিত আছে। কথিত আছে যে ইহা আওরঙ্গজেব প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই দরগাহে শাহজলালের সমাধি ব্যতীত এমন-রাজকুমার শাহাজাদা শেখ আলি প্রভৃতি আরও অনেকের সমাধি আছে। শাহজলালের অনুচরবর্গের অনেকের সমাধি শ্রীহট্ট শহরে অবস্থিত। শহরের গোয়াইপাড়ায় চাসনি পীরের কবর।

সম্রাট আকবরের সময় হইতে শ্রীহট্ট শাসনের ভার আমিল উপাধিধারী কর্ম্মচারীদের উপর ন্যস্ত ছিল। সাধারণে ইহাদের নবাব বলিত। আমিলদের শাসনকাল সাধারণতঃ অল্প ছিল। হরকৃষ্ণ নামক একজন হিন্দুও আমিলপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ইনি নবাব হরকিষণ দাস মনসুর-উল-মুলক বাহাদুর নামে পরিচিত হন। হরকৃষ্ণের শাসনকাল অতি অল্প হইলেও তিনি সেই

অল্পকালের মধ্যে অনেক দান করিয়া গিয়াছেন। হরকৃষ্ণের প্রতিপক্ষ পূর্ব্ববর্ত্তী পদচ্যুত আমিলের প্ররোচনায় গুপ্ত ঘাতকের হাতে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর দিল্লী হইতে নূতন আমিল নিযুক্ত হইতে প্রায় এক বৎসর সময় লাগিয়াছিল। এই এক বৎসর শ্রীহট্টের শাসন কার্য্যে নায়েব ফৌজদার সাদেকউল্লা, সেনাধ্যক্ষ হরদয়াল ও দেওয়ান মাণিকচাঁদ একত্র এই তিন জনের উপর ন্যস্ত ছিল। ইঁহারা একযোগে কার্য্য করিতেন, তাঁহাদের যুক্ত শাসনের মোহরে তিন জনের নামের আদ্যাংশ লইয়া "সাদেকুল হরমাণিক" লিখিত ছিল।

এই শহরের যুগলটিলার বৈষ্ণব আখ্ড়া ও দুর্গাবাড়ী বিশেষ বিখ্যাত।

পীঠমালা তন্ত্রপাঠে জানা যায় যে সতীদেহের গ্রীবা ও বাম জঙঘা শ্রীভূমি বা শ্রীহট্টে পতিত হইয়াছিল। শ্রীহট্ট শহর হইতে দেড় মাইল দক্ষিণে গোটাটিকর জৈনপুর নামক পল্লীতে গ্রীবাপীঠ অবস্থিত। এখানে দেবীর নাম মহালক্ষ্মী ও ভৈরব সর্ব্বানন্দ। শিবরাত্রি ও অশোকাষ্টমীর সময়ে এখানে মেলা হয়।

বামজঙঘা মহাপীঠ শ্রীহট্ট শহর হইতে ৩৮ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে প্রাচীন জয়ন্তীয়া রাজ্যের অন্তর্গত বাউরভাগ বা ফালজোর নামক গ্রামে একটি পর্ব্বতের পাদদেশে অবস্থিত।

ইহা সাধারণ্যে ফালজোরের কালীবাড়ী বলিয়া পরিচিত। এখানে দেবীর নাম জয়ন্তী, ভৈরব ক্রমদীশ্বর। প্রস্তরময়ী দেবীর সহিত ভৈরব অবিচ্ছিন্নরূপে অবস্থিত। শ্রীহট্ট হইতে বর্ষাকালে স্টীমারে ও অন্যান্য ঋতুতে নৌকায় কানাইর ঘাট পৌছিয়া তথা হইতে পদব্রজে ৫ মাইল পথ গেলে এই মহাপীঠে পৌছানো যায়। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই তীর্থে বহু নরবলি হইয়া গিয়াছে। জয়ন্তীয়া রাজ্য ইংরেজের অধীনে আসিলে এই প্রথা বন্ধ হয়।

পূর্ব্বে এই মহাপীঠ অজ্ঞাত অবস্থায় ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে জয়ন্তীয়ার বড় গোসাইএর রাজত্ব কালে এই মহাপীঠের প্রকাশ হয়। একদা এক দল রাখাল বালক একটি শিলাখণ্ড লইয়া পূজা পূজা খেলিতেছিল। একজন পূজারী হইল, একজন ছাগল হইল, একজন ঘাতক ইত্যাদি। পূজান্তে ছাগরূপী বালককে বলি দিবার সময় খড়্গের স্থলে তৃণ দিয়া আঘাত করিলে বালকটি দ্বিখণ্ডিত হইয়া যায়। বালকেরা ভয়ে পলাইয়া গেল। এই ব্যাপার শুনিয়া জয়ন্তীয়া রাজের গুরু আধ্যাত্মিক প্রমাণ পাইয়া ও শাস্ত্রালোচনার দ্বারা স্থির করেন যে এই শিলাখণ্ডই বামজঙঘা মহাপীঠ বা জয়ন্তী দেবীর প্রতিকৃতি। এখানে সতীর বামজঙঘা পতিত হয়। বামজঙঘা হইতে বামউরুভাগ ও তাহা হইতে বাউরভাগ নাম হইয়াছে।

বাউরভাগ হইতে দুই মাইল দূরে একটি পর্ব্বতের উপর রূপনাথ শিব ও রূপনাথ গুহা অবস্থিত। এই অন্ধকারাবৃত গুহার মধ্যে বহু স্বাভাবিক শিবলিঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে পর্ব্বতগাত্রে সতত জলবিন্দু সঞ্চিত থাকে। তাহার উপর আলোক সম্পাত হইলেই মনে হয় যেন শত শত নক্ষত্র শোভা পাইতেছে। ইহাকে "নক্ষত্র মণ্ডল" বলে। এই গুহার মধ্যে একখানি প্রস্তর নির্ম্মিত ত্রিশূল প্রথিত আছে। উহা মহাকালের ত্রিশূল নামে প্রসিদ্ধ। কথিত আছে যে অসুরগণের ভয়ে ভীত দেবগণ এই গুহার মধ্যে লুকাইয়া থাকিতেন। রূপনাথ গুহার নিকটে "সাত হাত পানি," "গুপ্তগঙ্গা" ও "পাতালগঙ্গা" নামক অপর কয়েকটি তীর্থ আছে। "সাত হাত পানি" একটি

কুণ্ড বিশেষ। ইহাতে সাত হাতের বেশী জল কখনও থাকে না। এখানে সর্ব্ব তীর্থের সমাবেশ হয় বলিয়া প্রবাদ আছে। পর্ব্বত গাত্র হইতে নিঃসৃত একটি জলধারার নাম গুপ্তগঙ্গা। এই জলধারাটি যে কোথা হইতে আসিতেছে তাহা কেহই বলিতে পারে না। স্থানীয় লোকদের বিশ্বাস যে রূপনাথ শিবের অভিষেকের জন্য গঙ্গা গুপ্ত ভাবে এই ধারার মধ্যে প্রবাহিত হইতেছেন। নিকটস্থ অনুরূপ একটি কুণ্ডের নাম পাতালগঙ্গা। এই স্থানে শিবরাত্রি ও বারুণীর সময়ে বহু যাত্রীর সমাগম হয়।

রূপনাথ শিবের দক্ষিণে একটি জলাশয়ের ধারে কাল পাথরের একটি প্রকাণ্ড হস্তী মূর্ত্তি আছে। দেখিলে মনে হয় ঠিক যেন জীবন্ত বন্য হস্তী জল পানের জন্য আসিয়াছে।

শ্রীহট্ট জেলা চৈতন্য-যুগের বহু বৈষ্ণব ভক্তের জন্মভূমি। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পৈতৃক নিবাস ছিল শ্রীহট্টে। শ্রীহট্ট হইতে ১৪ মাইল দক্ষিণ পূর্ব্বে "ঢাকা দক্ষিণ" দত্তরাইল নামক গ্রামে চৈতন্য দেবের জনক জগন্নাথ মিশ্রের জন্মস্থান। এখানে মহা-প্রভুর মন্দির আছে। ইহা ঠাকুর বাড়ী নামে খ্যাত। শ্রীচৈতন্যদেব বৃদ্ধা পিতামহীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া তাঁহাকে দুইটি মূর্ত্তি দিয়া যান বলিয়া কথিত। একটি নিজের এবং অপরটি কৃষ্ণমূর্ত্তি। দুটি মূর্ত্তিই ঠাকুর বাড়ীতে পূজিত হয়। শ্রীহট্ট হইতে এই স্থান পর্য্যন্ত ভাল রাস্তা আছে। ঢাকা দক্ষিণে কৈলাস নামক ছোট একটি পাহাড়ে গোপেশ্বর শিব আছেন।

শ্রীহট্ট হইতে স্টীমারে করিয়া এই জেলার প্রাচীন লাউড়ের অন্তর্গত অন্যতম মহকুমা সুনামগঞ্জে যাইতে হয়। শ্রীহট্ট হইতে সুনামগঞ্জ নদীপথে ৬৫ মাইল দূর। স্টীমারে প্রায় ৯ ঘণ্টা সময় লাগে। সুনামগঞ্জ হইতে প্রাচীন লাউড় রাজ্যের অন্তর্গত নবগ্রামের পণাতীর্থে যাওয়া যায়। নবগ্রাম প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব অদ্বৈত আচার্য্যের জন্মস্থান। স্বীয় জননীর স্নানের জন্য অদ্বৈত আচার্য্য শক্তিবলে লাউড় পাহাড়ের উপর সমগ্র তীর্থের সমাবেশ করেন। তীর্থগণ বৎসরের মধ্যে একদিন লাউড়ে আসিবার জন্য পণ করিয়াছিল বলিয়াই ইহার নাম পণাতীর্থ। এই তীর্থটি একটি ঝরণা। ঈশান নাগর কৃত "অদ্বৈত প্রকাশ" গ্রন্থে পণাতীর্থের বিবরণ সবিস্তারে বর্ণিত আছে। বারুণীর সময়ে এখানে বিস্তর জন সমাগম হয়।

লাউড়ে প্রাচীন কালে ভগদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন বলিয়া কথিত। দৈবশক্তি সম্পন্ন দ্রুতগামী হস্তী পৃষ্ঠে তিনি রাজ্যের সীমান্ত পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিতেন। কেহ কেহ বলেন ইনিই কামরূপ রাজ ভগদত্ত। লাউড় কামরূপের অন্তর্গত ছিল।

শ্রীহট্ট হইতে প্রায় ৩০ মাইল দূরে শ্রীহট্ট-শিলং মোটর রাস্তার উপর জয়ন্তীয়াপুর অবস্থিত। এখানে জয়ন্তীয়া রাজ্যের রাজধানী ছিল। জয়ন্তীয়ারাজ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত জয়ন্তেশ্বরী নামক এক কালীমন্দির এখানে বিদ্যমান আছে। পূর্ব্বে এই কালীর নিকট নরবলি দেওয়া হইত। এখনও প্রতি অমাবস্যা তিথিতে বহু লোক এখানে পূজা দিতে আসে।

লাতু—আখাউড়া জংশন হইতে ৫৪ মাইল। স্টেশন হইতে ৫ মাইল দূরে পঞ্চখণ্ডের সুপতলা গ্রামে বাসুদেবের মন্দির বিদ্যমান। এক খণ্ড কালো পাথরে তিনটি সুন্দর মূর্ত্তি উৎকীর্ণ।

মধ্যে বাসুদেব ও দুই পার্শ্বে লক্ষ্মী ও সরস্বতী মূর্ত্তি। বাসুদেবের নাম হইতে স্থানটিকে বাসুদেবপুর বলা হয়।

করিমগঞ্জ জংশন—আখাউড়া জংশন হইতে ১২১ মাইল দূর। ইহা শ্রীহট্ট জেলার একটি মহকুমা ও বিখ্যাত বাণিজ্য কেন্দ্র। শহরটি কুশিয়ারা নদীর তীরে অবস্থিত। এখানে তিনটি হাই স্কুল ও একটি বালিকা বিদ্যালয় আছে।

এই মহকুমায় অনেক চা-বাগান আছে।

করিমগঞ্জ জংশন হইতে একটি শাখা লাইন ৩১ মাইল দূরবর্ত্তী দুর্ল্লভছড়া পর্য্যন্ত গিয়াছে।

এই শাখাপথের বারৈগ্রাম জংশন হইতে অপর একটি শাখা ৮ মাইল দূরবর্ত্তী **কলকলিঘাটে** গিয়া শেষ হইয়াছে। এই শাখা রেলপথ দুটি শ্রীহট্টের প্রাচীন খণ্ডরাজ্য প্রতাপগড়ে অবস্থিত। পুরাতন রাজবাড়ীর ভগ্নাবশেষ জঙ্গল মধ্যে দৃষ্ট হয়। এই রাজবাড়ী পাথরের কারুকার্য্যে সুশোভিত ছিল। আদম আইল ও দু-আলিয়া নামক দুইটি পর্ব্বত শ্রেণী এই রাজ্যের মধ্য দিয়া উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত রহিয়াছে।

বদরপুর জংশন—আখাউড়া জংশন হইতে ১২৮ মাইল দূর। ইহা একটি প্রসিদ্ধ জংশন ও বাণিজ্য প্রধান স্থান। বদরপুর বন্দর বরাক নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। এই স্থান শ্রীহট্ট জেলার শেষ সীমানা। বরাক নদীর উপরকার রেলওয়ে সেতুটি একটি দ্রষ্টব্য বস্তু। আসাম বাংলা রেলপথের পার্ব্বত্য বিভাগ এখান হইতে বাহির হইয়াছে। স্টেশনের অনতিদূরে বরাক নদীর ধারে সিদ্ধেশ্বর শিবের মন্দির অবস্থিত। এই শিব কপিল মুনি কর্ত্তৃক স্থাপিত বলিয়া কথিত। বায়ুপুরাণমতে এই স্থানের নাম কপিলতীর্থ এবং কপিল মুনি এই স্থানেই তপস্যা করিয়াছিলেন। বায়ুপুরাণে বরাক বা বরচক্র নদের মাহাত্ম্যও লিখিত হইয়াছে। বারুণী উপলক্ষে এই স্থানে একটি বৃহৎ মেলা হয় এবং বহু লোক স্নানার্থে আসিয়া থাকেন।

বরাক নদীর অপর পার হইতে কাছাড় জেলার সীমানা আরম্ভ হইয়াছে। কাছাড় শব্দটি নেপালী ভাষার শব্দ। উহার অর্থ "প্রান্তদেশ"। এই জেলার দক্ষিণাংশ সমতল। এই অংশে প্রধানতঃ বাঙালীর বাস। জেলার উত্তরাংশ পর্ব্বতবহুল ও জনবিরল। এই বিভাগে নাগা, কুকী প্রভৃতি পার্ব্বত্য জাতির বাস। শ্রীহট্টের ন্যায় কাছাড় জেলায়ও বিস্তর চা-বাগান আছে।

কাছাড়ের প্রাচীন নাম হৈড়ম্ব প্রদেশ। পূর্ব্বে এখানে একটি স্বাধীন রাজ্য ছিল। উক্ত রাজবংশীয়গণ হিড়িম্বা ও ভীমের পুত্র ঘটোৎকচের বংশধর বলিয়া আত্মপরিচয় দিতেন। ত্রিপুরা রাজপরিবারের সহিত এই রাজবংশের বৈবাহিক সম্বন্ধ ছিল। এই রাজবংশের প্রাচীন কীর্ত্তি **মাইবং** নামক স্থানে এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। মাইবং স্টেশনটি বদরপুর-লামডিং বা পার্ব্বত্য বিভাগে অবস্থিত। বদরপুর জংশন হইতে ইহার দূরত্ব ১৪৯ মাইল। এই পথে বদরপুর জংশন হইতে ৩৭ মাইল দূরবর্ত্তী ডামছেরা একটি মনোরম স্থান। ইহার চতুর্দ্দিকের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি সুন্দর। আহোম ও নাগাগণ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া মাইবং আসিবার পূর্ব্বে কাছাড়ী

রাজাদের রাজধানী ছিল ডিমাপুরে। ইহা পাণ্ডু-তিনসুকিয়া লাইনের মণিপুর রোড স্টেশনের নিকটেই অবস্থিত ছিল। ইহার বিস্তৃত ধ্বংসাবশেষ আজও দেখিতে পাওয়া যায়। পার্ব্বত্য বা উত্তর কাছাড়ের মহকুমা দপ্তর ৩১১৭ ফুট উচচ হাফ্‌লং শৃঙ্গ। এই স্টেশন বদরপুর জংশন হইতে ৮৭ মাইল। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম। এখানে একটি অতি সুন্দর হ্রদ দেখিতে পাওয়া যায়।

কাটাখাল—বদরপুর জংশন-শিলচর শাখা লাইনে অবস্থিত এবং আখাউড়া জংশন হইতে ১৩৫ মাইল। এখান হইতে একটি শাখা লাইন কাছাড় জেলার অন্যতম মহকুমা হাইলাকান্দি হইয়া ২২ মাইল দূরবর্ত্তী লালাঘাট পর্য্যন্ত গিয়াছে। হাইলাকান্দি মহকুমায় বহু চা-বাগান আছে।

শিলচর—আখাউড়া ও বদরপুর জংশন হইতে যথাক্রমে ১৪৬ ও ১৮ মাইল। ইহা কাছাড় জেলার সদর। বরাক নদীর তীরে অবস্থিত এই শহরটির স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য অনুপম। অনতিদূরে উত্তর কাছাড়ের দৃশ্য সুন্দর।

মাইবং হইতে কাছাড়ী রাজাদের রাজধানী শিলচরের ১০ মাইল উত্তরে খাসপুরে স্থানান্তরিত হয়। রাজবাড়ীর ভগ্নাবশেষ ও রাজবংশ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত রণচণ্ডী দেবীর মন্দির এখনও এখানে বিদ্যমান আছে।

শিলচর হইতে মণিপুর রাজ্যের রাজধানী ইম্ফল ও লুসাই-পাহাড় জেলার প্রধান শহর আইজলে যাওয়া যায়।

শিলচর হইতে ইম্ফলের দূরত্ব ১২৫ মাইল। ইহার মধ্যে কতকটা পথ মোটর গাড়ীতে ও মধ্যবর্ত্তী কতকটা পথ ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতে হয়। পথিমধ্যে বিশ্রামের জন্য স্থানে স্থানে রেস্ট হাউস্ বা বিশ্রামাগার আছে। এই পথের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি সুন্দর।

মণিপুর একটি করদ রাজ্য। মণিপুররাজ ইংরেজ সরকারকে বার্ষিক পঞ্চাশ হাজার টাকা কর দিয়া থাকেন। এই রাজবংশ অর্জ্জুনের পুত্র বভ্রুবাহনের বংশধর বলিয়া খ্যাত। মণিপুর রাজ্যে লোগটক্ নামে অতি সুন্দর একটি হ্রদ আছে। উহা দৈর্ঘ্যে ৮ মাইল এবং বিস্তারে ৫ মাইল। ইম্ফল হইতে উহা ৩০ মাইল দূর। এই হ্রদটি দেখিবার জন্য বহু ভ্রমণকারী মণিপুর যাইয়া থাকেন। মোটরবাসে এই হ্রদে যাওয়া যায়। মণিপুরের অধিবাসিগণ বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী এবং শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্ত। প্রাচ্য নৃত্যকলায় মণিপুরী নৃত্যের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। মণিপুরের রাসলীলা ও দোলযাত্রা উৎসব বিশেষ বিখ্যাত। প্রবাদ যে জগদ্বিখ্যাত "পোলো" খেলার উৎপত্তি মণিপুর হইতে হইয়াছে।

শিলচর হইতে আইজলের দূরত্ব ১১১ মাইল। এই পথে আটটি সুসজ্জিত বিশ্রামাগার আছে। শিলচর হইতে দোয়রবাঁধ পর্য্যন্ত প্রথম ১৮ মাইল পথ গো-যানে যাওয়া যায়। ইহার পরবর্ত্তী পথ অশ্বারোহণে যাইতে হয়। শিলচর হইতে নৌকাযোগেও আইজলে যাওয়া যায়। ইহাতে সাধারণতঃ ১৫ দিন সময় লাগে। লুসাই পাহাড়ের পাদদেশস্থ সাইবং নামক স্থান পর্য্যন্ত নৌকাযোগে গিয়া সেখান হইতে প্রায় ১৪ মাইল পথ গো-যানে যাইতে হয়। নৌকাপথের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোহর।

উপসংহার

পাৰ্ব্বত্য বিভাগ বা বদরপুর-লাম্‌ডিং শাখা পার হইয়া আসাম-বাংলা রেলপথের প্রধান লাইন একদিকে তিনসুকিয়া ও অন্যদিকে গৌহাটি ও পাণ্ডু পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই বিস্তৃত ভূভাগ বনজ ও খনিজ সম্পদে পরিপূর্ণ। তিনসুকিয়ার নিকটবর্ত্তী অঞ্চল কেরোসিন তৈল, পেট্রোল ও কয়লার জন্য বিখ্যাত। ভাষা ও বেশভূষার দিক দিয়া গারো, নাগা, মিকির ও কুকি প্রভৃতি পাৰ্ব্বত্য জাতি এই স্থানের বৈশিষ্ট্য ঘোষণা করে। বস্তুতঃ ভ্রমণকারীর পক্ষে আসাম-বাংলা রেলপথ তথা আসাম প্রদেশ অপূৰ্ব্ব বৈচিত্র্যের আধার।

বাংলায় ভ্রমণ

দ্বিতীয় খণ্ড

—স্থান-সূচী—

দ্রষ্টব্য :—কোন স্থানের পার্শ্বে একাধিক পত্রাঙ্ক থাকিলে উহা একই নামের বিভিন্ন স্থান বলিয়া বুঝিতে হইবে।

পৃষ্ঠা